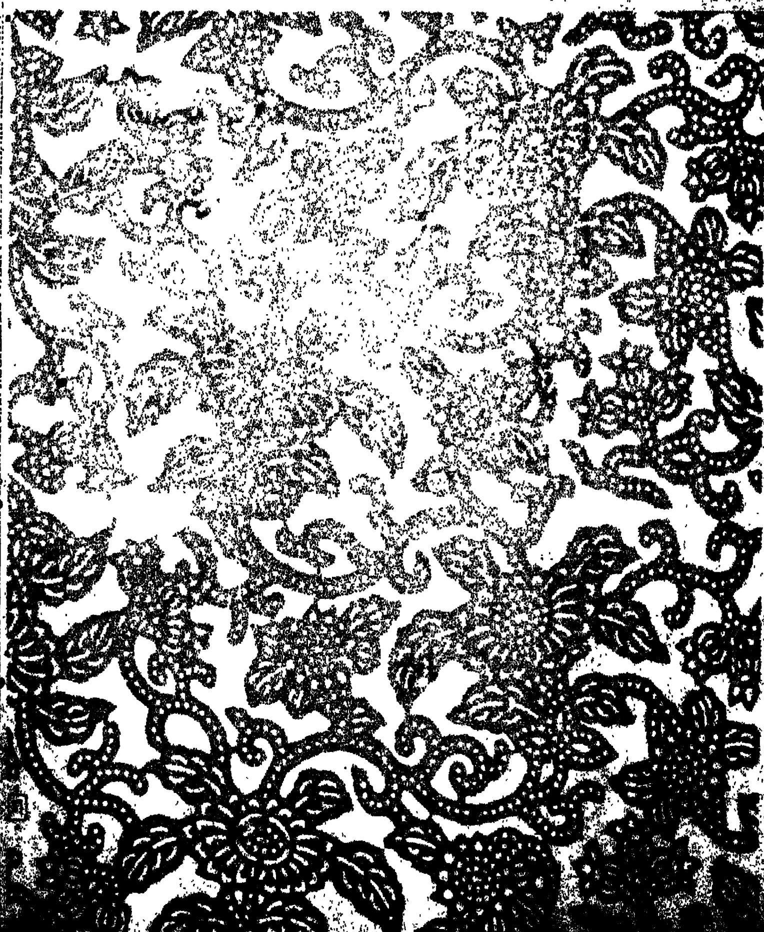
কবি ভারতচন্দ্র

শঙ্করীপ্রসাদ বসু



কবি ভারতচন্দ্র

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৬৭
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
মণ্ডল বুক হাউস
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীগণেশ বসু
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
ব্লক নির্মাতা
মডার্ন প্রসেস
কলকাতা-৯
মুদ্রক
অজিতকুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯।

পঁচিশ টাকা

উৎসর্গ

শ্রীমতী বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে

যিনি জীবনের ইতিহাস এবং
ইতিহাসের জীবনকথা লেখেন।

সূচীপত্র

ভূমিকা

বই যেমনই হোক, তার একটা ভূমিকা থাকে। অনেক সময়ে ভূমির চেয়ে ভূমিকা বড় হয়ে দাঁড়ায়। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ লেখকের বিশেষ দাবির ঘোষণা থাকে ভূমিকায়, যা তিনি ছাড়া অর হয়ে কে আর করবেন? তদনুযায়ী এই বইয়ের ভূমিকাও বড় হতে পারত, কারণ ভারতচন্দ্রের কবিমন ও কাব্য সম্বন্ধে নূতনভাবে কিছু বলবার চেষ্টা করেছি ('নূতন' কথাটায় যে-কোনো লেখকের জন্মগত অধিকার!)—এই বিনীত দাবি আছে, কিন্তু না, আমি পাঠকদের বন্ধু মনে করি, তাঁরাই স্থির করবেন, ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে।

প্রায় কুড়ি বছর আগে ডঃ মদনমোহন গোস্বামীর ভারতচন্দ্র বিষয়ে উৎকৃষ্ট গবেষণাগ্রন্থটি বেরোয়। সেটি পড়ে, প্রভূত তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, মনে হয়েছিল, সাহিত্যের দিক দিয়ে এই কবির পুনর্বিচার প্রয়োজন। তদনুযায়ী অবিলম্বে এই বইয়ের বেশি অংশ লিখে ফেলি, এবং কবি অধ্যাপক বিভূতি চৌধুরীকে, ও পরে সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে পাণ্ডুলিপি পড়তে দিই। তাঁরা যেসব মন্তব্য করেন তাতে স্নেহপক্ষপাতের এমন প্রাবল্য এবং নিরপেক্ষতার এমন অভাব দেখা গিয়েছিল যে, সৃষ্টিস্নেহাতুর এই লেখকের পক্ষেও সেগুলি ব্যক্ত করা সম্ভব নয়; ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত স্মিতকৌতূহলের সঙ্গে গ্রন্থের বিষয়-বক্তব্য শুনেছিলেন। এঁরা অকালে লোকান্তরিত। এঁদের কথা আজ বিশেষ-ভাবে মনে পড়ছে।

আমার অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী মহাশয়ও ঐ সময়ে এই বইয়ের পাণ্ডু-লিপির কিছু অংশ পড়েছিলেন। কয়েকটি বিষয়ে তিনি আমাকে তীক্ষ্ণভাবে সতর্ক করে দেন, যাতে ক্ষেত্রবিশেষে আমার উগ্র উৎসাহ প্রশমিত হয়েছে। গ্রন্থের সূচনাংশটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের পত্রিকায় প্রকাশিত হলে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য আমাকে উৎসাহিত করেছেন। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়, বর্তমান লেখকের প্রতি স্নেহগুণে (বা দোষে) বইটি প্রকাশে বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। এর আশু প্রকাশের মূলে নিঃসন্দেহে তাঁরই প্রেরণা। অধ্যাপক জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য এবং ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের সঙ্গে এই গ্রন্থ-সূত্রে সাহিত্য বিষয়ে নানা আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি।

বহু বৎসর পরে বইটির পুনর্বিন্যাস ও পরিমার্জন করবার সময়ে একটি বৃহৎ নূতন অধ্যায় যোগ করেছি, 'ভারতচন্দ্র-সমালোচনার ধারা', যেটি লেখার সময়ে প্রচুর সাহায্য করেছেন অধ্যাপক স্বপন বসু। তিনি কৃতী গবেষক, সংবাদ তাঁর নখাগ্রে থাকে, সুতরাং স্বচ্ছন্দে বহু জিনিস জোগাড় করে দিয়েছেন। আমার অনুরোধে যেসব জিনিস এনে দিয়েছেন, তাদের উল্লেখ করছি না, কিন্তু স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে যা দিয়েছেন, তাদের কথা অবশ্যই জানাতে হবে। নিম্নলিখিত সূত্র থেকে তিনি সংবাদ দিয়েছেন:

৪ ডিসেম্বর ১৮৭২ ইণ্ডিয়ান অবজারভার; মাঘ ১৩৮০, জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৬ শক, বিবিধার্থ সংগ্রহ; জুলাই ১৮৫৫ ক্রীশ্চান অবজারভার; ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩ সোম-

প্রকাশ; ১০ মে ১৮৫২ সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়; ২৫ ফেব্রু. ১৮৩২ সমাচার দর্পণ। এবং সংবাদপত্রে সেকালের কথা থেকে কাশীপ্রসাদ ঘোষ-সংবাদ; এম পি সাহা সম্পাদিত লেবেডফ-ব্যাকরণ থেকে লেবেডফ-সংবাদ; লঙের ক্যাটালগ থেকে লঙের মন্তব্য; কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'রামমোহন' প্রবন্ধ থেকে মন্তব্য; বেথুন সোসাইটিতে বাংলা সাহিত্য-বিতর্ক বিষয়ে কয়েকটি সংবাদ (মন্মথনাথ ঘোষের 'রঙ্গলাল' গ্রন্থ থেকেও), বাংলা ছাপাখানার প্রথম পর্বের সংবাদ, কলকাতায় প্রথম বাংলা অভিনয়-সংবাদ, অন্নদামঙ্গলের প্রথম পৃষ্ঠার বিবরণ ইত্যাদি।

গ্রন্থমধ্যে কাশীপ্রসাদ ঘোষ কর্তৃক ১৮৩০ খ্রীঃ বিদ্যাসুন্দরের আংশিক ইংরেজি অনুবাদের কথা বলেছি। বই ছাপা হয়ে যাবার পরে শ্রীস্বপন বসু কাছাকাছি সময়ে বিদ্যাসুন্দরের সম্ভাব্য বিস্তৃততর ইংরেজি অনুবাদের সংবাদ দিয়েছেন:

বাঙ্গালা পুস্তকের ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ:

অপর নায়ক নায়িকার রসবিস্তারঘটিত যে অতি প্রসিদ্ধ বিদ্যাসুন্দর পুস্তক শোভাবাজারের শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় বিজ্ঞব্যক্তিরদের মধ্যে এই গ্রন্থ অতিশুশ্রূষণীয় এবং যাঁহারা ঐ নায়ক-নায়িকাবিষয়ক রসানভিজ্ঞ তাঁহারদের অতি সুশ্রাব্য।

[সমাচার দর্পণ, ৭২৬ সংখ্যা; ২৫.২.১৮৩২]

গ্রন্থ রচনাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথিশালা বিশেষভাবে ব্যবহার করেছি। শ্রীসুকুমার মিত্র এবং শ্রীঅরুণ বসুর সাহায্য কৃতজ্ঞমনে স্মরণ করছি।

বিদগ্ধ পাঠকের কাছে এই বইয়ের অনেক দোষ ধরা পড়বে, যেহেতু কোনো কোনো দোষ মমতাকাতর লেখকের চোখেই ধরা পড়েছে। চেষ্টা করেও সব ছাপার ভুল দূর করা যায়নি, ভুল নাকি মুদ্রণধর্ম। তা লেখকধর্মও বটে। অবশ্যই তথ্যে ও বিচারে অনেক ভুল করেছি। সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু নিশ্চয় ক্ষমা পাব না পাদটীকা-বাহুল্যের জন্য, যার কোনো কোনোটি ছোটখাট প্রবন্ধের আকার ধরেছে। এতখানি পায়াভারী ব্যাপারকে কোনো পাঠকের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়, বিশেষতঃ যখন মাথাভারী হবার গুণ এই লেখার নেই। এক্ষেত্রে পাঠককে অনুরোধ, পাদটীকার অস্তিত্ব ভুলে এগিয়ে যান।

গ্রন্থের প্রকাশককে ধন্যবাদ দেওয়া রীতিসম্মত নয়, কারণ এটা তাঁর ব্যবসায়িক কাজ। কিন্তু বর্তমানে বাংলা বইয়ের বাজার যে-রকম, তাতে মোটামুটি বড় আকারের প্রবন্ধ-বই যিনি প্রকাশ করার সাহস দেখান তাঁকে প্রকাশক না বলে পৃষ্ঠপোষক বলাই উচিত। এই বই বার করে শ্রীযুক্ত সুনীল মণ্ডল মহাশয় আমার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

:বি, ওলাবিবিতলা লেন,
হাওড়া-৪

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

ভারতচন্দ্রের কবিমানস

॥ ১ ॥

বিক্ষুব্ধ জীবন

মধ্যযুগের বাঙালি-কবিদের মধ্যে মানসিক জটিলতা ভারতচন্দ্রেই সর্বাধিক। তাঁর সম্বন্ধে উগ্র নিন্দা বা প্রশংসার একটা কারণ এখানে পাওয়া যাবে। ভারতচন্দ্রের কাব্য আলোচিত হলেও তাঁর কবিমনের যথেষ্ট বিশ্লেষণ হয়েছে মনে হয় না। অথচ ভারতচন্দ্র সেই শ্রেণীর কবি, নিছক কাব্যের আলোচনায় যাঁকে সম্পূর্ণ ধারণা করা যায় না, তাঁর মানস-পরিস্থিতি সম্পূর্ণ না বুঝলে বোধ হয় তাঁর কাব্যের পূর্ণ রসাস্বাদও সম্ভব নয়।[১] কাব্যের অত্যুজ্জ্বল রূপ কবির মানসদ্বিধা ও দ্বন্দ্বক্ষোভকে আপাতত গোপন করলেও সেই দীপ্তির আতিশয্যই মনের আংশিকতাকে প্রকাশ করে দিয়েছে। হাসির ছটায়, ব্যঙ্গের জ্বালায়, প্রবৃত্তির উত্তেজনায় কবি অনেক কিছু ঢাকতে চেষ্টা করেছেন। আমরা প্রথমে সেই মনের একটা মোটামুটি রূপ খাড়া করে পরে কাব্যালোচনার চেষ্টা করব।

মধ্যযুগের বাঙালি-কবির মনকে বুঝবার একটি বড় বাধা তথ্যের

১। কাব্যের সঙ্গে কবিকেও বুঝবার প্রয়োজনীয়তা আছে, একথা অন্য কেউ নন, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, যিনি অপরপক্ষে নিজের ব্যক্তিজীবনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন যাতে পরবর্তী গবেষকেরা তাঁর জীবনের সঙ্গে সাহিত্যকে যুক্ত করতে না পারেন! কিন্তু জীবন ও সাহিত্যকে একযোগে দেখার মূল্যকে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন দীনবন্ধু ও ঈশ্বরগুপ্তের উপরে আলোচনা করার সময়ে, এবং স্বীকারও করেছেন: 'কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।…কবিতা কবির কীর্তি, তাহা তো আমাদের হাতেই আছে, পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে এই কীর্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে।'

অভাব। শ্রীচৈতন্যের অভাবিত ব্যক্তিত্বে আত্মহারা হয়ে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাঁর বা তাঁর অনুবর্তীদের দু' চারখানা জীবনী লিখেছিলেন বটে, কিন্তু জীবনী বা ইতিহাসরচনা তাঁদের ধাতসই ছিল না কোনোকালেই। কবিরা যে কাব্য রেখে গেছেন, সেগুলোকেই উপযুক্ত-ভাবে রক্ষা করা যায় নি, আবার কবিদের জীবনী! ভারতচন্দ্রের ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্তের মতো উৎসাহী সমঝদারের সাধু চেষ্টায় জীবনীর একটি ক্ষীণসূত্র পাওয়া গেলেও তা সিদ্ধান্ত খাড়া করবার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। তবু আমাদের অসম্পূর্ণ চেষ্টা করে যেতে হবে।

কবির মনোভূমি আবিষ্কারের জন্য সেকালের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক পরিবেশ এবং তাঁর ব্যক্তিজীবনের তথ্যানুসন্ধান প্রয়োজন। ভারতচন্দ্রের কাব্য সম্বন্ধে যাঁরা আলোচনা বা গবেষণা করেছেন, তাঁরা ঐসব বিষয়ে যথেষ্ট জোর দিয়েছেন। আঠারো শতকের বাংলাদেশের বিপর্যস্ত অবস্থা কারো চোখ এড়াবার নয়। মোগলসাম্রাজ্যের পতন সুস্থির জীবনাশ্রয়-নাশেরই তুল্য। অরাজকতা আর অতিরাজকতায় দেশের প্রজার নাভিশ্বাস উঠেছে। নূতন আশা-বিশ্বাসের উদয়গিরিও দৃষ্টির অগোচর। দেশে কেবল অন্নের নয়, প্রাণেরও দুর্ভিক্ষ। এমনই সময়ে—স্থানীয় প্রধানদের কোলাহল আর অত্যাচারের মধ্যে, প্রজাপুঞ্জের মনে অব্যাহতি-কামনার একটা ক্লান্ত চাঞ্চল্য যখন জেগেছে, তখন সহসা শোনা গেছে নূতন এক শক্তির বাত্যরব—তার আঘাতে মুসলমানরাজের অপস্থিতি এবং তার প্রশ্রয়ে হিন্দুর চোখে রাজ্যপাট সাজাবার মদির স্বপ্নের প্রাসাদ-নির্মাণ। ভারতচন্দ্র এই যুগের কবি। বড় জমিদার এখন কালধর্মে 'ধরণী-ঈশ্বর'রূপে অনুজ্ঞা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করছেন; বিক্রমাদিত্যের আবেশগ্রস্ত কৃষ্ণচন্দ্রের কালিদাস প্রয়োজন হয়েছে—ফলে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতন ও কয়েক বিঘা নিষ্কর জমির বিনিময়ে ভারতচন্দ্র কালিদাসের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে গেলেন।

কিন্তু ভারতচন্দ্র সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। কেবল ব্যক্তিগত সাচ্ছল্যের অভাবের জন্য নয়, সমাজজীবন ও ধর্মবোধের অসামঞ্জস্যে এবং নিজস্ব আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠায় পীড়াবোধ করবার মত মানসিক প্রখরতা তাঁর

ছিল। ভাগ্যতাড়িত ভারতচন্দ্রের কাছে সমাজবিধির বহু অংশ অর্থহীন মনে হয়েছিল, মনে-প্রাণে বুঝেছিলেন ধর্মকলহের অসারত্ব। এই পর্যন্তই। তাঁর ছিল সমস্যার জ্ঞান। সমস্যার জ্ঞান আর সমাধানের প্রজ্ঞা এক জিনিস নয়। আবার সমাধান-নির্দেশের ক্ষমতা থাকলেও একই সঙ্গে সে ঘোষণার মূল্যহীনতা প্রতীয়মান হতে পারে। তেমন ক্ষেত্রে সমর্থ প্রতিভা ব্যর্থ ক্রোধে আত্মদংশন করে। ভারতচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তাঁর আত্মসজ্ঞানতা তাঁর মনের প্রসন্নতা ঘুচিয়ে, রূঢ় প্রগল্‌ভতায় প্রলুব্ধ করে, তাঁকে সমালোচনার লক্ষ্য করে তুলেছে।

সমকালীন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অবস্থার সম্বন্ধে বেশি কথা বলার প্রয়োজন নেই। সে বিষয়ে উপযুক্ত আলোচনা আছে। ভারতের ব্যক্তিজীবনের প্রসঙ্গে অবতরণ করতে চাই। তবে ব্যক্তিজীবনের উপর প্রতিক্রিয়াকারী সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থার উল্লেখ প্রয়োজনমত করে যাব।

ভারতচন্দ্রের স্বল্পপরিমাণ জীবনকাহিনী, কাব্যের অন্তর্গত আত্মকথন ও ভণিতা, 'নাগাষ্টক' ও 'বাসনা' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা এ-ব্যাপারে আমাদের অবলম্বন।

মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্ররায়ের পুত্র ভারতচন্দ্র রায় মূলাজোড়ের গঙ্গাতীরে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে যখন দেহত্যাগ করলেন, তখন তাঁর শেষ নিঃশ্বাসটি পরিপূর্ণ শান্তি ও সুখের মধ্যে পড়েছিল, এমন বলবার মতো উপাদান আমাদের হাতে নেই। অর্ধশতাব্দীর অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ প্রতিভাদীপ্ত সেই জীবনটি কিন্তু তারই মধ্যে আমাদের প্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেলেছে। ভারতচন্দ্র ভাগ্যের অনুকুলতা পান নি—কৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদ কৃষ্ণপক্ষের পাণ্ডুর চন্দ্রহাস্যের মতই তাঁর দুঃখময় জীবনপ্রান্তকে মাত্র আলোকিত করেছিল—বিনিময়ে তিনি বিরূপ ভাগ্যের বিরুদ্ধে পরিহাসময় চৈতন্যদীপ্ত একটি প্রতিবাদ রেখে গেলেন। আদিরসের তরঙ্গবেষ্টনের মধ্যে একটা ভিন্নতর জীবনবোধের আভাস পেয়ে আমরা চমকিত হলাম।

নরেন্দ্ররায়ের আর পাঁচজন পুত্রের মতো তিনি ছিলেন না। বর্ধমানেশের

সঙ্গে বিবাদে সপুত্র নরেন্দ্ররায় সম্পত্তি হারিয়েছিলেন—নরেন্দ্ররায়ের ভারতচন্দ্র-নামক বালক-পুত্রটি হারিয়েছিলেন আরো কিছু, পিতৃ-সম্পত্তির সঙ্গে সম্পত্তিপুষ্ট সংস্কৃতিজীবন যাপনের সম্ভাবনাকেও। অথচ বিদ্যাহীনতা আর অবিদ্যাময়তা তাঁর কাছে একই কথা। বালক তাই মাতুলালয়ে পালিয়ে গিয়ে সেখানে থেকে সংস্কৃত শিখতে লাগলেন। ব্যাকরণ, অভিধান যখন আয়ত্ত করলেন, তখন বয়স মাত্র চৌদ্দ। কৃতবিদ্য বালক বড় প্রত্যাশা নিয়ে ঘরে ফিরলেন, পেলেন কিন্তু অপ্রত্যাশিত রূঢ় আঘাত। ভাইয়েরা বৈষয়িক; সংস্কৃত বহুদিন অন্ন-হীন ব্রাহ্মণের কুটীরবদ্ধ—সেই সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য? অনুচিত গঞ্জনায় আক্রান্ত হলেন তিনি। প্রথম থেকেই ভারতচন্দ্র অনুভূতিশালী আর অভিমানী; পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাঁর গৃহত্যাগ; বিদ্যার্জন করে ঘরে ফিরেছেন; সে সংগ্রামের, সাফল্যের, এতটুকু সমাদর নেই!! ভাইদের তিরস্কারটা আরো বাজল—ইতিমধ্যে বিয়ে করেছেন। আনন্দময় পরিবারজীবনেব স্বপ্ন ছিঁড়ে ফেলে অর্থকরী আরবী-ফার্সী শিখবার উদ্দেশ্যে ভারতচন্দ্র আবার গৃহত্যাগ করলেন। দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র মুন্‌শীর বাড়ীতে থেকে কঠোর শ্রমে ও সাধনায় ফার্সী শিখলেন। মুসলমানী ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে এই প্রবেশ পরবর্তী-কালে তাঁর কাব্যে উল্লেখযোগ্য প্রভাববিস্তার কবেছিল। তাঁর প্রথম রচনা এই কালেই—সত্যপীরের দুটি ক্ষুদ্রাকার পাঁচালী। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি, ভারতচন্দ্রের পরিণত চিন্তা ও মনোবৃত্তির বীজ এই দুটি পাঁচালীর মধ্যেই রয়েছে—ধর্মদ্বেষহীনতা এবং কাম-মুগ্ধতা। সেই অল্পবয়সী বালকের আত্মসচেতনতা ও মানসিক পক্বতা অনুমান করা যায়।[২] ভারতচন্দ্র আবার ঘরে ফিরলেন। এইবারই প্রথম সমাদর পেলেন। এখন তাঁর আয়ত্তে আর নিরন্নের সংস্কৃত নয়,

---

২। ঈশ্বর গুপ্ত সংকলিত জীবনী অনুসারে ভারতচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র ১৪। কিন্তু ডঃ মদনমোহন গোস্বামী প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, কবি তখন ১৭ বছরের। ১৭ বছরকে অল্পবয়স বলা শক্ত। সে যুগে জীবনের অভিজ্ঞতা অল্পবয়সেই ঘটত। তবু, সতেরো বেশি বয়স নয়।

পলায়নের ফার্সী। সমাদৃত কবির গৌরবহাসিতে বঙ্কিমহাসি মিশিয়ে ছিল কি-না বলতে পারব না। নবার্জিত যোগ্যতার কর্মসংস্থান ঘটে গেল অবিলম্বে—সম্পত্তির তদারকিতে ভারতচন্দ্রকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বর্ধমানে। আনন্দে না দুঃখে তিনি বর্ধমানে গিয়েছিলেন, জানবার উপায় নেই। তবে যদি সরস্বতীর মাল্যরচনায় ইতিমধ্যে মন বসে থাকে, জমিদারীর মোক্তারগিরি ভাল না লাগাই স্বাভাবিক। ভারতচন্দ্র সেই বর্ধমানে গেলেন, যে-বর্ধমান তাঁর কবিজীবনের অভিশাপ। ভূপতি নরেন্দ্ররায়কে রাজ্যচ্যুত করেই সে-বর্ধমান সন্তুষ্ট হয় নি, তাঁর কনিষ্ঠ সন্তানটিকেও অল্পদিনের মধ্যে কারাগারে নিক্ষেপ করল। রাজকর্মচারীদের চক্রান্তে ভারতচন্দ্র কারাবাস করতে লাগলেন। তবে তাঁর চরিত্রের মাধুর্য ও আভিজাত্য একেবারে অগোচর থাকতে পারে না; কারাধ্যক্ষকে তা এবার মোহিত করল; পলায়নের সুযোগ পেলেন; গিয়ে হাজির হলেন মরাঠা-অধিকৃত কটকে, এবং সেখানকার সুবাদার শিবভট্টের কাছে আশ্রয় পেলেন। এই সময়ে তাঁর মর্মপীড়া চূড়ান্তে পৌঁছেছে। বিবাগী হয়ে নীলাচলে গিয়ে সেখানকার মঠে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর মতো দিন কাটাতে লাগলেন।

ভারতচন্দ্র জীবনমুগ্ধ, স্বভাবতঃ জীবনবিরাগী নন। অতি বাল্যকাল থেকে তাঁর সংগ্রাম জীবনের অপহৃত পানপাত্র পুনরুদ্ধারের জন্যই! এমন মানুষের বৈরাগ্যভাবনা, ভাগ্যের প্রতিকূলতার রূপ কল্পনা করতে সহায়তা করবে। জীবনযুদ্ধে পরাজিত, ভগ্ন, শ্রান্ত ভারতচন্দ্র অধ্যাত্মজীবনে শান্তি খুঁজছেন!! এই বৈরাগ্যের নির্মোক, অনুমান করতে পারি, জীবনীশক্তির পুনরুদ্ধার ও সংসারের অনুকূল আকর্ষণে সহজেই খসে পড়বে। ঘটনাও তাই। আরো বেশী বৈরাগ্যব্যাকুলতায় যখন নীলাচল থেকে বৃন্দাবন যাচ্ছেন, পথিমধ্যে খানাকুল-কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হলে তাঁর জনৈক আত্মীয় সংসারের প্রা৬ কর্তব্যবোধে তাঁকে (সহজেই?) উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হলেন এবং সকলের তৃপ্তিসাধন করে ভারতচন্দ্রের শিথিল গৈরিক বহির্বাস পরিত্যক্ত হল। সন্ন্যাসী এখন পনশ্চ সংসারী। সুতরাং সন্ন্যাসীর মাধুকরীর সুবিধা নেই—বেরুতে

হল চাকুরির সন্ধানে। আবার গৃহত্যাগ! প্রথমে গেলেন ফরাসডাঙ্গায় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকটে, তারপর কৃষ্ণনগরে 'ধরণী-ঈশ্বর' কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে। এরপরেই কবি কিছুকালের সুস্থিরতা পেয়েছিলেন, এবং সেই অবসরে 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করে কৃষ্ণচন্দ্রকে গৌরবান্বিত আর সাহিত্যরসিককে আনন্দিত করে গেছেন। এই হল ভারতচন্দ্রের সৌভাগ্যশশীর পূর্ণিমারজনী। রাজসভায় তিনি কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত, 'গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত, রসিকের দ্বারা সমাদৃত, সুজনের দ্বারা প্রশংসিত; মাসিক বৃত্তিধারী এবং ভূসম্পত্তির মালিক; পরম প্রিয় গঙ্গাতীরে নিজ অধিকারভুক্ত গ্রামে তাঁর নবনির্মিত গৃহ; সেখানে অতিথির কোলাহল, বৃদ্ধ পিতার অবস্থিতি, অন্নপূর্ণা-গৃহিণীর সদানন্দ প্রশ্রয়, 'আকুল হর্ষভরে শিশুর কলধ্বনি'—এ যে অবিশ্বাস্য সুখ! ট্রাজেডি-অভ্যস্ত পাঠকের বেদনাময় প্রত্যাশা পূরণ করে আবার বর্ধমান-শনি উপস্থিত হয়। বর্ধমানের রাজমাতার অনুরোধে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে ভারতচন্দ্রের মূলাজোড় গ্রামসাম্রাজ্যটি হস্তান্তর করতে দ্বিধা করলেন না। বর্ধমানের পত্তনীদার রামদেবের অত্যাচারে সকলের প্রাণ ত্রাহি-ত্রাহি করে উঠল অবিলম্বে। আবার সেই ঘরছাড়ার শনির ডাক; বড়র পিরীতির স্বরূপ স্মরণ করে কবি গৃহত্যাগে উদ্যত—প্রতিবেশীদের অনুরোধে শেষবারের মত রুখে দাঁড়ালেন। রামদেব নাগের চরিতকথা সংক্ষেপে আট শ্লোকে লিখে পাঠালেন কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে। নাগাষ্টকের কবিকৌশলে মুগ্ধ রসিক কৃষ্ণচন্দ্র নাগদমন করে যথার্থনামা হলেন এবং আমাদের কবি নিজ বাসগৃহে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের সৌভাগ্যে বঞ্চিত হলেন না।

জীবন সম্বন্ধে কবির অসরল দৃষ্টিভঙ্গির কারণ সদ্য-কথিত বিবরণ থেকে বোঝা যায়। ভারতচন্দ্রের মত জ্ঞানী, গুণী ও স্পর্শকাতর কবির পক্ষে ঐ কটু অভিজ্ঞতার পর শরবৎ সরল হওয়া সম্ভব ছিল না। দৈবের অত মার খেয়েও যাঁর মূল্যবোধে চিড় না ধরে—যাই হোক, অন্ততঃ সে মানুষ ভারতচন্দ্র নন। এমন শোনা যায়, চিরকালের শত্রু

বর্ধমানের উপর প্রতিশোধ তুলতে কবি সুড়ঙ্গটি বর্ধমান-প্রাসাদের তলায় কেটেছিলেন। কথাটি যদি সত্য হয়, সেইসঙ্গে আরো একটি কথা সত্য, ঐ সুড়ঙ্গ বর্ধমান থেকে কৃষ্ণনগরের দিকেও বিস্তৃত ছিল। কবির ন্যায্য দাবিকে উপেক্ষা করে পরবর্তীকালে কৃষ্ণচন্দ্র বর্ধমানের সঙ্গে উচ্চতর সৌহার্দ্যের মুখাঘ্রাণ করেছিলেন, তার রাজকীয় স্বাভাবিকতা ভারতচন্দ্রের তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে পূর্বেই ধরা পড়েছিল। তাই শত কণ্ঠে কৃষ্ণচন্দ্রের স্তুতি গেয়েও তাঁরই নাকের উপর রসিকতার সুযোগে কবি রাজসভার শূন্যগর্ভতাকে বিদ্রূপ করতে ছাড়েন নি।

এই তিক্ত মাধুরীর মুহূর্তেই আমরা ভারতচন্দ্রকে দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু ভিন্নতর এক ভারতচন্দ্র, শান্ত, সুস্থির, গম্ভীর, হৃদয়বান, সংযত ও দৃঢ়চরিত্র—আন্তরিক ভক্তি ও প্রীতিভাবনায় ব্যাকুল এক মূর্তিও আছে। সেই ভারতচন্দ্রকে আমরা কাব্য থেকেই আবিষ্কারের চেষ্টা করব। তার আগে প্রচলিত জীবনীর কয়েকটি তথ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। যথা, ভারতচন্দ্রের ঐ কর্তব্যপরায়ণ ও আত্মসম্মানী স্বভাব। তিনি যে সন্ন্যাস ত্যাগ করেছিলেন, তার কারণ, আগে যা বলেছি, তার কিছু সংশোধন করে বলব—গৃহজীবনে কবির প্রত্যাবর্তন বিবাহিতা পত্নীর প্রতি কর্তব্যবশেও বটে। চাকরির উদ্দেশ্যে ফরাসডাঙ্গায় যাত্রার পূর্বে তিনি তাঁর অবিচারী ভাইদের কাছে পত্নীকে পাঠাতে দৃঢ় নিষেধ করেছিলেন। তারপর প্রথম সুযোগেই পত্নী ও পিতাকে এনেছিলেন নিজের কাছে। এছাড়া সৎ গৃহস্থের মতো সন্ধ্যাহ্নিক ও দেবার্চনাও করতেন নিয়মিত। জীবনীকার এক-কৌতূহলজনক কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একবার স্বাভাবিক রসবোধে ভারতচন্দ্রের মত রসিক (নিশ্চয় রসিক ; তাঁর কাব্য কাত ক'রে রাখলে রস গড়িয়ে পড়ত), সৌন্দর্য-চেতন ও বিদেশবাসে অভ্যস্ত পুরুষের আনন্দবিধানের জন্য সুন্দরী এক লোকপ্রেয়সীকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। কবির কাছে কোনো প্রশ্রয়ই সে পায় নি। কাহিনীর সত্যতা কতদূর জানি না, তবে ঘটনা এমন হওয়া আশ্চর্য নয়। এইটিই দেখা যায়, যাঁরা অপরের জন্য ভোগপাত্র সাজিয়েছেন, তাঁরা ব্যক্তিজীবনে

প্রায়ই সংযতস্বভাব। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দ্রিয়পীড়িত রাজসভা এবং নিজ কবিকর্মের আপাতলক্ষ্য সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের নিবিড় ঘৃণার কারণও বোঝা সম্ভব।

॥ ২ ॥

যৌবনের কবি

ভারতচন্দ্রের জীবনী আলোচনায় প্রথমে আমরা তীব্র অনুভূতি-সম্পন্ন একটি বালককে দেখে, তারপর তাঁর বিচিত্র ও বিক্ষুব্ধ অভিজ্ঞতার ইতিহাস পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেছি। ভারতচন্দ্রের মত মানসিক শক্তিসম্পন্ন মানুষে ঐ অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া নিদারুণ। এই প্রতিক্রিয়া কাব্যে দুই মুখে ভেঙেছে—মানবজীবনে যৌনকামনা ও ধর্ম-কামনার দুই খাতে। এই দুই ব্যাপারের বিকারই, পূর্বের তথ্য অনুযায়ী, কাব্যে প্রাধান্য পেতে বাধ্য। এর অতিরিক্ত, ভারতচন্দ্রের মনে কিন্তু একটি পূর্ণ জীবনের আদর্শ ছিল। আলোচনাক্রমে আমরা সেই আদর্শের রূপ লক্ষ্য করতে সচেষ্ট থাকব। প্রথমে কাব্যের কাম-প্রবৃত্তির স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা যেতে পারে।

ভারতচন্দ্র চিন্তাশীল, সমাজচেতন, ভক্ত বা ধর্মসমন্বয়কামী কতদূর ছিলেন, সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু তিনি যে যৌবনের কবি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই যৌবনপ্রীতিকে কবি বিদ্যাসুন্দরে কাব্যরূপ দিয়েছেন, আর তার কথা স্বীকার করেছেন 'রসমঞ্জরী'তে মুক্তকণ্ঠে। ভারতচন্দ্রের নানাপ্রকার অনুচিত আতিশয্যের কারণওএই বিশুদ্ধ যৌবনাসক্তি। যৌবন বলতে পূর্ণপ্রস্ফুট অথচ স্ববশ ইন্দ্রিয়ের উপভোগজীবন কবি বুঝেছেন। সুস্থ, সবল, আনন্দধন্য যৌবনের ভোগারতি তাঁর শ্রদ্ধার কামনা। অথচ সমাজমানসে এই স্বাস্থ্যসম্পূর্ণ উপভোগের সমর্থন নেই। এই ভোগকে একদিকে বিকৃতচিত্ত কামুক চৌর্যের অন্ধকারে লেহন করে, অন্যদিকে নীতিবাদীর শুদ্ধাচার অনৌচিত্যের কলঙ্কে ঠেলে দেয়। যৌবনবাদী ভারতচন্দ্র তাই স্বাস্থ্যহীন নাগরালি এবং সন্ত্রস্ত আচারপনার বিরুদ্ধে দ্বিমুখী যুদ্ধ ঘোষণা করে-

ছিলেন। তাঁর দুর্ভাগ্য, বিভ্রান্ত গণমনে অসাধু প্রবৃত্তির আশ্রয়দাতা, নীতিশত্রুরূপে তিনি গৃহীত হলেন, কিন্তু সুস্থ জীবনের পক্ষে তাঁর গূঢ় প্রচার অজ্ঞাত থেকে গেল।

যৌবন সম্বন্ধে কবির বক্র-মনের বহু কটাক্ষই কাব্যে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর সহজ-মনের সুগভীর যৌবনপ্রীতি 'রসমঞ্জরী'তে একবার উদ্ঘাটিত দেখেছি। সে কবিতা পরে উদ্ধৃত করব, কেবল ভণিতায় কবির স্বীকারোক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেব, যেখানে তিনি বলেছেন, 'ভারতচন্দ্রের ভারতী-যোগ, যৌবনেতে কর যৌবন ভোগ।' অর্থাৎ কবি অকুণ্ঠে মেনেছেন, তাঁর ভারতী-যোগ যৌবনে যৌবনভোগে প্রেরণা দিতে। বিদ্যা-সুন্দরের প্রতি তার প্রীতি ও পক্ষপাতের কারণ এ-দিক দিয়ে সহজে বুঝতে পারি।

বিদ্যা ও সুন্দরের ভোগকে কতভাবেই না তিনি সংবর্ধনা জানিয়েছেন। পৃথিবী খুঁজে সৌন্দর্যে ও বৈদগ্ধ্যে মণ্ডিত করেছেন সেই দুটি দেহমন। তাদের মিলনের কোনো প্রতিকূলতাই রাখেন নি, অসুবিধার শেষ কাঁটাটি পর্যন্ত (এমন কি কালীকে দিয়ে) উৎপাটিত করে ছেড়েছেন। কুটিল মালিনী ও কোপন রাজার চোখের উপর দরজা বন্ধ করে, অনুকূল সখীদের উদ্দীপন-সঙ্গীতে, বিদ্যা ও সুন্দর একদেহ হয়েছে। কাব্যের সর্বত্র ভোগের উচ্ছ্বাসময় বর্ণনা আছে এবং একবার অন্ততঃ যক্ষী বসুন্ধরার মুখে যৌবনসম্ভোগের নৈতিক যুক্তি অখণ্ডনীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

ভোগের এই অকুণ্ঠ অলজ্জতাই বিদ্যাসুন্দরের নৈতিক শক্তি। কাম-মোহিত ক্রৌঞ্চকে হননের জন্য ব্যাধ অভিশপ্ত, সেইরূপ কামমোহিত সুন্দরকে মশানে পাঠিয়ে রাজা কবির দ্বারা শাপগ্রস্ত। বিদ্যাসুন্দরের বিরুদ্ধে যাঁরা নীতির ব্যাধবৃত্তি করতে উৎসুক, তাঁদের বিরুদ্ধেও এ যুগের রসিক সমালোচক অভিশাপ দিয়েছেন। আমরা দেখি, কবি তাঁর সর্ববিধ শক্তি নিয়োগ করেছেন বেষ্টনীবদ্ধ সম্ভোগের প্রকাশে। জীবনের সর্বাঙ্গীণ আস্বাদনের পরিবর্তে এক বিশেষ জাতীয় ভোগকে উপস্থিত করাই ছিল কবির অভিপ্রায়। সেই বিশেষ ভোগকে যত্নসৃষ্ট

একটি পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করে তার সুতীব্র চেতনার রূপকে ফোটাবার চেষ্টা তিনি করেছেন। পরিবেশটি অবশ্যই কৃত্রিম উপায়ে রচিত, সেই কৃত্রিমতা স্বাভাবিক জীবনছন্দে আন্দোলিত না হয়েও জীবনবিচ্ছিন্ন নয়। জীবনের ভোগতীব্র মুহূর্তগুলোকে সংগ্রহ করে প্রগাঢ় পেষণে এখানে সংহত করা হয়েছে, এবং তারই অগ্নিশয্যার উপর আসীন পাঠক কামনার জ্বালাময় নিশ্বাসে উত্তেজিত, উন্মত্ত ও মূর্ছিতপ্রায় হয়েছে ক্ষণে-ক্ষণে।

মানবদেহ কবির কাছে উদ্দেশ্যসিদ্ধির মুখ্য উপাদান, এবং আত্মা সম্বন্ধেও তিনি সাধারণতঃ চিন্তাক্লিষ্ট নন। বৈষ্ণবকবিতাতেও প্রেমের অবলম্বন দেহ। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' দেহ থেকে প্রেম। ভারতচন্দ্রে যেন দেহই সব। প্রেমের অনুভূতি, যদি কোথাও থাকে, দেহ-চেতনার অলঙ্করণের জন্য; দেহাত্মবাদী আলঙ্কারিকের নিকট 'ধ্বনি' যেমন কাব্যের আত্মা নয়, কাব্যালঙ্কার মাত্র, অনেকটা সেইরূপ। তাই তিনি পরমোৎসাহে বিদ্যা-সুন্দরের বিহার এঁকেছেন। কারণ, তাঁর কাছে সুন্দর নরনারীর মিলন সুন্দর—নীতির সুন্দর নয়, শিল্পীর সুখের সুন্দর। তিনি, অধিকন্তু মনে হয়, নরনারীর ইন্দ্রিয়চেতন মন ও প্রস্তুত দেহে যৌবনকামনার অভিব্যক্তির রূপ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

এইখানেই আবার, অন্যতর এক ভারতচন্দ্রকে যেন দেখতে পাই। বিদ্যা-সুন্দর তাঁর প্রীতির সন্তান, হৃদয়হীন কৌতূহল নিবারণেব উপাদানও বটে। এদের প্রতি তাঁর অবিমিশ্র অনুরাগ যদি থাকত, আমার তো মনে হয়, একটা লজ্জার আবরণ তাদের দিতেন। সমালোচক ক্ষুব্ধচিত্তে বলেন, ভারতচন্দ্র প্রচলিত সমাজবিধিকে ব্যঙ্গ করেছেন বিদ্যাসুন্দরে। কিন্তু কবি কি বিদ্যা ও সুন্দরকে ব্যঙ্গ করেন নি? যদি তৎকাল-চলিত নীতিবুদ্ধিকে ভারতচন্দ্র উপহাস করে থাকেন, তবে একই সঙ্গে মানুষের লজ্জাহীনতাকেও তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি। প্রথম আঘাতটি স্পষ্ট, দ্বিতীয়টি সূক্ষ্ম। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মানুষের 'সুস্থ পশুসত্তাকে' বক্র কটাক্ষে দর্শন করেছিলেন, তাতেই রূপ নিয়েছে তাঁর তির্যক প্রতিবাদ। অশান্ত সন্ধানী ভারতচন্দ্র জীবন-সমস্যার

সমাধান চেয়েছিলেন, কিন্তু সমাধানের স্থির বিন্দুতে আত্মস্থ হতে না পারার জন্য তিনি সমাজ ও সমাজদ্রোহী উভয়কেই আঘাত করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু মহৎ ও শিবময় আদর্শের প্রতি তাঁর আকর্ষণের প্রমাণ রইল ধর্মসমন্বয়-কামনায় এবং গানগুলির ভক্তিব্যাকুলতায়।

নিষ্ঠুর শিল্পী তিনি। আমাদের প্রচলিত মূল্যবোধে কিভাবে না আঘাত করেছেন! আমাদের দেশে ধর্ম লোকজীবনে ভোগাকাঙ্ক্ষার বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করে নি। মন্দিরশিল্পে, বৈষ্ণবকাব্যে, তান্ত্রিক আচারে তার প্রমাণ আছে। ধর্মের সঙ্গে কামকে আমরা একসঙ্গে মেনেছি। ভারতচন্দ্রের বোধহয় মনে হয়েছিল, ধর্মের মধ্যে আর যাই থাক, কামাচার নেই। অবাধ যৌন-কামনার প্রশ্রয় দান করে সে যুগে ধর্ম কি পরিমাণ আত্মবিরোধী ও হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছিল, ভারতচন্দ্র তা খুলে দেখাতে চেয়েছিলেন, এবং তিক্ত পরিহাসের সঙ্গে সেই উদ্দেশ্যে একটি ধর্মমূলক কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন। সেখানে স্বর্গের ঈশ্বরী কাম-সহায়িকা হলেন, মহাশক্তিকে অধঃশক্তির বেগদাত্রী দেখান হল। দেব-দেবীর আশীর্বাদ নিয়ে মহাবীরেরা যুদ্ধজয় করে। ভারতচন্দ্র ব্যাপারটিকে একটু ঘুরিয়ে দেখালেন। যৌনসমরে জয়লাভের প্রেরণা ও অস্ত্র পাওয়া গেল দেবীর কৃপায়। ভারতচন্দ্র সম্ভবতঃ দেবদেবীদের সঙ্গে ভক্তের অনাবৃত স্বার্থসম্বন্ধে পীড়া বোধ করেছিলেন। সেই স্বার্থ-সম্বন্ধের বীভৎসতা নরহত্যার পূর্বে দেবী-প্রসাদপ্রার্থী দস্যুমূর্তির অপেক্ষা অনেক বেশী ফুটেছে বিদ্যার কুমারীত্ব-সংহারকামী দেবীর প্রসাদপুষ্ট সুন্দর-মূর্তিতে।

আমাদের বিরুদ্ধে একটা স্ববিরোধের অভিযোগ এখন উঠতে পারে। আগে বলেছি, স্বাদসমর্থ যৌবনের কবি ভারতচন্দ্র, বিদ্যা ও সুন্দর সেই যৌবনের স্ফুরিত মূর্তি। পরে আবার বিদ্যা-সুন্দরের বিরুদ্ধে কবির সূক্ষ্ম ঘৃণার কথা বললাম। এই অসামঞ্জস্যের মীমাংসার জন্য ভারতের কবিস্বভাব ও স্বভাববিকাশের পটভূমিকার কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। ভারতচন্দ্র যে যৌবনের জয়গান করেছেন, সেই যৌবনশক্তি যেমন আত্মনিগ্রহে ও অনুচিত সঙ্কোচে পীড়িত নয়, তেমনি কামনার প্রকাশ্য

প্রদর্শনীর লাম্পট্য ও বিকৃত মনোভাবকেও স্বীকার করে না। কবির দুর্ভাগ্য, তাঁর সুস্থ জীবনসম্ভোগের মানসসন্তান বিদ্যা ও সুন্দরকে অবাধ আশ্লেষের মুহূর্তে কবির পৃষ্ঠপোষকদের সামনে দ্বার খুলে দিতে হয়েছে। কামার্ত পোষণকর্তাদের সুখভোগের সুযোগ করে দিতে (সুযোগ দিতে অন্নদাস কবি বাধ্য) নিজ মানসসন্তান দুটিকে ভাড়াটিয়া দেহজীবীব আচরণে নিযুক্ত করিয়ে কবি যে মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন, সেই আত্মদংশনই নিজ সৃষ্টির প্রতি বিতৃষ্ণায় তাঁর মনকে বিরস করে তুলেছিল। নিজের প্রিয় কলাসৃষ্টিরূপে বিদ্যাসুন্দরকে তিনি ভালবাসতেন; সেই ভালবাসার সামগ্রীকে পণ্য করতে তাঁর সমস্ত মন বিদ্রোহ করেছে। ভারতচন্দ্রের 'অসভ্যতা', 'ঔদ্ধত্য', 'ইতরতা'— এ সকলের মূলে রয়েছে অনুচিত কর্মবাধ্যতার জ্বালা।

কবির মানস-বিরোধের রূপ ফোটাতে গিয়ে আমরা যেন কোনো ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি না করি। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে ভারতচন্দ্র নিশ্চয়ই অশ্লীলতার প্রশ্রয়দানকারী সমাজদূষণ কবি। তাঁর কবিত্ব সম্বন্ধে সচেতন থেকেও অশ্লীলতা স্বীকার করতে হবে। বর্ণনীয় বস্তু বা ভাবের স্পন্দনকে যথাযথভাবে ফোটাতে পেরেছেন বলে অশ্লীলতা বিশেষ-ভাবে প্রকট হয়েছে। ভাবস্পন্দন ফোটানো সকল কবির একান্ত অভিপ্রায়, তবে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ কেন? তার কারণ, ভারতচন্দ্র ক্ষেত্রবিশেষ যা বর্ণনা করেছেন, তার যথাযথ অনুভূতিকে প্রকাশ্যে উপভোগ করতে বাধে। বিদ্যা-সুন্দরের উন্মুক্ত বিহারের অনুরূপ নিদর্শন অন্য কবির (মানে সত্যকার কবির) কাব্যে মিলবে না তা নয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর একটি আবরণ দেবার চেষ্টা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আছে।[৩] অধিকাংশ স্থলে (সংস্কৃত কাব্যে ও

৩। মুক্তভোগের কবিরূপে মধ্যযুগের ভাষাসাহিত্যে বিদ্যাপতির নাম সহজে মনে আসে। ক্ষুধা ও ক্ষুন্নিবৃত্তির চিত্রণ বিদ্যাপতির কাব্যে কম তীব্র নয়। কিন্তু তিনি ক্ষুদ্র পদের আকারে ভোগখণ্ডগুলিকে দেখিয়েছেন বলে তাঁর কাব্যে সেই অর্জর যাতনা নেই, যা ভোগের ক্রমোচ্চ রূপকে পূর্বাপর উদ্‌ঘাটিত করার জন্য ভারতচন্দ্রের কাব্যে মিলবে।

বৈষ্ণবকাব্যে) দেবদেবীর উপর ভোগের দায়িত্ব অর্পণ করে কবিরা অপ্রাকৃত ব্যাপার বলে' পাশ কাটিয়েছেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দের মত কাব্যে বর্ণনীয় বস্তুর সঙ্গে ছন্দ-সুরের ইচ্ছাকৃত (?) বিরোধ সৃষ্টি করে কাব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দ্বিধার ভাব আনা হয়েছে। তার মানে, বর্ণনীয় বস্তুতে আছে উগ্র লৌকিক রতি আর ছন্দ-সুরে আছে অলৌকিক অপার্থিব আরতি। মঙ্গলকাব্যের ভোগ সাধারণ মানুষের হলেও জীবনে তার গৌণমূল্য, সেইসঙ্গে কাব্যিক অপকর্ষের জন্য তা সমাজমনকে গভীরভাবে আলোড়িত করতে পারে নি। ভারতচন্দ্রের বর্ণনা একদিকে কাব্যগুণে শ্রেষ্ঠ, অন্যদিকে সেই উৎকর্ষকে এমন একটি অনুভূতির প্রকাশে নিযুক্ত করা হয়েছে, যার অপেক্ষাকৃত মার্জিত ও পরিস্রুত রূপকেই আস্বাদ করতে পাঠক অভ্যস্ত। ভারতচন্দ্রের কবি-ভাষা ভোগচ্ছন্দকে উত্তাল করে পাঠকহৃদয়কে অসহ্য আবেগে মথিত করেছে। এবং—ভোগকে ত্যাগে মহিমান্বিত করে যে বিরহ, ভারতচন্দ্রে সে বিরহও নেই, আছে ভোগবিরতিজনিত আক্ষেপ মাত্র।

ভারতচন্দ্রের আচরণের উগ্রতাও তাঁর সমালোচিত হওয়ার অন্যতম কারণ। মুক্ত ভোগচিত্র দেবার সময় অন্য কবিরা একটু সন্ত্রস্ততার ভান করেন এবং এই মনোভাব জাগাতে চেষ্টা করেন যে, যে-লোলুপ কৌতূহলের সঙ্গে গোপনতার পর্দাটুকু তাঁরা সরিয়েছেন, সে নিজেদেরই জন্য, কেবল সহৃদয়তা আছে তাই পাঠককে পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি মারবার ঠাঁইটুকু দিয়েছেন। ভারতচন্দ্রের ব্যবহার অন্যরূপ। তিনি কেবল প্রকাশ্যে বিদ্যা-সুন্দরের বিহারকে স্থাপন করেন নি (সুড়ঙ্গপথ ও বিদ্যার কক্ষ, অতিবুদ্ধিমতী মালিনী, স্থূলবুদ্ধি কোটাল এবং নির্বোধ রাজাটি ছাড়া রসিক জনতায় ভরে গেছে), কেউ যদি নীতির প্রশ্ন তোলে, উদ্ধত উগ্র দৃষ্টি মেলে প্রস্তুত হয়েছেন কলহের জন্য। সম্ভাব্য নীতিবাদীর সঙ্গে ভারতের পূর্বপ্রস্তুত কলহ মাতার নিকট বিদ্যার ছলনাময় আত্মসমর্থনে ও সুন্দরের শ্বশুরসম্ভাষণে নিপুণ রূপ ধরেছে। শুধু ভোগ বর্ণনা করাতে নয়, 'বেশ করেছি' এই মনোভাবও ভারতের কাব্যের অশ্লীলতার অন্যতম কারণ।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর তাই দৈহিকতার উপরে উঠতে পারে নি, কারণ দেহজাত অথচ দেহোত্তরতার শক্তিসম্পন্ন প্রেম এ-কাব্যে মিলবে না। বিদ্যাসুন্দর ইন্দ্রিয়মুগ্ধ কবিপ্রহরায় রক্ষিত সুখসজ্জা ও শয্যার বিলাসসঙ্গীত। এই কবিবিধাতা যখন জীবনের আনন্দপল্লবগুলিকে চয়ন করে সুখের পুষ্পমূর্তি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, তখন জীবনের অগ্নিশ্বাসে সে মূর্তিলাবণ্য যেন শীর্ণ না হয়, তা দেখার দায়িত্বও নিয়েছিলেন। কাব্যের সান্ত্বালীশীর্ষে সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত ছিল তাঁর অপরাজেয় কবিপ্রতিভা। বিদ্যাসুন্দরের সেই বাসরের চতুর্দিকে মোহিত সৌন্দর্যের বেষ্টনী, কালস্রোত কলসঙ্গীতে যে অম্লানমিলনকে অভিনন্দন জানিয়ে আজো প্রবাহিত।

॥ ৩ ॥

মানুষের প্রবৃত্তিজীবন সম্বন্ধে কবির জটিল মনোভাব বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের পরিচয় নিলে মানসগঠনটি পূর্ণরূপে ধারণা করতে পারব।

সমাজ ও ধর্মকে ভারতচন্দ্র মনোমত পান নি। বুদ্ধিশীল মানুষের কাছে সমাজ ও ধর্ম চিরকাল অপরিণত। ভারতচন্দ্রের অসন্তোষের পক্ষে আরো বলা যায়, বাস্তবিক আঠারো শতকের বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষের সমাজে প্রশংসাযোগ্য কিছু খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল। রাষ্ট্রিক ভয়াবহতার উল্লেখ আগে করেছি। প্রতাপের অত্যাচারের সাক্ষাৎ ফলভোগী কবি স্বয়ং। জমিদারতন্ত্রের বাহ্য আড়ম্বর ও আভ্যন্তর কলুষ তাঁর সকল স্বপ্নমোহকে মুছে দিয়েছিল।[৪] কবি ধনীর সন্তান

৪। কৃষ্ণচন্দ্র এবং কৃষ্ণনগরের জীবন সম্বন্ধে কিছু সংবাদ এখানে সংকলন করে দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্রের মনোরম রচনার দ্বারস্থ হতে পারি। কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন: "১৭১০ খ্রীঃ কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃব্য রামগোপালেরই রাজা হইবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি পথে তাম্রকূটপ্রিয় পিতৃব্য মহাশয়ের বিলম্ব সংঘটন করিয়া নবাবদরবারে অগ্রে উপস্থিত হন এবং বাকচাতুরী

ছিলেন; সেই হেতু অধিকতর বেদনাবোধে সমর্থ দেহমন নিয়ে দুঃখের মুখোমুখি হওয়ার জন্য দুঃখের স্বরূপও বুঝেছিলেন। 'ক্ষিতির প্রদীপের' তলায় ক্ষিতির সমস্ত অন্ধকার তখন পুঞ্জিত। কলাবৎ, নট, ভাঁড় ও ভাড়াটিয়া কবির রসের ফোয়ারায়, স্ফূর্তির হররায় পৃথিবীর কান্না ঢাকা পড়েও পড়ছে না। সমাজের এই মারীগ্রস্ত অবস্থায় ধর্মকলহের উত্তেজনা কী বিসদৃশ! ভারতচন্দ্রের মতো বুদ্ধিমান নিপুণ-বাক্ মানুষের পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব ছিল না। অথচ বলবেন কিভাবে? এক-মাত্র যে উপায়, উপায়ান্তরহীন কবি তাকেই অবলম্বন করেছিলেন। ধর্মকাব্যে নবভাবনা ও নবমূল্যবোধের যন্ত্রণা প্রবেশ করিয়ে দেবার জন্য কবিকে আজ পর্যন্ত গাল দিচ্ছি।

দ্বারা রাজ্য দখল করেন। আলীবর্দী তাহাকে এত ভালবাসিতেন যে,...তাঁহাকে 'ধর্মচন্দ্র' উপাধি দিয়াছিলেন; কিন্তু এই 'ধর্মচন্দ্র'-মহাশয় প্রতারণাপূর্বক আলীবর্দী খাঁকে স্বীয় রাজ্যের অনুর্বর ভূমিখণ্ডগুলি দেখাইয়া ২০ লক্ষ টাকা মাপ পান। যখন মীরকাশেমের হস্তে বন্দী, মৃত্যুর আজ্ঞা তাঁহার মস্তকের উপর, তখন তিনি পুত্র শিবরামকে লইয়া এক বিরাট পূজার ফাঁদ পাতিয়া উদ্ধার পাইয়া আসেন। কনিষ্ঠ পুত্র শম্ভুচন্দ্র, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দকে আয়ত্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রব-ঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিলে, কৃষ্ণচন্দ্র হেস্টিংস-পত্নীকে একছড়া মুক্তার হার উপহার দিয়া পুত্রের উদ্দেশ্য বিফল করেন। ইংরেজ আনিতে যে-ষড়যন্ত্র হয়, কৃষ্ণচন্দ্র তাহার গুরু। রাজবল্লভের হাতে রাখি বাঁধিয়া তিনি ঢাকার নবাবসরকারে কয়েক লক্ষ টাকা মাপ লইয়া আসেন, অথচ রাজবল্লভের বিধবাবিবাহ প্রচলনের চেষ্টা চক্রান্ত করিয়া বিফল করেন।...বীরোচিত সৎসাহসের অভাব থাকিলেও কূট রাজনীতিতে কৃষ্ণচন্দ্র অতিশয় প্রাজ্ঞ ছিলেন।...মুসলমান-দরবারের দুর্নীতিগুলি কৃষ্ণচন্দ্র অনে-কাংশে অনুসরণ করিয়াছিলেন।...কৃষ্ণচন্দ্রের যোগ্যপুত্র শম্ভুচন্দ্র পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু রটাইয়া নিজে রাজত্ব লইয়াছিলেন।...বস্তুতঃ পুত্রের দোষ নাই, তাঁহারও পড়াশোনা রাজসভার টোলে হইয়াছিল।"

দীনেশচন্দ্র 'রাজ্যশাসন ও সংরক্ষণে' কৃষ্ণচন্দ্রের দক্ষতার প্রশংসা করেছেন; তাঁর উৎসাহে স্থপতিবিদ্যার, মূর্তিশিল্পের এবং বস্ত্রশিল্পের উন্নতি হয়েছিল, তাও বলেছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও বিদ্যোৎসাহিতার বিষয়ে বলেছেন: "কৃষ্ণচন্দ্র নিজে সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার সভায় কেবল কবিগণের আদর

ভারতচন্দ্রের কাব্যের এই কুণ্ঠিত আধুনিকতার চরিত্র বোঝা দরকার। পুরাতন সহজ বিশ্বাস একদিকে তাঁর বুদ্ধির খোঁচায় বিক্ষত, অন্যদিকে নূতন বিশ্বাসও জাগছে, অপরিণত দেশপ্রীতি যার অন্যতম দৃষ্টান্ত। কৌলীন্যপ্রথা প্রভৃতি কয়েকটি সামাজিক অবিচার সম্বন্ধে তাঁর বিরূপ মনোভাবের মধ্যে ছিল প্রগতিশীলতা। মানুষের অশ্রুর দিক তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। তিনি অন্নের কামনা জানিয়েছেন, নারীদের পতিনিন্দার মধ্যে জীবনের নানামুখী প্রবঞ্চনাকে খুলে ধরেছেন, প্রচলিত ধর্মের বিকৃত দিকগুলিকে ব্যঙ্গ করেছেন বহুভাবে,

---

ছিল এমত নহে; দর্শন, ন্যায়, স্মৃতি, ধর্ম—এস মস্ত বিষয়েরই সেখানে চর্চা হইত।...তিনি হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি ও রামগোপাল সার্বভৌমের সঙ্গে ন্যায়ের কূটবিচার করিতে পারিতেন। প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, গোপাল ন্যায়ালঙ্কার ও রামানন্দ বাচস্পতির সঙ্গে ধর্মশাস্ত্রের তত্ত্বনিরূপণ করিতেন এবং শিবরাম বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ ও বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চাননের সঙ্গে ষড়দর্শন সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে সমর্থ ছিলেন। বাণেশ্বর তাঁহার সভার রাজকবি ছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সঙ্গে সংস্কৃত কবিতা প্রণয়ন করিতেন।"

তাই বলে কৃষ্ণচন্দ্র রুচিবাগীশ ছিলেন না—দ্রাক্ষারস থেকে তালরস, সকলই গ্রাহ্য: "এই উচ্চশিক্ষিত কূটরাজনীতিপ্রাজ্ঞ মহিমান্বিত রাজচক্রবর্তী একটি পল্লীগ্রামের সামান্য ব্যক্তির ন্যায় কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার কৌতুকরাশিতে সুরুচি কি সংযত ভদ্রতা ছিল না; কিন্তু সেগুলি চার্লস্ দি সেকেণ্ডের পরিহাস হইতে বেশী দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইবে না। কৌতুকার্থে রাজসভায় তিনটি লোক নিয়োজিত ছিলেন; ১ম—গোপাল ভাঁড়;...২য় হাস্যার্ণব-উপাধিবিশিষ্ট জনৈক সভাসদ; ...৩য় মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়,...সুরসিক দেখিয়া রাজা ইঁহাকে বৈবাহিক বলিয়া ডাকিতেন। এই ব্যক্তিত্রয়ের কৌতুকাভিনয়ে রাজ্যসভায় হাস্য ও বীভৎসরসের শ্রাদ্ধ হইত।"

দীনেশচন্দ্র সিদ্ধান্ত করেছেন: "আমোদপ্রমোদ ভিন্ন রাজা শাস্ত্রালোচনা করিতেন, রাজ্যবিস্তারের নূতন-নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেন, শিল্পের উন্নতির জন্য নানারূপ উৎসাহ দিতেন ও ভারতচন্দ্রকে দিয়া তোটক-ছন্দে কবিতা লিখাইতেন। বিলাসের এই বিবিধ সন্তানের মধ্যে নির্মল প্রেমের কথা কেহ শুনাইতে গেলে উপহাসাস্পদ হইত।"

→

এবং সেই দেবীকে মাত্র মেনেছেন, যিনি উৎপীড়ন দ্বারা পূজা আদায় করেন না—অপরপক্ষে, সুখভোগকে বাধাহীন করার বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা-চোঁয়ানো ভক্তিতে সন্তুষ্ট থাকেন। কবি ইন্দ্রিয়নির্ভর জীবনের সুখের পথে কোনোরূপ বাধা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বুদ্ধিধর্ম তাঁর মনকে কঠিন করে একদিকে মুকুন্দরামের মতো দুঃখদর্শনে আবেগ-বিচলিত হতে বাধা দিয়েছে, অন্যদিকে নরনারীর বিহারকে জনসমক্ষে উদ্ঘাটিত করে নিরুদ্ধ জীবনপিপাসাকে প্রকাশ করতে উৎসাহিত করেছে। কবির সকল ব্যঙ্গচিত্রের পিছনে কি আমরা কঠিন দুঃখের যুদ্ধঘোষণাকে দেখতে পাই না?

ভারতচন্দ্রের কাব্যে সমাজমানব অপেক্ষা সমাজমানসেরই অধিক প্রকাশ। মুকুন্দরামের কাব্যের বাস্তবতা বেশি, বলা হয়। বাস্তবচিত্রের

• ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর কলেজ শতবার্ষিকী গ্রন্থে *The Court of Raja Krishnachandra of Krishnanagar* প্রবন্ধে (গোস্বামীর গ্রন্থে বহুলাংশে উদ্ধৃত) কৃষ্ণচন্দ্রের কারুশিল্পের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, এবং কৃষ্ণনগর রাজসভার দ্বৈতজীবন সম্বন্ধে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। সেখানে প্রাচীন ব্রহ্মণ্যজীবন ও মুসলমানী নাগরিক-জীবনের মিশ্রণ ঘটেছিল, যার প্রতিভূচরিত্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্র: "An aristocrat like Raja Krishnachandra of Nadiya lived like many an 'English educated' highly placed Indian of the present day, a double life: On the outside in certain contexts it was an imitation of the Muslim-Cum-Rajput court life of Agra or Delhi; and inside, it was the same old fashioned way of living and thinking that characterised a secular Brahman of late medieval times."

সুনীতিকুমার এই সূত্রে একটি মূল্যবান কথা বলেছেন। মুঘল-রাজপুত বাজসুভার সমস্ত বাহ্যিক আড়ম্বর-অনুকরণের মধ্যেও কৃষ্ণনগরের সংস্কৃতি ছিল মূলে একান্ত দেশীয়—একেবারে বাঙালি: "...the inner spirit of this old culture of Krishnanagar was fundamentally of Bengal and of the village culture that characterised the province. Krishnanagar, in fact, became urban and pan-Indian, without ceasing to be Bengali, and it remained broad-based on the life and ways of the Bengali village."

ব্যাপাবে কথাটি নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু বাস্তবের যে-ভাবরূপ তার আত্মাকে—আত্মার উদ্ভাসে গভীরতর বাস্তবকে—উদ্ঘাটিত করে, মুকুন্দরামে তার রূপ কি যথেষ্ট প্রকাশ পেয়েছে? ঐ সত্যতর বাস্তবের কবিরূপে ভারতচন্দ্রকে দাঁড় করাতে চাই না, কিন্তু অন্ততঃ আংশিক-ভাবেও তিনি কি যুগভাবনাকে অধিক প্রকাশ করেন নি?

সহানুভূতিহীন পারিপার্শ্বিক ও দারিদ্র্যদুঃখের দ্বারা পীড়িত এই কবির আত্মার স্বপ্ন মলিন হয়ে গিয়েছিল কামাচারী অভিজাত ও শুচিবায়ুগ্রস্ত সামাজিকদের লোভ ও ঘৃণার নিঃশ্বাসে। তাই দেখি, উৎসবরাত্রের পেশাদার বাদ্যকর এই কবির উজ্জ্বল বিস্ফারিত আঁখিতলে রাত্রি-জাগরণের গাঢ় কালিমা। তাঁর কাব্যের সৌন্দর্যপ্রলেপ কি ক্ষয়ের রেখা, ক্লান্তির রুদ্ধ ক্রন্দন দূর করতে পেরেছিল? পারে নি। তার প্রমাণ, ভারতচন্দ্রের রঙিন শিল্পমেলায় নিরন্ন নরনারীর সংখ্যাধিক্য। শিল্পের বাঞ্ছিত উপাদানরূপে নয়, জীবনের অনড় আবর্জনারূপেই এদের অবস্থান। মুকুন্দরামের মতো প্রকাশ্য সহানুভূতি না দেখিয়ে ভারতচন্দ্র যেসব অবাঞ্ছিতদের দূর-দূর করে তাড়িয়েও পরে কখনো-কখনো কাছে টানতে বাধ্য হয়েছেন, তাদের প্রতি বিচিত্র আকর্ষণ বোধ করি। তখন কবির উজ্জ্বল বিদূষকবেশের অভ্যন্তরে, আত্মবিক্ষত, অভিমান, ক্রোধ ও নিগূঢ় প্রীতিতে মথিত হৃদয়টি আমাদের স্পর্শ করে। ক্ষুধার্ত শিব, পদ্মপত্রে আচ্ছাদিত পদ্মিনী, অসন্তুষ্ট রাজদ্বারী ও ঈশ্বরী পাটনীতে আমাদের পৃথিবী ভবে যায়। অন্যদিকে দেখি, ভারতচন্দ্রের স্বপ্নের ভুবন, যেখানে অন্নের অভাব নেই, সুখের উপচার স্তরে-স্তরে সজ্জিত, দীপের ও মনের আলোকে উদ্ভাসিত কক্ষ ও সেই কক্ষে জীবনাস্বাদের সুখসহচরী—হায়, সেই সৌন্দর্যনিকেতনে সুড়ঙ্গপথ ছাড়া প্রবেশপথ নেই! সুড়ঙ্গ কেটে ভারতচন্দ্র সমাজবিরোধী—যারা তাঁকে সে পথ কাটতে বাধ্য করেছিল, তারা কি সমাজপ্রেমিক?

ভারতচন্দ্রের জীবনের ট্রাজেডী এই, তিনি কেলিকুতূহলী রাজা, স্তাবক সভাসদ ও অসুস্থ ইন্দ্রিয়পীড়িত জনসাধারণের লালসাবর্ধন কবি-রূপে পরিচিত রইলেন। বিচারমুখে সংসার-দর্শনে অনেক সময়ে জীবন

সম্বন্ধে হতাশা ও অনাস্থা জাগে, তাকে অতিক্রম করে নূতনতর জীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়—ঐ বিচারের পরিণতরূপ প্রজ্ঞার দ্বারা। বিচার দৃষ্টির ফলে ভারতচন্দ্র অবিশ্বাস-জর্জর, তাকে হাসির ছটায় আবৃত করার চেষ্টায় লোকরঞ্জন বিদূষক। অথচ নূতন জীবনবোধের পদধ্বনি তাঁর কাব্যে দূরবর্তী নয়। মনে হয়, জীবনের অকালখণ্ডনের জন্য (৪৮ বৎসর দীর্ঘকাল নয়) কবি তাঁর সংশয়কে নবপ্রত্যয়ে উত্তীর্ণ করাতে পারেন নি (তা পারবার সম্ভাবনা যে ছিল, 'অন্নদামঙ্গলে'ই দেখতে পাই), এবং তিনি যে মানসধারার উৎসমুখ মোচন করেছিলেন, অব্যবহিত পরেই জাতীয় জীবনের মূল ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হওয়ায় তা রুদ্ধগতি হয়ে ওড়ে, তার ফলে উপযুক্ত শিষ্যের দ্বারা বাহিত হবার গৌরব ভারতচন্দ্র পান নি।

স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে, কৃষ্ণনগরের এই বিদূষক-কবির কি কোনোদিন সংস্কারক হবার বাসনা জেগেছিল ? কথাটা আপাততঃ হাস্যকর, তবু ভেবে দেখা যায়। সমাজপ্রেমিকের পরম আস্থাভাজন মুকুন্দরাম কিন্তু কোনো বুদ্ধিতেই সংস্কারক নন, অথচ সংস্কারকদের কোপভাজন ভারতচন্দ্রের মধ্যে সংস্কারকের আদি প্রয়োজন—প্রচলিত ব্যবস্থার গ্লানি অনুভব ও তাকে দূর করবার মতো সক্রিয় মন—যথেষ্টই ছিল। কিন্তু সংস্কারক যেমন নিজ আদর্শের পক্ষে কঠিনচিত্তে যুদ্ধঘোষণা করেন, যুদ্ধের মধ্যে হাসির অবসর প্রায়ই রাখেন না, হাসির কবি ভারতচন্দ্র বৃত্তির প্রয়োজনে সামাজিকের তোষণে নিযুক্ত থেকে সেই সংগ্রামী দৃঢ়তা দেখাতে পারেন নি।

হাসিতে মানুষের রোগ হয়ত কিছুটা দূর করা যায়, কিন্তু স্বাস্থ্য দেওয়া যায় না। হাসির ছটায় যে আহত হয়, সে ঐ আঘাতকে যদি হাস্যকর নাও মনে করে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই মনে করে), হাসির উত্তেজনায় আঘাতের বেদনা ভুলতে বিলম্ব করে না ; এবং, যার কাছে অন্যের মুখোস খোলা হল, সেও কৌতুকের নগদ-বিদায়ে এতই সন্তুষ্ট থাকে যে, তলিয়ে দেখবার উৎসাহ প্রায়ই বোধ করে না। উদ্দেশ্যমূলক ব্যঙ্গের আর একটি বড় দোষ, তা যেমন স্থিরবদ্ধের প্রতি অশ্রদ্ধা

জাগাতে পারে, তেমনি স্থাণু আদর্শকে তামাসা করেছে বলে (হায়, আদর্শ বস্তুটাই যে স্থাণু!) নূতনতর আদর্শ উপস্থাপনের নৈতিক অধিকার হারিয়ে ফেলে। বার্নার্ড শ'কেও শেষজীবনে নিজের ভাঁড়ামিকে গাম্ভীর্যের উপরে রঙ্গভঙ্গ করতে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়েছিল। ভারতচন্দ্রও অব্যাহতি পান নি।

॥ ৪ ॥

কবির ধর্মদৃষ্টি

সমাজ সম্বন্ধে দৃষ্টির অস্বচ্ছতা বা অস্পষ্টতার তুলনায় ধর্মবিষয়ে কবির ভাবনা বহুলাংশে পূর্ণায়ত। তাঁর জীবনজিজ্ঞাসা স্থির বিশ্বাসে সমাপ্ত হয় নি, একথা সত্য। সে জিজ্ঞাসা ত্রিমুখী—আধ্যাত্মিক, দার্শনিক ও জাগতিক। এখানে আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার বিষয়ে বলা চলে, সম্পূর্ণ সমাধান তিনি করতে পারেন নি, যদি পারতেন তাহলে ভক্তিতে বিগলিত, বিশ্বাসে স্থির, আনন্দে উদ্‌বোধিত এক কবিকে পেতাম, যেমন পেয়েছি বহু অভিজ্ঞতার প্রান্তে উপস্থিত বিদ্যাপতিকে, তাঁর প্রার্থনা বা ভাবসম্মিলনের পদে।

অথচ ভারতচন্দ্রের কাব্য থেকে অনুভূতিসম্পন্ন কাব্যাংশ উদ্ধৃত করা সম্ভব, সেইসকল অংশের ভাবগভীরতা প্রশ্নাতীত—সেখানে প্রণামের সঙ্গে প্রশ্নের একত্র অবস্থান আমাদের সিদ্ধান্তকে দ্বিধান্বিত ক'রে। ভারতচন্দ্রের বহুমুখ বুদ্ধি কোনো কিছুকে চূড়ান্ত মানতে তাঁকে বাধা দিয়েছে।[৫] অথবা বুদ্ধির এমনই ধর্ম, যদি পিছনে কোনো স্থির বিশ্বাস

---

৫ ভারতচন্দ্র বুদ্ধিবাদের না বুদ্ধির সন্তান? বুদ্ধিবাদের সন্তান বললে সমকাল বা পূর্বকালের সাহিত্যে ও সমাজে নিছক যুক্তি ও বুদ্ধিনির্ভরতার প্রমাণ দিতে হবে। ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তিত্ব কোথায়—আলাওলের তথাকথিত ক্লাসিসিজমে, ঘনরাম-রামেশ্বরের অপটু বাকপটুত্বে? আমাদের বিবেচনায়, নাগরিকতার সঙ্গী যে বুদ্ধি, ভারতচন্দ্র সেই বুদ্ধির অংশীদার। আবার বুদ্ধি কবির সহজাত বটে; আর সংশয়, অবিশ্বাস, নেতিবুদ্ধিও বুদ্ধির সহজাত। ভারতচন্দ্র এই বুদ্ধির দান, বুদ্ধিবাদের সৃষ্টি বা স্রষ্টা নন। ভারতচন্দ্রের উপর এখনো পাশ্চাত্য প্রভাব প্রমাণিত হয় নি।

থাকেও, প্রকাশের ক্ষেত্রে একমুখিতাকে স্থূল জেনে অবিশ্বাসের ছন্ম বিলাসকে লালন করতে বাধ্য হয়।[৬] আর দুর্ভাগ্যের কথা, ঐ বাহ্য অভিব্যক্তির উপর আমাদের সিদ্ধান্ত নির্ভর করে। তাঁকে ভুল বুঝবার প্রচুর সুযোগ কবি নিজ কাব্যেই দিয়ে গেছেন।

ধর্মবিষয়ে কবির মন বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দুই প্রান্তে দুলেছে। অবিশ্বাস অশ্রদ্ধার উদাহরণরূপে শিবের ভাঁড়ামি, ব্যাসের মনোবিকার, কামাচারের প্রতি কালিকার সস্নেহ প্রশ্রয় প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়। বিশ্বাসময় মনোভাবের স্মারক—অন্নদার কৃপাময়ী কল্যাণী মূর্তি, তীর্থমঙ্গলকথন, কবির গঙ্গাভক্তি, ও গানগুলির বিগলিত ভক্তিরস। এই বিশ্বাসেরই গাঢ়তর রূপ—ধর্মসহিষ্ণুতা ও ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ।

ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি নাতিশ্রদ্ধার একটি দৃষ্টান্ত এখনি পরীক্ষা করা যায়। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবি, জ্ঞানগুরু, মহাভারতকার ব্যাসদেবের চরম দুর্গতি ঘটিয়ে এই কবি অনেকের কাছে নিন্দাভাজন হয়েছেন। কবির পক্ষসমর্থনে তাঁর পুরাণ-আনুগত্যের কথা কেউ হয়ত তুলতে পারেন; এহেন ব্যাসকে তিনি নাকি স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে পেয়েছেন। কিন্তু যা পাওয়া যায়, তাকেই নেওয়া যায় না। কাহিনীর নির্বাচন ও তার রূপান্তরের গুণদোষের অংশ কবিকেই নিতে হবে। পুরাণ সম্বন্ধে মনে রাখা ভাল, এগুলি মনুষ্যবুদ্ধির সৃষ্টি, এদের সম্বন্ধে অপৌরুষেয়তার দাবি নেই, বিশেষ কালের প্রয়োজনপূরণের দিকে দৃষ্টি রেখেই এগুলির রচনা। বাস্তব ইতিহাসের সঙ্গে মনোহারী কল্পনা মিশিয়ে চিরসত্যকে

৬ অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী বলেন, "বুদ্ধির এই অনৃজু ধর্মটি বোধহয় চিরকালের নয়, একালের।" এই সমালোচনা সত্য মনে হয়। এদেশে আগে নৈয়ায়িক, লোকায়তিক বা জ্ঞানমার্গী—সকলেই বুদ্ধিনির্ভর ছিলেন, কিন্তু তাঁদের বুদ্ধি অপরকে খণ্ডন করবার জন্য প্রযুক্ত হত, আত্মখণ্ডনকে শোচনীয়ভাবে উদ্ঘাটিত করবার জন্য নয়। এমন-কি বুদ্ধি যেখানে শূন্যকে প্রমাণ করেছে, সে বড় অনির্বচনীয় পরম শূন্য। বুদ্ধি একালের পৃথিবীতে বিশ্বাসের ঘর ভেঙে অবিশ্বাসের হাত ধরেছে, কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও সত্য, আত্মক্ষয়ে সৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

যুগসত্য করা হয় পুরাণের মধ্যে। এই হেতু পৌরাণিক মূল্যবোধ পরিবর্তন বা সমালোচনার অতীত নয়। পুরাণ মূলতঃ ভক্তিযুগের উৎপাদন। দেবতার বা ভক্তের মহিমা বাড়াতে গিয়ে পুরাণকারগণ অনেক সময় সামঞ্জস্য হারিয়েছেন। সেই একই কথা পরবর্তীকালের কবিদের সম্বন্ধেও বলা যায়। মুনিদেরও মতিভ্রম হয় দেখাতে হলে মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসের মতিভ্রম দেখানোই আশু কার্যসিদ্ধির উপায়। তাই যিনি প্রজ্ঞাঘনমূর্তি, যাঁর সত্যসন্ধিৎসা নিজ জননীর কুমারী-কলঙ্ককে পর্যন্ত গোপন থাকতে দেয় নি, স্থিতধী ও সমন্বয়বুদ্ধির বিগ্রহস্বরূপ সেই ব্যাসদেবকে পর্যন্ত আত্মহারা করে, উৎকট ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করতে কবি কুণ্ঠিত নন। শুদ্ধধর্মের স্পর্শভাগ্যে যারা বঞ্চিত, তারা তো ধর্মের খোলস নিয়ে টানাটানি করবেই, কিন্তু স্বয়ং বেদগুরু ও মহাভারতকারকে দিয়ে যদি ঐ তুচ্ছ কাজটা করানো যায়, তাহলে একদিকে মানববুদ্ধির অনিবার্য ভ্রান্তি, অন্যদিকে মহামায়ার সর্বনাশা মায়ার তত্ত্বটি প্রমাণিত হয়। ব্যাসের বুদ্ধিনাশের গুরুমূল্যে আমাদেব কবি অন্নপূর্ণার প্রতি-ভক্তি ক্রয় করে নাতিমূল্যে বিতরণ করেছেন।

অথচ নিছক ঐ মূল্যে আমরা যথেষ্ট ভক্তিলাভ করি না। ব্যাসেব মর্যাদার বলিদান ব্যর্থই হয়েছে, কবির বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত অশ্রদ্ধাসৃষ্টিব অভিযোগ ঘুচতে চায় না। ব্যাসের পাশে অধিকন্তু ক্ষুণ্ণমূর্তি মহাদেব বা গঙ্গা এসে কবিব বিরুদ্ধে সমালোচনাকে তীব্রতর কবে তোলেন। ঠাকুরের মানুষালি নিয়ে কিছু খেলা করা চলে, কিন্তু দেখতে হবে, মহিমার সূত্রটি যেন না ছেঁড়ে! চরিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র ভক্তিব স্থিতিস্থাপকতার শেষ সহনবিন্দুতে পৌঁছেও অসংযত। সম্ভ্রমশূন্য সখ্য-রস ভক্তিরসের অন্তর্গত; ভারতচন্দ্র ক্ষেত্রবিশেষে ঐ সম্ভ্রমশূন্যতাকে অসম্ভ্রম এবং সখ্যকে ইয়ার্কির পর্যায়ে নামিয়েছেন।

এই অবস্থায় কবিকে দেখে আমাদের বিচার স্বভাবতঃই কঠোর হয়। কিন্তু ধৈর্যধারণের প্রয়োজন আছে। ভারতচন্দ্র কি সত্যই ঐতিহ্যবোধ-হীন? তাঁর রচিত সঙ্গীতগুলির ভাবকিরণ তো শিবশিরের নিত্য-জ্যোৎস্নার মতো আমাদের মনের অন্ধকার হরণ করে। সেইসঙ্গে ধর্মের

প্রতি দৃঢ়তর আস্থার নিদর্শনরূপে বুদ্ধিমূলক ধর্মসমন্বয়ে কবির আগ্রহ দেখে নূতনভাবে চিন্তা করতে আমরা উদ্বুদ্ধ হই। ব্যাসের বলিদান এই ধর্মসমন্বয়ের বেদীপীঠেই।

চৈতন্যযুগে রসপুর কৃষ্ণ ও রসময়ী রাধিকা মঙ্গলকাব্যের ভয়ঙ্করী মহাদেবীর পীড়নেচ্ছা দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন, একথা প্রায়ই বলা হয়। মুকুন্দরাম থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত শাক্ত কবিগণ নাকি তাঁদের প্রীতিময় ভীতিহীন জীবনবোধের জন্য বৈষ্ণবের নিকট ঋণী। কথাটি বিতর্কযোগ্য।[৭] অপরপক্ষে দেখি, অষ্টাদশ শতাব্দীর দুই শাক্তকবি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ যা দিয়েছেন তা বৈষ্ণবের সাধ্যাতীত, এবং বৈষ্ণব অবৈষ্ণব সকলের পক্ষে আদর্শস্বরূপ। ধর্মসমন্বয়ের সেই আদর্শ, আংশিকতা সত্ত্বেও, ভাবতচন্দ্রের একটি মহৎ দান।

ভাবতচন্দ্রে, সমন্বয় বুদ্ধিমূলক বলে এক্ষেত্রে যুগপরিবেশেব বিচাব অবশ্যই করতে হয়। আগে আমরা এই কালেব ধমকলহেব তিক্ততার

৭ জীবনবোধেব পরিবর্তনের জন্য মঙ্গলকবিরা বৈষ্ণবদেব কাছে কতখানি ঋণী, তা কিন্তু বিচারের বিষয় হওয়া উচিত। ভয়ঙ্করী দেবী বৈষ্ণবপ্রভাবে শুভঙ্করী হয়েছেন, একথা যদি প্রমাণ কবতে হয়, তাহলে চৈতন্যপূর্ব দেবী-চরিত্রের সঙ্গে চৈতন্যোত্তর দেবী-চরিত্রের তুলনামূলক বিচার প্রয়োজন, এবং বিচার কেবল চণ্ডীকে নিয়েই হবে না, মনসাকেও বিচারের মধ্যে আনতে হবে। মনসা কি পরবর্তীকালে আচারে আচবণে সত্যই বদলেছিলেন? হয়ত সুন্দরতরভাবে মনসার কথা লেখা হয়েছিল, কিন্তু কালগতে ভাষা ও সাহিত্যর স্বাভাবিক উন্নতি হয়, সেকথা ভুললে চলবে না। এক্ষেত্রে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—'সংস্কৃত পুরাণের প্রভাবের ফলেই মুকুন্দরামের চণ্ডী ভারতচন্দ্রের অন্নদায় পরিণত হয়।…বাংলার লৌকিক শক্তি-দেবতাদিগের ভয়ঙ্করী প্রকৃতি কালক্রমে শুভঙ্করী প্রকৃতিতে পরিবর্তিত হইয়া যায়। বাংলা কাব্যের উপর পরবর্তীকালে পৌরাণিক প্রভাব ইহার কারণ।' অবশ্য অধিকমাত্রায় পুরাণ অনুসরণের মূলে বৈষ্ণবপ্রভাব থাকতে পারে, কারণ বৈষ্ণব কবিরা সংস্কৃত সাহিত্য থেকে প্রচুর ঋণগ্রহণ করে সাহিত্যের রুচি ও মর্যাদাবৃদ্ধির যে চেষ্টা করেছিলেন, তার দৃষ্টান্ত অন্যান্য কবিদের সামনে ছিলই।

মঙ্গলকাব্যে ভক্তিরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে বৈষ্ণবপ্রভাব কিছুটা স্বীকার হয়ত করতে

উল্লেখ করেছি। ধর্মকলহের তিক্ততার প্রতি বিতৃষ্ণা, তারো চেয়ে তার অসারত্বের উপলব্ধি কবির সমন্বয়চেষ্টার মূলে রয়েছে। বৃন্দাবনদাসের কাব্য থেকে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের কুশ্রী ধর্মবিবাদের কিছু পরিচয় পাই। অনুভূতিহীন ধর্মাচার ভেদ করে সেদিন বৈষ্ণবধর্ম উঠেছিল। সেই উত্থানে শুদ্ধতর ধর্মপ্রেরণা ছিল, সেইসঙ্গে ছিল 'ধর্ম'-নামধেয় অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শক্তি। কালগতে বৈষ্ণবধর্ম জীর্ণ হয়েছে, মানসিক অবসাদে কিংবা কলহের উত্তেজনায় পূর্ণ হয়েছে সমাজজীবন, তখনি শাক্ত ও বৈষ্ণবমতের সমন্বয়ভাবনার মধ্যে জন্ম নিয়েছে ভাবী আদর্শ। ভারতচন্দ্রের ধর্মসমন্বয় কেবল সে যুগের নয়, পরবর্তী যুগের সমস্যা-সমাধানের ইঙ্গিতরূপেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।[৮]

কবির বাল্যকালের প্রথম ও দ্বিতীয় রচনা থেকেও এই ধর্মীয় উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যপীরের দুটি ক্ষুদ্রাকার পাঁচালী—কবির প্রথম দুই রচনা। হিন্দু-মুসলমানের এই মিশ্র-দেবতা ভারতচন্দ্রের নিজস্ব সৃষ্টি নয়। বোঝা যায়, ব্যাপকতর সমন্বয়ের মনোভাব

হবে, রীতির উৎকর্ষের ক্ষেত্রেও, কিন্তু মূল ভাববস্তুতে বৈষ্ণবদর্শন মঙ্গলকবিরা গ্রহণ করতেই পারেন না। বৈষ্ণবগণ ঐশ্বর্যভাব পরিহার করে মধুরভাব নিয়েছিলেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে ঐশ্বর্যভাব অপরিহার্য। ঈশ্বরের কাছে বস্তুগত প্রার্থনা নিয়ে সে দাঁড়াবেই। বৈষ্ণবের দেবতার কাছে তা করতে না পারলে অন্য দেবতার কাছে করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। দেশের অধিকাংশ মানুষের প্রয়োজনেই মধ্যযুগে ব্যাপক আকারে মঙ্গলকাব্য বজায় ছিল, এবং সেই প্রয়োজনই মঙ্গলকাব্যের ভাবগঠনকে অব্যাহত রেখেছিল।

৮ বর্তমানকালের প্রধান অধ্যাত্মপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধি ও ঘোষণার আলোকে ভারতচন্দ্রের আদর্শের গৌরব বোঝা সহজ হবে। 'অশিষ্ট' ভারতচন্দ্রই ধর্মকলহের অসারত্ব বাংলাসাহিত্যে প্রথম পূর্ণভাবে ঘোষণা করেছেন। তাঁর ধারণা কতখানি বুদ্ধিপ্রসূত, কতখানি উপলব্ধিজাত, সে প্রশ্ন করা যায়, কিন্তু তাঁর সমাধানের গৌরব হরণ করা যায় না। এক্ষেত্রে ইতিহাসের পুরাতন সিদ্ধান্তটি স্মরণযোগ্য—যুগের নিগূঢ় বিক্ষিপ্ত আবেগ শ্রেষ্ঠ মানুষের জীবনে চূড়ান্ত সত্যোপলব্ধির মহিমা লাভ করে। কেবল রামপ্রসাদ নন, ভারতচন্দ্রও শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনী গেয়ে গেছেন।

লোকমনে তখন ক্রিয়াশীল। পরবর্তী জীবনে কবি যে সমন্বয়-মতের সচেতন ঘোষক, আমরা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করি, তার প্রতি কবির বাল্যাবধি আকর্ষণ রয়েছে। আরবী-ফারসী সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত এই কবি কেবল হিন্দু সম্প্রদায়গুলির মতসামঞ্জস্য কামনা করেন নি, সম্পূর্ণ বিরোধী ধর্ম বলে কথিত মুসলমানধর্মের সঙ্গেও হিন্দুধর্মের ভাব-মিলনের একটি ক্ষেত্র আবিষ্কারে সচেষ্ট ছিলেন। অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথম খণ্ডে হিন্দু ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে মিলনসূত্র কবি দেখিয়েছেন ; শেষ খণ্ড মানসিংহে হিন্দুধর্মের দৃঢ় পক্ষসমর্থনের সঙ্গে মুসলমান ধর্মের মূল সত্যকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। ভারতচন্দ্রের দৃঢ়তা এবং উদারতার প্রমাণরূপে ভবানন্দ-পাতশাহ সংবাদের উল্লেখ করা যায়।

ভারতচন্দ্রের ধর্মসমন্বয় বুদ্ধিমূলক বলে তা সমকালীন ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত।[৯] অষ্টাদশ শতকে মোগলসাম্রাজ্যের ভগ্নদশা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছিলেন বলেই কবির পক্ষে মানসিংহ-খণ্ডে জাহাঙ্গীরের অবমাননা ঘটানো সম্ভব হয়েছিল। পূর্ববর্তী কবিদের রচনায় মুসলমান-অত্যাচারের বর্ণনায় চোখের জল যত ঝরেছে, মনের আগুন তত জ্বলে নি। এখানে অধিকন্তু তাই প্রশ্ন জাগে, মুসলমান-রাজত্বের অবসানসূচনা দেখে কি ভারতচন্দ্র হিন্দুরাজত্বের স্বপ্ন দেখেছেন (জমিদার কৃষ্ণচন্দ্রকে 'ধরণী-ঈশ্বর' বলা কি শুধুই চাটুবাদ, না শুভ ইচ্ছার আকাশসৌধ ?), এবং সেই স্বপ্নসিদ্ধির পক্ষে যেহেতু প্রয়োজন ছিল জাতীয়শক্তির কলহ-হীন সম্মিলিত প্রকাশ—তাই কি কবি ধর্মসমন্বয়ের মধ্য দিয়ে এক-ধর্মের

---

৯ একথা বোধহয় স্মরণ করাবার দরকার নেই, কেবল বিবেচক বুদ্ধি নয়, শুদ্ধতর অনুভূতিও ইতিহাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একালীন বস্তুবাদীরা এই মতের পক্ষে সরব। তাঁদের কথা বাদ দিয়ে যদি ভাববাদীদের মত বিবেচনা করি তাহলেও কার্যতঃ একই জায়গায় পৌঁছতে হয়। মানতে হয়ই—নিত্য-সত্য কাল-সত্য হয়ে ওঠে ব্যক্তিমানুষের বিশেষ সাধনা ও উপলব্ধির আলোকে। নচেৎ যুগে-যুগে অবতরণের কোনই অর্থ হয় না ; তাহলে একজন কৃষ্ণ, বুদ্ধ বা খ্রীস্ট চিরকালের জন্য শেষকথা বলে যেতে পারতেন। কিন্তু তা নয়, স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, তিনি লোকপ্রয়োজনে আবির্ভূত হন যুগে-যুগে।

প্রবর্তনকামনা করেছিলেন ? ধর্মের ব্যাপারে ভারতচন্দ্রকে যদি রামপ্রসাদের মতো অনুভূতিমার্গের পথিক না বলা যায়, তবে তাঁর সমন্বয়ী বুদ্ধির পিছনে হিন্দুর সমাজপ্রয়োজনের প্রেরণা কাজ না করবে কেন ?

ভারতচন্দ্রকে এতখানি সমাজসচেতন ভাবার যথেষ্ট বিপদ আছে জানি। সেই 'খেলুড়ে' কবি, যে-গুরুতর প্রয়োজনের ভার তাঁর উপরে আজ আমরা চাপিয়ে দিচ্ছি, হয়ত তার থেকে পরিত্রাণের জন্যই ধর্মসমন্বয় চেয়েছিলেন, এবং সেখানেই তিনি যথার্থ আধুনিক—সুখবাদী, দায়িত্বহীন, আত্মপরায়ণ কবি ! কবি কি ধর্মকে ব্যক্তিগত বস্তু বলে সংসারক্ষেত্র থেকে ঠেলে দেবার মনোভাবে সমন্বয় চেয়েছিলেন ? ধর্ম নিয়ে বিবাদ করলেই তার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সত্তাকে স্বীকার করতে হয় এবং সেজন্য ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন আসে। ধর্মসমন্বয়ে আস্থার মধ্য দিয়ে কি ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে, প্রত্যেকের জন্য ভোগসুখের নিরঙ্কুশ পথকেই খুলে দেওয়া হয় নি ? ধর্ম, বিসম্বাদের বস্তু নয়, তা ব্যক্তিস্বভাবকে উন্নত ও উপলব্ধিযুক্ত করে, তাকে তাই নিজস্ব বিশ্বাসের বেষ্টনীতে আবদ্ধ রাখা উচিত—ধর্মসহিষ্ণুতার এই যেমন শ্রেষ্ঠ রূপ, অপরদিকে ঐ সহিষ্ণুতার মনোভাব ব্যক্তিজীবনে পালনীয় ধর্ম আদৌ পালিত হচ্ছে কি না সে-বিষয়ে কৌতূহলের অধিকাব হারিয়ে ফেলে।

শেষোক্ত কথাগুলি সমকালের সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাবে না। বিচিত্র এই, বুদ্ধিমার্গের ভারতচন্দ্র এবং সাধনমার্গের রামপ্রসাদ একই সিদ্ধান্তে উপনীত। বুদ্ধি ও অনুভূতি—দুইয়েরই পিছনে আশ্চর্যভাবে সক্রিয় যুগশক্তি। বুদ্ধিযোগে যাব একটি দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ অসম্পূর্ণ রূপ সৃষ্টি করা হয়, অনুভূতির শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম স্পন্দনে তারই সম্পূর্ণ সত্যরূপ ধরা দেয়। ভারতচন্দ্রের গানগুলির কথা মনে রাখলে ধর্মব্যাপারে কদাপি তাঁকে অভিনেতা বলা যাবে না, যদিও একথা মানতে হয়, তাঁর উদারতার ছিদ্রপথে উদাসীনতা প্রবেশ করেছে, এবং আপাতভাবে তিনি নাগরিকের নানা নিত্যকৃত্যের অন্যতম কৃত্যরূপেই ধর্মকে নিবদ্ধ রেখেছেন। ভারতচন্দ্রের ধর্মবোধের পরিপূরকরূপে রামপ্রসাদের ধর্মবোধকে যদি গ্রহণ কবা যায়, তবেই কেবল এই অষ্টাদশ শতকীয় সভাকবির সাধুপ্রচেষ্টার মাহাত্ম্য যথাযথ বোঝা যাবে।

ভারতচন্দ্র-সমালোচনার ধারা

॥ ১ ॥

এক নিঃশ্বাসে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে আমার মোট কথাগুলি বলেছি। এগুলি প্রথাসিদ্ধ কথাবার্তা নয়; বলা যেতে পারে, বহুলাংশে বিতৃষ্ণা-জনক। ভারতচন্দ্র-বিষয়ে সুদীর্ঘ সুপরিসর নিন্দাবাণীর পটভূমিকায় এই কথাগুলি এমনই বেমানান যে, যে-কোনো পাঠক বিরক্তি প্রকাশ করে বলতে পারেন, এ হল সেই বিষাক্ত আধুনিকতা যা সামাজিক অনাচার কদাচারকে শ্রেয় জীবননীতি করতে উৎসুক, তদনুযায়ী ঐ ধরনের জীবননীতির প্রবক্তাদের পক্ষে স্তুতিকথনে উৎসাহী।

এক্ষেত্রে, আমাদের বক্তব্যের পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করা অবশ্য-কর্তব্য। যথাসাধ্য সে চেষ্টা করব। তার আগে, ভারতচন্দ্রের উপর ইতিপূর্বে যেসব আলোচনা হয়েছে, তার একটা খসড়া-ইতিহাস তৈরী করতে চাই। ঐসব আলোচনা নিজস্বভাবে চিত্তাকর্ষক। আরও দেখা যাবে, আমরা অনেকেই আমাদের মূল বক্তব্যে মৌলিক নই; এবং ভারতচন্দ্র পরবর্তীকালে একেবারে অনাথ অসহায় বালকও নন; মারা যাবার পরে তিনি যখন আধুনিক সমালোচকদের হাতে পুনশ্চ মারা যেতে বসেছিলেন, তখন তাঁর পক্ষে তলোয়ার ঘুরোবার মতো মিত্র-যোদ্ধা কেউ-কেউ ছিলেন।

ভারতচন্দ্রের রচনারীতি বা ভাষাশক্তির প্রশস্তিগুলি এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে উপস্থিত করব না, যেহেতু অঙ্গসজ্জার প্রশংসা তিনি সর্বদাই পেয়েছেন, বিরোধী সমালোচকদের কাছ থেকেও, কিংবা তাঁদের কাছ থেকেই অধিক পরিমাণে (আরে ছি! লোকটা কেবল আমাদের চোখ আর কান টানল, আত্মাকে উপড়ে আনল না!!)—এখানে আমি ভারতচন্দ্রের নৈতিক কুকীর্তির বিরুদ্ধে যেসব আদর্শবাদী আক্রমণ হয়েছে তাদের অধিক উল্লেখ করব, সেইসঙ্গে ভারতচন্দ্রের পক্ষসমর্থন-কারীদের বক্তব্যেরও।

প্রথমেই পাঠকদের একটি অতীব সত্য কিন্তু ইদানীং প্রায় অপরিচিত সংবাদ সম্বন্ধে অবহিত করিয়ে দিতে চাই—ভারতচন্দ্র রায় পুরো

একশ বছর ধরে বাংলাদেশের বিদগ্ধমহলে দেশের সবচেয়ে বড় কবি বলে স্বীকৃত ছিলেন। এই একশ বছর সময়ের মাপকে অনেকে আরও অন্তত: তিরিশ বছর বাড়িয়ে নিতে চেয়েছেন। এবং ভারতচন্দ্রের কাব্য রচনার প্রায় একশ আশি বছর পরে জনৈক বিখ্যাত লেখক, যিনি প্রমথ চৌধুরী ছাড়া কেউ নন, এই তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করেছিলেন—'আজ থেকে একশ আশি বছর পরে বাংলার কজন সাহিত্যিকের নাম বাঙালি-জাতি মনে রাখবে ?' চৌধুরী মহাশয় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'ভারতচন্দ্র আজ থেকে প্রায় একশ আশি বছর পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করেছেন, অথচ আজও আমরা তাঁর নাম ভুলিনি, এমনকি তাঁর রচিত সাহিত্য নিয়ে আজও উত্তেজিতভাবে আলোচনা করছি।'[১]

১৭৫২-তে 'অন্নপূর্ণামঙ্গল' কাব্য[২] রচিত হবার পরে এবং ১৮৬১-তে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য রচিত হবার আগে পর্যন্ত কিছু-বেশি যে একশ বছরে ভারতচন্দ্র নিঃসংশয়ে বাংলার প্রধান কবি (তাই বা কেন, মোহিতলাল মজুমদার বা প্রমথনাথ বিশীর মতো বিশিষ্ট সমালোচকদের মতে, ভারতচন্দ্র তাবৎ মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি অর্থাৎ ৯০০ বছরের বাংলা সাহিত্যের সেরা কবি)—সেই কালের প্রথম তিরিশ বৎসরে ভারতচন্দ্রের কাব্যসমাদর সম্বন্ধে অনুমানমূলক ধারণা করা ছাড়া উপায় নেই, কারণ লিখিত বিবরণ কিছু পাইনি।[৩] ঐ সময়ে

---

১ 'ভারতচন্দ্র' (প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, ১ম সং, ১৯৫২): প্রমথ চৌধুরী।

২ ভারতচন্দ্রের প্রধান সৃষ্টি 'অন্নদামঙ্গল', 'অন্নপূর্ণামঙ্গল'—নামেও পরিচিত। এই কাব্যের তিন খণ্ড : প্রথম খণ্ড অন্নদামঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দর, তৃতীয় খণ্ড মানসিংহ। কাজের সুবিধার জন্য এর পরে আমরা সমগ্র কাব্যকে বোঝাতে অন্নপূর্ণামঙ্গল লিখব (বা ত্রয়ী কাব্য) এবং পৃথক পৃথক খণ্ডগুলির জন্য উল্লিখিত পৃথক নাম লিখব।

৩ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী'র ভূমিকায় পাই :

"অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল বাঙালীর চিত্তে ভারতচন্দ্র যে অনেকখানি ঠাঁই জুড়িয়াছিলেন, তাহা সে-যুগের পুঁথিপত্র হইতে প্রমাণিত হয়।"

ভারতচন্দ্রের কাব্য পুথিতে প্রচারিত, মুদ্রিত হয়নি। তা হলেও ভারতচন্দ্রের সমঝদারের অভাব হয়নি ধরে নিতে পারি। ঈশ্বর গুপ্ত জানিয়েছেন, ভারতচন্দ্র তাঁর প্রথম সৃষ্টি সত্যপীরের পাঁচালী লিখেই ধন্য ধন্য শুনেছিলেন (বলাবাহুল্য সেই ধন্যরব কানে হেঁটে ঈশ্বর গুপ্তের কাছে পৌঁছেছিল)[৪]—আমরা সে প্রশংসার উপরে গুরুত্ব আরোপ করছি না, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় অন্নপূর্ণামঙ্গল পঠিত হবার পরে কি কোনো সংশয় থাকার সম্ভাবনা ছিল? আর কৃষ্ণনগরের সমাদর মানে সেকালীন বিদগ্ধ বাংলার সর্বোচ্চ সমাদর, কারণ কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ তখন বাংলা-নামক ধরণীর রাজধানী ও 'ক্ষিতির প্রদীপ।' এই কৃষ্ণনগর বাংলা বা ভারতের সাংস্কৃতিক জগতে তখন সত্যই কী বস্তু ছিল তা শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো বিচক্ষণ ব্যক্তির উচ্ছ্বাস থেকে বোঝা যাবে : 'ইহা বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না, যে-বঙ্গদেশ আজিও (১৯০৪) ভারতসাম্রাজ্যের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধি সুরসিকতা প্রভৃতির জন্য প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে, কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা তাহার পত্তনভূমিস্বরূপ ছিল।'[৫]

কৃষ্ণনগরের রসিক ও পণ্ডিতজনেরা ঠিক কিভাবে ভারতচন্দ্রের কাব্যকে নিয়েছিলেন তা এতদিন অলিখিত ছিল কিন্তু এখন আর নেই। কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'অমাবস্যার গান'-এর মধ্যে

---

৪ "যাঁহারা সেই কবিতা [সত্যপীরের পাঁচালী] শ্রবণ করিলেন, তাঁহারা তাবতেই মোহিত হইয়া সাধু সাধু ও ধন্য ধন্য ধ্বনি করিতে লাগিলেন। গ্রন্থের সর্বশেষে ভারতের নামের ভণিতা এবং সবিশেষ পরিচয় বর্ণিত হওয়াতে [শ্রোতারা জানতেন না পাঁচালীটি ভারতচন্দ্রের লেখা] সকলে আরও অধিক আশ্চর্য জ্ঞান করিলেন। সকলেই মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, ভারত! তুমিই সাধু! সরস্বতী তোমার মুখাগ্রে নৃত্য করিতেছেন। তুমি সামান্য মনুষ্য নহ। তোমার অসাধারণ ক্ষমতা ও অলৌকিক সাধ্য দৃষ্টে আমরা চমৎকৃত হইয়াছি।" [ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত 'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত।' বর্তমানে ডঃ ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত 'কবি-জীবনী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।]

৫ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'—শিবনাথ শাস্ত্রী।

উক্ত রচনার অবিলম্ব-সমাদরের যে চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন, তা কাল্পনিক হলেও অসত্য নয়—প্রস্তরীভূত ইতিহাসের অভাবের ক্ষেত্রে (কিংবা তার নিরেট জমাট জগতে) সাহিত্যিকেরা অনেক সময়ে কল্পনা-নামক গবেষককে কাজে লাগিয়ে ঘটমান ইতিহাসকে উদ্ধার করে আনেন, তারপর তাকে প্রাণরসসায়রে স্নান করিয়ে আলোক-দিব্যতা দিয়ে দেন। ঐতিহাসিক বিবেকসম্পন্ন সাহিত্যিকই একাজ করতে সমর্থ। একই সঙ্গে পণ্ডিত, অধ্যাপক ও কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এক্ষেত্রে সমর্থ পুরুষ ছিলেন।

নিতান্ত পণ্ডিতজনেরা আমাকে ক্ষমা করুন—আমি কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় ভারতচন্দ্রের সমাদর দেখাতে 'অমাবস্যার গান' থেকে অংশ উদ্ধৃত করবই :

মহারাজ [কৃষ্ণচন্দ্র] বলে চললেন, 'দুঃখ কর অবধান, আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান। এ সবই কবিকঙ্কণের হাতে খোলে ভাল। আসলে মুকুন্দরাম চাষাভূষো ছোটলোকের কবি, গরিবের দুঃখের কথা শুনিয়ে কান ঝালাপালা করে দেয়। আদিরস যেটুকু আছে নেহাৎ জলো, নিতান্তই নিয়মরক্ষা করতে হয়, তাই লেখা। তারপর বছর-বছব শুনতে-শুনতে এখন কেমন একঘেয়েও লাগে।'…

একটু হাই তুলে মহারাজ [ভারতচন্দ্রকে] বললেন, 'তুমি তো খুচরো কবিতা লিখেই চালাচ্ছ। কখনো একটুখানি বসন্তবর্ণনা শোনালে, কখনো-বা হিন্দী-ফার্সী-বাংলা-সংস্কৃত মিশিয়ে খানিকটা ইয়ার্কি করলে!' মহারাজ আরক্তিম চোখদুটো আধ-বুজে একটু হাসলেন, 'তা এসব তোমার হাতে জমে বেশ! ভূয়ো ভূয়ো রোরুদসি ইয়াকৎ নমুদা যাঁ কোসি—হা-হা-হা!'

মহারাজা শব্দ করে হেসে উঠলেন। কণ্ঠাভরণের গান একবার হোঁচট খেল, ঘরশুদ্ধ লোক দৃষ্টি ফেলল এদিকে, ফিরিঙ্গিবণিকেরা নিজেদের ভেতরে কী যেন কানাকানি করলেন, আর ভারতচন্দ্র অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে গেলেন। মহারাজাও যেন লজ্জা পেয়ে চুপ করে রইলেন।

কিছুক্ষণ [চণ্ডীমঙ্গলের] গান চলল। তার পরেই আবার চাপা গলায় ডাক এল : 'ভারত!'

'আজ্ঞা করুন!'

'নাঃ, এ নিতান্তই পান্‌সে। এই চৌতিশায় মন ভরে? আর ভাবো দিকি, বিল্‌হণের চৌরপঞ্চাশিকার সেই স্তুতি? শ্মশানে মরতে বসেছে, তবু কী বুকের পাটা!

অদ্যাপি তাং শশীমুখীং নবযৌবনাঢ্যাং।
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তীম্।
পশ্যামি মন্মথশরাসন পীড়িতাঙ্গীং
গাত্রাণি সম্প্রতি করোমি সুশীতলানি।—

'এ না হলে আর শ্মশান-স্তব!···তুমিই ভার নাও এবার।··· পুরনো চণ্ডীকাব্য আর নয়—মা-কে নিয়ে নতুন মঙ্গলকাব্য লিখে ফেলো একখানা।'

'মঙ্গলকাব্য!'

'হ্যাঁ, সম্পূর্ণ কাব্য। এসব টুকরো কবিতা কবিতা লিখে কেবল নিজের প্রতিভারই অপচয় করছ তুমি।'

'আমি পারব মহারাজ?'

'কেন পারবে না? তুমি রসিক, তুমি পণ্ডিত, অলঙ্কারশাস্ত্র তোমার মুঠোয়, তার উপর স্বভাবকবি। মুকুন্দরাম কোথায় দাঁড়াবে তোমার কাছে?'

'ওকথা বলবেন না মহারাজ, কবিকঙ্কণ আমাদের নমস্য। তবে আপনি যখন আদেশ করলেন, আমি চেষ্টা করব।'

'চেষ্টা তোমায় করতে হবে না, সরস্বতী নিজে এসে তোমার কলমে ভর্ করবেন। কিন্তু মনে রেখো, সরস হওয়া চাই। আর দেখছ তো, আমার কৃষ্ণনগরের লোক এমনিতেই একটু বেশি রসিক, তাদেরও খুশি করা চাই।'

'মহারাজের আদেশ শিরোধার্য।'

[সুতরাং ভারতচন্দ্র কাব্য লিখে ফেললেন—অন্নদামঙ্গল। নির্দিষ্ট দিনে রাজসভা বসল কাব্য শুনবার জন্য।—]

'ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী,—'

মনে-মনে স্মরণ করে ভারতচন্দ্র চেয়ে দেখলেন সভার দিকে। মাথায় ধবল ছত্র, দু'পাশে চামর দুলছে, বহুমূল্য সিংহাসনে মখমলের কোমল পাদপীঠে পা রেখে বসেছেন স্বয়ং নবদ্বীপের অধীশ্বর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। সিংহাসনের কিছু নীচে দু'পাশে রাজার দুই পক্ষের ছয় পুত্রের পাঁচজন সাবালকই আসীন। তাছাড়া চার জামাতা, দুই ভগ্নীপতি, ভাগিনেয়, ভাগিনীজামাই, পিসে শ্যামসুন্দর। শ্যামসুন্দরের তিন জামাই, জ্ঞাতির দল ; এছাড়া পণ্ডিত-পরিষদ, দেওয়ান, রাজবৈদ্য, রাজজ্যোতিষী, নর্তক, বাদক মোগল-ভোজপুরী-বুন্দেলখণ্ডী সেনানায়কেরাও সভা আলো করে রয়েছেন। আর সকলের মাঝখানে বিকশিতদন্ত গোপাল ভাঁড়, তাব পাশে হরষিতকে কানে-কানে ক্রমাগত কী যেন বলে চলেছে।

[অতঃপর ভারতচন্দ্রের কাব্যপাঠ—]

দেশের সেই গুণিজন-প্রতিপালক দানধ্যানে অমিতকীর্তি চার সমাজের অধিনায়ক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ভারতচন্দ্র পড়ে চললেন তাঁর কাব্য। বন্দনা শেষ হল, সভাবর্ণনা সাঙ্গ হল, তারপর আরম্ভ হল পার্বতী-পরমেশ্বরেব কাহিনী। দক্ষযজ্ঞের সূচনা, দশমহাবিদ্যার রূপ, দক্ষের শিবনিন্দা, সতীর দেহত্যাগ, যজ্ঞ বিনাশ, পীঠের বিবরণ ; দেবীর নবজন্ম, শিববিবাহের আয়োজন, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, শিববিবাহ, হরগৌরীর সংসার, দরিদ্র সংসারে দাম্পত্যকলহ, ভিখারী শিব, অন্নপূর্ণার রূপ ; ব্যাস ও ব্যাস-কাশীর কথা, শেষে দেশে মানসিংহের আবির্ভাব, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের সৌভাগ্যোদয়ের বৃত্তান্ত—কাহিনীর সমাপ্তি।

এই দশদিন ধরে নানা অভিব্যক্তি ফুটে উঠল শ্রোতাদের মুখে। ছন্দ অলঙ্কারের ছটায় কখনো তাঁরা মুগ্ধ হয়ে বসে রইলেন,

কখনো-বা বাক্‌চাতুর্যে চকিত হলেন, কখনো-বা উচ্ছ্বসিত কৌতুকের হাসিতে সভা মুখরিত হল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রথমে উপেক্ষার ভাব করে বসেছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁরাও যেন আকৃষ্ট হয়ে উঠতে লাগলেন। দশদিন পরে কাব্যপাঠ সমাপ্ত হল। গ্রন্থ বন্ধ করে ভারতচন্দ্র উচ্চারণ করলেন :

'যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্বং ত্বৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বরী—'

সকলের আগে উঠে দাঁড়ালেন প্রাচীন গদাধব তর্কালঙ্কাব। পৈতাটি তুলে ধরে বললেন, 'অপূর্ব হয়েছে তোমার কাব্য। আশীর্বাদ করছি নরলোকে খ্যাতি তোমাব অক্ষয় হোক।'

রাজকবি বাণেশ্বব বিদ্যালঙ্কার বললেন, 'ভাষার কবিতায় আমি বিশ্বাস করি না। সংস্কৃতই একমাত্র উচ্চাঙ্গেব কাব্যরস বহন করতে পারে। তবু ভারতচন্দ্রের কাব্য শুনে আমি প্রীত হয়েছি। এতে তরলতা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিস্ময়কর কবিত্বের স্ফুরণও রয়েছে। আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি।'

বাণেশ্বর এই প্রথম স্বীকৃতি দিলেন ভারতকে। অন্য পণ্ডিতেরা বললেন, 'সাধু, সাধু।' কালিদাস সিদ্ধান্ত অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মুগ্ধস্বরে বললেন, 'রসে অলঙ্কারে অনুপম। সমস্ত শাস্ত্র-পুরাণ মন্থন করা বিদ্যা। ভাষায় এমন কাব্য আর লেখা হয়নি। মহারাজের শতরত্ন-সভায় কবি ভারতচন্দ্র শ্রেষ্ঠ রত্ন।'

গোপাল ভাঁড় বললে, 'বুড়ো ব্যাসটাকে খুব জব্দ করে দিয়েছ খুড়ো। "গর্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে।" হা-হা-হা। কিন্তু খামোকা তুমি আবার হরিহর অভেদ-টভেদ করতে গেলে কেন? ও জায়গাটা কেটে দাও। ও-সব ন্যাড়ানেড়ীগুলোর কথা শুনলেও গা জ্বালা করে। বরং শিবকে আর একবার ক্ষেপিয়ে দিয়ে বোষ্টুম-টোষ্টুমগুলোকে নিকেশ করে ফেলো।'

আফিঙের নেশায় টকটকে রাঙা চোখ মেলে রাজার পিসেমশাই শ্যামসুন্দর চাটুজ্যে বললে, 'তুমি থামো গোপাল।

কীলোৎপাটীব বানরের মতো তুমি আর অব্যাপারে নাক গলিয়ো না।'

বিষ্ণুভক্ত মুক্তিরাম মুখুজ্জে বললেন, 'অপূর্ব—অপূর্ব ! ভারত, তোমার মনে কোনো সাম্প্রদাতিক ভেদবুদ্ধি নেই, তুমি শ্যাম ও শ্যামার অভেদত্ব উপলব্ধি করেছ, এ দেখে বড় আনন্দ হল।'

[এত প্রশংসা ! তবু, তিনি কি বললেন যাঁর প্রশংসা সব-চেয়ে মূল্যবান সুতরাং প্রয়োজনীয়, সেই একাধাবে 'কুলপতি' ও 'প্রমোদের প্রভু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ?—]

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গম্ভীব বিষণ্ণ হয়ে বসে বইলেন। সভাসদ-দের আলোচনা, মন্তব্য, কিছুই তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন না। কপালে কয়েকটা কুঞ্চিত বেখা, চোখ অর্ধনিমীলিত।

একটু পরে ডাকলেন, 'ভারত !'

'আদেশ করুন, মহারাজ !'

'তোমার রচনা অতি উত্তম। কিন্তু—কিন্তু এ আমি চাইনি।'

এক মুহূর্তে সভা স্তব্ধ হয়ে গেল। পরম কাব্যরসিক মহা-পণ্ডিত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে এ প্রত্যাশা কেউ করেনি। এমনকি গোপাল ভাঁড় পর্যন্ত আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল, বিবর্ণ হয়ে গেল ভারতচন্দ্রের মুখ।

রাতের পর রাত, দিনের পর দিন। আহার নিদ্রা ছিল না, বিশ্রাম ছিল না। সমস্ত মনপ্রাণ, জীবনের সব সাধনা ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যের প্রতিটি ছত্রে ঢেলে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই তার পারিশ্রমিক !

রাজা বললেন, 'তোমার কাব্য অসম্পূর্ণ। এ রাজসভার যোগ্য নয়।'

'মহারাজ—'.

'আজ সন্ধ্যাবেলায় তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে—' রাজা সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন : 'তখন আমার যা বক্তব্য সে আমি তোমাকে বলব। সভাভঙ্গ হল আজকে।'

[রাজার খাসকামরায় অতএব সেইদিন উপস্থিত উদ্‌ভ্রান্ত ভারতচন্দ্র।]

কৃষ্ণচন্দ্র মুখ থেকে গড়গড়ার নল নামিয়ে রাখলেন। হাসলেন সস্নেহে। 'খুব অভিমান হয়েছে, না ভারত?'

'না মহারাজ, অভিমান আবার কিসের? আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারিনি—এ আমারই দুর্ভাগ্য।'

'কাব্য তোমার উৎকৃষ্ট হয়েছে ভারত, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এও তো মুকুন্দরামের মতোই হল। সেই দেবতার বন্দনা, সেই দেবতার কাহিনী, সেই নাম-মহিমা, তীর্থমাহাত্ম্য, তার ফাঁকে-ফাঁকে মানুষের সাদা-মাটা সুখ-দুঃখের কথা। তোমার কাব্যে রস কোথায় ভারত?'

'রস নেই মহারাজ?'—ভারতচন্দ্র চমকে উঠলেন।

'না, রস নেই। রসের শ্রেষ্ঠ আদিরস, তাই যদি না থাকে, তাহলে চণ্ডীর গীত লেখা হতে পারে, কিন্তু কাব্য হয় না। স্বয়ং কালিদাসের কুমারসম্ভব ছ্যাখো। দেবতাকে আশ্রয় করেও—'

ভারতচন্দ্র মাথা নাড়ালেন: 'কিন্তু মহারাজ, কুমারসম্ভবের ও-অংশটা কি খুব শোভন হয়েছে?'

'কাব্য কাব্যই, তা কামন্দকীয় নীতিসার নয়। রস যেখানে আসল কথা, শোভন অশোভনের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। তুমি বিল্‌হণ পড়েছ ভারত!'

'পড়েছি মহারাজ।'

'অমরু শতক?'

'পড়েছি।'

'রাজশেখর?'

'দেখেছি মহারাজ।'

'তুমি তো ভাল ফার্সী জানো। কিস্‌কা পড়েছ কিছু কিছু?'

'পড়বার সৌভাগ্য হয়েছে।'

'তবে তো তুমি সবই জানো।' মহারাজ একটু থামলেন:

'দিনকাল দেখতে পাচ্ছ না? লোকের রুচি বদলে যাচ্ছে, মন বদলে যাচ্ছে। দেবতার কথা শুনতে কারো আর ভাল লাগে না। রামায়ণ গান, কথকতায় লোকের আর মন নেই, এখন খেউড়-গান শুনতে তারা ভিড় করে। একালে অন্নদার কথা কে শুনবে ভারত?'

'কিন্তু মহারাজ, ইতরের রুচিপরিচর্যা করাই কি কবির কাজ?'

'কবিরও তো শ্রোতা চাই, ভারত।'—কৃষ্ণচন্দ্র হাসলেন: 'রাজসভায় যারা বাহবা দিয়েছে, তাদেরও মন পড়ে আছে নদে, শান্তিপুরের খেউড়ের দিকে। তাছাড়া আসল কথা, আমি তোমাকে কবি হিসেবেই দেখতে চাই, পাঁচালী লিখিয়ে বলে নয়। আর—'

মহারাজ একটু থামলেন। ভারতচন্দ্র বললেন, 'আর?'

'নানা ঝঞ্ঝাটে আমারও মন-টন একেবারেই ভালো নেই। চারদিক থেকে কেমন মেঘ ঘনিয়ে আসছে। কী যে হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। এগুলো ভুলতে চাই, ভারত। মজিয়ে দাও, নেশা ধরিয়ে দাও।'

[সুতরাং নেশা-ধরানো কাব্য লিখলেন ভাবতচন্দ্র। তারপর—]

দু'সপ্তাহ পরে হুজুরে সেলাম দিলেন ভারতচন্দ্র।

'মহারাজ, আমার কাব্য প্রস্তুত।'

'আদিরস?'

'হ্যাঁ মহারাজ, বিশুদ্ধ প্রেমকথা।'

'সংস্কৃত নাটকের সেই "হা প্রিয়ে—চন্দ্রাননে! এই মলয় বাতাসে বিরহজ্বরে আমি জর্জরিত"—এইসব পোষাকী প্রেমের কথা নয় তো?'

'না মহারাজ, এ রসে কোনো আবরণ নেই।'

'সাধু—সাধু!···শুভস্য শীঘ্রং। তাহলে কালই হোক।'

'কিন্তু মহারাজ, একটি নিবেদন আছে। কালকের আসরে কুমারেরা, মহারাজের পূজনীয় আত্মীয়েরা, তর্কসিদ্ধান্ত, বাচস্পতি, ন্যায়ালঙ্কার, বিদ্যাবাগীশ, ন্যায়পঞ্চানন, বিদ্যালঙ্কার আর প্রবীণেরা কেউই থাকতে পারবেন না।'

কৃষ্ণচন্দ্র হেসে উঠলেন : 'বুঝেছি, আর বলতে হবে না।'

অন্তরঙ্গ আসর বসল পরদিন সন্ধ্যায়। একবার চোখ বুজে কৃষ্ণনাম স্মরণ করলেন ভারতচন্দ্র। শুরু হল অন্নদামঙ্গলে নতুন সংযোজন বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী।···

···তিন দিন ধবে শ্রোতাদের কারো আর নিঃশ্বাস পড়ল না। শুধু থাকতে না পেবে মাঝখানে একবার গোপাল ভাঁড় চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'কাত করে বই ধরো না খুড়ো, কাত কবে বই ধরো না, রস গড়িয়ে পড়ে যাবে।'

পাঠ শেষ কবে ভাবতচন্দ্র যখন বসলেন, তখন স্বয়ং আসন ছেড়ে উঠে এলেন মহারাজ। দু'হাত দিয়ে তুলে ধরলেন ভারতচন্দ্রকে।

'অপূর্ব অদ্ভুত। কৌতুকে, রসিকতায়, কবিত্বে—কামশাস্ত্রকে মহাকাব্য কবে তুলেছ তুমি। বিল্‌হণ, অমরু, রাজশেখর—সবাই ম্লান হয়ে গেছে তোমার কাছে। আজ আমি তোমার উপাধি দিচ্ছি, রায়গুণাকর।'

॥ ২ ॥

কৃষ্ণচন্দ্র অস্তগত হলেন যথাকালে। তাঁর কৃষ্ণনগর কলকাতার গর্ভে নবজন্ম নিল, অবশ্যই পাশ্চাত্ত্যসভ্যতাব ঔরসে— সে কৃষ্ণনগর ভূমিলাভ করেছিল ভাবতচন্দ্র নামক দুলালটিকে কোলে নিয়েই। প্রমাণ—মুদ্রিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে কলকাতায় বিদ্যাসুন্দরের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা। সে জনপ্রিয়তা কেবল পুস্তক-মুদ্রণে আবদ্ধ থাকেনি, গানে অভিনয়ে ব্যক্ত হয়েছিল একই সঙ্গে, বিশেষতঃ গোপাল উড়ের প্রতিভায় (!), যিনি বিদ্যাসুন্দরকে দগ্ধ করে বঙ্গময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন টপ্পার তালে দুলেশ্চুলে।

১৭৭৮ খ্রীঃ হুগলীতে, তারপরে ১৭৮০ খ্রীঃ কলকাতায় ছাপাখানা চালু হবার পরে "ইংরেজি ভাষাতেও যে-সকল বাংলাভাষা-সম্পর্কিত গ্রন্থ বাহির হয়, সেগুলির ভূমিকায় অথবা দৃষ্টান্তবাক্যে ভারতচন্দ্রের

'অন্নদামঙ্গল', বিশেষ করিয়া 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের অংশ ভূরি-ভূরি উদ্ধৃত হইয়াছে। হালহেডের ব্যাকরণ (১৭৭৮), ফরস্টারে অভিধান (১৭৯৯-১৮০২), লেবেডফেব ব্যাকরণ (১৮০১) প্রভৃতি পুস্তকে ইহার প্রমাণ মিলিবে।"[৬]

অধ্যাপক স্বপন বসু আমাদের জানিয়েছেন: হাল্‌হেড ভারতচন্দ্রের নামোল্লেখ করেননি, যদিও 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের উল্লেখ করেছেন এবং মাঝে-মাঝে ব্যাকরণের সূত্রের উদাহরণ হিসাবে ভারতচন্দ্রের কাব্য-পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করেছেন ও তার অনুবাদ করেছেন। এই সকল বিক্ষিপ্ত অনুবাদের দ্বারা, আমরা এখনকাব মতো ধরে নিচ্ছি, হাল্‌হেড ভারত-

---

৬। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলীর সাহিত্য-পরিষদ সংস্করণের ভূমিকা।

এই অংশে প্রদত্ত সংবাদকে ডঃ মদনমোহন গোস্বামীও তাঁর গ্রন্থে গ্রহণ করে-ছেন। সেই সঙ্গে তিনি যোগ কবেছেন ১৭৮০-তে কলকাতায় অগস্টস্ হিকি ও গ্ল্যাডস্টোন মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন।

বাংলাদেশে ছাপাখানা স্থাপন সম্বন্ধে অধ্যাপক স্বপন বসু আমাদের জানিয়ে-ছেন, সেপ্টেম্বর ১৭৮৬-তে কোম্পানীর কর্মচারী মিঃ বোল্টস্, কলকাতায় ছাপা-খানার অভাবজনিত অসুবিধা দূর করার জন্য কেউ উদ্যোগী হলে তাঁকে সবতো-ভাবে সাহায্য করবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি বিজ্ঞাপন কলকাতাব কাউন্সিল হাউসের দরজায় লাগিয়ে দেন। তার 'অল্পদিন পরে' হুগলিতে 'সম্ভবতঃ' প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়, যেখান থেকে ১৭৭৮ খ্রী হালহেডের গ্রামার ছাপা হয়। এর দু'বছর পরে কলকাতায় কোম্পানীর প্রেস স্থাপিত হয়, তবে হুগলি প্রেসটিই স্থানান্তরিত হয়েছিল, অথবা এটি কোনো স্বতন্ত্র প্রেস বলা মুশকিল। ১৭৮০-তে গভর্নমেণ্ট প্রেস থেকে ভারতের প্রথম গেজেট ছাপা হয়।

[সংবাদসূত্র : *First Establishment of a Press in Calcutta* : The friend of India : No. 9. Vol. 1. 26. 2. 1835. p. 65]

অধ্যাপক বসু আরও জানিয়েছেন, ১৭৮০ তে কোম্পানীর প্রেসে বাংলা ছাপার মালমসলা ছিল এমন প্রমাণ নেই। তবে ১৭৮৩ থেকে ক্যালকাটা গেজেট প্রেসে বাংলা হরফ ছিল, এবং ১৭৮৫ খ্রী. কোম্পানীর প্রেস থেকে বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত দ্বিতীয় পুস্তক বেরিয়েছে। বাবুরাম হিন্দুদের মধ্যে কলকাতায় প্রথম প্রেস করেন। তারপর উল্লেখযোগ্য গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের প্রেস। →

চন্দ্রের প্রথম ইংরেজি অনুবাদক। উক্ত অনুবাদের কিছু নমুনা দিচ্ছি। প্রথমে অন্নদামঙ্গলের সুবিখ্যাত কয়েকটি লাইনের অনুবাদ, তার পরে বিদ্যাসুন্দরের :

সিঁউতিতে পদ মাতা রাখিতে ২।
সিঁউতি হইল সোনা দেখিতে ২॥
সোনার সিঁউতি দেখি পাটনীর ভয়।
এ ত মেয়া মানুষ নয় দেবতা নিশ্চয়॥

The mother (of nature) on suddenly placing her foot in the bucket,
The buckct immediately became gold to behold.
Fear freezed the pilot, on beholding the golden bucket; (and he said)
This woman is not of human race, she is certainly an angel.

[সংবাদসূত্র : 'বাংলা ছাপার হরফের জন্মকথা' : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩৩৪।

On the Effect of the Native Press in India : The Friend of India (Quarterly, Vol. 1. No. 1. 1821)]

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য অন্নদামঙ্গলের প্রথম সচিত্র সংস্করণ প্রকাশ করেন—এ মত স্বীকৃত। সে গ্রন্থ কলকাতা থেকে প্রকাশিত। ডঃ সুশীলকুমার দে তাঁর *Bengali Literature* (2nd Ed. 1962) গ্রন্থে কিছু ভিন্ন সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ১৮০১-২৫ সময়ে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে কেরীর উদ্যোগে বহু বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ছিল। 'The editions of the *Ramayana* of Kirtibas and *Annadamangal* of Bharatchandra, published through the zeal of Carey, remaind for a long time the standard texts of these ancient works. (P-142).

অধ্যাপক স্বপন বসু বলেন, এম এস খান ১৮৩০-৩৪-এ শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত বইয়ের যে তালিকা দিয়েছেন, তাতে অন্নদামঙ্গলের নাম নেই ; শ্রীরাম-

এক পুত্রী আইবড় বিদ্যা নাম তার।

He has one daughter unmarried; her mame is Beedyaa.

বড় সুন্দর সেই অতি অনুপাম।

সুনিলাম বিদ্যার পতি অতি গুণধাম॥

This petron vary fair and extremely beautiful, I have heard to be the most accomplished husband of Beedyaa.

মেঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানি।

ঘরের বাহিরে নহে যেই যুবা···

The cold of the month Maagh is like the strength of the cloud,

Then I say the youth should not be without the house.

আমি যে হই সে হই, আমি যে হই সে হই।

জিনিয়াছি পণে বিদ্যা, ছাড়ি জীব নাই॥

I am what I am, I am what I am,

But as I have conquered (in the conditions of the marriage)

I will not go and quit Beedyaa.

বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যানাম জপ।

বিদ্যালাভ বিদ্যালাভ বিদ্যানাম তপ॥

পুর কলেজ কেরী লাইব্রেরিতে শ্রীরামপুর-প্রকাশিত বইয়ের যে তালিকা আছে, তাতেও অন্নদামঙ্গলের নাম নেই। সুতরাং ডঃ দে'র প্রদত্ত সংবাদ ঠিক নয় বলেই মনে হয়।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের অন্নদামঙ্গলের আখ্যাপত্র:

OONOODAH MONGUL
Exhibiting the tales of
BIDDAH AND SOONDER
To which is Added
THE MEMOIRS OF RAJAH PRUPATA DITYA
Embellished with six cuts. Calcutta: From the Press of Ferris. 1816

The beauty of Beedyaa is my study, Beedyaa's name is my bead-roll ;
Beedyaa is my desire, Beedyaa is my desire, Beedyaa's name is my prayer.

ভাটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার।
উথলিল সুন্দরের সুখ-পারাবার॥

Having heard an account of Beedyaa from the mouth of Bhaat,
The inclinations of Soondor boiled vehemently.

কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক সে আঁখি ধরি বিদ্যার মাজায়॥

Who says that the figure of love is not to be seen ?
Opening his eyes let him look on the, shape of Beedyaa.

ব্যাকরণের গাঁটে-গাঁটে রসসঞ্চার করবার জন্য যে-রকম উত্তপ্ত আনন্দে বিদ্যাসুন্দরের অনুবাদ করেছেন হাল্‌হেড, তাতে তাঁর মনোভাব বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাঁর থেকেও যে, বিদ্যাসুন্দরে অধিক আমোদী হয়ে উঠবেন নাট্যামোদী রুশ-পর্যটক হেরাসিম লেবেডফ, তাতে সন্দেহ কি! "১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৭-এ নভেম্বর তারিখে রুশদেশবাসী হেরাসিম লেবেডফের উদ্যোগে কলকাতায় ২৫ নং ডুমতলাতে (বর্তমানে এজরা স্ট্রীটে) সর্বপ্রথম যে বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে প্রথমদিনের অভিনয়ের পরে ভারতচন্দ্রের কয়েকটি গান যন্ত্রসহযোগে গীত হইয়াছিল।"[৭] লেবেডফ ভারতচন্দ্রে কতখানি মগ্ন হয়েছিলেন, তা বোঝা যায়, ১৭৯২ সাল নাগাদ সেন্ট পিটস্‌বার্গের আর্চপ্রিস্ট এ এ সামবর্কস্কি-কে (A A Samborsky) লেখা তাঁর পত্র থেকে। পত্রমধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তিনি লেখেন :

"I also translated from books extracts of heoric

৭। পরিষদ-সং ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলীর ভূমিকা। এই অভিনয়ের একটি বিজ্ঞাপন পরে উদ্ধৃত করেছি।

poetry written by Bharat Chandra Ray, the glorious light of Hinduism, who with an oderly division of the parts wrote so sweetly, pleasingly, clearly and truthfully that many people committed them to memory in order to be able to be just service in language tests."[৮]

হাল্‌হেড যদি ভারতচন্দ্রের প্রথম ইংরেজি অনুবাদক হন (অবশ্য খুবই সামান্যভাবে), তাহলে লেবেডফ, এ পর্যন্ত যা পাচ্ছি, তাতে তাঁর প্রথম সমালোচক। শুধু তাই নয়, তিনি ভারতচন্দ্রের প্রথম রুশ-ভাষায় অনুবাদকারীও। লেবেডফ-ব্যাকরণের ১৯৬৩ সংস্করণের মুখবন্ধে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই সংবাদ দিয়েছেন। অনুবাদ অবশ্য মুদ্রিত হয়নি—লেবেডফ ভারতচন্দ্রের যে-পুথি নিজের জন্য বিশেষভাবে লিখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তারই মধ্যে ঐ অনুবাদ করে রেখেছিলেন।[৯]

৮। লেবেডফ-ব্যাকরণের (*A Grammer of the Pure and Mtxed East Indian Dialects*) ১৯৬৩ সংস্করণের সম্পাদকীয় ভূমিকার মধ্যে সম্পাদক শ্রী এস, পি, সাহা উক্ত পত্রটির এই ইংরাজি অনুবাদটি উদ্ধৃত করেছেন।

৯। ডঃ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

"It has now been discovered that he [Lebedeff] had taken with him a manuscript of the very famous religious and historical poem of Bharat Chandra Ray Gunakar, the greatest poet of Bengal in the 18th. century, and in this manuscript which evidently he had got specially written for himself, we find under each Bengali word its pronunciation given in Russian letters and below this transcription we have the Russian equivalent of the Bengali word. This is thus a very close line to line translation —really, it is a Bengali-Russian crib, prepared before 1797. Lebedev evidently prepared that transcription and translation with some care, and it would appear certain that he wanted to do some serious literary work in connection with this well-known poem of Bengal."

ডঃ মদনমোহন গোস্বামী তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় আলোচ্য বিষয়ে লিখেছেন :

॥ ৩ ॥

১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য অন্নদামঙ্গলের প্রথম সচিত্র সংস্করণ বার করলেন। বাংলা প্রকাশন-ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এটি। ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলীর (পরিষদ-সং) সম্পাদকের মতে, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য মুদ্রণ করিয়াই বাংলাদেশে তৎকালীন পুস্তক-ব্যবসায় আরম্ভ হয়,' এবং 'বাংলাদেশে মুদ্রিত সর্বপ্রথম সচিত্র পুস্তকও এইটি।' এর পরে কলকাতা এবং বাংলার অন্যত্র অন্নদামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের ব্যবসা ফেঁপে ওঠে, ভারতচন্দ্রের জনপ্রিয়তার সীমা থাকে না। পূর্বোক্ত সম্পাদক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, 'গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া

"লণ্ডনস্থ রুশ রাষ্ট্রদূত ভোরোন্‌সভ্-কে লিখিত হেরোসিম লেবেডফ (=গেরাসিম [illegible]নোভিচ্ লেবেদিয়েভ্)-এর পত্রে (২৭-৭-১৭৯৭) জানা যায় যে, তিনি 'সুবিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র রায় কর্তৃক রচিত বর্ধমানের রাজকন্যার বিবাহ সম্বন্ধীয় কাব্যখানি' রুশ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।"

লেবেডফের বিদ্যাসুন্দর-মুগ্ধতার প্রমাণ তাঁর ব্যাকরণেও (ব্যাকরণের মধ্যেও !! হাল্‌হেডের মতই !!!) রয়েছে। নামপত্রে নিম্নের অংশ উদ্ধৃত আছে :

Shoono anondit, Raja Kohila tahare ; beia-koron adie shastro poraho Beddere.

Agge pae beprobor, beddere poray ; beia-koron adie kabbeo shongito nirnoy.

Jyotish, tipponie, tica, koteco percar ; alpo cale bahoo shastre hoilo odhicar.

Chitro korie ak-shloc lekelec pate ; nijo poriechoy deia tooilo tahate.

BEDDE SHOONDOR Vol. 1.
SHRIE CHONDRO RIY

গোস্বামী-কৃত বাংলা পাঠ : 'শুন আনন্দিত, রাজা কহিল তাহারে ; বেয়াকরণ আদী শাস্ত্র পড়াহ বেদ্দেরে। আজ্ঞা পাএ বিপ্রবর বেদ্দেরে পড়ায় ; বেয়াকরণ আদী কাব্য শঙ্গিত নির্ণয়। জৈতিষ, টিপ্পনী, টিকা, কতেক পেরকার ; অল্প কালে বহু শাস্ত্রে হৈল অধিকার। চিত্র করী এক-শ্লোক লেকেলেক পাতে ; নিজ পরীচয় দেইআ তুইল তাহাতে। বেদ্দে শুন্দর, প্রথম খণ্ড, শ্রী চন্দ্র রায়।' →

বাংলাদেশে অন্য কোনো বাংলাপুস্তক এত অধিক প্রচারিত ও পঠিত হয় নাই।' কলকাতার হঠাৎ-বাবুর দল কিংবা বেনিয়ন-মুৎসুদ্দিরা (বা তাঁদের নন্দনেরা) পায়রা ওড়ানো, বেড়ালের বিয়ে দেওয়া বা গণিকা-বিলাসের ফাঁকে-ফাঁকে বিদ্যাসুন্দর তারিয়ে চাখতেন, এই কথাটাই এক-মাত্র সত্য নয়, পাশ্চাত্ত্য-জ্ঞানালোকে স্ফুটিতচক্ষু নবজাগরণের বিহঙ্গ-গণও (কেউ কেউ একেবারে অগ্নিবিহঙ্গ!) যে, ভারতচন্দ্রকে কবিকুলপতি মেনে ফেলেছিলেন, তাও দেখতে পাই। ইংরেজিনবিশ লেখক ও কবি

লেবেডফের গ্রন্থের আখ্যাপত্রে উদ্ধৃত এই অংশটি ভারতচন্দ্রের রচনা কিনা সে বিষয়ে ডঃ গোস্বামী সন্দেহপ্রকাশ করেছেন। কারণ, প্রথমতঃ নাম ভারত চন্দ্র নয়, 'শ্রীচন্দ্র রায়', যে নামের লেখকের কোনো রচনা পাওয়া যায় না। দ্বিতী-যতঃ বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রাচীনতম দুই পুথিতে (বৃটিশ মিউজিয়ামে এবং বিব-লিওথেক নাসিওনেলে সংরক্ষিত) বা অন্য কোনো মুদ্রিত সংস্করণে ঐ অংশটি পাওয়া যায় না।

এক্ষেত্রে আমাদের অনুমান, কোনো দেশী পণ্ডিত ভারতচন্দ্রেব নাম করে ঐ অংশটুকু চালিয়ে দিয়েছিলেন লেবডফের কাছে। সে যাই হোক, ব্যাপারটা বিদ্যা-সুন্দর-ঘটিত এবং লেবেডফ তার এত অনুরাগী যে, আখ্যাপত্রে উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারেন নি, এই যথেষ্ট।

বাংলা-থিয়েটার ভারতচন্দ্রের গান গলায় নিয়ে জন্মেছিল। ডবলিউ এইচ কেরীর *The Good Old Day of Honorable John Company : 1600-1858* Vol. 1. গ্রন্থে (১৮৮২) এ সম্পর্কে পাই :

"There existed in 1795 another theatre in Doomtullah, a lane leading out of the Old China Bazar, and near to the other theatre. The manager of the Doomtullah in that year anounced an unique performance :—"By permission of the Honorable the Governor General, Mr. Lebedeff's New Theatre in the Doomtullah, decorated in the Bengali style, will be opened very shortly, with a play called the Disguise; the characters to be supported by performers of both sexes. To commence with vocal and instrumental music called the Indian serenade. To those musical instruments, which are held in esteem by the Bengalees, will be added European. The words of the much admired poet Shree Bharot Chondro Ray are set to music".

কাশীপ্রসাদ ঘোষ লিটারারি গেজেটে বাংলা কাব্য ও কবিতা সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন, তার মধ্যে ভারতচন্দ্রের বিশেষ প্রশংসা ছিল।[১০] লিটারারি গেজেটের প্রয়োজনীয় সংখ্যাগুলি পরীক্ষার সুযোগ না হলেও দেখতে পাই, ৬ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০-এর সমাচার দর্পণে কাশীপ্রসাদের উক্ত রচনার উল্লেখ আছে :

"...অপর.কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিদ্যাসুন্দর নামক এক পুস্তকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেব এক অংশ। তিনি যথার্থরূপে তাহার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তাহার কয়েক পয়ারে তিনি ইঙ্গরেজী ভাষায় তরজমা করিয়াছেন এবং তাহাতে অনেক কাব্যরস দৃষ্ট হইতেছে। বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের সংস্কৃতানুযায়ী ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট অন্য তুল্য এমত পুস্তক নাই, কেবল মধ্যে ২ অনেক আদিরসঘটিত কথাব দ্বারা তাহাতে কলঙ্ক আছে।" ['সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম (তৃতীয় সং)-৬২]

এ পর্যন্ত যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে কাশীপ্রসাদ ঘোষই বাঙালিদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের প্রথম আংশিক ইংরেজি অনুবাদক এবং সমালোচক।

ভারতচন্দ্রের প্রথম সমালোচক বলে কথিত রাধামোহন সেন[১১]

১০। লিটারারি গেজেটের সম্পাদককে ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪ লেখা চিঠিতে কাশীপ্রসাদ যে আত্মকথা জানান (লঙ-এর 'হ্যাণ্ডবুক অব বেঙ্গল মিশনস'-এ সেটি পুনঃমুদ্রিত হয়েছে), তার মধ্যে পাই :

'I seldom wrote in prose until the year 1829, in which and in the following year I wrote *the Vision, a tale, on Bengali Poetry*, and *on Bengali Works and Writers*, published by you in the Literary Gazette.

[সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম (তৃতীয় সং) সম্পাদকীয়, ৪৪১]

১১। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে (প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ) রাধামোহনকে 'ভারতচন্দ্রের প্রথম ক্রিটিক' বলেছেন। ডঃ মদনমোহন গোস্বামীও রাধামোহনী পদ্য-টিপ্পনী উদ্ধৃত করে বলেছেন—'ইহাই ভারতচন্দ্রের সর্বপ্রথম সমালোচনা।' কথাটা ঠিক নয়। কাশীপ্রসাদ এর কিছুদিন আগে ভারতচন্দ্রের সমা-

১৮৩৩ সালে 'অন্নদামঙ্গল' প্রকাশ করেন। সে গ্রন্থে টীকার মধ্যে তিনি ভারতচন্দ্রের রচনার অনেক ভুল দেখিয়ে পদ্য-সমালোচনায় তার সংশোধনের চেষ্টাও করেছেন। বলাবাহুল্য এই রাধামোহনী কাণ্ডকে সুবুদ্ধিগণের হেসে ওড়াতে অসুবিধা হয়নি।[১২] সত্যই হাস্যকর, রাধামোহন যা করেছিলেন, খাটো হাত বাড়িয়ে চাঁদের কানমলার সেই চেষ্টা। নমুনা এই প্রকার ঃ

ক্রম দোষ হয় অন্নদার বর্ণনায়।
ছন্দোভঙ্গ পদ রাজসভা বর্ণনায়॥
অনুলিপি দ্বারাতে অশুদ্ধ ঘটিয়াছে।
স্থানে স্থানে অনেক শোধিত হইয়াছে॥
কোন কোন স্থানে ব্যতিক্রম সম্ভাবনা।
পরিবর্তে তথা তথা নূতন রচনা॥
কোতাও বা তুল্য পদ নহিল বিনাশ।
তদধঃ শোধিত পদ্য পাইল প্রকাশ॥
নানা স্থানে অগৌরব বচন বিন্যাস।
মধ্যে মধ্যে তার বিনিময় উপন্যাস॥

লোচনা করেছেন, যদিও সেটিকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবে, ডঃ সেন ও ডঃ গোস্বামী যদি বাংলাভাষায় কৃত সমালোচনা মনে করে থাকেন, তাহলে তাঁদের কথা সত্যি হলেও হতে পারে, মানে, প্রাচীনতর কিছু আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত।

১২। দে ব্রাদার্স-প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর (১৯১১) মুখবন্ধে আছে :
"রাধামোহন সেন যত্নপূর্বক ভারতচন্দ্র গুণাকরের কাব্য-সমুদায় টীকা-টিপ্পনী-সহ মুদ্রিত করেন। তিনি মনুষ্যস্বভাবসিদ্ধ ভ্রান্তিবশতঃ স্থানে-স্থানে ভারতের অসাধারণ কবিত্বের পরিচয়লাভে বিড়ম্বিত ও অকৃতকার্য হইয়াছেন। এই নিমিত্ত তিনি স্থানে-স্থানে ভারতের রচনা অশুদ্ধ ও অসম্বদ্ধ বিবেচনা করিয়া অহঙ্কারপূর্বক তাহা সংশুদ্ধ ও সংবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ তিনি ভ্রান্তিক্রমে বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহারই সংশোধন ভাবীকালে অশুদ্ধ ও অসম্বদ্ধ-রূপে পরিগণিত হইবে।" (ডঃ মদনমোহন গোস্বামীকৃত 'রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র' গ্রন্থে, উদ্ধৃত। অতঃপর ডঃ গোস্বামীর নাম বা গ্রন্থনামের উল্লেখের সময়ে সংক্ষেপে 'গোস্বামী' লিখব। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দ।]

গ্রন্থরূপ উপবনে ভাবরূপ গাছে।
কচিৎ বা দুষ্টনামা ফল ফলিয়াছে॥
আনুপূর্বী যদিস্যাৎ করেন শীলন।
বহু পদে দেখিবেন আছে কুমিলন।
অর্থাতেতাক্ষরি মিল ভাষা পদ্যে হেয়।
অন্য অন্য বিষয়ে সামান্য উপমেয়॥
প্রচলিত দ্ব্যক্ষব মিল বুঝিবা সত্তম।
স্বরে স্বরে হলে মিল মিলন উত্তম॥
কথিত বিবিধ শব্দ ব্যাপ্ত অগণন।
হয় নয় পরীক্ষা করিবা সুধীজন॥
উক্ত তাবতের পত্র পংক্তি অঙ্কগণ।
নাহি লিখিলাম অতি বাহুল্য কারণ॥
শ্রীরাধামোহন সেন করয়ে প্রার্থনা।
অত্র প্রমাণেতে করিবেন বিবেচনা॥[১৩]

[সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ১ম]

১৩। ভারতচন্দ্রের ঝাড়-পোঁছ করার হক্ রাধামোহন সেনের ছিল। একে 'তিনি রামমোহন রায়ের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু,' তায় তিনি এমন কবি, যাঁর প্রশংসা করে কালীপ্রসাদ লিখেছিলেন, 'বাঙ্গলা ভাষায় কাব্যরচনার বিষয়ে স্বদেশীয় লোকের মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধ।' কালীপ্রসাদ অধিকন্তু তাঁর কয়েকটি সঙ্গীতের ইংরাজি অনুবাদ করেছিলেন, যার দ্বারা বোঝা যায় (রাধামোহন বুঝেছিলেন কিনা জানি না) —অনুবাদ অনেক সময়ে মূলের শ্রীবৃদ্ধি করে। [দ্রষ্টব্য : সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ১ম]

ভারতচন্দ্রের ধুলো-ঝাড়বার লোকাভাব কখনো হয়নি। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'-এ ১০ মে ১৮৫২ সংখ্যায় এই বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল :

"সুকবি ভারতচন্দ্র রায়ের কৃত অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, চোরপঞ্চাশিক এবং মানসিংহ এই পুস্তক চতুষ্টয় সংশোধনপূর্বক ক্ষুদ্র হরফে উত্তম কাগজে মুদ্রিত ও এক জেলদে বান্ধাই হইয়া পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে বিক্রয় হইতেছে, মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ১ টাকা, বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ১৷৹ টাকা।"

উনিশ শতাব্দের গোড়ার দিকে রামমোহন রায় ভারতচন্দ্রের প্রতি ঈর্ষাপূর্ণ অনুরাগ বোধ করতেন, একথা জানিয়েছেন যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত'-এ : "অন্যের কথা কি, অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ও ভারতচন্দ্রের প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করিয়া কোনো নূতন পথে গমন করিতে সংকুচিত হইয়াছিলেন।" "এইরূপ কথিত আছে যে, রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন, 'বাঙ্গালা ভাষায় একখানি কাব্যরচনার আমার বড় ইচ্ছা ছিল কিন্তু ভারতচন্দ্রের সমতুল্য হইতে পারিব না বলিয়াই তাহাতে নিরস্ত হইয়াছি।'"

ঘটনা যদি সত্যই এইরকম হয়, তাহলে রামমোহনের পরিমাণ-বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়, কারণ তাঁর প্রভূত গুণাবলীর মধ্যে অন্ততঃ কাব্যগুণ ছিল না (সঙ্গীতকার রামমোহনের কথা মনে রেখেই বলছি), এবং সেটা বুঝে কাব্যরচনার চেষ্টা না করে, তিনি পরবর্তী ভক্তগণকে অব্যাহতি দিয়েছেন 'বাংলা কাব্যে আধুনিকতার অগ্রদূত রামমোহন' —একথা প্রমাণের প্রাণান্ত দায়িত্ব থেকে। কিন্তু রামমোহন যে সত্যই ভারতচন্দ্রের সমঝদার ছিলেন, তা কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮৪৫ খ্রীঃ লেখা রামমোহন-বিষয়ক প্রবন্ধে জানিয়েছিলেন :

> He [Rammohun] appreciated the brilliant and caustic wit of Gopul Bhar··· as well as the poerty of Varut Chundar.

একই প্রবন্ধে কিশোরীচাঁদ ভারতচন্দ্রকে ব্যক্তিগত আদর ও আঘাত দুইই দিয়েছেন :

> The Vida-Sundar of Varut Chundar Roy, the most popular poem in Bengal and the words of which are as much household words with its people as those of Hamlet and the Othelo among the people of England, is nevertheless a filthy production. Though it exhibits a fancy and almost Shakespearean knowledge of practical work-

ings of the human heart, yet its excellencies are marred by that vicious tone which pervades it throughout. Its immoral tendency cannot be too strongly reprobated.[১৪]

॥ ৪ ॥

কিশোরীচাঁদের উক্ত মন্তব্যের পাঁচ বছরের মধ্যে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে সত্যই উৎকৃষ্ট কিছু কথা পেয়েছি, এক অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে। পাদরি ওয়েঙ্গার ১৮৫০-এর ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় (ত্রয়োদশ খণ্ড) *Popular Literature of Bengal* নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন,[১৫] যাতে ভারতচন্দ্রের বিস্তারিত আলোচনা ছিল। সে-প্রবন্ধে বলা হয়ঃ বাংলার মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজে, বিশেষতঃ নারীদের মধ্যে, অন্নদামঙ্গল সবচেয়ে জনপ্রিয় বাংলাগ্রন্থ। সব জড়িয়ে বলা যায়, এই গ্রন্থ বাংলায় সুচারু রচনার সর্বাধিক কৃতিত্বপূর্ণ নিদর্শন। ভারতচন্দ্রের যথার্থ কবিপ্রতিভা ছিল, কাব্যরীতি ও ছন্দের সব রকমের পরিচয় তাঁর কাব্যে মিলবে, তার অনেকগুলি বাস্তবিক সুন্দর। সত্যই এমন শ্রুতিসুখকর ছন্দ-সঙ্গীত বিরল। সর্ববিধ শব্দ-উপাদানের অপূর্ব ব্যবহার তিনি করেছেন, বহুসংখ্যক হিন্দুস্থানী শব্দ তার অন্তর্ভুক্ত, যদিও তাঁর ব্যবহৃত কিছু বাংলা শব্দ এখন অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভারতচন্দ্রের দুটি দেববন্দনার ইংরেজি গদ্যানুবাদ ওয়েঙ্গার করেন, সেইসঙ্গে সবিনয়ে স্বীকারও করেন, ইংরেজি গদ্যে মূলের রস ফোটানো সম্ভব নয়। এই পাদরি এমন কথাও বলেছেন, দেববন্দনার

১৪। *Rammohun Roy* by Kissory Chand Mitra (Calcutta Review, No. VIII, Vol. IV, 1845)

১৫। ক্যালকাটা রিভিউয়ে প্রকাশিত আলোচ্য প্রবন্ধটিতে লেখকের নাম ছিল না। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৩১২ বৈশাখের 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'ভারত চন্দ্রের অশ্লীলতা' প্রবন্ধে ঐ লেখকের নামোল্লেখ করেছেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদের রচনা থেকে সংবাদ পেয়ে আমরা মূল প্রবন্ধটি সংগ্রহ করি।

এই অংশগুলি খ্রীস্টীয় ধর্মসঙ্গীতের সঙ্গে তুলনীয়। খুবই বিস্ময়ের কথা, ধর্মযাজক হয়েও ইনি বিদ্যাসুন্দরকাহিনীকে অনুবাদের অযোগ্য মনে করেন নি, ফলে অতি চমৎকার ইংরেজিতে উক্ত কাহিনীর সারসংক্ষেপ পেয়েছি। ইনি মনে করেছেন যে, বিদ্যাসুন্দরকে গীতিনাট্যের রূপ দিলে তা ইতালীয় অপেরার (যা অবশ্যই সূর্যতপ্তদ্রাক্ষারসে সঞ্জীবিত!) সমতুল হয়ে উঠবে। বিদ্যাসুন্দরের রোমান্টিক কাহিনী অতি মোহকর-ভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেকথা স্বীকার করার পরে ইনি বলেছেন—অতুলনীয় এব ভাষা ও বর্ণনার ঐশ্বর্য। পাদবি-লেখক অবশ্য শেষের দিকে এই কাহিনীব নৈতিক অশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ধর্মরক্ষা করতে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর বচনার মধ্যে যখন নিদ্রিত অ্যাডোনিসেব সঙ্গে সুন্দরের তুলনা দেখা যায়, তখন রসিক পাঠক সহর্ষে বলবার ইচ্ছা বোধ করে, 'সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত'. কিন্তু আমবা 'ভালমন্দ নাহি জানি!'

ওয়েঙ্গাবেব রচনাটি বহুলাংশে উদ্ধৃত করছি :

"Among all the popular Bengali books *Annada Mangal* is the one most entitled to a prominent notice, for various reasons. It probably is the greatest favourite with the middle and upper classes, especially with the fair sex; and may be regarded, upon the whole, as a mere creditable specimen of elegant literature than any other work of genuine Bengali origin....

Bharat Chandra appears to have been possessed of a true poetical genius. His work contains poetry of almost all kinds, and in all metres : and some of the pieces are rerlly beautiful. Nothing can be more pleasing than the cadence of certain of his verses ; and he displays a wonderful mastery of all the sources of the language. In the narrative parts, however, he introduccs a very large number of Hindustani words ; and many of his Bengali terms have ceased to be intelligible....

To give an idea of the genius of our author, we subjoin two specimens from this part of his work [*i.e. Annada-*

Mangal]. The first is an Invocation of the Sun, to which it is impossible to do justice in English prose. It will be seen that one passage in it bears some resemblance to a part of the 19th Psalm :

Invocation of the Sun

Hail, source of light, remove my darkness! Giver of the day, have mercy. The four Vedas proclaim that thou art the resplendent divinity; the god most excellent. Giver of the day, look upon the distressed. Thy glory according to the Vedas, knows no limits. Forgive the sins of the sufferer. The cause of the universe, the eye of the universe, the life of the universe, art thou ;—all divine, the refuge of all divinities, of heaven, hell and earth. On thy one-wheeled chariot thou drivest on the road of heaven, from the eastern mountain to the western, accomplishing the race in a single day. Who can describe thy strength ? Thy burning rays consume the hills, and dry up the waters of the ocean. How sweetly the lotus smiles, when gladdened by thee ! Who can comprehend thy essence ? Lord of the twelve signs, and of all the planets ; blessed are thy spouses Sangya and Chhya (shadow). Shani, Yama and Manu are thy sons, and Yamuna thy daughter. Preserver of the universe ; purifier of the universe, whence thy name Savita (purifier), thou art the essence of the universe. Convey me safely into eternity ; I ask it with a million of salutations. Enthorned for ever on the red lotus, thou ocean of boundless virtue, the giver of security, endowed with three eyes, thy head adorned with a costly ruby—the remembrance of thee banishes sin ; be gracious to this company. Regard in thy own way king Krishna Chandra, in answer to the praises of Bharat Chandra.

The other piece is a hymn, which is equally beautiful in the original with the foregoing :

A Hymn

The Supreme has turned' against me. When the Supreme is a man's opponent, what avails his ability ?

My misery is most distressing. In all devotions, my intention is good, but my performance evil. I have fallen into a state of infatuation.

I know religion leads to happiness ; yet my heart dislikes it. I have a great dread of wickedness ; yet it pleases me.

My wife and child—these vain things—please me ; vain delights delight me. He who rests in self-seeking, is plunged in distress.

The will of God alone is truth ; all else is vanity. This Bharat has found, through the favour of his teacher.

Let not Christian reader be deceived by the phrasology here used. It is not a true index of the author's real feelings but mere talk, put into the mouth of some other person. What we call the domestic virtues, such as attachment to one's wife and children are here branded as the most glaring sin ; and religion is made to consist in an unfeeling state of metaphysical contemplation.

The most interesting portion of the *Annada Mangal* is a tale, called *Bidya Snndar*, a young couple, of whose adventures Mansingha is stated to have heard at Burdwan, when on his way to Jessore, where he had to put down the rebellious Raja Pratapaditya—an exploit which forms the subject of one of the subseqent short pieces.

Bidya and Sundar is the title of a poem, which might appropriately have been put into the form of a play, and which actually does bear some resemblance to the text of a modern Italian opera. We cannot tell how far the similarity extends, as regards the musical accompaniment. It is this composition, which is the great favourite of Hindu ladies. The outline of the plot is as follows :

There lived at Burdwan a king, named Birasingha, whose beautiful daughter Bidya (Learning) was allowed to

choose her own husband. Having received a very superior education, she declared she would belong only to him, who should surpass her in learning. This condition being proclaimed, and invitations sent out, many princes came to woo the proud maiden, but were all unsuccessful. One of her father's messengers, however, having gone to to the court of Kanchi (Conjeveram) in the Deccan, the prince royal, who name was Sundar (Handsome), determined to try his fortune. In an incredibly short time he proceeded to Burdwan with a large train of horses, etc. of which however, he was eased on his arrival by the guard, who in the true native style, threatened to imprison him, if all was not surrendered. Having given himself the name of a 'Follower of Learning', he was allowed to keep only his satchel, his books, and a favourite parrot, with some money. After strolling about the city and viewing its wonders, he found his way to a tank, where, sitting under the shade of a tree he fell asleep. The women, who came, to bathe and draw water there, were thrown into a delirium of ecstasy at the sight of the sleeping Adonis ; one of them going so far as to charge Providence with injustice, for not having been made his wife. In the evening an old woman, a dealer in flowers, comes to the spot, and, upon his awaking, offer him an asylum in her house, which he accepts upon learning that she daily disposes of flowers in the royal palace. She becomes the house-keeper of her lodger, taking care to secure for herself a portion of the money which passes through her hand. Sundar having learned from her all the particulars of the royal family, and being charmed with her account of Bidya, devises a plan for opening a communication with the princess. He constructs a human figure of flowers, and places in its folded hands a box, which can not be removed without discharging a flowery arrow at the intruder and which contains a card with a riddle, in the shape of a Sanskrit sloke. With this *chef-d' oeuvre* of her guest, the old woman proceeds to the palace. The plot succeeds to admiration ; and the princess returns an answer

to the riddle in the same shape, requesting the old woman, on her leaving, to procure her an interview with her ingenious correspondent. This takes place near Rath. Though no conversation ensues, yet 'they both fall into the snare of each other's eyes ; the hearts of both are caught ; they exchange hearts, and each returns home, with a heart for his trophy.'

At her next interview with the old woman, the princess tells her that she is determined to marry the young man secretly, and leave the result to Kali. The remonstrances of the other are all unavailing ; she insists upon Sundar paying her a visit. On receiving this message, compliance with which appears to him altogether impossible, he applies for aid to Kali, who graciously answers him, by sending down from heaven a brass instrument for house-breaking. Delighted with this gift, he prays that it may 'cut through bricks and stones, through earth and rock', he next, without the knowledge of his hostess, cuts subterranean passage, which leads from his lodging to the middle of Bidya's apartment, where he unexpectedly makes his appearance, and is favourably received. The first interview commences with a vain attempt to perform a kind of secret marriage ceremony, and ends in the loss of the young lady's honour. Sundar pays her many nightly visits, which after some time, she ventures to return, bringing, on one occasion, a companion for the solitary of her lover.

In the meanwhile, Sundar makes his appearance at court in the day time, disguised as a disgusting religious mendicant, who puts in his claim for the princess and bids fair to be successful, since he is able to out-do in learning all the 'ornaments' of the court. Bidya is twitted by her companions on account of her fine prospect of becoming the wife of such a vagabond. Sundar keeps his secret, both from her and from his hostess, who at length suggests to him that he has no chance of success, unless he also becomes a Sannyasi and manages to cut out his rival.

After sometime, the disgrace of Bidya becomes mani-

fest. Her mother, hearing of it, almost becomes deranged, and threatens to do, what every disappointed woman in Bengal professes to be prepared for, viz., to drown herself or take poison, Her father flies into a dreadful rage, and sends for Dhumketu, the Kotwal, or police officer, a man of the most brutal cruelty, who had been apppointed to his office on principle of setting thief to catch a thief. The king threatens to punish him for all his former crimes, unless he succeeds in apprehending the daring house-breaker who violated his daughter. The old rogue, in a great fright asks for a respite of seven days, and sets to work. On searching the apartments of the princess, the passage is discovered, and, instead of the expected super-human monster, Sundar is caught, to the horror of his mistress, and his own utter consternation. He is roughly handled by the unfeeling kotwal, and cast into prison. The old flower-dealer also to her great indignation, is cruelly bitten and all her property confiscated. Sundar's prospects now are gloomy indeed. However, through the intervention of Kali, whom he invokes, his real name and character are brought to light by the parrot ; and finally, the prince is honourably dismissed, with his bride, to his native country.

Impartiality compels us to acknowledge that the romantic story is treated in a manner, which commands admiration, so far as the beauty of its language and the richness of its descriptions are concerned, but its tendency is essentially and grossly immoral, and its perusal by native females must be injurious in the extreme. Both the hero and the heroine are, throughout, the objects of the writers admiration. Faith in Kali is, according to him, rewarded by the successful issue of their criminal undertakings. And the lascivious interviews between them are described, again and again, with diausting minuteness, and in the most glowing language. If ever vice has been decked out in gaudy colours, and made to appear attractive, it has been in this novel. The study of it must destroy all purity of mind

and yet it can not be doubted, that if any book is read by, and to, respectable Bengali females, this is it. But we must not forget that there are to be found in Calcutta European ladies, who can read with equal interest and delight the most licentious novels of the same stamp—a taste in them much more reprehensible than that of their Bengali sisters who admire Bidya and Sundar.

॥ ৫ ॥

ভারতচন্দ্রের আলোচনায় ওয়েঙ্গাবের লেখাটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এটিই সম্ভবতঃ প্রথম বিস্তাবিত রচনা, যার মধ্যে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে ভারতচন্দ্রেব কাব্যকে বিচারের বিষয় কবা হয়েছিল (কাশীপ্রসাদের পূর্ববর্তী লেখাটি ঠিক কী ধরনের ছিল, আমরা জানবাব সুযোগ পাইনি)। ওয়েঙ্গাবের লেখাব দু'বৎসবেব মধ্যে ভাবতচন্দ্রকে কেন্দ্র করে রীতিমত সাহিত্যিক বিতর্ক বেধে যাবে, যাতে অংশ নেবেন হরচন্দ্র দত্ত, কৈলাসচন্দ্র বসু এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮৫২ সালের সেই তর্কযুদ্ধেব বিশদ বিবরণ আমরা পবে দেব, একই বৎসবে মহেন্দ্রনাথ রায়ের মন্তব্যের উল্লেখও করব, (বিবিধার্থ সংগ্রহে হরিমোহন সেনগুপ্ত এরই কাছাকাছি সময়ে কবির জনপ্রিয়তার পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন)[১৬]—তার আগে বলে নিতে পারি, আরও তিন বৎসর পরবর্তী

১৬। হরিমোহন সেনগুপ্ত 'ভাবতচন্দ্র রায়' প্রবন্ধে (১ ফাল্গুন, ১৭৭৫ শকে লিখিত, ১৭৭৬ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার বিবিধার্থ সংগ্রহে প্রকাশিত) বলেন:

"বাঙ্গালা কবিদিগের মধ্যে ভারতচন্দ্র রায়-প্রণীত কাব্যের বিচার বিশেষ সার্থক বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহা অতি দুরূহ ব্যাপার। রায়গুণাকরের প্রতি লোকের যে প্রকার অনুরাগ ও শ্রদ্ধা, তাঁহার প্রতি প্রতিবাদ প্রকাশ করিলে লেখকের প্রতি লোকে সহজেই বিপক্ষ হইবেন; এবং তাঁহার যশোবর্ণন-কালীন বিচারকর্তার অত্যন্ত সাবধান ও সতর্ক হওয়া বিধেয়।"

এই লেখক কবিদের জীবনীর প্রয়োজন বিশেষ অনুভব করেছিলেন। তখনো ঈশ্বর গুপ্তের ভারতচন্দ্র প্রকাশিত হয়নি, স্মরণ রাখতে হবে। ভারতচন্দ্রের কিছু জীবনকথা পরিবেশন করার আগে ভূমিকা-হিসাবে ইনি লিখেছিলেন: →

১৮৫৫ সাল বাংলাদেশে ভারতচন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গণ্য বৎসর, কারণ এই সালেই ঈশ্বরগুপ্তের 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি দীর্ঘ পরিশ্রম ও সন্ধানের ফল।[১৭] এবং 'বাঙালী কবির ইহাই সর্বপ্রথম জীবনী।' এই গ্রন্থ প্রকাশের পরে এর সাহায্য না নিয়ে ভারতচন্দ্রের আলোচনার কথা কেউই ভাবতে পারেন নি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভারতচন্দ্রের অত্যন্ত অনুরাগী, বহুলাংশে অনুকারী, এক্ষেত্রে সফল অবশ্যই নন, সেজন্য সমালোচকগণ কর্তৃক নিন্দিত,[১৮]

"এদেশের কবিদিগের জীবনচরিত প্রাপ্ত হওয়া অতি কঠিন। অতএব রায় গুণাকরের বিশেষ বৃত্তান্ত আমরা লিখিতে পারিলাম না।....এক্ষণে কেবল তাঁহার স্বকরকমলাঙ্কিত বচন-রচনার প্রমাণ ও যথাশ্রুত কিংবদন্তী অনুযায়ী এ বিষয়ে কিঞ্চিতমাত্র লিখিতে সঙ্কল্প করিতেছি।"

১৭। ঈশ্বর গুপ্ত নিজ পরিশ্রমের পরিচয় এইভাবে দিয়েছেন :

"এমত মহাপুরুষের জীবনচরিত অপ্রকাশ থাকাতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। এ বিষয়ে যতদূর যত্ন করিতে হয়, আমরা তাহার অন্যথা করি নাই. বহু কাল পর্যন্ত সংকল্প করিয়া ক্রমশঃই যথাবিহিত পরিশ্রম এবং অনুসন্ধান করিয়াছি, কত স্থানে ভ্রমণ করিয়া কত লোকের নিকট কত প্রকারে কাতরতা প্রকাশ করিয়াছি। অধুনা দশ বৎসরের পর বাঞ্ছিত বিষয়ে একপ্রকার কৃতকার্য হইলাম, জগদীশ্বর অনুকূল হইয়া বুঝি এতদিনের পর আমারদিগের মনোরথ পরিপূর্ণ করিলেন।" ['কবিজীবনী—৩]

১৮। ডঃ সুশীলকুমার দে লিখেছেন :

"ভারতচন্দ্রের কাব্যের তিনি [ঈশ্বর গুপ্ত] প্রকৃত মর্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। ভারতচন্দ্রের যে সুমার্জিত ও গাঢ়বদ্ধ ভাষা, শিক্ষিত রসবোধ, বিদ্বৎসুলভ বৈদগ্ধ্য ও স্বল্পাক্ষর প্রকাশভঙ্গি, তাহার অন্তর্লোকে প্রকাশ করিবার মত শিক্ষা, ভাব ও কল্পনা ঈশ্বর গুপ্তের বা তাঁহার সমকালীন গীতরচয়িতাদের ছিল না। সেই-জন্য ভারতচন্দ্রের নিখুঁত ক্লাসিকাল বাণীভঙ্গি পরবর্তী যুগে স্থায়িত্বলাভ করিল না।" [ডঃ ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত 'কবিজীবনী'র ভূমিকা]

কালিদাস রায় লিখেছেন :

"গুপ্ত-কবির রচনায় ভারতচন্দ্রের প্রভাব দৃষ্ট হয় ছন্দের বৈচিত্র্যে নয়, শব্দা-

উল্টোদিকে আবার ক্ষেত্রবিশেষে ভারতচন্দ্রকে অতিক্রমকারী-রূপেও কীর্তিত[১৯]—তিনি ভারতচন্দ্রের কাব্যমূলে অঞ্জলিভরা পূজাপুষ্প অর্পণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন, ভারতচন্দ্রের জীবনী রচনায় তাঁর বিপুল পরিশ্রমের পিছনে কোন্ আনুগত্য ছিল।

আমি ঈশ্বর গুপ্তের ভারত-উচ্ছ্বাস (প্রায়-গদ্যকাব্য!) বেশ-কিছু অংশে উদ্ধার করব। পাঠকের প্রতি সেটা উৎপীড়নের কারণ হবে জানি (একালে রাজনীতি ভিন্ন সকলই নিরুচ্ছ্বাস), কিন্তু ভারতচন্দ্রের (এবং যে-কোনো বাঙালি-কবির) প্রথম জীবনীকারের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার দায় আছে, যা তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েই মাত্র পালন করতে পারি।—

"কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত বিদ্যোৎসাহী মনুষ্যমাত্রেই বিষমতর ব্যগ্র হইয়া থাকেন, কারণ ইনি সর্বাংশেই প্রধান ছিলেন; ইঁহাব পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব-বিষয়ের গুণের ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। বঙ্গ-

---

লঙ্কার, শ্লেষ, যমক, অনুপ্রাসাদির ঘটায়। গুপ্ত-কবি ভারতচন্দ্রকে পাইয়াছিলেন আদর্শরূপে। ভাষার পারিপাট্যসাধনে তিনি ভারতচন্দ্রের শিষ্য কিন্তু শ্লেষ যমক অনুপ্রাসের ভাষা অনেকস্থলে অপরিচ্ছন্ন। ভারতচন্দ্রও শ্লেষ যমক অনুপ্রাস প্রয়োগ করিতেন কিন্তু তাহা অত্যন্ত সুবিবেচিত প্রয়োগ, কলাসৃষ্টির অনুকূল।"

[গোস্বামী কর্তৃক উদ্ধৃত।]

১৯। যোগীন্দ্রনাথ বসু বি-এ তাঁর মধুসূদন-জীবনীতে বলতে চেয়েছেন—ভারতচন্দ্রের আদিরসের কবল থেকে দেশকে উদ্ধার করেছিল ঈশ্বর গুপ্তের হাস্য-রস। এর থেকে সহজেই বুঝতে পারি, সেকালীন 'খাঁটি বি-এ' যোগীন্দ্রনাথ হাস্য-রস কাকে বলে জানতেন না। তিনি লিখেছেন:

"রায়গুণাকর এবং গুপ্ত-কবি, উভয়েরই আদর্শে বঙ্গদেশে একসময় এক নূতন শ্রেণীর সাহিত্য উদ্ভূত হইয়াছিল। অনেকে তাহা এখনও সাদরে পাঠ করিয়া থাকেন এবং এখনও কিছুদিন তাহার সমাদর থাকিবে। ...গুপ্ত-কবির পূর্বে বঙ্গ-ভাষার কবিতাস্রোত ভারতচন্দ্রেরই প্রদর্শিত পথে প্রবাহিত হইতেছিল, গুপ্ত-কবি আপনার প্রতিভাগুণে তাহার পরিবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার সমকালবর্তী

ভাষার কবিতাপাঠে এই মহাশয়কে অদ্বিতীয় কবি বলিয়াই মান্য করিতে হইবে। ভারতের বিরচিত কাব্য এ-পর্যন্ত পুরাতন হইল না, চিরকাল নূতন রহিল—সকল সময়েই নূতন বোধহয়, প্রত্যেক বিষয়েই মনকে মোহিত করে।"

"অন্নদামঙ্গল এবং বিদ্যাসুন্দরের গুণের ব্যাখ্যা আমি কি করিব? তাহার উপমার স্থল নাই বলিলেই হয়; এই ভারতে ভারতের ভারতীর ন্যায় ভারতের ভারতী সমাদৃত ও প্রচলিত হইয়াছে।"

"জগদীশ্বর প্রসন্ন হইয়া যাঁহাব দিগ্যে কবিত্ব, পাণ্ডিত্য এবং সর্ববিষয়ের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন তাঁহারাই ইহার স্বরূপ গুণ গ্রহণ করিয়া পরিতোষিত হইবেন। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, এই বঙ্গদেশে বাঙ্গালি শ্রেণীতে বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা-রচকের মধ্যে তাঁহার ন্যায় উচ্চ ব্যক্তি প্রায় কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। অপিচ তিনি যে-সকল সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাও অতি উত্তম, বিশেষ ব্যাখ্যার যোগ্য বটে. তদ্ভিন্ন তেঁহ পারস্য ভাষায় কবিতা প্রস্তুত করিতে পারিতেন, ব্রজবুলি, হিন্দী ও যাবনিক শব্দে ভিন্ন ভিন্নরূপে এবং সংস্কৃত. ব্রজবুলি, হিন্দী ও যাবনিক ইত্যাদি মিশ্রিত শব্দে যে সকল কবিতা রচিয়াছেন, তাহাও অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। একাধারে এর অধিক গুণ প্রায় দৃষ্ট হয় না।…

কবিতা-লেখকগণের মধ্যে প্রায় এমন কেহ ছিলেন না, যিনি কিয়ৎপরিমাণে তাহার প্রভাবের বশবর্তী না হইয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে কেবল এক-মাত্র 'বাসবদত্তা'-প্রণেতা স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কারই তাঁহার প্রভাব অতিক্রম করিয়া ভারতচন্দ্রের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন।…ভারতচন্দ্র এবং তাঁহার অনুকারী কবিগণ আদিরসের যে-প্লাবনে বঙ্গভাষাকে পঙ্কিল করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতে বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধারের জন্যই হাস্যরসের অবতার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাব হইয়াছিল।"

['মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,' ২য় সং, ১৮৯৫ ; পৃ ১৫০-৫১, ১৫৩]

"এই মহোদয় যদ্যপিও অদ্যাপি এই পৃথ্বীসমাজে কীর্ত্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। কবিতার প্রতি যখন কটাক্ষ করিতেছি, তখনই তাঁহাকে দেখিতেছি।....তথাপি এই মহাপুরুষের জীবিতাবস্থায় যদিস্যাৎ আমরা মানবরূপে মহীমণ্ডলে প্রসূত হইতে পারিতাম, তবে কি এক অদ্বিতীয় উল্লাসের বিষয় হইত? কাব্যতরুর আশ্রিত হইয়া ছায়ায় বিশ্রাম করিতাম—শাখায় দুলিতাম—ফুলের সৌরভে আমোদিত হইতাম—এবং ফলের আস্বাদনে প্রচুর পরিতোষ প্রাপ্ত হইতাম—আপনি ধন্য হইতাম—ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করিতাম—এবং জন্ম সফল করিতাম।

"আহা! কি সুখের সময় সকল গত হইয়াছে! অধুনা সেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নাই, সেই সমুদয় উৎসাহদাতা ভাগ্যধর পুরুষ নাই, সেই ভারতচন্দ্র নাই, সেই রামপ্রসাদ সেন নাই, আর সেই কিছুই নাই। এই কাল মিথ্যা কাল।"

"ভারতচন্দ্রের গুণ বর্ণনা আর কত করিব? কোনমতেই লিখিয়া শেষ করিতে পারি না, যত লিখি ততই লেখনী নৃত্য করিতে থাকে।...যেমন সমুদ্র সম্বন্ধে গোষ্পদ, পর্বত সম্বন্ধে রেণু, মহাকাশ সম্বন্ধে ঘটাকাশ, সূর্য সম্বন্ধে খদ্যোত, হস্তী সম্বন্ধে মশক।—এবং সিংহ সম্বন্ধে শৃগাল, সেইরূপ ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে আমি। অতএব এই মহাপুরুষের 'জীবনচরিত' রচনাসূত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, বিদ্যা ও গুণাকরের আর আর গুণের বিষয়ে আমি যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম, অনবধানতা, অজ্ঞানতা এবং ভ্রান্তিবশতঃ যদি তাহাতে কোনরূপ দোষ হইয়া থাকে, তবে গুণাকর পাঠক মহাশয়েরা এই দোষাকর প্রভাকর প্রকাশকের প্রতি ক্রোধাকর না হইয়া ক্ষমাকর ও কৃপাকর হইবেন।"

॥ ৬ ॥

এই ১৮৫৫ সালেই ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বিদেশীকৃত আর একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সমুচ্চ প্রশংসা পাচ্ছি। রেভারেণ্ড লঙ ভারতচন্দ্রকে

তাঁর কালের হোরেস বলেছিলেন, সেখানেও না থেমে—বাংলার বার্নস্ ।—

"Bengali poetry embraces two subjects chiefly, religion and love....Last century we had Bharat, the Horace of his day, his themes were war and love."

"Annada Mangal, Durga's life···written by Bharat Chandra, the Burnes of Bengal, who flourished last century as Poet Laureate at the Court of the Raja of Krishnanagar; the first native book ever printed, very popular, and in it we have notice of Vyas opposing in Benares the worship of Siva and the origin of Kalighat.[২০]

লঙ-এর ক্যাটালগ প্রকাশিত হবার পরে 'দি ক্যালকাটা ক্রীশ্চান অবজার্ভার' পত্রিকায় জুলাই ১৮৫৫ সংখ্যায় জে-ডবলিউ 'বেঙ্গলী লিটারেচর' নামে যে আলোচনা করেন, তার মধ্যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়, ভারতচন্দ্র বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি।[২১]

॥ ৭ ॥

এইকালে বাংলার সাহিত্যজগতে 'ভারতরসের স্রোত' বইছিল; প্রকাশ্যে অনেকে তাতে অবগাহন করছিলেন ; না পারলে গোপনে

২০। *A Descriptive Catalogue of Bengali Works* By J. Long (Cal. 1855)

২১। "About a hundred years ago, Bengal possessed its greatest poet, Bharat Chandra, who enjoyed the patronage of Krishna Chandra Ray, the raja of Nadiya. The works by which he is best known are a lascivious tale, 'Vidya and Sundar'—an account of D[ur]ga, 'Annada Mangal',—and a description of the exploits of Man [sing], a general sent, we believe, by Akbar against Pratapaditya, the last king of Sagur island.'

[*Bengali Literature* By J. W.: *The Calcutta Christian Observer*, July 1855]

ঢুকু-ঢুকু খেয়ে মুখ মুছে বাইরে এসে ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে অগ্নোদগার তুলছিলেন। ভারতচন্দ্রের অব্যবহিত পরবর্তী দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় তাঁর 'গঙ্গামঙ্গলে' কিংবা পৃথ্বীচন্দ্র তাঁর 'গৌরীমঙ্গলে' (১৮০৬-৭), বা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'দুর্গামঙ্গলে' ভারতচন্দ্রের প্রভাবকে গ্রহণ করবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'বাসবদত্তা' কাব্য বা 'রসতরঙ্গিণী' নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে ঐ প্রভাব স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে (ভদ্র'লাক যতই আধুনিক মনোভাবের হোন, অবশ্যই রসিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত), তা থাকতে পারে তারাচরণ দাসের 'মন্মথ কাব্যে', ছিল—নিধুবাবুর গানে, রাজকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে [ইনি 'বঙ্গভূষণ' কাব্যের (১৮৭৩) অন্তর্গত 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর' কবিতায় ভারতচন্দ্রকে 'বঙ্গকবিচূড়া' বলেছেন], বিজয়কৃষ্ণ বসুর কাব্যেও ['অবকাশ গাথা' (১৮৭৭) কাব্যে ইনি 'কবিবর ভারতচন্দ্র' কবিতায় ভারতকে 'কবিতাকুঞ্জ-কুহুকণ্ঠপতি' বলেছেন], এবং নিশ্চয়ই গোপাল উড়ের গানে, অজস্র নাটগীতি, যাত্রা ও নাটকে (বিরাট তালিকা দিয়েছেন ডঃ গোস্বামী)—[২২]সে প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলার বাইরে হিন্দী জগতেও, কিন্তু একটি ক্ষেত্রে এক আধুনিক সমালোচক ব্যথিত না হয়ে পারেন নি যখন তিনি দেখেছিলেন—অক্ষয়কুমার দত্তের মতো কট্টর সংস্কারপন্থীও ঐ ভারতীয় পিচ্ছিল পথে প্রথমবয়সে পা হড়কেছিলেন (যৌবন অতি বিষম কাল!)। কিন্তু অক্ষয়কুমারের পা হড়কাতেই পারে—যেখানে সংস্কারপন্থীদের জ্ঞানগুরু ইংরেজরা পর্যন্ত

২২। এই অনুচ্ছেদের দৃষ্টান্তগুলি প্রধানতঃ গোস্বামীর গ্রন্থ থেকে সংকলিত। তিনি দু'লক্ষ টাকার বিদ্যাসুন্দর নাটকাভিনরের উপাদেয় সংবাদ দিয়েছেন :

"উত্তর কলিকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলের নবীনচন্দ্র বসুর স্বগৃহে সর্বপ্রথম যে বাঙলা নাটক সখের অভিনেতা-অভিনেত্রী সহযোগে অভিনীত হয় (৬. ১০.১৮৩৫), তাহা বিদ্যাসুন্দর নাটক।....এই অভিনয় ব্যাপারে নবীনচন্দ্রের খরচ হয় প্রায় দুইলক্ষ টাকা, যাহার ফলে তাঁহার ইংরেজটোলার 'খাতাবাড়ী' বিক্রীত হয়। নবীনচন্দ্রের বসতবাড়ির বিভিন্ন অংশ এই নাটকের দৃশ্যপটরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।" (পৃ-৩০৩)

চঞ্চল হয়েছিলেন, যে ইংরেজরা আমাদের অনেক সংস্কারপন্থীর দৃষ্টিতে সর্বদা নবদ্বার রুদ্ধ করে যোগাসীন!! শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ বিষাদের সঙ্গে ভেবেছেন :

"বটতলার সাহিত্যিকদিগের যেন গুরু হয়ে উঠলেন ভারতচন্দ্র এবং প্রেরণার অফুরন্ত নির্ঝর হল বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরী। কলকাতার সুতানুটির কবি কালীপ্রসাদের 'চন্দ্রকান্ত' কাব্য এবং 'কামিনীকুমার', 'রহস্যবিলাস', 'সুকুমারবিলাস' 'জীবনযামিনী', 'মধুমালতী', 'সতীত্বসুধাসিন্ধু, প্রেমোপদেশ নাটক', 'স্ত্রীলোকের দর্পচূর্ণ', 'কমলদত্তাহরণ', 'প্রেমোল্লাস', 'রসিকতরঙ্গিণী' প্রভৃতি বটতলার সাহিত্য মূলতঃ বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরীর ধারা বহন করে চলল! এই ধারায় ভেসে গিয়ে যদি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মত সিরিয়াস্ লোকও বিশ বছর বয়সে 'বাসবদত্তা' কাব্য লিখতে পারেন, 'শুনহে প্রাণ-বঁধু, যেসব মধু মধু, হাসিয়া মৃদু মৃদু জানালে'— ইত্যাদি ছন্দ-চাতুর্য দেখিয়ে (ভারতচন্দ্রের ভঙ্গিতে), এবং অক্ষয়কুমার দত্তের মত কড়া গদ্য ও পাঠ্যপুস্তক লেখকও যদি 'অনঙ্গমোহন' কাব্য লেখার লোভ না সামলাতে পারেন, তাহলে কড়েয়া-মেছুয়াবাজার-ভবানীপুর ও সূতানুটির 'বটতলার কবিদের' আর অপরাধ কি? বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরীর স্রোতোধারা শুধু যে মদনমোহন ও অক্ষয়কুমারের মত পণ্ডিত ও গদ্যভাবাপন্নদেরই কাত করে ফেলেছিল তা নয়, ইংরেজরাও রীতিমত ঘায়েল হয়ে গিয়েছিলেন। 'ক্যালকাটা গেজেট' ও অন্যান্য পত্রিকায় এইসব আদিরসাত্মক কবিতার ইংরেজী অনুবাদও তাঁরা প্রকাশ করতেন। একটির নমুনা দিচ্ছি :

My Veedya's beauty fills my head—I study nought beside;
My Veedya's name I dwell upon from morn till even-tide;
She only is my every hope, my wish, my aim, my end;
My orisons to Veedya and to her alone ascend.

বিদ্যাসুন্দর কতদূর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল এই ইংরেজি অনুবাদ তার প্রমাণ। কৃষ্ণনগর-শান্তিপুর থেকে যদি লণ্ডনকেও স্পর্শ করে থাকে, তাহলে বটতলা রেহাই পাবে কেন ?[২৩]

বাংলাসাহিত্যের প্রথম দিককার উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক রামগতি ন্যায়রত্ন কিন্তু অলজ্জ আনন্দে তাঁর 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭২) গ্রন্থে ভারতচন্দ্রের স্তুতি করেছেন। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ-ভুক্ত 'বর্ণনগুলি' এঁর মতে, 'যে কিরূপ সুন্দর ও মধুর হইয়াছে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ঐ সকল স্থান যখন পাঠ করা যায়, তখনই নূতন বোধ হয়।' এই সংস্কৃত পণ্ডিত ভাববিহ্বল হয়ে একথাও লিখে-ছেন, 'আমরা কালিদাসকৃত রতিবিলাপ পাঠ করিয়াছি, কিন্তু তাহাতেও [ভারতচন্দ্রের রতিবিলাপের তুল্য] মনোহর ভাব দেখিতে পাই নাই।' 'ফলতঃ রায়গুণাকরের রচনার এমনই মোহিনীশক্তি যে, উহার কোনো অংশের কোনো দোষ নয়নগোচর হয় না।' 'যে অংশ পাঠ করিবে, সেই অংশেই মধুবৃষ্টি অনুভব করিবে।' 'গর্ভসংবাদ শ্রবণে বিদ্যার নিকট রাণীর গমন' এবং তারপরে 'রাজার নিকট রাণীর গমন' অংশ উদ্ধৃত করার পরে রামগতি বাধাবন্ধহারা আবেগে লালকালির দোয়াত উপুড় করে লিখেছেন :

"এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, উল্লিখিত-রূপ রচনা কি সরল, কি মধুর এবং কি স্বভাবসঙ্গত ও সময়সমুচিত! ভারতচন্দ্রের যদি আর কোনো রচনাই না থাকিত, তথাপি সকল দিক বজায় রাখিয়া রাণীর এই একমাত্র পাকা গৃহিণীপনার বর্ণন দৃষ্টেই তাঁহাকে মহাকবি বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যাইত। এসব স্বভাবসঙ্গত হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা এ পর্যন্ত বাঙ্গালায় কোনো কবির লেখনী হইতে নির্গত হয় নাই। ইংরেজিতে পোপের ও

২৩ কালপেঁচার দু'কলম [বটতলার সাহিত্য (তিন)। যুগান্তর ৯. ৬. ১৯৫২]—গোস্বামীর গ্রন্থে উদ্ধৃত।

সংস্কৃতে বাল্মীকির রচনা যেরূপ মধুর, আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালাতে ভারতচন্দ্রের রচনাও সেইরূপ। এখনকার কৃতবিদ্যদিগের অনেকে ভারতের কবিত্বের প্রতি নানারূপ উক্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ভারতচন্দ্র বাঙ্গালা কাব্যসভায় যে সিংহাসন লাভ করিয়াছেন, তাহার নিকট ঘেঁষিতে পারে, এরূপ লোক এ পর্যন্ত জন্মে নাই—পরেও জন্মিবে কি না সন্দেহ।”

আলোচ্যকালে ভারতচন্দ্রের প্রভাব কেউই এড়াতে পারছেন না। বিদ্যাসাগর, অনেকের কাছে বাংলাগদ্যের জনক, প্রায় সকলের কাছে প্রথম শিষ্ট সাহিত্যিক গদ্যের রচয়িতা, এবং সমাজসংস্কারক, এবং মানবপ্রেমিক, ও খাঁটি পুরুষবীর—তিনিও ভারতচন্দ্রের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। অন্নদামঙ্গলের সংস্করণ পর্যন্ত তিনি প্রকাশ করেছিলেন, যেটি উক্ত গ্রন্থের প্রথম প্রামাণিক সংস্করণ বলে স্বীকৃত। বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টার পিছনে অর্থনৈতিক কারণ থাকতে পারে, বা ছিল[২৪] কিন্তু কেবল সেই 'মূল্যবান' কারণেই, নিজ রুচির প্রেরণা না থাকলে, তিনি ঐ কাজ করতেন বলে বিশ্বাস হয় না। একথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া যায়, বিদ্যাসাগর সাহিত্যরুচিতে বিধবা ছিলেন না, তাঁর উদ্ভট শ্লোকসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত রীতিমত তপ্ত শ্লোকগুলি তার প্রমাণ।

২৪। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত'-এর মধ্যে পাই—বিদ্যাসাগর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে একত্রে ৬০০'০০ ধার করে একটি প্রেস কেনেন, তারপর প্রেসের কাজ দেবার জন্য অনুরোধ করেন মার্শাল-সাহেবকে। মার্শাল-সাহেব বলেন, বিদ্যার্থী সিভিলিয়ানদের ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পড়তে হয়, কিন্তু তা জঘন্য কাগজে, জঘন্য অক্ষরে, অজস্র বর্ণাশুদ্ধি-সঙ্গে ছাপা হয়। বিদ্যাসাগর যদি কৃষ্ণনগরের রাজবাটী থেকে অন্নদামঙ্গলের পুথি আনিয়ে দ্রুত উত্তম সংস্করণ প্রস্তুত করতে পারেন, তাহলে তিনি ১০০ বই ৬০০'০০ টাকায় কিনে নেবেন, তার দ্বারা প্রেসের দেনা শোধ হয়ে যাবে। পরে বাকি বই বেচে বিদ্যাসাগর যথেষ্ট লাভ করে নিতে পারবেন। বিদ্যাসাগর এই পরামর্শমতো কাজ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের ভারতচন্দ্র-প্রীতি সম্বন্ধে বিহারীলাল সরকার তাঁর 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে বলেছেন :

"ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের বড় প্রিয় ছিল। ভারতচন্দ্রকে তিনি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস, কালিদাস যেমন সংস্কৃতে, ভারতচন্দ্র তেমনি বাঙ্গালায়। কালিদাসের গ্রন্থে যেমন সংস্কৃতের, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে তেমনই বাঙ্গালার পরিপাটি।"

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যেরও অনুরূপ সাক্ষ্য :

"বিদ্যাসাগর ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনা অতিশয় পছন্দ করিতেন। · আমি তাঁহাকে কোনো কোনো সময়ে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের কবিতা গদগদভাবে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। আমার বেশ মনে হইতেছে, একদিন তিনি 'হেথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া' ইত্যাদি কবিতাটি বিশেষ আনন্দের সহিত পড়িতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—দেখ দেখি, কেমন পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে ভাষা!"[২৫]

তবে উপভোগ কবা এক জিনিস আর তাব ব্যাখ্যান করা অন্য জিনিস, বিশেষতঃ ক্লাসে, ছাত্রদের কাছে। কিন্তু ছাত্ররা অনেকসময়ে গুরুমারা বিদ্যাব অধিকারী হয়। বিদ্যাসাগর সেইরকম ছাত্রভাগ্য লাভ করেছিলেন, যারা তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিল—চালিয়ে যান স্যার!

২৫। অদৃষ্টের পরিহাস বলে একটা কথা আছে। কৃষ্ণনগরেব আশ্রিত ভারতচন্দ্রের ঝক্‌ঝকে ভাষার এত ভক্ত বিদ্যাসাগর, নিজ গদ্যে যাকে কিছুটা অনুসরণ করবার চেষ্টা তিনি করেছিলেন—তাঁর সেই স্বচ্ছন্দ বাংলাই ধিক্কৃত হয়েছিল কৃষ্ণনগরের রাজসভার পণ্ডিতদের দ্বারা!—"এক সময়ে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে স্থানীয় কোনো বিষয়ের বিচার হয়। সিদ্ধান্ত স্থির হইলে একজন পণ্ডিত তাহা বাংলায় লেখেন। সেই রচনা শ্রবণ করিয়া একজন অধ্যাপক অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক কহিয়াছিলেন—এ কি হয়েছে! এ যে বিদ্যাসাগরী বাংলা হয়েছে! এ যে অনায়াসে বোঝা যায়।" (রামগতি)

এখানে মাত্র আমরা এইটুকু আশা করতে পারি, উক্ত অধ্যাপক (নির্ঘাত অধ্যাপক!) কৃষ্ণনগরের অধিবাসী ছিলেন না!

"বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিবিলিয়নদিগকে বাঙ্গালা পড়াইতেন, তখন তাঁহাকে বিদ্যাসুন্দর পড়াইতে হইত। বিদ্যাসুন্দরের খেউড়-অংশ পড়াইবার সময় তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিতভাব প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু এক-একজন ইউরোপীয় তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন, 'কেন তুমি কাতুমাতু করিতেছ? আমাদের ভাষাতে কি শেক্সপীয়রের *Venus and Adonis*, *Rape of Lucrece*, এবং পোপের *January and May*, এই সকল বহি নাহি? আর আমার কি ঐ সকল বই আদবে পড়ি না? শিকায় তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছি? অতএব ইহাতে আর লজ্জার বিষয় কি?' এইকথা আমি বিদ্যাসাগরের মুখে শুনিয়াছি।"[২৬]

বিদ্যাসাগর এতই ভারতচন্দ্র-ভক্ত ছিলেন যে, কৃষ্ণকমল ইঙ্গিত করেছেন, বঙ্কিমের ভারতচন্দ্র-বিরোধী মন্তব্য তাঁর বিরক্তির কারণ হয়েছিল।

ভারত-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহী বীর, ঐ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল যিনি টলিয়ে দিয়েছিলেন, সেই মধুসূদন কিন্তু ভারতের সত্যই অনুরাগী, বারবার তা জানিয়েছেনও, কারণ সেটাই ক্ষত্রনীতি, শত্রু হলেও বীরের সম্মান করে বীর!!

তাই বলে কি অহঙ্কার ত্যাগ করেছেন? কদাপি নয়। গোঁফ মুচড়ে তৃপ্তির সঙ্গে রাজা অবশ্যই তাঁর পারিষদবর্গকে বলেন—ছাখো হে! শেখো হে! হেরে-যাওয়া ঐ রাজাটার, মানে রাজকবিটার, কি রকম পিঠ চাপড়াতে হয়!

সুতরাং মধুসূদন ফ্রান্সের 'ভরসেলস্ নগরে' থাকাকালে ভারত-

২৬। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের উক্তিগুলি বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গে'র বিদ্যাভারতী সংস্করণ ১৩৭৩ (সম্পাদক শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়) থেকে সংগৃহীত।

চন্দ্রের উপর একটা চতুর্দশপদী লিখে ফেলার উদারতায় মুগ্ধ হয়ে নিজের পিঠ চাপড়ে বলে ফেলেন—ওহে, জেনে রাখো, তোমাদের ভারতচন্দ্র রায় গত হবার পরে এমন মনোহারী প্রশস্তি কুত্রাপি পান নি।[২৭] আর তাঁর প্রাণের কথা বেরিয়ে এসেছিল যখন ঈশ্বরী পাটনীর প্রসঙ্গে তিনি বলে ফেলেছিলেন—মায়ের ঐ রাঙা পায়ের বর্ণনা আমি যদি করতে পেতাম, তাহলে আরও কত সুন্দর হত তা![২৮] তিনি কত খুশি হয়েছিলেন যখন ভারতচন্দ্রের এক ভক্ত সমঝদার তাঁর আনুগত্য মধুসূদনের পায়ে অর্পণ করেছিলেন।[২৯] কেননা তিনি জানতেন, তাঁর আসল লড়াই ভারতচন্দ্রের সঙ্গেই—ঐ 'বকুলফুলের কবির' সঙ্গে, কৃত্তিবাস কাশীরাম দাসের মত সরল মহান যিনি নন, কিন্তু মাধুর্যে

২৭। বন্ধু গৌরদাস বসাককে মধুসূদন ২৬ জানুয়ারী ১৮৫৫ লেখেন:

"I flatter myself that since the day of his death ভারতচন্দ্র রায় never had such an elegant compliment paid to him."

মধুসূদনের মনোভাবের প্রশংসা করে 'সমাচার-দর্পণ' সম্পাদক লিখেছেন:

"তিনি কবিগণের বা গুণিগণের অবমাননা করিতেন না। অসাধারণ উন্নত-মনা মাইকেল মধুসূদন দত্ত আপনার চতুর্দশপদী কবিতায় আপনার অলোক-সামান্য মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনুগতেরা তাঁহাকে ভারতের অপেক্ষা মহান বলিতেন; অথচ তিনি আপন চতুর্দশপদী কবিতায় ভারত ও বিদ্যা-সাগর প্রভৃতি গুণীদিগের অন্তরের সহিত স্তবস্তুতি করিয়া গিয়াছেন।"

['নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি', ১৩৬১ সং—পৃ ২৮০]

২৮। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

"একদিন [মধুসূদন] ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনীর জগদম্বাকে পার করার উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, 'আমি যদি এই বর্ণনা করিতে পাইতাম, তাহা হইলে স্বচ্ছতোয়া ভাগীরথীর সংস্পর্শযুক্ত রাঙা অবিশ্বসুলভ পা দুখানির কতই মহিমা বাড়াইতাম, কতই ভক্তমনোহারী করিয়া আঁকিতাম।"' [মধুস্মৃতি—৪৭৭]

২৯। মেঘনাদবধ সূত্রে রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন লেখেন:

"My printer Baboo I. C. Bose (a very intelligent man and once a most warm admirer of Bharat) and his friends stick out for the 1 book."

আচ্ছন্ন করে রেখেছেন কাব্যরসিকদের।[৩০] মধুসূদন অনুভব করছিলেন —কী দুর্ভাগ্য! বাংলা যে কত সুললিত ভাষা, সংস্কৃত বা ইতালীয় ভাষার চেয়ে যে কম ললিত নয়, তা বোঝাতে ঐ ভারতচন্দ্রেরই দ্বারস্থ হতে হয়,[৩১] চতুরতা ইতরতা কামুকতার ভাষা-ভাণ্ডারও তিনিই,[৩২] কোনো কিছু বর্ণনা করার পরে দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়, ঐ লোকটার চেয়ে ভাল করা গেল তো।[৩৩]—অথচ ভাঙতেই হবে ঐ মিত্রাক্ষরের বেড়ি, দূর করতে হবে 'শবদে শবদে বিয়া' দেবার কবিছলনাকে, আনতে হবে

৩০। "কবিবর কাশীরাম দাসের প্রতি তাঁহার এতই অনুরাগ ছিল যে, একদিন কথায়-কথায় তাঁহার বন্ধুকে বলেন, 'কাশীরাম দাসের তুল্য কবি আমাদের দেশে নাই। এমন সর্বজনীন আদর আর অন্য কোনো কবিরই নাই। দেখ, তাঁহার মহাভারত তেতলাতেও পাঠ হইতেছে, দোতলাতেও পড়িতেছে, আবার দোকানেও গাছতলাতেও সাধারণ লোকে সুর করিয়া পড়িতেছে।' আর হাসিয়া ভারতচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেন, 'উনি তো বকুল ফুলের কবি।'" [মধুস্মৃতি]

৩১। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা:

"প্রথমবার উত্তরপাড়ায় অবস্থিতিকালে আমাকে আদেশ করিলেন, 'একদিন কবিত্ব সম্বন্ধে আমার একটি বক্তৃতার আয়োজন করো।' সেই বক্তৃতায় মধুসূদন মেঘদূতের প্রথম শ্লোক 'কশ্চিৎ কান্তা বিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' এবং ভারতচন্দ্রের 'কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেন ভাট, খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট' উচ্চারণ করিয়া দেখাইলেন, সংস্কৃত অপেক্ষা বাংলাভাষা কত বেশি সুললিত ও মধুর। তিনি বলিতেন, 'ইতালীয় ভাষা অপেক্ষা বঙ্গভাষা অধিকতর মধুর ও হৃদয়গ্রাহী।'" [মধুস্মৃতি]

৩২। 'মধুসূদনের' বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে বৃদ্ধ লম্পট ভক্তপ্রসাদ কয়েকবার রসালো জিভে ভারতচন্দ্রের কাব্যছত্র চেটেছিল।

৩৩। ফ্রান্সে অবস্থানকালে ৩ নভেম্বর ১৮৬৪, মানে শীতের মধ্যে, মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে পত্রে ওখানকার শীতের তীব্রতার কথা লেখেন:

"It is about six times colder then the coldest day in our coldest month! Do you remember the line in ভারতচন্দ্র—'বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী?' What would he have said if he had been here?"

অমিত্রাক্ষরের শিকল-ছেঁড়া-প্রমিথিউসের গর্জন, জীবন মিত্রনয়, অমিত্র, অমিত্রের ছন্দই আধুনিক জীবনের ছন্দ, সে-পথে প্রধান বাধা ঐ নেশার ঝিম্-ধরানো ছন্দ-লেখা লোকটা।—৩৪

মধুসূদন বড় সুখে আছেন কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ সতীশচন্দ্রের আতিথ্যে ; তাঁর জন্য বড়-বড় থালাভরা সরপুরিয়া, ছানাক্ষীরের নানা রকম মিষ্টান্ন পাঠানো হচ্ছে, সেগুলো কিছু খেয়ে বেশির ভাগ বিলিয়ে দিচ্ছেন, রাত্রে প্রাসাদে প্রচুর রাজকীয় ভোজ, ভোজনান্তে 'দ্রবময়ী মহাদেবী'র সানন্দ অর্চনা—মধুসূদন নিশ্চয় মনে-মনে ফিরে গিয়েছিলেন শতাধিক বৎসর আগে—সেজন্য, প্রাসাদে যখন ঢুকছেন, সামনে মহারাজা, পিছনে তিনি, বলে উঠলেন খুশিভরা কণ্ঠে—

'I see Krishna Chandra followed by Bharat chandra.'

৩৪। বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন মানে লড়ায়ে নেমে পড়া—মধুসূদন তা জানতেন। সুতরাং তিনি চড়াসুরে নিজের পক্ষসমর্থনের চেষ্টা করছেন এবং প্রতিপক্ষে ভারতচন্দ্রের নাম টেনে এনেছেন। তাঁর দুটি চিঠির কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

"I am afraid you think my style hard, but believe me, I never study to be grandiloquent like majority of the 'barren rascals' that write books in these days of litarary excitement. The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) Inspiration! Good Blank Verse should be sonorous and the best writer of Blank Verse in English is the *taughest* of poets—I mean old John Milton! And Virgil and Homer are anything but easy. But let that pass. You no doubt excuse many things in a fellows first poem. I began the poem in a joke, and I see I have actually done something that ought to give our national poetry a good lift, at any rate, that will teach the future poets of Bengal to write in a strain very different from that of the man of Krishnanagar—the father of a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genius." [২৪শে এপ্রিল ১৮৬০ তারিখে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা]

"Blank Verse, and its melody and power *astonish* me....Take

মহারাজা উল্টোপক্ষে বলেছিলেন : এতদিন আমাদের ভারতচন্দ্র বঙ্গকবিদিগের মধ্যে প্রথমস্থান অধিকার করে আসছিলেন, কিন্তু এখন আপনি সে স্থান কেড়ে নিয়েছেন !

শুনে মধুসূদন আরও খুশি। বিশেষতঃ ভারতচন্দ্রকে সরানো মানে রাজকবির আসনে উঠে পড়া, সেই সুযোগে একটি মণিদীপদীপ্ত ভবন নির্মাণ করে নেওয়া, রাজকবির উপযুক্ত আবাস-রূপে! সুতরাং মধুসূদন সতীশচন্দ্রকে বললেন, 'আপনারা ভারতচন্দ্রকে ৩০০'০০ টাকার গাঁতি দিয়েছিলেন, আমাকে কী দেবেন ?'

মধুসূদন ভাবছিলেন—কী বোকা ঐ ঈশ্বরী পাটনীটা, যাকে ভারত এঁকেছেন ! লোকটা বুঝতেও পারল না, 'মোহিনী রূপসী বেশে ঝাঁপি কাঁখে করি' কে তার নৌকার উপরে পা রেখেছেন !—ওরে ভুল করিস্ না ! ভুল করিস্ না ! ভবপার যিনি করেন, তাঁকে পার করেছিস্—যা চাইবার এখনি চেয়ে নে !

মধুসূদন আবার বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। কি হবে ধনসম্পদে ! দেবী যদি আজ রাজাসন, রাজছত্রও দেন, তাও কি চিরস্থায়ী হবে ! লক্ষ্মী চিরচঞ্চল—অচঞ্চল একটি জিনিসই আছে এ-জগতে—কবিযশ। ধন্য ভারতচন্দ্র ! কবিযশের অধিকারী তুমি ধন্য ! ধন্য কৃষ্ণনগরের ভবানন্দ

---

my word for it, that Blank Verse will do splendidly in Bengali and that in course of time, like the modern Europeans, we too shall equal, if not surpass *our* classic writers. What we want at present are men of zeal, of diligence, of energy, of enthusiasm, of liberal views, to give our language a jolly lift ....My motto is, 'Fire away my boys!' The Namby-Pamby-Wallahs—the imitators of Bharat Chunder—*our* Pope, who has—

'Made poetry a mere mechanical art,
And every wrabler has his tune by heart!'

may frown or laugh at us, but I say—'Be hanged' to them !

[কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত]

ও তাঁর বংশধরেরা, যাঁদের তুমি যুক্ত করে নিয়েছ তোমার চিরস্মরণীয় নামের সঙ্গে।

হে ভবানন্দ—

'তব বংশ-যশঃ-ঝাঁপি অন্নদামঙ্গল—
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে।'[৩৫]

ঐ অন্নদামঙ্গল কাব্যের মধ্যে কোন্ অংশটিতে রয়েছে মণিমর্মের রক্তদ্যুতি? কে না জানে সে প্রশ্নের উত্তর? ঐ—যেখানে জননীর রাঙা চরণ স্থাপিত হয়েছিল:

'চেয়ে দেখ, পদ-ছায়া-ছলে—
কনক কমল ফুল্ল এ নদীর জলে—
কোন্ দেবতারে পূজি, পেলি এ রমণী?
কাঠের সেঁউতি তোর, পদ-পরশনে
হইতেছে স্বর্ণময়!'[৩৬]

কবিতাটি লিখেই মধুসূদন উৎফুল্ল। হারিয়ে দিয়েছি ভারতচন্দ্রকে। দিয়েছি তো!! ভারতকে মাধুর্যের, স্নিগ্ধ রমণীয়তার ক্ষেত্রে পরাভূত করা কি সম্ভব? ব্রজাঙ্গনার কবি আমি। মেঘনাদের শঙ্খরবকে বাঁশির সুরে গলিয়ে দিয়েছি বীরাঙ্গনায়। তবু—ভারতচন্দ্রকে যদি হারাতেই হয়—অমিত্রাক্ষর-ধ্বনিতেই তা করতে হবে। আমি ভারতচন্দ্রের ভক্ত কিন্তু তাঁর চেয়েও বড় কবি।[৩৭]

'Yes when Michael takes up his pen the Krishna-nagar men should look up to his laurels'.[৩৮]

৩৫। 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি': চতুর্দশপদী কবিতাবলী।

৩৬। 'ঈশ্বরী পাটনী': চতুর্দশপদী কবিতাবলী।

৩৭। "He was an admirer of Bharat Chandra the poet; but prided himself on being by far his superior as a poet."

[From *Reminiscences of Michael Modhu Sudan Dutta*, by Rashbihari Mukerjee; যোগীন্দ্রনাথ বসুর মধুসূদন জীবনীতে সংগৃহীত]

৩৮। মধুস্মৃতি; ৪৬৯

মধুসূদনের অহঙ্কার অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল—তাঁর কণ্ঠস্বর বাজতে লাগল রণস্থলে, যেখানে রাজ্যের ওঠাপড়া, মানবভাগ্যের বিচিত্র পরিণতি, নিয়তিলীলা, কালান্তকালের প্রলয়ভীষণ বিদারণ।—হায়, অনেকদিন পরে মধুসূদনের একান্ত অনুরাগী এক কবি-সমালোচক দেখলেন—তাঁর রুদ্রসঙ্গীতের মর্মের মধ্য থেকে যে-সকরুণ আকুতির সুরটুকু উঠছিল, সে সুরই শেষ পর্যন্ত সকল কোলাহলকে নীরব করে ছড়িয়ে পড়ছে :

> "আয়োজনের ত্রুটি ছিল না—ছন্দ, ভাষা, ঘটনাকাহিনী, হোমর মিল্টনের ভঙ্গি, দান্তে ভার্জিলের কল্পনা, এবং সর্বোপরি বিদেশী কাব্যের প্রাণবস্তু—এমনকি বাক্যঝঙ্কার পর্যন্ত আত্মসাৎ করিবার প্রতিভা—সবই ছিল ; কিন্তু কবি,সত্যকার কবি বলিয়া, সৃষ্টিরহস্যের অমোঘ নিয়মের বশবর্তী হইয়া যাহা রচনা করিলেন তাহা মহাকাব্যের আকারে বাঙালি-জীবনের গীতিকাব্য। দূর দিগন্তের সাগরোর্মি তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল, তিনি তাহারই অভিমুখে তাঁহার দেহ-মনের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া কাব্য-তরণী চালনা করিয়াছিলেন। সমুদ্রবক্ষে তরণী ভাসিল ; ছন্দে, ভাষায় ও বর্ণনা-চিত্রে নীলাম্বু-প্রসার ও জলকল্লোল জাগিয়া উঠিল —কিন্তু কবি-কর্ণধারের মনশ্চক্ষু আধ-নিমীলিত কেন? সাগরবক্ষে উত্তাল তরঙ্গরাজির মধ্যেও এ কার কুলুকুলু ধ্বনি ?—এ যে কপোতাক্ষ ! তীরে, ভগ্ন শিবমন্দিরে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছে, জলে 'নূতন গগন যেন, নব তারাবলী' এবং গ্রাম হইতে সন্ধ্যারতির শঙ্খধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে ! সমুদ্র গর্জন করুক, ফেনিল জলরাশি তরণীতটে আছড়াইয়া পড়ুক—তথাপি এ স্বপ্ন বড় মধুর ! সমুদ্রতলে কপোতাক্ষের অন্তঃস্রোত তাঁহার কাব্যরচনার গতি-নির্দেশ করিল, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া আর হইল না। তরী যখন তীরে আসিয়া লাগিল, তখন দেখা গেল—'সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী'।" [মোহিতলাল]

॥ ৯ ॥

'নির্ভেজাল বি-এ' হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁর কলম থেকে মেঘনাদবধের আলোচনা লাভ করে মধুসূদন নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন —তাঁকে ঘোবতর লড়াই করতে হয়েছিল ভারতচন্দ্রের সঙ্গে—মধুসূদনকে শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি প্রতিপন্ন করতে গিয়ে—কারণ, তিনি পূর্ব থেকে ভারতচন্দ্রের কাছে মাথা নামিয়ে আছেন। হেমচন্দ্র তাঁর প্রথম গ্রন্থ চিন্তাতরঙ্গিণীর (১৮৬১) ভূমিকায় ভারতচন্দ্র থেকে সরে থাকার স্বাধীনতা গ্রহণ করতে গিয়ে কী কুণ্ঠাপ্রকাশই না করেছেন !—

"কবিতাকেশবী রায়গুণাকরের পর কবিতা রচনা করিয়া যশঃলাভ করা অসাধ্য। ইহা জানিয়াও এ-বিষয় প্রবৃত্ত হওয়া আপাততঃ মূঢ়ের কার্য বলিয়া বোধ হইতে পারে ; কিন্তু সকলের মন সমান নহে। মুহুর্মুহু কত লোকের মনে কতরূপ ভাব যাতায়াত করিতেছে। দেশ-কালভেদে মনোবৃত্তিপ্রবাহের সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য ঘটিতেছে। এমনকি এক ব্যক্তিরই সময়ে সময়ে মনের গতি পরিবর্তিত হইতেছে। অতএব উথলিত অন্তরের ভাবনিকর লিপিবদ্ধ কবা সর্বতোভাবে কর্তব্য।" [হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, পরিষদ-সং]

সুতরাং হেমচন্দ্র কিছুদিনের মধ্যে যখন মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা লিখতে বসলেন, যার কবি 'কবিতাস্রোতঃ নির্গমনের নূতন খাদ খনন' করেছেন (যার ফলে, 'হে মেঘনাদবধ-গ্রন্থকার ! এই নূতন মালা চিরকালের নিমিত্ত তোমার গলদেশে শোভা প্রতিপাদন করিবে !')—তখন স্বতঃই তাঁকে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তুলনামুখে এই সদ্য-আবির্ভূত কবির কাব্যবিচার করতে হয়েছিল। প্রথমে তিনি ছন্দপ্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন, যেহেতু মধুসূদন আদিতে নবছন্দের আঘাতেই পুরাতন বাংলাকাব্যকে ধরাশায়ী করেছেন। বহু শত বৎসর ধরে বাংলাকাব্য পয়ার-ত্রিপদীর মিত্রাক্ষর-তটবন্ধনে শান্তভাবে বয়ে গেছে—মধুসূদন সেখানে বাঁধ ভাঙা-বন্যা এনেছিলেন—তাঁর সে আক্রমণ আরও বেশী বিভ্রান্তির বিষয় মনে হয়েছিল, কারণ তার আগে ভারতচন্দ্র ঐ পূর্বপ্রচলিত ছন্দের চূড়ান্ত সঙ্গীতসুর আকর্ষণ করে তারই

সুখবিহ্বলতায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছিলেন বাঙালির কান, প্রাণকে। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্যের উপরে দীর্ঘ আলোচনা শুরু করবার আগে তাই হেমচন্দ্র, মধুসূদনের 'গাঁথিব নূতন মালা…রচিব মধুচক্র, গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিবরধি'—এই 'সদর্প উক্তি' উদ্ধৃত করে, এই প্রশ্ন না তুলে পারেন নি—'ভারত ব্রাহ্মণ নূতন প্রণালীতে কবিতা গ্রন্থন করিবার কি পথ রাখিয়া গিয়াছেন?' হেমচন্দ্র আলোচনান্তে বলেছেন—হাঁ, সেই পথ নিজের প্রতিভায় নির্মাণ করেছেন মধুসূদন; 'এই অতি ঋজু ও পবিপাটী প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক মহতী কীর্তিস্তম্ভ সংস্থাপন করিয়াছেন।'

হেমচন্দ্রের মোট সিদ্ধান্ত: 'ভবিষ্যতে কবি মাইকেলেব নাম যে বঙ্গব্যাপক হইবে, এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগেব নিকট মেঘনাদবধ কাব্য যে বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা সমাদৃত হইবে, তাহাতে আব সন্দেহ নাই।' অন্যতম 'বিচক্ষণ ব্যক্তি' হেমচন্দ্র মেঘনাদবধকে কেন শেষপর্যন্ত বিদ্যাসুন্দরের উপরে স্থাপন করতে চান, তাব কারণ তিনি আলোচ্য ভূমিকায় জানিয়েছিলেন। তাঁর মতে, ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব ললিত রচনার ক্ষেত্রে ('ভারতের তুল্য সুলেখক আজ পর্যন্ত এদেশে জন্মগ্রহণ করে নাই, এবং বোধহয় আর জন্মিবে না; তেমন মধুমাখা কথা বুঝি আর কেহ কখনো গৌড়বাসীদের শুনাইতে পারিবে না'), আর মধুসূদনের শ্রেষ্ঠত্ব 'তেজস্বিতা এবং উদ্ভাবকতায়।' ভাবতচন্দ্রের কল্পনাশক্তির অভাব সম্বন্ধে হেমচন্দ্র তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেছেন: 'কল্পনাদি শ্রেষ্ঠতর গুণ তাঁহাতে যৎসামান্য ছিল।…প্রাত্যহিক ব্যাপার সমস্ত সুন্দররূপে সাজাইয়া, তাহাতে বাক্যামৃত বর্ষণ করাই তাঁহার সাধ্য ছিল এবং তাহাতে তিনি অপ্রমেয় দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উৎপাদিকা শক্তি এত দুর্বল ছিল যে, বিদ্যাসুন্দর লিখিয়া তিনি নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার দৃষ্টান্তস্থল মানসিংহ। এই গ্রন্থ মুমূর্ষু ব্যক্তির আয়াসসদৃশ। ইহাতে কথার মিল ছাড়া কবিতার অন্য কোনো লক্ষণ নাই। অন্নদামঙ্গল মন্দ নয় বটে, কিন্তু ভারতচন্দ্র যদি বিদ্যাসুন্দর

না লিখিতেন, তবে আজি অন্নদামঙ্গলের এত আদর কোথায় থাকিত? ফলতঃ ভারত অদ্বিতীয় লেখক ছিলেন বটে, রসিকতা, চতুরতা ও মনুষ্য প্রকৃতিতে দৃষ্টি তাঁহার বিলক্ষণরূপ ছিল, কিন্তু তিনি মধ্যবিত কবি ছিলেন। কিন্তু মাইকেলের উৎপাদিকা শক্তির বুঝি ইয়ত্তা নাই।'

এই রচনার পাঁচ বৎসর পরে (১৩ আশ্বিন, ১২৭৪) আলোচ্য ভূমিকার সংশোধিত রূপান্তরে হেমচন্দ্র কবিকল্পনার ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র ও মধুসূদনের তুলনা আরো বিস্তারিতভাবে করেছেন। তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করতে পারি :

"মাইকেল মধুসূদনের কি কুহকিনী শক্তি!—তাঁহার কাব্যোদ্যানে কল্পনাদেবীর কিরূপ লীলাতরঙ্গ! কখনো তিনি ধীরে-ধীরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাল্মীকির পদতল হইতে পুষ্প হরণ করিতেছেন, এবং কখনো-বা নবনিকুঞ্জ সৃজন করিয়া অভিনব কুসুমাবলী বিস্তৃত করিতেছেন। ইন্দ্রজিৎ-জায়া প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশ, শ্রীরামচন্দ্রের যমপুরীদর্শন, পঞ্চবটী স্মরণ করিয়া সরমার নিকট সীতার আক্ষেপ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, এবং প্রমীলার সহমরণ কিরূপ আশ্চর্য, কতই চমৎকার, বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আমরা এতদিন কবিকুলের চক্রবর্তী ভাবিয়া ভারতচন্দ্রকে মাল্যচন্দন দানে পূজা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু বোধ হয়, এতদিন পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় কবিকে সিংহাসনচ্যুত হইতে হইল। এ কথায় পাঠক-মহাশয়েরা মনে করিবেন না যে, আমি ভারতচন্দ্রের কবিত্বশক্তি অস্বীকার করিতেছি। তিনি যে প্রকৃত কবি ছিলেন, তৎপক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু কবিদিগের মধ্যেও প্রধান-অপ্রধান আছেন। কেহ-বা ভাবের চমৎকারিত্বে, কেহ-বা লেখার চমৎকারিত্বে লোকের চিত্তহরণ করেন। ভারতচন্দ্র যে শেষোক্ত প্রকার কবিদিগের অগ্রগণ্য, তৎসম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করিবার কাহারো সাধ্য নাই। পরিপাটী সর্বাঙ্গসুন্দর শব্দবিন্যাস করিয়া কর্ণকুহরে অমৃতবর্ষণ করিবার ক্ষমতা তিনি যেরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন, বঙ্গকবিকুলের মধ্যে তেমন আর কেহই পারেন নাই; এবং সেই গুণেই বিদ্যাসুন্দর এতদিন সজীব রহি-

য়াছে। কিন্তু গুণিগণ যে-সমস্ত গুণকে কবিকৌলীন্যের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ গণনা করেন, ভারতচন্দ্রের সে সকল গুণ অতি সামান্য ছিল। বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্র-রচিত সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু যাহাতে অন্তর্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহ্যেন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়, তাদৃশ ভাব তাহাতে কই? কল্পনারূপ সমুদ্রের উচ্ছ্বাসিত তরঙ্গবেগ কই, বিদ্যুৎছটাকৃতি বিশ্বোজ্জ্বল বর্ণনাছটা কোথায়? তাঁহার কবিতাস্রোতঃ কুঞ্জবনমধ্যস্থিত অপ্রশস্ত, মৃদুগতি প্রবাহের ন্যায়; বেগ নাই, গভীরতা নাই, তরঙ্গগর্জন নাই; মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে অথচ নয়ন এবং শ্রবণ তৃপ্তিকর।

"মালিনীর প্রতি বিদ্যার লাঞ্ছনা-উক্তি, বকুলবিহারী সুন্দর-দর্শনে নাগরীয় কামিনীগণের রসালাপ, বিদ্যাসুন্দরের প্রথম মিলন, কোটালের প্রতি মালিনীর ভৎসনার ন্যায় সরল সুকোমল বাক্যলহরী মেঘনাদবধে নাই, কিন্তু উহার শব্দপ্রতিঘাতে দুন্দুভিনিনাদ এবং ঘনঘটা-গর্জনের গম্ভীর প্রতিধ্বনি শ্রবণগোচর হয়। বোধ হয়, এ কথায় পাঠক-মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে বিরক্ত হইবেন এবং আমাকে মাইকেল মধুসূদনের স্তাবক জ্ঞান করিবেন। তাঁহাদিগের ক্রোধশান্তির নিমিত্ত আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, পূর্বে আমারও তাঁহাদিগের ন্যায় সংস্কার ছিল যে, মেঘ-নাদবধের শব্দবিন্যাস অতিশয় কুটিল ও কদর্য, এবং সেকথা ব্যক্ত করিতেও পূর্বে আমি ক্ষান্ত হই নাই; কিন্তু এই গ্রন্থখানি বারংবার আলোচনা করিয়া আমার সেই সংস্কার দূর হইয়াছে, এবং সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বিদ্যাসুন্দরের শব্দাবলীতে মেঘনাদবধ বিরচিত হইলে অতিশয় জঘন্য হইত। মৃদঙ্গ এবং তবলার বাদ্যে নটীদিগেরই নৃত্য হয়, কিন্তু রণতরঙ্গবিলাসী প্রচণ্ড যোধগণের উৎসাহবর্ধন-জন্য তূরী, ভেরী এবং দুন্দুভির ধ্বনি আবশ্যক;—ধনুষ্টঙ্কারের সঙ্গে শঙ্খনাদ ব্যতিরেকে সুশ্রাব্য হয় না।" [হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ২য়, পরিষদ-সং]

উদ্ধৃত অংশের শেষে হেমচন্দ্র মধুসূদনের ভাষা সম্বন্ধে তাঁর মত-

পরিবর্তনের কথা বলেছেন। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় যে বিরূপ মন্তব্য তিনি করেছিলেন, তা এখানে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কিন্তু প্রথম সংস্করণের ভূমিকার পরিত্যক্ত অংশে শব্দপ্রয়োগের ঔচিত্য সম্বন্ধে কিছু মূল্যবান কথা আছে, যা আমরা ভারতচন্দ্রের রচনাশৈলীর উপরে লিখিত অধ্যায়টিতে উপস্থিত করব।

হেমচন্দ্র যে ক্রমেই ভারতচন্দ্র-সংস্কার ত্যাগ করেছিলেন বোঝা যায় পরবর্তী 'ছায়াময়ী' কাব্য (১৮৮০) পাঠ করলে, যেখানে তিনি অশুচি প্রণয়ে লিপ্ত হবার জন্য 'পাপীয়সী' বিদ্যাকে কামীর নরকে শকুনী-গৃধিনীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন, যদিও তাঁর সেই আধ্যাত্মিক ক্রোধকে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মোটেই ন্যায়সম্মত বিবেচনা করেন নি।[৩৯]

মধুসূদনের আবির্ভাবের পরে ভারতচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগলেও তিনি অবিলম্বে সর্বসম্মতভাবে সিংহাসনচ্যুত হননি। বিবিধার্থ সংগ্রহের মাঘ ১৭৮০ শক সংখ্যায় (১৮৫৮) রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভারতচন্দ্রকে 'বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ কবি' বলে চিহ্নিত করেছিলেন—তিনিই পরবৎসর (১৭৮১ অগ্রহায়ণের বিবিধার্থ সংগ্রহে) মধুসূদনের তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে একইপ্রকার নিঃসংশয় বিশ্বাসে ভারতচন্দ্রের অবিসংবাদিত উচ্চতার কথা বলতে পারলেন না। দীর্ঘ-উৎকৃষ্ট বিশ্লেষণ করে তিনি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের গুণগরিমা দেখিয়েছিলেন। 'অন্ত্যানুপ্রাস, কবিতার সামান্য অলঙ্কার মাত্র, কোনো মতে অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে'—তাঁর এই মতকে রাজেন্দ্রলাল বিচারের

৩৯। "গ্রন্থকার [হেমচন্দ্র] নরকবাসীদিগের মধ্যে টেটস, ওট্‌স্, নীরো, কংস, সিরাজ-উদ্দৌলা, ক্লিওপেট্রা প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে অশুচি প্রণয়ে আসক্তা বলিয়া ভারতচন্দ্রের বিদ্যাকেও নরকে ফেলিয়াছেন। কিন্তু অন্নদামঙ্গল পাঠ করিয়া বিদ্যাকে অসতী বলিয়া, বোধহয়, কাহারও প্রতীতি জন্মে না। ভারতের বিদ্যা অসতী হইলে কালিদাসের শকুন্তলাও অসতী হইয়া পড়েন।" (রামগতি)

দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার সময়ে অন্ত্যানুপ্রাস-আসক্তি ভারতচন্দ্রের কাব্যের অংশবিশেষের কি ধরনের ক্ষতি করেছে, তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তবু তিনিও ভারতচন্দ্রের কাব্যের অতুলনীয় লালিত্যের কথা স্বীকার করেছেন :

> "ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, বাঙালি-কবির মধ্যে ভারতচন্দ্র যেমত্ত কবিতার লালিত্য অনুভব করিতে পারিতেন, এমত আর কোনো কবি পারেন নাই। তিনি শব্দের গৌরব ও অর্থের গৌরব অতি চমৎকৃতরূপে সমাহিত করিয়া রাগদ্বেষাদি-প্রকাশ-করণ-সময়ে তদুপযুক্ত গম্ভীর কর্কশ ভয়ানক শব্দ, ও কোমল ভাবের জ্ঞাপনার্থে, সুমধুর কোমল মৃদু শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অতি অল্প বাঙালি-কবি এ-বিষয়ে তাঁহার সহিত তুলনীয় হইতে পারেন।"[৪০]

সাহিত্যের রূপরীতির আলোচনায় এই অধ্যায়ে প্রবেশের ইচ্ছা নেই—প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ যে-আলোচনায় রাজেন্দ্রলাল প্রবেশ করিয়াছিলেন। বাংলা কাব্যজগতে ভারতচন্দ্রের আধিপত্য সম্বন্ধে স্বীকৃতির বিষয়টিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাক। আমরা দেখতে পাব, বাংলাসাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাবের পরেও শিক্ষিত রসিকসমাজের একটি বড় অংশে ভারতচন্দ্রকে সবচেয়ে বড় কবি মনে করা হচ্ছে। এই বিষয়টি অনেকে ধিক্কারের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এসম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭১ সালের ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় 'বেঙ্গলী লিটারেচর' প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

> "The···writers···who flourished under the Nuddea Raja Krishna Chandra····enjoy an undeserved celebrity, and are in our opinion, a very worthless set. The best known among them is *Bharat Chandra Roy, who was till lately considered the best of Bengali poets—an opinion not yet wholly*

৪০। সাহিত্য-সাধক চরিতমালার (৩য়) 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র'-এর মধ্যে উদ্ধৃত।

eradicated but fast losing ground. [বক্রলিপি বর্তমান লেখকের নির্দেশে][৪১]

পর বৎসর, ইণ্ডিয়ান অবজার্ভার পত্রিকার ৪ ডিসেম্বর ১৮৭২ সংখ্যায় *Bharat Chandra Roy, the Poet* নামে যে লেখা বেরোয় তার মধ্যে ভারতচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠত্বের সম্বন্ধে জনস্বীকৃতির উল্লেখ ছিল :

"This versatile writer, esteemed by his countrymen as one of the best, if not the best poet in their language, was born in 1711 at Panduah, a town in the Huguly District." [৪২]

১৮৭৭ খ্রী. রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'লিটারেচর অব বেঙ্গল' গ্রন্থে ভারতচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ লেখক বলে স্বীকারকারীদের সমূহ গঞ্জনা দিয়েছিলেন :

"Critics have formed very different estimates of Bharat Chandra's poetical powers. A considerable portion of our countrymen would place him in the highest rank of poets, and maintain that he has no rival among the poets of Bengal. We must emphatically differ from this opinion.…

"That this work should generally, we might almost say universally, be considered to be the best work in the language, that the descriptions should be universally admired by our countrymen and learnt by rote, that Bharat Chandra should still be considered as the greatest poet of Bengal, and should be spoken of with rapture, afford a curious index to the education and tast of our coun trymen.[৪৩]

৪১। *English Writings* of Bankim Chandra Chatterjee. পরিষদ সংস্করণ।

৪২। রামগোপাল সান্যাল-সম্পাদিত ও প্রকাশিত *Reminiscences and Annecdotes of Great Men of India.* Vol. II (1895) গ্রন্থে উদ্ধৃত।

৪৩। রমেশচন্দ্র ১৩০১ মাঘে লেখা তাঁর 'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধের সূচনা এইভাবে করেছেন : →

পরবৎসর রাজনারায়ণ বসু (১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত) তাঁর 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা'য় লিখেছিলেন :

"কাহারও কাহারও মতে ভারতচন্দ্র বাংলাভাষার অদ্বিতীয় কবি। একথায় আমি সায় দিতে পারি না।"

গঙ্গাচরণ সরকার তাঁর 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা'-বিষয়ক বক্তৃতায় ১২৮৬ (১৮৮০) সালে বললেন :

"অন্নদামঙ্গল বঙ্গসাহিত্যানুরাগীদিগের মধ্যে অনেকেরই অতি প্রিয় পুস্তক ; অনেকেই তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন ; আমিও ইহার প্রশংসা করি ; ইহা যে বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারের একটি সুদৃশ্য রত্ন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিব। কিন্তু এই গ্রন্থগুণে ভারতচন্দ্র প্রাচীন বঙ্গ-কবিসমাজে যেরূপ উন্নত আসন গ্রহণ করিয়াছেন, সেই আসন তিনি কবিকঙ্কণ-সম্মুখে পাইবার যোগ্য কিনা, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সন্দিহান।"

কৈলাসচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'বাংলা সাহিত্য' পুস্তকে (১২৯২) একই কথা বলেছেন :

"অনেকে বলেন, ভারতচন্দ্রই বঙ্গভাষার সর্বপ্রধান কবি। কিন্তু একথায় আমরা আস্থাসম্পন্ন হইতে পারি না। মুকুন্দরামের

"বাল্যকালে শুনিতাম, ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবি আর কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। শুনিতাম, বাঙ্গালা ভাষায় ভারতের কবিত্বের ন্যায় কবিত্ব আর হয় নাই, তাহার ন্যায় মৌলিকতা অন্য কোনো কবির নাই, তাহার ন্যায় মধুরত্ব ও লালিত্যও অন্য কবির নাই। এখনও অনেকে ভারতচন্দ্রকে বঙ্গদেশের প্রধান কবি মনে করেন। মাননীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের সিংহাসন গ্রহণ করিতে পারে, এরূপ কবি এখনও বঙ্গদেশে হয় নাই। অন্যান্য বঙ্গীয় লেখক ও পাঠকের মত এই যে, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ গুণাকর ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ নহেন ; আধুনিক কবি মধুসূদন দত্তও ভারতের নিকটে স্থান গ্রহণ করিতে পারেন না।"

[সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ; নিখিল সেন-সম্পাদিত 'রমেশচন্দ্র দত্ত প্রবন্ধ সংকলন'-এর থেকে গৃহীত]

ক্ষমতার নিকট ভারতচন্দ্র তিষ্ঠিতেও পারেন না।"

আরও পাঁচ বছর পরে ১৮৯০ খ্রী. ইংরেজি গদ্যে বিদ্যাসুন্দরের অনুবাদক গৌরদাস বৈরাগী ভূমিকায় লিখেছিলেন—এখনো অনেকের কাছে ভারতচন্দ্র কবিশ্রেষ্ঠ ঃ

"The poem [Vidya Sundara] is recond as one of the gems of the Bengali literature—nay, some going to the length of according the poet the foremost place in the ranks of Bengali writers.".

[*An English Translation of Vidya Sundara of Bharat Chandra Roy*]

স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, ১৮৯০-এর মধ্যে কেবল মধুসূদনই নন, রবীন্দ্রনাথও (অন্ততঃ মানসীর) কবিরূপে আবির্ভূত।

॥ ১০ ॥

ভারতচন্দ্রের প্রশংসা যেমন, তাঁর উপরে আক্রমণও তেমনই প্রচণ্ড, এবং তা শুরু হয়ে গিয়েছিল বহুদিন আগেই। ভারতের কবিখ্যাতি প্রধানতঃ রূপরীতির উৎকর্ষের জন্যই, সে বিষয়ে নিন্দা সর্বদাই অল্প (রাধামোহনী চালাকির বিপরীত দৃষ্টান্ত অবশ্য আছে), বিরোধিতা নীতির প্রশ্নে, এবং এ সম্পর্কে এমন একটি প্রাণবন্ত বিতর্ক হয়েছিল, বাংলাসাহিত্যের আসরে যার তুলনা বেশি মিলবে না। এই বিতর্কে বাংলার কয়েকজন সেরা পণ্ডিত বা লেখক অংশ নিয়েছেন, ভারতচন্দ্রের পক্ষে বা বিপক্ষে কলম-তলোয়ার বারে-বারে ঝলসেছে—বড়ই উপভোগ্য সে রণরঙ্গ। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নিয়েও প্রচুর তর্কবিতর্ক হয়েছে, কিন্তু সেগুলি প্রধানতঃ সন-তারিখের পঞ্জিকা-সংগ্রাম ; আর ভারতচন্দ্র-কেন্দ্রিক ব্যাপার সাহিত্যেরই, যদিও-নীতি-নামক স্বাস্থ্য-বিভাগীয় প্রসঙ্গ তার মধ্যে ঢুকে পড়ে 'সমাজ ও সাহিত্য'-সমস্যায় অনেককে বিচলিত করে তুলেছিল।

ভারতচন্দ্র যখন উত্তুঙ্গ আসনে, তখনই তাঁর বিরুদ্ধে কানাকানি আরম্ভ হয়ে যায়; তাঁর আসন টলাবার মত কবির আবির্ভাব না হলেও

সাহিত্যরুচি টলাবার মত ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষা দেশের একাংশে তখন ছড়িয়েছে। এই নব্যশিক্ষিতেরা ভিক্টোরীয় নৈতিক পরচুলের উপরিতন সৌন্দর্যে মোহিত ছিলেন, তাই ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার নিন্দা না করে পারেন নি। ১৮৪৫ খ্রী কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর 'রামমোহন' প্রবন্ধে ভারতচন্দ্র-প্রসঙ্গে বলেছিলেন (মূল আগেই উদ্ধৃত হয়েছে)—'ভারতচন্দ্রের রচনার চমৎকার-নৈপুণ্য নষ্ট হয়ে গেছে সর্বত্রব্যাপ্ত বিষাক্ত সুরের দ্বারা। এর নীতিহীন প্রবৃত্তি সম্বন্ধে কোনো ধিক্কারই যথেষ্ট ধিক্কার নয়।' ১৮৫০ সালে পাদরি ওয়েঙ্গার পাদরি-হিসাবে স্বতঃই বলেছিলেন (মূল আগে উদ্ধৃত):

"নিরপেক্ষতার দায়ে পড়ে আমাদের স্বীকার করতেই হয়, [বিদ্যাসুন্দরের] এই রোমান্টিক কাহিনী ভাষার সৌন্দর্য ও বর্ণনার ঐশ্বর্যে আমাদের সবিস্ময় প্রশংসা কেড়ে নেয়, কিন্তু কাব্যটির প্রবৃত্তি মূলতঃ এবং প্রধানতঃ নীতিদুষ্ট—দেশীয় নারীগণ কর্তৃক এর পঠন চরম ক্ষতির কারণ। এর নায়ক এবং নায়িকা সর্বদাই লেখকের প্রীতিপুষ্ট। লেখকের রচনা-অনুযায়ী তাদের কালীভক্তি পুরস্কৃত হয়েছে অপরাধমূলক কার্যকলাপের সাফল্যের দ্বারা। তাদের কামতাড়িত সাক্ষাৎকারগুলি বিতৃষ্ণাকর খুঁটিনাটির সঙ্গে পুনঃপুনঃ বর্ণিত হয়েছে অত্যুজ্জ্বল ভাষায়। পাপ যদি কখনো জাঁকালো বর্ণবাহুল্যে চিত্রিত হয়ে অতি চিত্তাকর্ষক চেহারায় উপস্থিত হয়ে থাকে, সে এই উপন্যাসে। এর পঠন মনের সর্বপ্রকার পবিত্রতা নষ্ট করবেই করবে। অথচ একথাও নিঃসংশয় সত্য, যদি কোনো বই ভদ্রঘরের বাঙালি মহিলারা অবিরত পড়েন বা শোনেন, সেও এই বইটি।"

ওয়েঙ্গার সাহেব নিরপেক্ষতার দায় বইছিলেন। তারই চাপে, বাঙালি-অন্তঃপুরে উঁকি দেবার পরে স্বদেশবাসী'দর নিভৃতকক্ষে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করে পারেন নি:

"কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই, কলকাতায় এমন অনেক ইউরোপীয় মহিলা পাওয়া যাবে, যাঁরা একইপ্রকার আগ্রহ ও উল্লা-

সের সঙ্গে ইউজিন সু (Eugene Sue) প্রমুখ অনুরূপ চরিত্রের ফরাসী লেখকদের চরম কামুকতাপূর্ণ উপন্যাসগুলি পড়ে থাকেন। তাঁদের সেই রুচি, বিদ্যাসুন্দর-সমাদরকারিণী তাঁদের [দেশীয়] ভগিনীগণের রুচি অপেক্ষা অনেক বেশী নিন্দনীয়।"

১৮৫২ সালে মহেন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'কুসুমাবলী অর্থাৎ বাংলাভাষার কাব্যসমূহের সারসংগ্রহ' নামক দুইখণ্ড গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ভারতচন্দ্রের অন্নপূর্ণামঙ্গল থেকে অংশ উদ্ধৃত করেছিলেন। কিন্তু বইটি স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের জন্য সংকলিত বলে তার রসাধিক্য কিছু চেঁচে বাদও দিয়েছিলেন। কৈফিয়তরূপে মহেন্দ্রনাথ লেখেন :

"যদিচ ভারত প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের প্রবন্ধবচনা বিশেষ মাধুর্যবিশিষ্ট হইয়া অতিমাত্র জন-কমনীয় হইয়াছে, তথাপি উক্ত পুস্তক কোনরূপেই ছাত্রপুঞ্জের পাঠোপযোগী নহে। যেহেতু স্থানে-স্থানে বিবিধ অশ্লীল বাক্য ও কদর্য ভাষা ব্যবহার হওয়াতে তাহা ভদ্র-সমীপে উচ্চার্য নহে। অতএব এই দোষসমূহ নিবাবণার্থে প্রচুব যত্ন দ্বারা ঐ সকল অপকৃষ্ট ভাব ও বীভৎস বর্ণনাদি পরিত্যাগ করিয়া উক্ত কবিদিগেব সারভাগমাত্র সংকলনপূর্বক প্রস্তুত করা গেল।"[৪৪]

ভারতচন্দ্রকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকব বিতর্ক এই ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দেই হয়, এবং এমন কাণ্ড ঘটে যার ফলে বীটন সোসাইটির মতো বিখ্যাত বিদ্বজ্জনসভাব প্রচলিত রীতিব বদল পর্যন্ত করতে, বা কববাব কথা ভাবতে হয়েছিল।

ঘটনা এই—। হরচন্দ্র দত্ত ৮ এপ্রিল ১৮৫২ খ্রী. বীটন সোসাইটিতে 'বেঙ্গলী পোয়েট্রি' নামে প্রবন্ধ পাঠ কবেন (যেটি ১৮৫২-এর ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়), যার মধ্যে তিনি নিতান্ত অবজ্ঞার সঙ্গে বাংলা কাব্যসাহিত্যের দীনতার কথা বলেছিলেন। এই সূত্রে বিরক্ত-ভাবে ভারতচন্দ্রের কাব্যের অশ্লীল জনপ্রিয়তার কথাও বলেন, যদিও উক্ত কবির রচনারীতির প্রশংসা করতে ভোলেন নি। এক্ষেত্রে মুকুন্দ-রামের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের তুলনাও করেছিলেন।

৪৪। গোস্বামীর গ্রন্থে উদ্ধৃত।

বীটন সোসাইটির রিপোর্টে এই অধিবেশনের এবং সংশ্লিষ্ট পরবর্তী অধিবেশনের কোনো উল্লেখ না থাকলেও (অধ্যাপক স্বপন বসু আমাদের জানিয়েছেন) 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায় উক্ত দুটি বৈঠকের সংবাদ বেরিয়েছিল। ৮ এপ্রিলের বৈঠকের সংবাদ বেরোয় ২১ এপ্রিল—তার মধ্যে বাবু হরচন্দ্র দত্তের বাংলা কবিতার উপরে প্রবন্ধপাঠ, তার উপরে মহেন্দ্রনাথ সোমের কিছু মন্তব্য, হরচন্দ্র দত্তের প্রবন্ধের উপরে (প্রবন্ধটি পূর্বেই প্রচারিত) বাবু নবীনচন্দ্র পালিতের প্রবন্ধপাঠ, এবং তার উপরে কৈলাসচন্দ্র বসু প্রমুখ কয়েকজনের আলোচনার উল্লেখ আছে। ওখানে আরও পাই—বাংলাকাব্যের এই আলোচনা প্রচুর আগ্রহ জাগিয়েছিল. অনেক রাত্রি হয়ে যাবার পরেও যখন তা অব্যাহত থাকে, তখন অগত্যা সভাপতি, এমন একটা উপাদেয় বিষয় পরবর্তী অধিবেশনে পুনশ্চ আলোচিত হওয়া উচিত বলে সভাভঙ্গ করেন।

মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর 'রঙ্গলাল' জীবনীতেও এই সভার বিবরণ দিয়েছেন। তার মধ্যে দেখতে পাই, নবীনচন্দ্র পালিত তাঁর প্রবন্ধে হরচন্দ্র দত্ত কোন্ কোন্ কবির নামোল্লেখ না করে অনুচিত কাজ করেছেন, তাঁদের তালিকা দিয়েছিলেন, অন্যদিকে তিনি হরচন্দ্রের বাংলা সাহিত্য-বিরোধী বক্তব্যেরও প্রতিবাদ করে বলেছিলেন: 'বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্য অনিন্দনীয়, এবং সমালোচকের প্রতিকূল মন্তব্য বিচারসহ নহে।'

নবীনচন্দ্র পালিতের এই ধরনের দেশসাহিত্য-প্রীতি কৈলাসচন্দ্র বসুর অসহ্য লাগে। নবীনচন্দ্রকে তিনি বিশেষরকম ধাতানি দেন:

> "অতঃপর ইংরাজি সাহিত্যরসে বিভোর মনীষী কৈলাসচন্দ্র বসু বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, লেখক মূলের যে অনুবাদ শুনাইয়াছেন, তাহা মূলের ঠিক অনুযায়ী নহে। মূল অপেক্ষা অনুবাদ অধিকতর কবিত্বপূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার মতে, বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যে এমন কিছুই নাই যাহা কোনো শিক্ষিত বা মার্জিতরুচি ব্যক্তির সন্তোষবিধান করিতে পারে। উহা কুৎসিত অশ্লীলতা ও কুরুচিতে পূর্ণ এবং ভদ্র ও সভ্য ব্যক্তিগণের বিরক্তি

উৎপাদন না করিয়া থাকিতে পারে না। বাঙ্গালা কবিদিগের অঙ্কিত চিত্র ও উপমাগুলি যে উৎকৃষ্ট নহে তাঁহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বিদ্যা-সুন্দর হইতে কতকগুলি পংক্তি আবৃত্তি করিয়া মুখে-মুখে তাহার অনুবাদ করিয়া শুনাইলেন।"[৪৫]

এই সূত্রে হরচন্দ্র দত্ত বাংলাসাহিত্য বিষয়ে যা বলেছিলেন, তার খানিক উদ্ধৃত করা উচিত। বাংলাসাহিত্যের নিম্নমান সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করার দরকার নেই, এখানে কেবল ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা ও কুপ্রভাবের বিষয়ে তাঁর উক্তির অনুবাদ দিচ্ছি :

"বাংলার জনগণের কাছে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যা-সুন্দর এতই পরিচিত যে, ঘরোয়া জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্ব-শ্রেণীর দেশীয় মানুষ আনন্দের সঙ্গে, প্রশংসার সঙ্গে, তাদের পড়ে থাকে। সেগুলি পড়ে উচ্চঘরের হিন্দুমহিলারা অবসরবিনোদন করেন, মেদস্ফীত সুচতুর বেনিয়ারাও তাই করে, হালে বসে-থাকা মাঝির শ্রমক্লান্তিও সে বাস্তবিক দূর করে দেয়। আমরা স্বচক্ষে দেখেছি, বাঙালি তরুণীরা এঘরে-ওঘরে শুয়ে-বসে কাটাচ্ছে—হাতে ঐ দুটি বইয়ের একটি। স্বতঃই আমরা বুঝতে পারি, ওগুলি পড়ে কিভাবে বিষিয়ে যাচ্ছে তাদের মন। বিদ্যাসুন্দরের কয়েকটি অধ্যায়ের তুল্য জঘন্য অশ্লীল জিনিস কুত্রাপি মিলবে না—ছন্দ, মিল ও রচনাকৌশলের দ্বারা যাদের আকর্ষক করে তোলা হয়েছে। ...বাংলার তরুণীমহলে বিদ্যাসুন্দর যতখানি প্রিয়, অ্যাভনের কবি-বিহঙ্গের [শেক্সপীয়ারের] 'ভীনাস ও অ্যাডোনিস' এলিজাবেথের সভাসুন্দরীদের বা সেকালের অবসরভোগীদের কাছেও বোধহয় ততখানি প্রিয় ছিল না।"

হরচন্দ্রের প্রবন্ধে আক্রমণ থাকলেও যুক্তি ছিল, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তিনি যথেষ্ট প্রশংসাযোগ্য বস্তু আবিষ্কার করতে পেরে-ছিলেন (সেসব কথা অন্যত্র বলব), কিন্তু কৈলাসচন্দ্র বসুর বক্তব্যে

৪৫। 'রঙ্গলাল' : মন্মথনাথ ঘোষ।

ছিল অবিমিশ্র দাম্ভিকতা। স্বতঃই সভার অনেকে তাঁর কথায় আহত হয়েছিলেন ; একজন প্রতিবাদ করতেও ওঠেন, কিন্তু রাত এগারোটা হয়ে যাওয়ায় সভাভঙ্গ করতেই হয়,[৪৬] তবে ব্যাপারটার ইতি সেখানে হয় নি, বীটন সোসাইটির ম্যানেজারদের কাছে 'জনৈক নেটিভ' চিঠি পাঠিয়ে হরচন্দ্রের বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেন, কবিতার উপরে প্রবন্ধ না লিখে অন্য কাজে সময়ক্ষেপ করলে দত্ত-মহাশয় সমাজের উপকার করবেন।[৪৭] তারপর যখন ১৩মে তারিখে বীটন সোসাইটির পরবর্তী অধিবেশনে পূর্বোক্ত অসমাপ্ত আলোচনার সূত্রপাত হল, তখন সভাস্থলে উৎসুক্য ও উত্তেজনার অবধি ছিল না, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতিবাদ-প্রবন্ধ পড়েছিলেন, তা কিছু দীর্ঘ হলেও সকলে সাগ্রহে শুনেছিল। মন্মথনাথ ঘোষের মতে, প্রবন্ধ শেষ হতে রাত্রি হয়ে যাওয়ায় তার উপরে আলোচনা হতে পারেনি। কিন্তু কেবল রাত্রি হওয়াই নয়, আলোচনা না হওয়ার অন্য কারণও ছিল, যা ২৪ মে-র বেঙ্গল হরকরার সংবাদে দেখা যায়। রঙ্গলালের প্রবন্ধের বক্তব্য এবং সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের কথায় ও আচরণে অম্লরস ও রৌদ্ররসের এমনই আধিক্য দেখা দিয়েছিল যে, উক্ত সভার সভাপতি ডাঃ এফ জে মোয়াট বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—ব্যাপারটা ঠিক সভ্য, শিষ্টজনোচিত দাঁড়াচ্ছে না, সাহিত্যের আলোচনাসভায় এরকম ব্যাপার-স্যাপার গর্হিত। পূর্বদিনের আলোচনাসভায় রীতিমত অশ্লীল কাব্যাংশ উপস্থিত করার কঠোর নিন্দাও তিনি করেন (রঙ্গলালও তাঁর লেখায় ও-বিষয়ে কসুর করেন নি), বিশেষতঃ তরলমতি ছাত্রেরা যে-সভায় উপস্থিত ছিল। তাঁর বিবেচনায়, পঠিত প্রবন্ধের উপরে লিখিত প্রতিবাদপাঠও বাঞ্ছনীয় নয়, তাতে অযথা মনোমালিন্যের কারণ ঘটে। এ প্রথা রহিত হওয়াই উচিত।[৪৮]

৪৬। 'রঙ্গলাল' : মন্মথনাথ ঘোষ

৪৭। হরকরা : মে, ১৮৫২

৪৮। "**The Bethune Society :** The subject of Bengali poetry being brought forward for discussion, Baboo Rung Loll Baner-

এই পটভূমিকায় রঙ্গলালের প্রবন্ধের গুরুত্ব বুঝে নিতে হবে। পরাধীন দেশে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হতে পারে না, তদনুযায়ী বাংলা-সাহিত্যও কিস্সু নয়—এই কৈলাস-মনোভাব বিচিত্র ও মর্যাদাহানিকর ঠেকেছিল রঙ্গলালের কাছে (যুক্তি বটে ! কৈলাস বসুরা ভারতে ইংরেজের অক্ষয় রাজ্যপাটে বিশ্বাসী, সুতরাং 'কিছু হবে না'-টা চিরদিনের জন্য সেঁটে রইল বঙ্গভারতীর ললাটে !!)। কেবল পরানুবাদ ও পরানুকরণ, কেবল আত্মগ্লানির উদ্গিরণে আত্মশ্লাঘা, অভাবের ক্ষেত্রে সাহায্যের চেষ্টামাত্র নয়—ইংরেজি-শিক্ষিতদের একাংশে এই মনোভাব দেখে রঙ্গলালের মন ধিক্কারে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। মনে রাখতে হবে, রঙ্গলাল কিছুদিনের মধ্যে জাতীয়তার অগ্রণী কবি হয়ে উঠবেন এবং নিজের যা সাধ্য তদনুযায়ী স্বদেশীয় সাহিত্যের সেবা করবেন।

---

jee, Editor of the Sagore newspaper, read a paper in Bengali regarding it. Several other gentlemen were desirious of carrying in the debate when it was agreed, on account of lateness of the hour, and for other causes, to postpone the discussion of the subject to a future occasion.

"The President [Dr. F. J. Mouat] mentioned that it had been brought to his notice, that a highly objectionable and improper passage of Bengali poetry had been quoted by one of the speakers at the preceding meeting. He had learned this with extreme regret, and trusted that mere mention of his entire and emphatic disapproval of so gross a breach of good breeding and propriety, would be sufficient to prevent its repetition. It was not justifiable in any circumstances, would not have been tolerated in any literary association elsewhere, and was particularly objectionable in the presence of an audience composed chiefly of the young, from whose minds every taint of impurity and corruption should be carefully and studiously withheld. He had no doubt that the speaker was not fully aware of the extremely objectionable nature of his proceeding, and in all probablity had quoted to condemn the passage referred to, but it was his duty to point out the utter

আলোচ্য ব্যাপারে রঙ্গলাল কতখানি আহত হয়েছিলেন বোঝা যায়, ৬ বৎসর পরে, ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'পদ্মিনীর উপাখ্যানে'র ভূমিকা পড়লে। তার মধ্যে দেখতে পাই, রঙ্গলালের মতো অনেকেই আঘাত পেয়েছিলেন ঐ ব্যাপারে[৪৯] এবং রঙ্গলাল তাঁর প্রতিবাদের সময়ে কার্যতঃ প্রতিনিধির ভূমিকা নিয়েছিলেন, ঠিকভাবে বলতে গেলে, প্রতিবাদের ভাষা সৃষ্টি করে প্রতিনিধি হবার অধিকার অর্জন করেছিলেন। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এই প্রবন্ধটির অসামান্য গুরুত্ব—সম্ভবতঃ এর মধ্যে 'প্রথম' দেখা গেল (পূর্বে উল্লিখিত বাবু নবীনচন্দ্র পালিতের প্রবন্ধে কী ছিল আমরা জানি না), অবজ্ঞাত বা নিন্দিত বাংলাসাহিত্যের মর্যাদারক্ষায় এগিয়ে এসেছেন কোনো ইংরেজ নন—একজন বাঙালি !!

impropriety of the proceeding, and to interdict its repetition, and he had no doubt that the good sense and the right feeling of the meeting would support him in the excercise of the authority of a Chairman in all such matters. ....

The President also stated that the practices of reading written replies to discourses submitted for discussion, was an objectionable one, calculated to produce unprofitable debates, to introduce a controversial and unfriendly spirit, and to occupy the time of the Society to an injurious extent with questions of no real importance."

[*The Bengal Hurkaru and The India Gazette*, Monday. May 24, 1852]

৪৯। রঙ্গলালের প্রবন্ধ পাঠান্তে 'ভূম্যধিকারী মৃত বাবু কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী' আক্ষেপ করে পত্রকবিতা লিখে পাঠান তাঁকে :

'আধুনিক যুবাজনে স্বদেশীয় কবিগণে
ঘৃণা করে নাহি সহে প্রাণে।
বাঙালীর মনপদ্ম কবিতাসুধার সদ্ম
এইমাত্র রাখ হে প্রমাণে॥'

['পদ্মিনীর উপাখ্যানে'র লেখককৃত ভূমিকায় উদ্ধৃত]

বাংলাসাহিত্যের, বিশেষতঃ ভারতচন্দ্রের সমর্থনে রঙ্গলালের বক্তব্যের আলোচনায় আসার আগে আর একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। মনে হতে পারে, রঙ্গলাল বুঝি প্রচলিত অর্থে অশ্লীলতার সমর্থক ছিলেন এবং একেবারে অন্ধ ছিলেন নবযুগের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে। মোটেই তা নয়। তিনি পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা যথেষ্ট নিয়েছিলেন, 'এতদ্দেশীয় অধিকাংশ ভাষা-কাব্যনিচয়ের অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা' সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, এবং 'বিশুদ্ধ প্রণালীতে' কাব্যরচনা করতে বাল্যাবধি সচেষ্ট ছিলেন।[৫০] এই বিশুদ্ধ প্রণালী যে তিনি 'ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালী' দেখেই জেনেছেন, তা স্বীকার করেছেন—স্বীকার করেছেন যে, জাতীয় সাহিত্যের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে পাশ্চাত্ত্যসাহিত্য থেকে ভাবগ্রহণ করেছেন প্রচুর পরিমাণে, এবং বিশ্বাস করেছেন, 'ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবেক, ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য কবিতাকলাপ অন্তর্ধান করিতে থাকিবেক এবং তত্তাবতের প্রেমিক-দলেরও সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবেক।'

রঙ্গলালের 'বাঙ্গালা কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ' সাহিত্য-পলেমিকের অতি উত্তম নমুনা। এর মধ্যে রঙ্গলালের পড়াশোনার পরিচয় যেমন আছে, তেমনি আছে তর্কযুক্তি সাজানোর ক্ষমতাও। বিদ্রূপে অদ্ভুত দক্ষতা তাঁর ছিল, তামাশা করে অপরকে তুচ্ছ করতে পারতেন, এবং তারই মধ্যে পাঠককে সচেতন রাখতেন—কোন্ গভীর বেদনাবোধ অন্তঃশীলা হয়ে আছে। স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়—ঐ পঁচিশ বৎসরের যুবকটি ওরই মধ্যে বছর-তিনেক সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফেলেছেন (উক্ত লেখার কালে তিনি 'সংবাদ-সাগর'-এর সম্পাদক)।

৫০। "কিশোর কালাবধি কাব্যামোদে আমার প্রগাঢ় আসক্তি, সুতরাং নানা ভাষায় কবিতাকলাপ অধ্যয়ন বা শ্রবণকরতঃ অনেক সময়-সংবরণ করিয়া থাকি। আমি সর্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্যালোচনা করিয়াছি, এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহুদিনের অভ্যাস। বাঙ্গালা 'সমাচার' পত্রপুঞ্জে আমি চতুর্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উক্ত প্রকার পদ্য প্রকটন করিতে আরম্ভ করি।" ['পদ্মিনীর উপাখ্যানে'র ভূমিকা]

লেখাটিতে দোষ এই—রঙ্গলালের গদ্যভাষা যথেষ্ট তুরস্ত নয়—সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ফোটাবার পক্ষে। সেটা তাঁর বিশেষ দোষ নয়, কারণ বাংলাগদ্য তখনো যথেষ্ট শক্তি অর্জন করে নি।

প্রবন্ধের গোড়ায় রঙ্গলাল জটিল সমাসবহুল ভাষায় জানিয়েছেন, উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে তাঁর অবস্থা হংস-মধ্যে বকের মতো, ঐ বকের চিৎকার অবশ্যই হাস্যকর, 'কিন্তু [যেহেতু] হাস্যরস বা নাট্য-রসে জ্ঞানীরাও কিঞ্চিৎকাল ক্ষেপণ করিয়া থাকেন,' সেহেতু তাঁর চেষ্টা, যদি তিনি 'এই ধৈর্যগুণসম্পন্ন জ্ঞানিসমাজের রহস্যরসোদ্দীপন' করতে পারেন! তারপর রঙ্গলাল ব্যাখ্যা করে দেখালেন, নিসর্গপ্রকৃতির ভিন্নতা অনুযায়ী দেশে-দেশে কাব্যরূপ ও কাব্যচরিত্র ভিন্ন হয়। ইউ-রোপে পাণ্ডুবর্ণ সূর্য, অনুজ্জ্বল চন্দ্র, প্রচুর তুষারপাত, 'সমীরণের অসুখ-কর চিৎকার', আর উষ্ণ ভারতবর্ষে হাস্যময় নিকুঞ্জকানন, সুনির্মল সরোবর, তাতে প্রফুল্ল রাজহংস, মধুকরনিকর ও কলকোকিলের মিষ্ট-ধ্বনি ইত্যাদি। সেজন্য 'ইউরোপখণ্ডে কবিতাসতী শুভ্রবর্ণ বস্ত্রাবৃতা সলজ্জ এবং গম্ভীর মুখভঙ্গিযুক্তা···কিন্তু অস্মদ্দেশে তিনি চিরযুবতী, অবিরত হাস্যবতী, হাব-ভাব-লীলা-হেলা প্রভৃতি বিবিধ রসশালিনী সুন্দরীরূপে বিরাজিতা।' রঙ্গলালের সিদ্ধান্ত: 'ইউরোপীয়া কবিতাসতী'কে তিনি সম্ভ্রম করবেন, আর দেশীয় কবিতাকে অবশ্যই প্রগাঢ় প্রেমের সহিত আদর করবেন।

দেশীয় রঙ্গিণী কবিতা-যুবতীকে বক্ষে ধারণ করতে গিয়ে রঙ্গলাল দেখলেন—ব্যঙ্গবক্র নয়নে বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী-প্রেমিকেরা দাঁড়িয়ে। ঈষৎ সামলে তিনি বললেন: 'আমারদিগের আবার কবিতা—তাহার আবার কথা! আমি নিতান্ত দুর্ধর্ষ সেইজন্যই এই সভ্যসমাজে উল্লেখ করিতেছি, বাঙ্গালাদেশে কবিতাসতী আবির্ভূতা আছেন। একথা শুনিলে ইংরেজীবিদ্যোজ্জ্বলবুদ্ধি নববাবুরা আমাকে উপহাস করিতে পারেন। অতএব এই সভার মধ্যে যে-যে মহাশয় সে ভাবের ভাবী, তাঁহারা হাস্য করুন, আমি প্রথমেই বলিয়া রাখিতেছি, তাহাতে আমি চরিতার্থ মানিব।' ঐ সভায় কৈলাসচন্দ্র বসুই ছিলেন প্রধান প্রতিপক্ষ,

সুতরাং—'কৈলাসবাবুর দূরদর্শিতা এবং বিদ্যানুরাগিতার প্রতি নমস্কার প্রদান করি।' কৈলাসবাবুরা ইংরাজদের অনুকরণে দেশীয় কাব্যের শ্রুতিসুখকরতায় বিতৃষ্ণ; সেই 'ইয়ংবেঙ্গল-বাবুরা সাধ করিয়া বেসুরা ও বেতালা হইতে চাহেন হউন'; তাঁরা এই প্রকার আবোল-তাবোল বকতে থাকুন যে, মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্ম হয় না; রঙ্গলাল বিপরীত দৃষ্টান্ত যথেষ্ট জানেন, তা দিয়েছেনও, যথা, 'ইউরোপীয় আদি-কবি হোমর একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত ছিলেন, অবিড্ দ্বীপান্তরে প্রেরিত রাজদণ্ডভোগী ছিলেন', এবং জানেন যে, কৈলাসবাবুরা তাঁদের সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি সত্ত্বেও এই কথাটা জানেন না—'The dying swan sings the sweeter.'

এই ভূমিকার পরে রঙ্গলাল ভারতচন্দ্রের পক্ষসমর্থনে নেমেছেন। 'ভারতচন্দ্র রায় যথার্থ কবি ছিলেন না, কৈলাসবাবুর সহিত আমরা এই সিদ্ধান্তে কখনও সম্মত হইতে পারি না।' কোন্ সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় ভারতচন্দ্র কাব্যরচনা করেন, সে বিষয়ে রঙ্গলাল এর পরে কিছু বলেছেন, সে কথাগুলির বিশেষ মূল্য এইখানে, তা বলা হয়েছিল ঈশ্বর গুপ্তের ভারতচন্দ্র-জীবনী প্রকাশিত হবার আগে:

> "যে-সময়ে বর্গীর হাঙ্গামা, সে সময়ে ইংরাজদের বিক্রমবৃদ্ধি, এবং যে-সময়ে মুসলমানের ছত্রভঙ্গ, সেই সময়ে ক্ষুদ্র এক তটিনী-তীরবর্তী ক্ষুদ্র এক নগরীর ক্ষুদ্র এক রাজার সভা মনে করুন, সেই রাজা একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন না, একজন স্বাধীন রাজার ভৃত্যানুভৃত্য। সেই রাজার ধীরতার চিহ্নের মধ্যে এইমাত্র ছিল যে, তিনি 'কাব্যশাস্ত্রবিনোদন কালো গচ্ছতি ধীমতাং'—এই প্রসিদ্ধ কথার মর্মজ্ঞ ছিলেন, অতএব স্বীয় সভাসৎ এবং আশ্রিত ভারতচন্দ্র রায়কে গুণাকর উপাধি পুরস্কার করিয়া কবিতা-কলাকলনে অনুমতি প্রদান করাতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন।"

ভারতচন্দ্রের কাব্যে কৃষ্ণচন্দ্রের তোষামোদবাহুল্য আছে। সেই নিন্দার খণ্ডন করেছেন রঙ্গলাল:

"ভারতচন্দ্র রায় স্বয়ং জনৈক ভাগ্যধর ব্রাহ্মণের বংশধর ছিলেন কিন্তু সেই সময়ে সেই দেশে অত্যন্ত অরাজকতা বিধায় স্বীয় সম্পদ-পরিচ্যুত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এই জন্যই রায়গুণাকর কবিতার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের বিস্তর স্তুতি করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ স্তাবকতার কারণ দেদীপ্যমানই রহিয়াছে। যেখানে লাটীন-কবি অবিড্-মহাত্মা স্বীয় প্রভু কর্তৃক দ্বীপান্তরিত হইয়াও তোষামোদ করিতে ত্রুটি করেন নাই, সেখানে ভারতচন্দ্র 'অন্নেন পুরুষো দাসঃ' ইতি নীতিবাক্যের মর্মরক্ষা করিবেন, ইহাতে দোষ কি ?"

রঙ্গলাল কিন্তু ভারতচন্দ্রের অন্নদাস নন (যদিও কাব্যদাস), সুতরাং অযথা স্তুতিবাদে ইচ্ছুক নন। তিনি স্বীকার নিয়েছেন, 'ভারতচন্দ্র কোনো মহাকবির ন্যায় উচ্চতর ভাবসকল প্রকাশ করিতে পারেন নাই', এবং 'ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতায় নির্লজ্জতা-প্রতিপাদক আদি-রস বর্ণনার আধিক্য দৃষ্ট হয়।' রঙ্গলালের মতে, এর জন্য অবশ্য কবি সম্পূর্ণ দায়ী নন; আসল দায়িত্ব সমকালীন সমাজের এবং জাতীয় চরিত্রের। দুর্ধর্ষ দুঃসাহসী জাতির মধ্যেই মাত্র ভয়ানক-রস ও রৌদ্র-রসের আধিক্য দেখা যায়। বলাবাহুল্য বাঙালি-জাতি ঐ দুই রসের রসিক নয়। এমনকি, পূর্বের স্বাধীন ভারতের জাতীয় ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতেও 'ইংরেজীতে যাহাকে ট্রেজডি কহে' তা নেই। 'তবেই বলিতে হইল, কামকলাকলিতা কবিতা রচনা করাতে ভারতচন্দ্রের কিছুই দোষ নাই।'

যুগরুচির দাসত্ব কি কেবল এই অভাগা দেশেই দেখা যায়, অন্যত্র নয়? রঙ্গলাল ইউরোপীয় দৃষ্টান্ত দিয়েছেন :

"রোমীয় সম্রাটের সভাতে টেরেন্স নামক কবির নির্লজ্জ নাটক-সকল যে-সময়ে প্রদর্শিত হইত, সে সময়ে তত্তাবৎ ঘৃণাকর বোধ হইত না, এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অদ্যাপি সুসভ্য ইংলণ্ডীয়-দিগের ওয়েস্ট মিনিস্টর ডরমিটরি নামক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সে সকল নাটক সম্ভ্রান্ত-সমাজে দেখাইয়া থাকেন।"

রসে রঙ্গে উচ্ছল এখন রঙ্গলাল ঃ

"যে দেশের মানুষ উলঙ্গ, সে দেশের সকলই উলঙ্গ। অতএব আগে ডাক্তর [গুডিভ ?] চক্রবর্ত্তী সাহেবের পরামর্শ লইয়া তাঁহার ন্যায় এতদ্দেশীয় লোকেরা জ্যাকেট পাণ্টালুন পরিধান করুন, তাহা হইলে কাজে কাজেই আমাদিগের কবিতা-সতী বিলাতীয়া বরাঙ্গনাদিগের ন্যায় সভ্যতার পেটিকোট পরিবৃতা হইয়া লজ্জার ঘোমটায় চারু চন্দ্রানন আবৃত করিয়া পিগাসস্-নামক ইউরোপীয় তুরঙ্গোপরে আরোহণ করতঃ মনুষ্যের চিত্তরূপ গড়ের মাঠে বায়ুসেবন করিতে যাইবেক।"

তারপর রঙ্গলাল বিলাতী ঘোমটা কিছু খুলে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন :

"বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু কহেন, 'বাংলাভাষার কবিতা কবিতাই নহে, তাহা লজ্জাহীনতা এবং কুভাব-নিকরের জননীস্বরূপা, সুতরাং তৎসহবাসে মানবপ্রকৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দাসী হইতে পারে।' আরো কহেন, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এমত জঘন্য এবং নির্লজ্জ যে, তাহার সহিত ইংরাজদিগের ফেনী হিল নামক অতি অপকৃষ্ট গ্রন্থ (যাহার নামোল্লেখ করিলে ব্রীড়ানম্রমুখ হওয়া যায়) সেই গ্রন্থের যথার্থ তুলনা হইতে পারে ইত্যাদি। কৈলাসবাবু হিন্দু কুলস্ত্রীদিগের চিত্ত সংশোধনের বিশেষ প্রতিষেধক বিদ্যাসুন্দরকে চিতানলে সমর্পণ করিতে চাহেন, অর্থাৎ আর যেন তাহারদিগের রঙ্গরস দেখিয়া কুলকামিনীকুল কুভাবজালে জড়িত না হয়। কিন্তু প্রিয় বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করি, যদ্যপি ইংরাজি নিয়মে আমারদিগের কুলজাদিগকে বিদ্যাবতী করিতে চাহেন, তবে যাহার সহিত অভাগা বিদ্যাসুন্দরের তুলনা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থখানি দগ্ধ করিয়া শেষ করিবার কি উপায় দেখিতেছেন ? বৃটিশ গবর্নমেণ্ট আমেরিকার সংযুক্ত প্রজাপ্রভুত্ব-রাজ্য নহে যে, তদধীন রাজ্যে এবম্প্রকার গ্রন্থসকল প্রকাশ করিলে রাজদণ্ড প্রাপ্ত হইতে হয়, অদিচ যে কুৎসিত গ্রন্থের নামোল্লেখ করিতে কৈলাসবাবু সলজ্জিত হইয়াছেন, সেই

গ্রন্থখানি কোন্ ভদ্র সাহেব, বিবির কেলিকুঠিরে রক্ষিত না হয়?"

তাই বলে কি 'ফেনী হিলে'র মতো কদর্য উপন্যাসের সঙ্গে রঙ্গলাল বিদ্যাসুন্দরের তুলনা করেছেন? আরে ছি! তিনি কেবল বলতে চান, নির্লজ্জতায় বিদ্যাসুন্দরকে অধোবদন করাবার মতো অনেক রচনা ইংরাজিতে আছে। তিনি 'লক, হড্‌সন, মার্লো এবং মার্সডন্ প্রভৃতি ইতর কবিদিগের' রচনাকে এখানে তুলনার যোগ্য মনে করেন নি—একেবারে চূড়ো ধরে টান দিয়েছেন, স্বয়ং শেক্সপীয়ারের পাণ্টালুনে টান, যাঁর ভাবসোহাগে ইয়ংবেঙ্গলবাবুরা ভরপুর। শেক্সপীয়ারের সতীত্ব, এঁদের কাছে, মহাভারতের সত্যবতীর কুমারীত্বের মতো, পরাশর-বরে সদা-রক্ষিত। অপূর্ব সরস বিদ্রূপ রঙ্গলালের:

> ইংরাজেরা যত্রতত্র যে-শেক্সপীয়ারের জ্ঞাতি বলিয়া আপনাদিগকে ধন্য মানেন, সেই শেক্সপীয়ারের বীনস্ এবং এডোনিস নামক কাব্যসহ তুলনায় বিদ্যাসুন্দরে কি অধিক নিকৃষ্টতা আছে? আমি [যদি]···বিলাতী কাব্যপর্বতের সর্বোচ্চ চূড়াবলম্বী শেক্সপীয়ারের নির্লজ্জতার সহিত বাঙালি কবিদিগের অগ্রগণ্য ভারতচন্দ্রের নির্লজ্জতার তুলনা করি, বিজ্ঞবর সভাপতি মহোদয়, আমার এই নির্লজ্জতা জন্য ক্ষমা করিবেন। যেখানে আমি লজ্জাবিহীনা বাঙ্গালা কবিতার পক্ষ, সেখানে লজ্জাহীনতাই আমার পতাকা হইয়াছে।"

অতঃপর রঙ্গলাল 'ঘোরতর কামাতুর লম্পটের যথার্থ আদর্শ'-স্বরূপ 'বীনস এবং এডোনিস' কাব্য, ভদ্র ইংরাজমহলে যার প্রভূত সমাদর—তার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের 'নির্লজ্জতার কিঞ্চিৎ তুলনা' করেছেন উপযুক্ত উদ্ধৃতিসহ, বলাবাহুল্য সেসব অংশ আমি পুনরুদ্ধৃত করতে চাই না, অর্থাৎ এখানে আমি কিঞ্চিৎ লজ্জারক্ষা করতে চাই, কিন্তু তাই বলে রঙ্গলালের সুমধুর প্রসঙ্গশেষ-বাক্যটি উপস্থিত করব না কেন?—

> "এইক্ষণে আমি আপনারদিগের সম্মুখে এক বাক্স রিয়েল লণ্ডন-বেকেড্ সুইটমীট এবং এক খুঞ্চে আসল কৃষ্ণনগুরে সরভাজা উপস্থিত করিলাম, আপনারদিগের অভিরুচি, যাঁহার যাহাতে ইচ্ছা তাহাই গ্রহণ করুন। কিন্তু এই কথা যেন মনে

থাকে, বিলাতী-মেঠাই হজম করিতে ভাল কাষ্টিলিয়ন লাল জলের আবশ্যক, সরভাজা [পরি]পাকে নির্মল খাড়য়া নদীর এক পাত্র জলই যথেষ্ট হইবেক।”

শেক্সপীয়রকে খুলে দেখিয়েই রঙ্গলাল ক্ষান্ত হলেন না, যেহেতু তাঁর ‘প্রিয় প্রতিযোগী’ কৈলাসচন্দ্র বলতে পারেন, ‘ইংলণ্ডীয় কবিতা বৃদ্ধাকালে তপস্বিনী অর্থাৎ সদাচারশালিনী হইয়াছেন।’ সুতরাং তাঁকে ‘ইংরেজী কবিতার…সাধ্বীত্বের প্রমাণ’ যেখানে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে সেই ‘লার্ড বাহাদুর বাইরনের’ ডনজুয়ান কাব্যের অংশবিশেষের উল্লেখ করতে হয়েছিল। কৈলাস বসু-বাবু তাঁর বক্তৃতায় শ্রোতাদের হাসাবার চেষ্টাও করেছিলেন—বিদ্যার রূপবর্ণনার ইংরেজি অনুবাদ শুনিয়ে। ঐ রূপবর্ণনার দ্বারা বিদ্যা-বিনোদিনী বসু-বাবুর কাছে ভয়ঙ্করী নিশাচরী বলে প্রতীয়মান হয়েছিলেন, বিশেষতঃ যেখানে সাপিনীর সঙ্গে তাঁর বেণীর তুলনা করা হয়েছে। রঙ্গলাল মিষ্ট পরিহাস করলেন :

“হিন্দু কামিনীগণ কালসর্পাকারে বিনোদ বেণী বিনাইয়া থাকেন, প্রিয় সখা কি তাহা দেখেন নাই ? অহো, দেখিয়েছেন বই কি ! তবে বুঝি ইংরাজি বিদ্যাপ্রভাবে তেঁহ খাটো-খাটো রাঙ্গা চুলের প্রিয় হইয়া থাকিবেন !”

বিদ্যার রূপবর্ণনায় কবির অতিশয়োক্তি নিন্দনীয়, কৈলাস বসুর অভিমত। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর মত---ওহেন উচ্ছ্বাস আপত্তিকর নয় যদি কোনো প্রেমিক প্রেমপ্রকোপে তা করে। রঙ্গলাল বললেন, বটে! বটে ! ‘কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, উক্ত মহাকবি [শেক্সপীয়ার] স্বীয় উক্তিতে লুক্রিশিয়ার পয়োধরের সহিত দন্তিদন্তনির্মিত যুগল ভূগোলের তুলনা করিয়া যদ্যপি নিস্তার পান, তবে অভাগা ভারতচন্দ্র কিজন্য এত গালাগালি খান ?’

রঙ্গলালের চূড়ান্ত রসিকতা এর পর—যখন তিনি বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৌন্দর্যবোধের পার্থক্য বাইবেলীয় দৃষ্টান্তযোগে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। অন্য কোনো গ্রন্থ নয়—স্বয়ং সাক্ষাৎ বাইবেল—ইউরোপীয় পণ্ডিতদের নিকট ‘যার কবিত্ব, অতি সুন্দর অলঙ্কার এবং যথার্থ মানসিক

ভাবসমন্বিত বলিয়া' নিরূপিত। রঙ্গলালের কাছে কিন্তু এই গ্রন্থের উপমাগুলি 'জঘন্য' বলে মনে হয়েছে। 'খ্রীষ্টিয়ানদিগের ধর্মপুস্তকে কিরূপ কবিতাশক্তি মূর্তিমতী আছেন' দেখিয়ে দেবার জন্য তিনি 'বায়বেলের' অংশ উদ্ধৃত করেছেন—তারই অংশ আবার আমি তুলছি, প্রথমতঃ এই জন্য যে, যাবার পথে একটু ঘুরে গেলে যদি সুন্দর একটা উপবন দেখা যায়, ঘুরে যাওয়াই উচিত; দ্বিতীয়তঃ আবও দেখিয়ে দেবার জন্য— কেবল ভারতীয় কবিরাই নন, অন্য দেশের প্রাচীন কবিদের অলঙ্কারেও বাস্তবচ্যুতির দোষ যথেষ্ট আছে। অথ 'বায়বেল'—

"হে আমার প্রিয়ে, তুমি সুন্দবী ও তুমি পরম সুন্দরী; ঘোমটাব মধ্যে তোমার চক্ষু কপোতের চক্ষুর ন্যায়, এবং গিলিয়দের পার্শ্বে চরে এমত ছাগপালের ন্যায় তোমার কেশ। এবং যে২ মেষী পুষ্করিণী হইতে ধৌতা হইয়া আগতা ও যমজবৎসবিশিষ্টা হয়, এবং যাহাদেব মধ্যে একও বন্ধ্যা নাই, এমত ছিন্নলোম মেষপালের ন্যায় তোমার দন্ত। এবং সিন্দূববর্ণ সূত্রের ন্যায় তোমার ওষ্ঠাধব, ও তোমার বাক্য অতি মনোহর, ও তোমার ঘোমটার মধ্যস্থিত গণ্ডদেশ দাড়িম্বখণ্ডের ন্যায়। এবং অস্ত্রাগারের নিমিত্তে নির্মিত একসহস্র বলবানের ঢালবিশিষ্ট দায়ূদের দুর্গের ন্যায় তোমার গলদেশ। এবং শোশন্ পুষ্পের মধ্যে ভক্ষণকারী মৃগের দুই যমজ বৎসের ন্যায় তোমার দুই স্তন।...

"হে রাজকন্যে, তোমার চরণ পাদুকাদ্বারা কিবা শোভা পাইতেছে! তোমার কটিমণ্ডল নিপুণ কর্মকারদ্বারা নির্মিত মণিময় হারস্বরূপ। এবং তোমার নাভিদেশ মিশ্রিত দ্রাক্ষারসে পরিপূর্ণ এক গোল পাত্রের ন্যায়, এবং তোমার উদর শোশন্ পুষ্পবেষ্টিত গোধূমরাশির ন্যায়। এবং তোমার স্তনদ্বয় যুগল হরিণবৎসের ন্যায়। এবং তোমার গলদেশ হস্তিদন্তময় উচ্চগৃহের ন্যায়। এবং তোমার চক্ষু বৈৎরব্বীমের দ্বারের নিকটস্থ হিশ্‌বোনের সরোবরের ন্যায়, এবং তোমার নাসিকা দম্মেষকের সম্মুখস্থ লিবানোনের উচ্চগৃহের ন্যায়। এবং তোমার মস্তক কর্মিল পর্বতের ন্যায়,

ও তোমার মস্তকের বেণী বাগুনীয়া রঙ্গের কেশবন্ধনীর ন্যায়। তোমার কেশবেশেতে রাজা বদ্ধ আছে।”

“হে প্রিয়ে, তুমি প্রেমদ্বারা সন্তোষ দিবার জন্য কেমন সুন্দরী ও মনোহারিণী! তোমার দীর্ঘতা তালবৃক্ষের ন্যায় ও তোমার স্তন তাহার ফলস্বরূপ। আমি কহিলাম, আমি তালবৃক্ষে আরোহণ করিব এবং তাহার বাগুড়া ধরিব; এখন তোমার স্তন দ্রাক্ষা-ফলের গুচ্ছস্বরূপ ও তোমার নাসিকার গন্ধ তপুহ ফলের ন্যায়। যে উত্তম দ্রাক্ষারস পান করা প্রিয়ের সুখদায়ক হয় ও তন্দ্রায়ুক্ত লোককে কথা কহায়, তাহার ন্যায় তোমার কথা—।”

হরচন্দ্র দত্ত ভারতচন্দ্রের সমালোচনায় একটা বড় কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন—ভারতচন্দ্র কামকর্দম অনেক ঘেঁটেও যথার্থ প্যাশন্ আনতে পারেননি। তার উত্তর দিচ্ছেন রঙ্গলাল:

“যথার্থ কবির যথার্থ চিহ্ন যথার্থ বর্ণন। অর্থাৎ কবি যে-বিষয়ে বর্ণনা করিবেন, সে বিষয় পাঠ করিতে করিতে বোধ হই-বেক, যেন তাহা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হইতেছে, ‘Thoughts that breathe and words that burn.’ ভারতচন্দ্র রায়ের গাথায় শ্বাস-প্রবহন এবং ভাবজালে অনল প্রভবন হইয়াছে কি না, তাহা রতিবিলাপ এবং বিদ্যাসুন্দরের পূর্বরাগ অর্থাৎ প্রথম মিলনের পূর্বাবস্থা পাঠ করিলেই প্রমাণীকৃত হইবেক, আমারদিগের ইয়ং বেঙ্গাল-বাবুরা যদি বিলাতীয় বিজাতীয় কুসংস্কার এবং দ্বেষ-মৎসরতা পরিত্যাগপূর্বক উক্ত বর্ণনাসকল পাঠ করেন, তবে তত্তাবতে লার্ড বাইরনের ন্যায় প্রখর ভাবসমূহ দেখিতে পাইবেন।”

রঙ্গলাল তাঁর প্রবন্ধমধ্যে বারবার আবেদন করেছিলেন—দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ইয়ংবেঙ্গল-বাবুদের প্রীতি জেগে উঠুক, কণ্ঠে কণ্ঠে তুলুক ‘বাঙ্গালা কবিতাহার।’ সে ডাকে যাঁরা সাড়া দেবেন তাঁরা দেশের সুসন্তান। আর যাঁরা সাড়া দেবেন না, যাঁরা মনে করবেন তাঁরা এমনই ইংরেজি শিখে ফেলেছেন যে, ইংরেজিতে কবিতা লিখে উক্ত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলবেন, তাঁদের জন্য রঙ্গলালের শেষ ছুরিকাঘাত:

"আপনারদিগের মধ্যে অনেকে অনায়াসে প্রাপ্য স্বদেশীয় শস্যকে ঘৃণা করিয়া বিলাতী ফসল ফলাইতে যান, অথচ বিবেচনা করেন না, যেরূপ বকুলবৃক্ষে আম্রমুকুল উদয় হয় না, সেইরূপ বাঙ্গালি কর্তৃক ইংরাজি কবিতা অথবা ইংরাজ কর্তৃক বাঙ্গালা কবিতা রচনা অসম্ভব হয়। যদি বলেন—বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, এবং রাজনারায়ণ দত্ত প্রভৃতি বাবুরা যে-সকল ইংরাজি কবিতা রচনা করিয়াছেন, সে-সকল কবিতা কি কবিতা হয় নাই? উত্তর—হইয়াছে, হইবেক না কেন, অশ্বতর শব্দের অগ্রে কি অশ্ব শব্দ যোজিত নাই?"

॥ ১১ ॥

ভারতচন্দ্রের ওপরে আক্রমণকে কিন্তু রঙ্গলাল নিবারণ করতে পারলেন না, ক্রমেই তা বেড়ে চলল। রঙ্গলাল তাঁর প্রবন্ধের জন্য কেবল প্রশংসা নয়, নিন্দাও শুনেছিলেন, বাংলাসাহিত্য-প্রেমিকদের কাছ থেকেই। ঈশ্বর গুপ্তের 'ভারতচন্দ্র'-এর বিষয়ে আলোচনাকালে ১৮৫৬-তে রাখালদাস হালদার (যিনি, ডঃ সুকুমার সেনের মতে, ঈশ্বর গুপ্তের মতোই ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ করেছিলেন) রঙ্গলালের সমালোচনা করেন এই বলে যে, শেক্সপীয়রের দোষ দেখিয়ে ভারতচন্দ্রের দোষস্খালন করা যায় না। রাখালদাস ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার কঠোর নিন্দা করেন।[৫১]

৫১। "অন্নদামঙ্গল নির্দোষ গ্রন্থ নহে। ব্যক্ত অশ্লীলতা তাহার মহৎ দোষ। ঘৃণা ব্যতিরেকে বিদ্যাসুন্দরের এক এক অংশ পাঠ করা যায় না। ইংরাজদের মধ্যে জগন্মান্য শেক্সপীয়ার প্রভৃতি কবিরা অভিহিত অশ্লীলতা দোষে দূষিত ছিলেন বটে কিন্তু তজ্জন্য তাঁহারা নিন্দনীয় ব্যতিরেকে প্রশংস্য হয়েন নাই। এতদ্দেশীয় একজন লেখক [রঙ্গলাল] ইউরোপীয় কবিদের দোষ দেখাইয়া ভারতচন্দ্রের দোষ খণ্ডনে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন, সেই কারণেই আমরা একথা উল্লেখ করিতেছি।" [রহস্য সন্দর্ভ, প্রথম পর্ব, সংবৎ ১৯২০, পৃঃ ১৩৯। ডঃ সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' ১ম, অপরার্ধ-এ উদ্ধৃত]

সিপাহী-যুদ্ধ বোধহয় ভারতচন্দ্রকে কয়েক বৎসরের জন্য কিছুটা অব্যাহতি দিয়েছিল, সত্যকার সমর প্রণয়সমর থেকে সকলের মন কিছুটা হয়ত সরিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু তার পরে যখন মহারাণী মহামাতা স্বহস্তে ভারতসাম্রাজ্যের ভার তুলে নিয়ে নিশ্চিন্ত করলেন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের, এবং নির্বিঘ্নে কলাচর্চা করবার মত মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য তাঁরা পেলেন, তখন দেখা গেল, একদিকে সংস্কার-আন্দোলনের কল্যাণে দেশে নীতি-প্রীতি যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে, ও অশ্লীল বিষয়াদি সম্পর্কে 'জানি কিন্তু বলব না' বলবার মত শুদ্ধশীলতা অনেকে আয়ত্ত করেছেন, অন্যদিকে, বাংলাসাহিত্য সত্যই সৃষ্টিশীল হয়েছে। এই সৃষ্টিক্ষম সাহিত্যিকদের মধ্য থেকে যখন ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে শরক্ষেপ হতে লাগল, তখন তাঁর সত্যই দুর্দিন এল। নব্যবাংলার প্রথম বিরাট কবি মধুসূদনের মনোভাবের কথা বলেছি, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কথাও, এর সঙ্গে এবার যুক্ত করব তৎকালীন বাংলার সবচেয়ে প্রভাবশালী লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যকে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পূর্বোক্ত 'বেঙ্গলী লিটারেচর' (১৮৭১) প্রবন্ধটিতে ভারতচন্দ্রকে নিতান্ত অবজ্ঞার সঙ্গে বরখাস্ত করেছেন। তাঁর মতে, ভারতচন্দ্রের কাব্যে উচ্চতর মানবিক গুণ নেই, চরিত্রসৃষ্টি নেই, সৃষ্টি বলতে এক হীরা মালিনী, সত্যই সজীব, বাংলাসাহিত্যে অতুলনীয়। ভারতচন্দ্রের ছন্দ অবশ্য প্রশংসাযোগ্য, তা আধুনিক কবিদের দ্বারা অনুকৃত হয়, এবং তিনি আধুনিক বাংলাভাষার জন্মদাতা। শেষোক্ত অংশেই বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বোচ্চ প্রশংসা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে। নচেৎ ঐ ঘৃণ্য অশ্লীলতা! বাঙালি পাঠকসমাজের সমস্ত অংশ যখন মদ্দা চোয়াড়ে নয় (হায় পুরুষজাতি!), তার মধ্যে রমণীয় কোমল অংশও আছে (আহা অঙ্গনা!), তখন ঐ কাব্য পুনর্মুদ্রণের যোগ্য নয়।[৫২]

৫২। "Bharat Chandra is chiefly known by his *Vidya Sundara* and his *Annada Mangal*. Neither work has much merit, though an exception must be made in favour of the character of Hira, the flower-girl, a coarse but racy and vigorous por-

এই প্রথম, কিন্তু শেষ নয়। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতচন্দ্রের উপরে বিস্তারিত মন্তব্য না করলেও ছিটেফোঁটা যা বলেছেন, তাতেই যথেষ্ট প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা। কৈশোরে তিনি ভারতচন্দ্রের প্রভাবাধীন ছিলেন, সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত তাঁর বাল্য-রচনাগুলিতে তার পরিষ্কার নিদর্শন আছে, কিন্তু সেই প্রভাব কাটিয়ে ওঠার দ্বারাই বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র হয়েছিলেন, সেজন্য আদি প্রলোভনের প্রতি তাঁর মনে ধিক্কার ছাড়া আর কিছু ছিল না। স্থূল বা অশালীন জিনিস সম্বন্ধে তাঁর পরবর্তী ত্রাসপূর্ণ সংকোচের একটি অনবদ্য রেখাচিত্র রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন জীবনস্মৃতিতে—এক সামাজিক সম্মেলনে জনৈক পণ্ডিতের সংস্কৃত শ্লোকব্যাখ্যায় ইতর রসাধিক্য ঘটবার সম্ভাবনা দেখা গেলে, হাত দিয়ে মুখ চেপে সেইস্থান থেকে বঙ্কিমচন্দ্র দ্রুত পলায়ন করেছিলেন। আমরা এখানে যোগ করে দিতে পারি, সর্বত্রই বঙ্কিমচন্দ্র পলায়ন করেন নি (বা অল্পক্ষেত্রে তা করেছেন)—প্রতিআক্রমণ

---

trait, not equalled by anything of its kind in Bengali. One other great distinction, however, must be accorded to Bharat Chandra. He is the father of modern Bengali. His versification, too, is very good, and it is the model followed by many distinguished poets of the present day, as for instance, Babu Ranga Lal Banerji. In the higher attributes of a poet, Bharat Chandra is far inferior to many who have preceded and followed him. His works are disfigured, too, by a disgusting obscenity which unfits him for republication at a time when Bengali readers are not all of the rougher sex."

ভারতচন্দ্রের তথাকথিত অনুকারীদের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র স্বতঃই আরও কঠোর :

"There is perhaps nothing more lamentable in the whole history of literature than the school of Bengali writers who followed…there is scarcely any readable work…belonging to that age—the age of *Naba Babu Bilas* and the *Probodha Chandrika*; as for literary filth, there never was a more copious supply. Happily, the whole mass of rubbish has vanished from public recollection."

যথেষ্ট, এবং তাঁর অন্যতম আক্রমণলক্ষ্য ভারতচন্দ্র, সেইসঙ্গে জয়দেব —যে-দুইজন বাঙ্গালি-কবি, তাঁর মতে, পাঁপের জীবনকে করেছেন রূপের প্রতিমা।

ভারতচন্দ্র বা জয়দেব উপলক্ষ, লক্ষ্য বৃহত্তর—বাঙালি-সমাজের ব্যাপক অশ্লীলতা। বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞানে-কর্মে বলীয়ান, আদর্শবাদী এক জাতির উত্থান চাইছিলেন, যার জন্য প্রয়োজন মানসিক সুস্থতার, বাঙালি-জীবনে তখন যার খুবই অভাব। বাঙালির মধ্যে অশ্লীলতার সমাদর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বহুবার অভিযোগ করেছেন, দুবার খুবই বিস্তারিতভাবে ; এক—'অশ্লীলতা' প্রবন্ধে (পৌষ ১২৮০)[৫৩ক], দুই—'ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ—ভূমিকা' প্রবন্ধে।

বাংলাদেশে একটি অশ্লীলতা-নিবারণী সভা স্থাপিত হওয়ায় নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—প্রথম প্রবন্ধটি সেই উপলক্ষে লিখিত। উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ, স্বচ্ছ ও দৃঢ় চিন্তার ফসল, সাহিত্যে অশ্লীলতা-সমস্যা সম্বন্ধে বাংলায় লেখা প্রবন্ধমধ্যে শীর্ষস্থানীয়। একশো বছর আগে লেখা এই প্রবন্ধ বক্তব্যে ঠিক বর্তমানেও আশ্চর্যভাবে আধুনিক। এর মধ্য থেকে আমি কেবল বাঙালি-সমাজে প্রসারিত অশ্লীলতা সম্বন্ধে বঙ্কিমের কিছু কথা উদ্ধৃত করছি :

> "অশ্লীলতা বঙ্গদেশীয়দিগের জাতীয় দোষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা ইহা অত্যুক্তি বিবেচনা করিবেন, তাঁহারা বাঙালির রহস্য, বাঙালির গালি, নিম্নশ্রেণীর বাঙালি-স্ত্রীলোকের কোন্দল, এবং বাঙালির যাত্রা, কবি-পাঁচালী মনে ভাবিয়া দেখুন। মুহূর্ত-জন্য বাঙালি-কৃষকের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া দেখুন—বাঙালির প্রণীত যে সকল কাব্যগ্রন্থ সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত, তাহা পাঠ করিয়া দেখুন। বাঙালির চরিত্রে অশ্লীলতার ন্যায় কোনো দোষই সর্বব্যাপী নহে।"[৫৩খ]

৫৩ক। প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে পৌষ ১২৮০-তে বেরোয়। লেখকের নাম ছিল না। ভাষা রীতি ও বক্তব্যে এটি কোনো সন্দেহ না রেখে বঙ্কিমচন্দ্রের।

৫৩খ। 'ঈশ্বর গুপ্ত' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র একই কথা বলেছেন : →

শিক্ষাবিস্তারেই যে অশ্লীলতার নাশ হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তা মানেন নি। সেক্ষেত্রে অনেকসময় ব্যক্ত-অশ্লীলতার স্থান নেয় গুপ্ত-অশ্লীলতা। এবং খুবই মারাত্মক, অল্পশিক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, যাদের চাহিদা মেটাতে সুযোগসন্ধানী লেখকেরা তেলেভাজা-চাটের সঙ্গে গাঁজানো রসের কারবার খুলে বসে।

বঙ্কিমচন্দ্র এই রচনায় অসচেতন অশ্লীলতার সঙ্গে সচেতন অশ্লীলতার প্রভেদ করেছেন: 'এমন লোক আমরা দেখিয়াছি যে, তাঁহাদের কথোপকথন অশ্রাব্য এবং চরিত্র অনুকরণীয় এবং পবিত্রতায় অতুল্য।'[৫৪] দেশভেদে অশ্লীলতার রূপভেদের কথা বঙ্কিম অবশ্যই জানতেন,[৫৫]

"সেকালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না। যে কথা অশ্লীল নহে, তাহা সতেজ বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল। চোর, কবি, চোর পঞ্চাশৎ দুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া লিখিবেন—বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে—দুই পক্ষে সমান অশ্লীল। তখন পূজা-পার্বণ অশ্লীল, উৎসবগুলি অশ্লীল, দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্র বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালী হাফ-আকড়াই অশ্লীলতার জন্যই রচিত।"

৫৪। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আরো বলেছেন:

"কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা, রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে। ঋষিরাও এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন। সেকালের বাঙালিদিগের ইহা একপ্রকার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। আমি এমন অনেক দেখিয়াছি, অশীতিপর বৃদ্ধ, ধর্মাত্মা, আজন্ম সংযতেন্দ্রিয়, সভ্য, সুশীল, সজ্জন, এমন সব লোকও, কুকাজ দেখিয়াই, রাগিলেই 'বদ্‌জোবান' আরম্ভ করিতেন। তখনকার রাগ প্রকাশের ভাষাই অশ্লীল ছিল। ফলে সে সময়ে ধর্মাত্মা এবং অধর্মাত্মা উভয়কেই অশ্লীলতায় সুপটু দেখিতাম—প্রভেদ এই দেখিতাম, যিনি রাগের বশীভূত হইয়া অশ্লীল, তিনি ধর্মাত্মা। যিনি ইন্দ্রিয়ান্তরের বশে অশ্লীল, তিনি পাপাত্মা।"

৫৫। রঙ্গে ব্যঙ্গে বঙ্কিম-রচনা:

"ইংরেজের কাছে প্যানটালুন বা উরুদেশের নাম অশ্লীল—ইংরেজের মেয়ের

এবং তিনি যে নিতান্ত সংকীর্ণচিত্ত নন, বোঝা যায়, যখন বলেন, 'এমন অনেক কাব্য আছে যে, তাহা অশ্লীলতার দোষযুক্ত হইলেও মনুষ্যবুদ্ধি-সৃষ্ট রত্নের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া চিরকাল আদরে রক্ষণীয়। কোনো কোনো স্থানে অশ্লীলতা কাব্যের উৎকর্ষপক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া ওঠে। যিনি একথা হঠাৎ বুঝিতে পারিবেন না, তিনি দুর্যোধনের সভায় দ্রৌপদীর কথা, মহাভারতে পাঠ করিবেন।' এবং সতর্ক করে এমন কথাও তিনি বলেছেন, অশ্লীলতা-নিবারকগণ যেন সেই মালীর মতো না হন, যে-ব্যক্তি বাগান পরিষ্কার করার সময়ে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ফুলগাছকে উৎপাটিত করেছিল এবং স্বকার্যসমর্থনে বলেছিল, 'নহিলে জঙ্গল সাফ হয় না।'

কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধুতি পায়জামা বা উরু শব্দগুলিকে অশ্লীল মনে করি না।...পক্ষান্তরে স্ত্রী পুরুষে মুখচুম্বনটা আমাদের সমাজে অতি অশ্লীল ব্যাপার! কিন্তু ইংরেজের চক্ষে উহা অতি পবিত্র কার্য—মাতৃপিতৃসমক্ষেই উহা নির্বাহ পাইয়া থাকে। এখন আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা দেশী জিনিস সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি,...দেশী সুরুচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী সুরুচি গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষিত বাঙালি এমনও আছেন যে, তাঁহাদের পরস্ত্রীর মুখচুম্বনে আপত্তি নাই, কিন্তু পরস্ত্রীর অনাবৃত চরণ, আলতাপরা মলপরা পা দর্শনে বিশেষ আপত্তি।...মেঘদূতের একটি কবিতায় কালিদাস কোনো পর্বতশৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতী রুচিবিরুদ্ধ। স্তন বিলাতী রুচি অনুসারে অশ্লীল কথা। কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অশ্লীল। নব্যবাবু হয়ত ইহা শুনিয়া কানে আঙুল দিয়া পরস্ত্রীর মুখচুম্বন ও করস্পর্শের মহিমাকীর্তনে মনোযোগ দিবেন।...

"আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি, এইরূপ বিলাতী রুচির অধীনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি, কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মস্থর জোলার নবেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, আর যাঁহারা রামায়ণ, কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, সীতা, শকুন্তলা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অশ্লীল!...কি শিক্ষা!" [পূর্বোক্ত প্রবন্ধ]

বলাবাহুল্য বাল্মীকি, কালিদাস যে ছাড় বঙ্কিমের হাতে পেয়েছেন, ভারতচন্দ্র তা পাননি।

ঈশ্বর গুপ্ত প্রচুর অশ্লীল লিখেছেন; বঙ্কিমের মতে, তিনি বদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত নন, যা ছিলেন—ভারতচন্দ্র :

"ঈশ্বর গুপ্ত যখন অশ্লীল তখন কুরুচির বশবর্তী হইয়াই অশ্লীল, ভারতচন্দ্রাদির ন্যায় কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া অশ্লীল নহেন।"

ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কোনো বিদ্বেষবশে এই অভিযোগ করেন নি, বুঝতে পারি, যখন দেখি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মহাকবি জয়দেব গোস্বামীর বিরুদ্ধেও একই কথা বলতে তিনি দ্বিধান্বিত নন কালিদাসকেও অব্যাহতি দেননি। সুতরাং এক্ষেত্রে তিনি মোটেই হালকা মেজাজে ছিলেন না—দীর্ঘকালপুষ্ট ধারণাকেই ব্যক্ত করেছিলেন।

বঙ্গদর্শনের পৌষ ১২৮০ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র 'মানসবিকাশ' বলে একটি প্রবন্ধ লেখেন ('মানসবিকাশ' নামক কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা-সূত্রে রচিত; পরে মার্জিত আকারে 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' নামে 'বিবিধ প্রবন্ধে'র অন্তর্ভুক্ত)—তার মধ্যে গীতিকাব্যের লক্ষণাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন এবং জয়দেবকে 'বাঙ্গালার সর্বোৎকৃষ্ট কবি'-রূপে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে, ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'ও গীতিকাব্য,[৫৬] 'যদিও রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীতি এমন আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই।' তারপরে ব[ঙ্ক]িম বাংলায় গীতিকাব্য-প্রাধান্যের পিছনে নিসর্গপ্রকৃতির ভূমিকার কথা বলেছেন: 'তাপ অসহ্য, বায়ু জল বাষ্পপূর্ণ, ভূমি নিম্ন, এবং উর্বরা, তাহার উৎপাদ্য অসার, তেজোহানিকর ধান্য।' তার প্রভাবে বাঙালি-প্রকৃতি, 'কোমলতা-

---

৫৬। নবীনচন্দ্র সেনের অবকাশরঞ্জিনীর সমালোচনাসূত্রে লেখা গীতিকাব্যে'র মধ্যে (ঐ নামে 'বিবিধ প্রবন্ধের' অন্তর্ভুক্ত হয়) বঙ্কিমচন্দ্র পুনশ্চ বলেছেন: "বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমবাবুর কবিত[াব]লী, ইহাই বাংলাভাষার উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। অবকাশরঞ্জিনী আর একটি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।" গ্রন্থের পাদটীকায় বঙ্কিম জানিয়েছেন, প্রবন্ধটি লেখার কালে "রবীন্দ্রবাবুর কাব্যসকল প্রকাশিত হয় নাই।" →

ময়ী, আলস্যের বশবর্তিনী এবং গৃহসুখাভিলাষিণী।' সাহিত্যের ক্ষেত্রে, 'এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্টি হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ।' এহেন গীতিকাব্য প্রণেতারাও বাংলাদেশে আবার দুই শ্রেণীর—এক শ্রেণীতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, অন্য শ্রেণীতে অন্তঃপ্রকৃতির। জয়দেব প্রথম শ্রেণীর, বিদ্যাপতি (বিদ্যাপতি তখনো বাঙালি, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তখনো তাঁকে বিহারী করে তোলেন নি) দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি। বঙ্কিমচন্দ্র এর পরে জয়দেব ও বিদ্যাপতির তুলনামুখে যা লিখেছিলেন, বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা স্মরণীয় রচনা, যদিও ভ্রান্তভিত্তির উপরে স্থাপিত, কারণ পরে-আবিষ্কৃত বিদ্যাপতির বহু পদে দেখা যায়, তিনি সম্ভোগের ক্ষেত্রে জয়দেবকে শিক্ষা দেবার ক্ষমতা ধরতেন। বিদ্যাপতির গোটা চেহারা দেখার সুযোগ বঙ্কিমচন্দ্রের হয়নি, ধরে নেওয়া যেতে পারে, যদিও একই কালে, অক্ষয়কুমার সরকারের বিবেচনায় (দ্রঃ 'তুলনায় সমালোচন', বঙ্গদর্শন বৈশাখ, ১২৮০), 'বিদ্যাপতির কবিতার সকলগুলিই আদিরসময়ী, আদিরসোদ্দীপিকা।'

উল্লিখিত জয়দেব ও বিদ্যাপতির তুলনা :

"জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য। জয়দেব, বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের

রসমঞ্জরীকে উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য বলা বিস্ময়কর। বিরাট প্রতিভাধর ব্যক্তিও কিভাবে কতকগুলি দৃঢ়বদ্ধ ধারণার (যার সবগুলি বিচারসহ নয়) দাসত্ব করেন, তার দৃষ্টান্ত এখানে পাওয়া যায়। অন্নদামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের ধুয়া-গানগুলির মতো সেরা গীতিকবিতাগুলির রসগ্রহণে বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থ ছিলেন না বিশ্বাস হয় না, কিন্তু বোধহয় তাঁর ভয় ছিল, যদি তিনি সেগুলির প্রশংসা করে ফেলেন, অমনি পাঠকগণ, পাঠিকারা বিশেষ, বিদ্যাসুন্দরকে কোল থেকে নামাবে না। কিন্তু আমাদের বিশ্লেষণ কি ঠিক? শৃঙ্গার-অলঙ্কারের বঙ্গানুবাদ রসমঞ্জরী কি খুব সাধু ব্যাপার? কি জানি! হয়ত, বঙ্কিমচন্দ্র অন্নপূর্ণামঙ্গলের ধুয়া-গানগুলি পড়বার সময়ে সাময়িক মানসিক পক্ষাঘাতের অধীন ছিলেন!!

প্রণয়কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয়কথা গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। বিদ্যাপতির কথা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত। তাহার কারণ কেবল এই বাহ্যপ্রকৃতির শক্তি। স্থূল প্রকৃতির সঙ্গে স্থূল শরীরেরই নিকট সম্বন্ধ, তাহার আধিক্যে কবিতা একটু ইন্দ্রিয়ানুসারিণী হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতি মনুষ্যহৃদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া, কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন, সুতরাং তাঁহার কবিতা, ইন্দ্রিয়ের সংস্রবশূন্য, বিলাসশূন্য, পবিত্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ; বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা। জয়দেবের কবিতা, উৎফুল্ল কমলজাল-শোভিত, বিহঙ্গমাকুল, স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর; বিদ্যাপতির কবিতা দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গসংকুলা নদী। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমালা। জয়দেবের গান মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি; বিদ্যাপতির গান সায়াহ্ন সমীরণের নিঃশ্বাস।" ['মানস বিকাশ'; বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৮০]

উপরের উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক নয়, বোঝা যাবে, নিম্নের উদ্ধৃতি পড়লে :

"আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাঁহাদিগকে এক-এক ভিন্ন শ্রেণীর গীতিকবির আদর্শস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহা বলিয়াছি। যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্তে, যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে তদ্রূপই বর্তে।"

একই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, কাব্যে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্যে ইন্দ্রিয়পরতা দোষ জন্মে। "এস্থলে শারীরিক ভোগাসক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি না—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে অনুরক্তিকেও ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ, কালিদাস ও জয়-

দেব।...ভারতচন্দ্রাদি বাঙালি-কবি, যাঁহারা কালিদাস ও জয়দেবকে আদর্শ করেন, তাঁহাদের কাব্য ইন্দ্রিয়পর।"[৫৭]

বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলেছেন, 'ভারতচন্দ্র আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন—কবিকঙ্কণের ঋষভস্বর কে শুনে?' [৫৮] এবং—'গীত-গোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়বহ্নি জ্বলিতেছে।'[৫৯]

৫৭। কালিদাসের কাব্যকে ইন্দ্রিয়পর বলায় তীব্র আপত্তি উঠবে, বঙ্কিম বুঝেছিলেন। সুতরাং অবিলম্বে ঝাঁঝালো কৈফিয়ত দিয়েছেন: 'কোনো মূর্খ না মনে করেন যে, ইহাতে কালিদাসাদির কবিত্বের নিন্দা হইতেছে। [এখানে] কেবল কাব্যের শ্রেণীনির্বাচন হইতেছে মাত্র।'

বঙ্কিম তবু বুঝেছিলেন, কালিদাসকে এভাবে টেনে আনা ঠিক হয়নি। সুতরাং 'মানস বিকাশ'-এর সংশোধিত রূপ 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে কালিদাসের নাম এই প্রসঙ্গে বাদ দেন। এবং বঙ্কিম ভারতীয় সাহিত্যের গৌরবরূপে কালিদাসের নামোল্লেখও করেছেন। কিন্তু কালিদাস যে তাঁর প্রাণের কবি নন তা দেখা যায় 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধের মধ্যে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার মহিমার কথা মনে রেখেও এখানে আমাদের বলতে হবে, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রশান্ত মহিমার যে অভিব্যক্তি কালিদাসের শকুন্তলায় ছিল, তা তিনি সম্পূর্ণ বুঝতে বা অনুভব করতে পারেন নি, যা পেরেছিলেন বিদ্যাসাগর;—এবং রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক পরিমাণে। রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' এবং 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধ দুটি তার প্রমাণ।

বঙ্কিমচন্দ্র, শকুন্তলার তুলনায় কুমারসম্ভবের অধিক ভক্ত। 'প্রকৃত ও অপ্রকৃত' প্রবন্ধে তিনি মিল্টনের প্যারাডাইজ লস্টের তুলনায় কালিদাসের কুমারসম্ভবের অধিক শক্তি, সৌন্দর্য ও আকর্ষণের কথা বলেছেন। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র কুমারসম্ভবের মধ্যে সম্ভবতঃ চরিত্রসৃষ্টিতে অধিক প্রবলতা ও গতিবেগ দেখেছিলেন: 'দেবচিত্র প্রণয়নে তিনি মিল্টন অপেক্ষা অধিক কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। কবিত্ব ধরিতে গেলে প্যারাডাইজ লস্ট হইতে কুমারসম্ভব অনেক উচ্চ। আমাদিগের বিবেচনায় কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের কবিত্বের ন্যায় কবিত্ব কোনো ভাষায় কোনো মহাকাব্যে আছে কিনা সন্দেহ।'

৫৮। 'বসন্তের কোকিল।' (কমলাকান্তের দপ্তর)

৫৯। 'পতঙ্গ।' (ঐ)

বঙ্কিমচন্দ্র বোধহয় ভারতচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, যখন তিনি 'মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত' রচনায় (ভাদ্র ১৩৮০) স্মরণীয় বাঙালিদের তালিকায় ভারতচন্দ্রের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতচন্দ্র-বিরোধী লেখা অনেকের কাছে অসহ্য ঠেকেছিল, তাঁর বিদ্যাসাগর-বিরোধী সমালোচনাও। ফলে, বঙ্কিম কবিতায় খোঁচা খেয়েছিলেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সেরকম দু'একটি কবিতা শুনিয়েছেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'বিদ্যাসাগর-মহাশয় যে বঙ্কিমের লিখা পছন্দ করিতেন না, তাহা আপামর সাধারণ সকলেই জানেন। তাঁহার একজন গোঁড়াভক্ত প্যারী কবিরত্ন এই সম্বন্ধে একটি ছড়া বাঁধিয়া গিয়াছেন।…বঙ্কিমের অপরাধ—তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কিছু নরম-গরম সমালোচনা করিয়াছিলেন। অনেকেই ইহাতে চটিয়া গেলেন।'

কৃষ্ণকমল-কথিত দু'একটি ছড়ার অংশ এই—'হালিসহর' পত্রিকায় বেরিয়েছিল :

কভু বা ব্যাসের মাথা চিবাইয়া খেয়ে,
নাচিতেছে যাদুমণি হাততালি দিয়ে।…
কাল চোখে কচি খোকা পরিয়া কাজল,
আপন রূপেতে হন আপনি পাগল।
ঈশ্বরচন্দ্রেতে দিতে কলঙ্কের রেখা,
সেদিন শহরে আসি দিয়াছিল দেখা।
ভারতের মধুমাখা কবিতালহরী,
অনা'সে ফেলিল ছিঁড়ে আব্দার করি।

প্যারী কবিরত্নের কবিতাংশ :

বঙ্গদর্শনের দর্শনশক্তি চমৎকার,
এ দোষ দর্শনে রোষ হয় না কার ?
অন্ধ যে জন, নাইকো লোচন,
সমালোচন কেন তার ?…

ভারতচন্দ্র গুণাকরে
নিন্দুকেরাই নিন্দা করে,
সে রূপ-রসমাধুরী ভাষায় কি বেরুল আর ?
অদ্যাপি কবি সকলে,
মুক্ত কণ্ঠে কে না বলে
কবিকুলে দিলেন কণ্ঠরত্নহার।
সমকক্ষ নর
মেলা সুদুষ্কর,
ভারতে 'ভারত'তুল্য কবি কেউ হবে না আর।
'চ্যাংড়া' কৃষ্ণচন্দ্র রায়,
শুনে শরীর জ্বলে যায়,
এর চেয়ে চ্যাংড়ামো করা বোধহয় হতে পারে না আর।
দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য,
প্রভায় প্রভাহীনাদিত্য,
সে যশ অদ্যাপি ধরায় ধরে না,
তাঁর দোষ ধরা,
ক্ষ্যাপামো করা,
বাণেশ্বর শঙ্করাদি সভায় ছিলেন সভ্য যার।

কেবল বঙ্কিমচন্দ্র নন, তাঁর বঙ্গদর্শনে অন্য লেখকেরাও ভারতচন্দ্রকে আক্রমণ করতে লাগলেন। ১২৭৯ পৌষ সংখ্যার বঙ্গদর্শনে 'যাত্রা' নামক প্রবন্ধে (লেখকের নাম ছিল না) সেকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় বিদ্যাসুন্দর-যাত্রাকে তচনচ করা হয়েছিল। 'অন্য যাত্রাপেক্ষা এক্ষণে বিদ্যাসুন্দরের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে এবং বাংলার রসজ্ঞতা-বিষয় বিচার করিতে হইলে এই বিদ্যাসুন্দর যাত্রা দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।' বলাবাহুল্য বিদ্যাসুন্দর যাত্রারসিকেরা উচ্চ সম্মানে এই রচনায় ভূষিত হননি। আদি, করুণ ও হাস্য—এই তিন রস প্রকাশ করার চেষ্টা এতে করা হয়েছে।

লেখক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন—'প্রণয় কি পদার্থ, তাহার শক্তি কি প্রকার, যাহাকে একবার স্পর্শ করে তাহাকে সাধারণ অপেক্ষা কিরূপ উন্নত করে, তাহার হর্ষ কিরূপ, বিষাদ কিরূপ, আকাঙ্ক্ষা কিরূপ, চাঞ্চল্য কিরূপ, ধর্ম কিরূপ, জগতের সমস্ত পদার্থের সহিত তাহার সহৃদয়তা কিরূপ, তদ্বিষয় বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কিছুই দেখা যায় না।'

আদিরসের এই অগভীরতা—করুণরস অপরপক্ষে বীভৎস :

বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে বিচ্ছেদ অতি অল্প। সুন্দরের আসিতে যেটুকু বিলম্ব হয়, সেইটুকু বিদ্যার বিচ্ছেদযন্ত্রণা। বিলম্ব দেখিলে বিদ্যা কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া থাকেন ; নাচিয়া তদ্বিষয় দুই-একটি গীত গাহিয়া থাকেন ; অথবা অধীরা হইলে হীরা মালিনীর সহিত দুটা রহস্য করিয়া সময় অতিবাহিত করেন। বিদ্যার বিচ্ছেদ এই-রূপ : সে বিচ্ছেদে কেহ তাপিত হয় না, কাহারও নয়নাশ্রু পতিত হয় না ; বিদ্যাও কাঁদে না, শ্রোতৃগণও কাঁদে না। 'আমার উড়্-উড়্ কচ্চে প্রাণ'—এই কথায় বা তদনুরূপ কথায় যতটুকু যন্ত্রণা প্রকাশ হয়, বিদ্যার বিচ্ছেদযন্ত্রণা ততটুকু হইয়াছিল।...

সামান্য বিচ্ছেদ সম্বন্ধে এইরূপ। আবার যখন যাবজ্জীবনের মতো বিচ্ছেদ-সম্ভাবনা হইয়াছিল, অর্থাৎ যখন মস্তকচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত সুন্দরকে মশানে লইয়া চলিল, বিদ্যা তখনও উঠিয়া, কঙ্কাল দোলাইয়া, নয়ন ঠারিয়া নাচিতে-নাচিতে গাড়খেমটায় শোক করিতে থাকে। নৃত্য দেখিয়া দর্শকমণ্ডলীতে রসের স্রোত বহিতে থাকে, অমনি বাহবার ঘটা পড়িয়া যায়। বিদ্যা আরও ঘুরিয়া-ঘুরিয়া নাচিতে থাকে। রসিক শ্রোতাদিগের আহ্লাদের আর সীমা থাকে না—বিদ্যার কঙ্কাল কেমন দুলিতেছে! বেশ্যা-স্বভাবানুকরণে সুপটু নট, কেমন নয়ন হৃদয় ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাচাইতেছে, ইহা দেখিয়া দুর্ভাগা সুন্দরের বিষাদ শ্রোতারা একেবারে ভুলিয়া যায়।

এক্ষণকার রুচির এই এক পরিচয়। শোকাকুলা [বিদ্যা] নাচিয়া হাসিয়া চোখ ঠারিয়া শোক করিতেছে, আর আমাদিগের

চিত্ত আর্দ্র হইতেছে! শ্রোতাদিগের মধ্যে কেহ-কেহ বলিতেছে—বড় আশ্চর্য যাত্রা হইতেছে।

বিদ্যাসুন্দর যাত্রায়, দেখা যায়, হাস্যরসেরই প্রাধান্য। 'এই যাত্রায় মালিনীই প্রধানা। তাহার রঙ্গরস লইয়াই এই যাত্রা। কাজেই হাস্য-রস ব্যতীত কোনো রসের প্রবলতা নাই।' মালিনী যে রস ঢেলেছে, তার চরিত্রের কথা না বলাই ভাল। লেখক বিদ্রূপ করে বলেছেন, 'পূর্বে বাঙ্গালায় করুণরস প্রবল ছিল। এই যাত্রা দ্বারা বোধ হইতেছে যে, এক্ষণে তৎপরিবর্তে হাস্যরসের প্রাধান্য জন্মিয়াছে!'

লেখক শেক্সপীয়রের ওথেলোর সঙ্গে একদিকে বিদ্যাসুন্দরের সাদৃশ্য দেখেছেন—উভয় রচনাতেই নায়িকা পিতার অজ্ঞাতে নায়ককে আত্ম-দান করেছে—কিন্তু মূলে কি তফাত! 'যাবৎ চন্দ্র-সূর্য থাকিবে, তাবৎ তাঁহার [কুলত্যাগিনী ডেসিডিমোনার] সতীত্ব সতীদিগের আদর্শ-স্বরূপ থাকিবে।' এবং 'এক ডেসিডিমোনার চরিত্রে সতীত্বের সাপেক্ষে ইংলণ্ডে যাহা করিয়াছে, সহস্র উপদেষ্টা একত্র হইয়া কস্মিনকালে তাহা পারিতেন না।' আমাদের বিদ্যাসুন্দরও বাঙালির জাতীয় চরিত্রের ক্ষেত্রে কিছু অবদান দিয়েছে। কী তা?—

> পল্লীগ্রামে অনুসন্ধান করিলে এই যাত্রার ফলভোগী অনেককে পাওয়া যাইতে পারে। মালিনী-মাসী দৌত্যক্রিয়ার অধ্যাপিকা; তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য ক্রমে দেশ ব্যাপিতেছে। ছোট-খাট সুন্দরের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। বিদ্যার বংশবৃদ্ধি কিরূপ হইয়াছে, তাহা বিশেষ জানা নাই; কিন্তু বোধহয় নিতান্ত অল্প না হইতে পারে। পল্লীগ্রামের যৌবনোন্মুখী সরলা যুবতীগুলি বিদ্যার মুখে নিম্নলিখিত বা তদনুরূপ গীত শুনিলে তাহাদের শিক্ষা কিরূপ হয়?—
>
> এখন উপায় আয়ি, করো তারে আনিতে,
> কামানলে জ্বেলে ছলে, ভুলে আছে মনেতে।
> কবে সে সুদিন হবে, সুধাকর প্রকাশিবে,
> বারিবিন্দু বরষিবে, চাতকীরে বাঁচাতে॥

আশ্চর্যের বিষয় যে, এইরূপ গীত পিতা, পুত্র লইয়া, মাতা, কন্যা লইয়া শুনেন, লজ্জা করেন না। সেই পুত্র-কন্যা জ্ঞানবান হইলে পিতামাতাকে কিরূপ ভাবিবেন, সেদিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত।"

বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা সম্বন্ধে উপরের সিদ্ধান্তের অনেকখানি, বলাবাহুল্য, এই লেখকের মতে, মূল ভারতচন্দ্রের প্রাপ্য।

'যাত্রা' বিষয়েই কার্ত্তিক ১২৮০ সংখ্যায় এক প্রবন্ধকার 'গ্রাম্যবাবুদিগের পক্ষে মৃতসঞ্জীবনী,...বারইয়ারী পাণ্ডাদিগের জীবনসর্বস্ব' খেমটা-নাচের প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রকে এনে ফেলেছিলেন। এঁর মতে, 'বঙ্গসমাজে কেবল দেহের মধ্যভাগের সঞ্চালনজনিত দেহেব যে ঘৃণিত আন্দোলন, তাহাকেই নৃত্য বলে'—সেই নৃত্য অবিরাম করে ভারতচন্দ্রের মালিনী আর বিদ্যা। 'খেমটা বাঙ্গালার নৃত্য।' 'যে দেশে তন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, যে-দেশে দেবার্চনায় পঞ্চ ম'কার আবশ্যক, সে-দেশে খেমটার জন্ম হইবে, অসম্ভাবনা কি?...খেমটা নাচ, চন্দ্রহার, চাবির শিকল, শান্তিপুরে ধুতি, যাত্রার মেতরানী, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী [হায় বঙ্কিমের উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য রসমঞ্জরী !]—এ সকল একজাতীয় —তীব্র, উগ্র এবং উত্তপ্ত।'

অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ভারতচন্দ্র-বিরোধী লেখাটিও বঙ্গদর্শনে এইকালে (বৈশাখ ১৩৮০) বেরোয়। অক্ষয় সরকার মান্য লেখক ছিলেন বলে এই লেখাটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। তিনি ভারতচন্দ্রের অস্ত্রেই ভারতচন্দ্রকে মারতে চেয়েছেন, রঙ্গচ্ছন্দে মেতে উঠে। তিনি 'ভারতচন্দ্রকে তাঁহার স্রষ্টা মালিনীর সহিত এক বলিয়া বিবেচনা' করেছিলেন। ওহেন বিচিত্র বিবেচনার কারণও দেখিয়েছিলেন সপরিহাসে। তাঁর মোটবক্তব্য: বিদ্যার 'কথায় হীরার ধার', ভারতচন্দ্রেরও তাই; ভারতচন্দ্র 'বাক্যরসরাজ', তিনি শব্দসমুদ্রের মন্থনদণ্ড নিজ হস্তে নিয়েছেন, ফলে বাগ্‌যুদ্ধে অপরাজেয় হীরার মতই তাঁর কাছেও 'বঙ্গীয় সকল কবিকেই পরাস্ত হইতে হয়; কখনই তাঁহার মুখের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বী টেঁকিতে পারে না, পড়শী কাছে থাকিতে পারে না।' 'হীরার দাঁত ছোলা ইত্যাদি

অঙ্গ-পরিষ্কৃতির লক্ষণমাত্র। ভারতচন্দ্র রায়ের বাক্যসকলের পরিষ্কৃতি প্রসিদ্ধ—ভাষা পরিষ্কৃত ও মার্জিত; ছন্দঃ পরিষ্কৃত ও মার্জিত; রচনা পরিষ্কৃত ও মার্জিত।' উভয়ের তুলনা আরো অগ্রসর হয়: 'হীরার সেই গালভরা পান, আর [ভারতের] কাব্যের সেই আদিরস-পূর্ণতা। হীরার সেই মাজা-দোলা আর ভারতচন্দ্রের নাচনিচ্ছন্দ। হীরার সেই সুচিকণ পরিষ্কৃত দন্ত আর [ভারতের] কাব্যের সেই মার্জিত স্বভাব। হীরার সেই মুচকে মধুর হাসি আর ভারতের সেই সহজ প্রসাদগুণ। হীরাও হাসে, ভারতের কবিতাও হাসে।'

লিখতে লিখতে অক্ষয়চন্দ্রের কলমও ক্রমেই পরিষ্কৃত:

"মালিনীর যে-সকল গুণ থাকাতে চেঙ্গড়া-মহলে তাহার পসার ছিল, ভারত সেইসকল গুণেই বঙ্গীয় চেঙ্গড়া-মহলে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন।"

এবং তাঁর কলমের অম্লমধুর রস:

"ভাবত তাঁহার মালিনীর ন্যায় 'ফুলের চুপড়ি কাঁখে ফিবে বাড়ি বাড়ি।'...ভারত ফুল-ব্যবসায়ী, তাহার খরিদ্দারও অনেক ও নানারঙ্গী। ভারতকে ফুল-ব্যবসায়ী বলি কেন? তিনি ক্ষণস্থায়ী রসব্যবসায়ী। তিনি এই ফুলের চুপড়ি লইয়া এই বঙ্গরাজ্যে কাহার বাড়ি না গিয়াছেন। প্রথমে রাজবাড়ি ফুল জোগাইতেন বটে, কিন্তু এক্ষণে ক্রমে-ক্রমে সকল গৃহস্থভবন পর্যটন করিয়া সোনাগাজি, মেছোবাজার প্রভৃতি স্থলে পসার বিস্তার করিতেছেন। যেখানে দেখিবেন, 'চাই বেলফুলের' ডাক অধিক, সেখানেই দেখিবেন যে, এখন ভারতচন্দ্র রায়ের সমাদর অধিক। তবে কি ভদ্রলোক ভারতের গ্রন্থকলাপ কখনো পাঠ করিবে না? উত্তর—কেন, ভদ্রলোক কি ফুলের আদর জানে না? না, ফুল-ব্যবসায়ী ভদ্রপল্লীতে থাকে না?'

অক্ষয় সরকারের হাসি, ঘৃণার হাসি। ঘৃণার বিশেষ কারণ, ভারতচন্দ্র দেবীর রূপবর্ণনার সময়ে তাঁর নিরুপম স্বচ্ছ বসনের ভিতরকার উরু নিতম্ব কটি নাভি কুচ ইত্যাদির দিকে রসদৃষ্টি প্রেরণ করেছিলেন। সেজন্য লোকটাকে মালিনীর সঙ্গে একত্রে শূলে দেওয়াই বিধেয়।

লোকটি কবি-নামের মতো বড় নাম নিয়ে ছিটেফোঁটা তন্ত্র-মন্ত্রে সবাইকে বশ করেছেন, বাক্‌ছলে অন্যায়রকম পটু, যে-বস্তু অন্যত্র কাব্যের মহৎ গুণ নয়, কিন্তু 'বঙ্গদেশে ছলা-কলা কবিতার জীবনীশক্তি, মুন্সীয়ানা দেখিল তো বাঙালি অমনি গলিয়া গেল; ভারতচন্দ্র এই মুন্সীগিরির খোসনবিশ।' অক্ষয় সরকারের দুঃখ: 'এমন কদর্য স্বভাবান্বিত কবিও বঙ্গদেশে সমূহ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন।' এই প্রতিপত্তি চেঙ্গড়াকুলকে ছাপিয়ে ভদ্রমহলেও প্রসারিত। ভারত-রসিক সেইসব ভদ্রমহোদয়গণের প্রতি অক্ষয় সরকারের তিরস্কার:

> "তবে কি না ভদ্রলোকে যদি মালিনী গোয়ালিনীর বিশেষ গৌরব করেন, বা কবি-ভারতকে পরম পূজনীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত কবিবর জ্ঞান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের রুচির প্রশংসা করিতে পারি না।"

অক্ষয় সরকার থামতে পারেন নি। ভারত-রসস্থদের বিষয়ে তিনি গোয়েন্দাগিরির ফরমাস পর্যন্ত করেছেন:

> "ভারত ও মালিনী উভয় পক্ষেই বলা যায় যে, 'আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে, এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে; ছিটা-ফোঁটা তন্ত্র-মন্ত্র জানে কতগুলি, চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায়, কত জানে ঠুলি।'...ভারত ও তাঁর মালিনী এখনও চেঙ্গড়া ভুলায়ে খাইতে থাকুন, তাহাতেও আপত্তি নাই। কিন্তু যে যুবক মালিনীর বাড়ি বাসা লইয়া থাকে, তাহার দিকে একটু সকলের দৃষ্টি থাকিলে ভাল হয়, আর যে সকল বঙ্গীয় মহাজন ভারতকে মালিনী-স্বভাবাপন্ন কবিযোগ্য আদর অপেক্ষা অধিক গৌরব প্রদান করিতে চাহেন, তাঁহাদের দিকেও সকলের একটু দৃষ্টি থাকা কর্তব্য।"

॥ ১২ ॥

অক্ষয় সরকার একশেষ করেছেন। ভারতচন্দ্রকে একেবারে কুপল্লীর কবি দাঁড় করিয়েছেন। রমেশচন্দ্র দত্ত কয়েক বৎসরের মধ্যে (১৮৭৭) লিখতে গিয়ে এতখানি খোলা গাল হয়ত দেন নি, কিন্তু

সমালোচনাটা নরমও বিশেষ করেন নি। ভারতচন্দ্রের প্রচণ্ড শক্তিকে তিনি স্বীকার করেছেন (অক্ষয় সরকার ঐ শক্তির প্রবলতার কথা স্বীকার করেন নি অথচ করেছেন, নচেৎ অমন গালাগালির কি দরকার ছিল!)—কিন্তু, 'সে শক্তি শয়তানের।' বিদ্যাসুন্দরের উপজীব্য বিষয় প্রেম—সে প্রেম 'স্থূল, জান্তব, দৈহিক।' তাঁর মতে, বিদ্যা ও সুন্দর প্রেমকে অনুভূতি হিসাবে পায়নি, পেয়েছিল ক্ষুধারূপে। পাঠকের কাছে অভিপ্রেত ভাবকে প্রত্যক্ষ জীবন্ত করাবার ক্ষমতা এই কবির ছিল—কিন্তু কী কদর্য সে ভাব! 'কবিদের অন্যবিধ উচ্চতর গুণাবলী—যা প্রকাশিত হয় সরলতায়, সত্যবোধে, কল্পনায় ও ভাবুকতায়, কিংবা এমনকি, যথার্থ স্নেহকোমলতায় বা কারুণ্যে, যা প্রায় অপর সকল বাঙালি-কবির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়—সে সকলের শোচনীয় অভাব রয়েছে ভাবত-চন্দ্রের মধ্যে। সেইজন্য, তাঁব বর্ণনার কুহকমোহিনী রূপ বা ভাষাব ঐশ্বর্যগরিমা সত্ত্বেও তাঁর গ্রন্থ পাঠান্তে হ্যামলেটের অনুকরণে এই কথাই বলতে প্রলোভন হয়—শব্দ! শব্দ! কেবল শব্দ!'[৬০]

রমেশচন্দ্র শেষ পর্যন্ত গভীর আক্ষেপের সঙ্গে এই কথাই বলতে চেয়েছেন—কৃষ্ণচন্দ্রের নীতিহীন বিলাসী রাজসভায় ভারতচন্দ্রের সমাদর বুঝতে পারি, কিন্তু 'আমাদের কালের ইংরেজি-শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষেরা, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বলে যাঁদের যথেষ্ট অভিমান, তাঁরা কি বলে…ভারত-চন্দ্রের কাব্যশক্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভাবাবেগে মূর্চ্ছা যান!'

রমেশচন্দ্র এবং অক্ষয় সরকার মুকুন্দরামের সঙ্গে তুলনা করে ভারত-

---

৬০। "His poetry has the *character* of Satan, but it has also the *power* of Satan to tempt and seduce."

"In all the higher qualifications of a poet, in simplicity and truth, in imagination and thought, nay, even in true tenderness and pathos, such as we meet with in almost every other Bengali poet, Bharat is singularly and sadly wanting. In spite therefore of the fascination of his descriptions, and the richness of his language, we are tempted, on reading his books, to exclaim with Hamlet, 'words, words, words.'"

[*Literature of Bengal*]

প্রসঙ্গে যেকথা বলেছেন, পরে তার উল্লেখ করব—চরিত্রচিত্রণে ভারত-চন্দ্রের আংশিক সাফল্য ও অধিক ব্যর্থতার কথাও।

উনিশ শতাব্দের সত্তরের দশক ভারতচন্দ্রের পক্ষে সত্যই দুর্দিন। লেখকের পর লেখক এই দশকে তাঁকে ফেলে কেটেছেন। পরবর্তী দশকে আক্রমণের বেগ একটু কম ছিল (লেখকরা দম নিচ্ছিলেন), তখন পাচ্ছি গঙ্গাচরণ সরকার ও কৈলাসচন্দ্র ঘোষকে। গঙ্গাচরণ, ভারতের ভাষা, চিত্রণশক্তি ইত্যাদির প্রশংসা করেও মুকুন্দরামের পায়ে তাঁকে ঘাড় ধরে গড় করিয়েছেন।[৬১] কৈলাসচন্দ্র ঘোষেরও সেই কাজ। তবে সমকালীন সমাজের বিকৃত চরিত্রকে একটু অধিক সমাজবোধের সঙ্গে তিনি দেখতে পেরেছেন বলে, সেই টানেই কবির পতন, একথা ভাবতে পেরেছেন।[৬২]

নব্বুয়ের দশকে ভারতচন্দ্র একবার বন্ধুমুখ দেখতে পেয়েছিলেন, যদিও ক্ষণস্থায়ী তাঁর সে সৌভাগ্য। গৌরদাস বৈরাগীকৃত বিদ্যাসুন্দরের ইংরেজি গদ্যানুবাদ বেরোয় ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে। তার ভূমিকায় তিনি বলে-ছিলেন: বাঙালি-জীবন ও রীতির চিত্র-হিসাবে ইতিহাসের ছাত্রের কাছে যেমন ভারতচন্দ্রের কাব্য বহুমূল্য, তেমনি এটি, কল্পনার সৃষ্টি সম্বন্ধে উৎসুক রসপিপাসুদের কাছেও বরেণ্য গ্রন্থ, এর অন্তর্গত অগণ্য বিকশিত সৌন্দর্যের জন্য। বৈরাগী এ-কাব্যের জনপ্রিয়তার কথা বলে-ছেন, রূপক-হিসাবে একে দেখা যায় কি না, তার বিচার করেছেন (প্রসঙ্গটি পরে আলোচিত), এবং অশ্লীলতার প্রশ্নে ভারতচন্দ্রের পক্ষ সমর্থনে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, রূপক-হিসাবে দেখলে নীতির নামে এর মধ্য থেকে বিকৃতি বা কুশ্রীতা আবিষ্কারে উৎসাহ কমে যাবে। তাঁর প্রশ্ন—পারলে সৌন্দর্য আবিষ্কার করব না কেন? তিনি বলতে চাইলেন, বিদ্যা ও সুন্দরকে গান্ধর্বমতে (অদৃশ্য!) গাঁটছড়ায় বেঁধেই

৬১। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (বিষয়ে বক্তৃতা)'; গঙ্গাচরণ সরকার, ১২৮৬, আষাঢ়।

৬২। 'বাঙ্গালা সাহিত্য': কৈলাসচন্দ্র ঘোষ; ১২৯২।

তবে কবি তাদের শয়নঘরের পর্দা সরিয়েছেন। এ ধরনের কাজ মিল্টনও করেছেন, যে মিল্টন কোলরিজের বিবেচনায় নির্ভেজাল পবিত্র। বৈরাগী অধিকন্তু বলেছেন—রেস্টোরিয়ান নাট্যকারেরা অনেক বেশী জঘন্য। শেক্সপীয়র কম যায় না। বৈরাগী বিশেষ গঞ্জনা দিয়েছেন তাঁদের, যাঁরা শকুনের চোখ নিয়ে লেখার মধ্যে বাড়তি লেখা ছোঁ মেরে পড়তে চান। শেষে সপাটে বলেছেন—সাহিত্যের এমন কি শক্তি যে, তোমরা অমন আর্তনাদ করছ? বলো দেখি, বায়রনের ডনজুয়ান সমাজকে কি এমন গোল্লায় দিয়েছে?

বৈরাগী ভারতচন্দ্রের পক্ষে আর কতটুকু করতে পারলেন, বিরুদ্ধে যা করলেন নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়! 'সাহিত্য' পত্রিকার চৈত্র ১২৯৯ সংখ্যায় 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধে ইনি যেসব কথা লিখলেন, সেই মারাত্মক কথাগুলি পরবর্তীকালে বহুল উল্লেখের গৌরবলাভ করেছে। এই লেখকের কলমের জোর ছিল; উচ্ছ্বাসও ছিল; কিন্তু এ সেই উচ্ছ্বাস যা অনুভূতির প্রবলতাকে, ফেনময়তাকে নয়, প্রকাশ করে। এঁর লেখায় লঘুতা নেই; দৃঢ় নীতিবুদ্ধি আশ্রয় করে, উপযুক্ত ভাষায় ইনি ভারতচন্দ্রকে ভেদ করতে চেয়েছেন, তা করার সময়ে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সমর্থকদেরও জড়িয়ে নিয়েছেন। ভারতচন্দ্রের রচনাশৈলীর প্রশংসা অবশ্য এঁর লেখায় আছে।

ভারতচন্দ্রের উপরে কালের প্রভাব দেখাতে গিয়ে সাধারণভাবে কবিদের উপরে দেশকালের প্রভাব কি রকম পড়ে, সে বিষয়ে এঁর বক্তব্য :

> "সমাজ ও সময় লইয়া কবি। কাব্য—সমাজ ও সময়ের মানচিত্র এবং অভাব নির্দেশক। এই জন্যই এক[ই] সময়ে দুইরূপ কবির আবির্ভাব হইতে পারে। কোথাও-বা লঘু ও অসার হাস্যে আপনার জাতীয় হীনতার হীনত্ব ঢাকিবার প্রয়াস; অলংকারের বা মজার কথার পরচুলার ভিতর আপনার প্রেতপঙ্কিল প্রতিকৃতি লুকাইয়া অধঃপতনের শিখা[কে] আমোদের হাততালিতে প্রদক্ষিণ করা; [আবার] কোথাও-বা জাতীয় হীনতায়, সামাজিক

দৈন্যে, কোনো মৃত পবিত্র অতীতের মুখপানে চাহিয়া কোনো সংক্ষুব্ধ পবিত্র আত্মার নিরাশ নিঃশ্বাস—অপাপবিদ্ধ, আদর্শ মনুষ্য অঙ্কনের তপঃসাধন। এইজন্যই মিল্টনের মহাকাব্য ও উইচারলির নাটকাবলী এক সময়ে সম্ভব; এইজন্যই ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সেনের পুণ্যগাথা সমসাময়িক। একজন জীবনের গণ্ডীর ভিতর দুইটা অশ্লীল তামাশা লইয়া পরিতৃপ্ত, অপরজন মরণের ব্যবধান ছাড়াইয়া সসীম অসীমে বিবাহবন্ধন বাঁধিয়া দেন।

"বাঙালির প্রথম কবি জয়দেব। বাংলার স্বাধীনতার সায়াহ্নে অধঃপতিত জাতির অলস জীবনের জন্য বৈশাখী পূর্ণিমার মত প্রতিভায় বিলাসিনীর বিলাস বা অভিসার গাহিতে তাঁহার জন্ম।" ভারতচন্দ্র জয়দেবের পথবর্তী। এই শ্রেণীর কবির সঙ্গে ভিন্নধর্মী কবিদের তুলনা ভাবধর্মী আলঙ্কারিক ভাষায়:

"শব্দ ও অর্থপ্রতিপত্তি লইয়া কাব্যের উৎকর্ষ। যাঁহার ভাব ভাষা সমানরূপে মহান এবং সুন্দর, তিনি মহাকবি। কিন্তু সচরাচর আমরা দুইরূপ কাব্য দেখিতে পাই—হয় শব্দগত, নয় ভাবগত। প্রথমের উদাহরণ গীতগোবিন্দ, অন্নদামঙ্গল—দ্বিতীয়ের উদাহরণ বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী প্রভৃতি। প্রথমের সৌন্দর্য—সযত্নরক্ষিত প্রমোদউদ্যানের মতো, দ্বিতীয়ের সৌন্দর্য—সন্ধ্যানিলসন্তাড়িত বনলতার ন্যায়। একটি সৌন্দর্যে বাবুদের 'বারুণী পুষ্করিণী', অপরটি নীলাকাশতলে সন্ধ্যার কালো ছায়ার মাঝে পর্বতাবরোহিণী শুভ্র নির্ঝরিণী। একস্থানে শুধু পদলালিত্য, অপরত্র আবেগের সৌন্দর্যে পদমাধুর্য। একের ঘষামাজা বিন্যস্ত মাধুরী, অঙ্কশাস্ত্রের পৌনঃপৌনিক নিয়মের বাধ্য; অপরের অচেষ্টিত রূপ, অবিজ্ঞাতে আপনি ফুটিয়া ওঠে। ভারতচন্দ্র শাব্দিক কবি।··· ভারতচন্দ্রে অসীমের সহিত কুটুম্বিতা প্রকাশের ক্ষমতা ছিল না।"

ইউরোপীয় কাব্যের অশ্লীলতার ধুয়া দিয়ে যাঁরা ভারতচন্দ্রের সমর্থন করতে চেয়েছেন এবং সেইসঙ্গে শেক্সপীয়র, মিল্টনের অস্থানে দৃষ্টি দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা নিক্ষেপ করে নলিনীনাথ ভারত-

চন্দ্রে সর্বত্রব্যাপ্ত অশ্লীলতার চরিত্র উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন। এঁর মতে, ভারতচন্দ্রের কাব্যে আদিরস নেই, কারণ (এঁরই মতে), আদিরস কাব্যের কেবল আদি নয়, আদ্যন্ত রস—তার পুষ্টি ভোগে নয়, ত্যাগে; অর্থাৎ আদিরস মানে প্রেমরস, বাল্মীকি, ব্যাস যার কবি। 'বিদ্যা-সুন্দর আদিরসাত্মক কাব্য নহে, উহা অশ্লীল বা অসৎ কাব্য।'

> "ভারতচন্দ্রে অশ্লীল ভিন্ন পারিপাট্য নাই। আমরা [তাঁহার কাব্যে] অন্যত্র এমন কোনো সৌন্দর্য দেখিতে পাই না, যাহাতে এ অশ্লীলতা সাময়িক রুচির ফল বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি। যদি কোনো স্থানে কাব্যের সহিত কবির তন্ময়ত্ব প্রকাশ হইয়া থাকে, তবে তাহা অশ্লীল স্থানে। কেহ কেহ বলেন, যুগধর্মে মানুষের ক্রমিক অবনতি দেখাইবার জন্যই বিদ্যাসুন্দরের প্রসঙ্গ—ভারতের বিদ্যাসুন্দর একরূপ ভবিষ্যপুরাণ। আমরা বুঝিতে পারি না, যদি মনুষ্যের অধঃপতন দেখানোই উদ্দেশ্য, তবে সে উৎপথপ্রতিপন্নের আবার সশরীরে স্বর্গারোহণ কিরূপ? ভারতচন্দ্র অপ্রয়োজনে অশ্লীল, হীরামালিনী সৃজনের উপযুক্ত কবি। তাঁহার আগাগোড়াই বিপরীত। জ্বালাময়ী প্রতিভা সত্বেও, হেনে (Heine) বলিয়াছেন, 'বায়রন অর্ধ কবিতার রাজ্যে কবি।' আমরা বলি, ভারতচন্দ্রও সেইরূপ।"

কয়েক বৎসরের মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর সুবিখ্যাত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে (১৮৯৬) ভারতচন্দ্রের উপরে প্রবল পরাক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর এই অত্যুগ্র আক্রমণের ঔচিত্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে কিন্তু তাঁর রচনাশক্তিকে বাহবা না দিয়ে উপায় নেই। কৌতুকে বিদ্রূপে, আঘাতে আক্রমণে তিনি ভারতচন্দ্রকে নাজেহাল করেছেন, এবং তাঁর রচনায় ব্যঙ্গাত্মক অংশটিকে অতি উপভোগ্য বলে মনে হয়েছে। অক্ষয় সরকার ভারতচন্দ্রকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করেছিলেন, দীনেশচন্দ্রও করলেন—তার দ্বারা এইটুকু প্রমাণ করলেন—ভারতচন্দ্র তাঁদের রসবোধ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন!!

ভারতচন্দ্রের চরিত্রচিত্রণ বা রূপরীতির বিষয়ে দীনেশচন্দ্রের বক্তব্য পরে দেখা যাবে, এখানে দুর্নৈতিকতার কথাটাই আনা যাক। দীনেশ-চন্দ্র স্থির সিদ্ধান্ত করেছিলেন, 'কবি, জীবনের কোনো গূঢ় সমস্যা কি কঠোর পরীক্ষা উদ্ঘাটন করিয়া উন্নত চরিত্রবল দেখান নাই।' 'বিদ্যা ও সুন্দরের কামোন্মত্ততা ক্ষণস্থায়ী ইতর-প্রকৃতি-সুলভ উত্তেজনার ফল।' ওসব কাব্যে আছে 'পচা আদিরসের গন্ধ।'

বিদ্যাসুন্দর 'অমাবস্যার গান।' সেদিকে তাকিয়ে দীনেশচন্দ্র যখন বিষাদনিঃশ্বাস ফেলেছেন, তখন তাঁর আন্তরিকতায় অন্ততঃ সন্দেহ করতে পারি না :

> "যে নবদ্বীপে বৈষ্ণবগণ এক সময়ে মেঘদর্শনে কৃষ্ণভ্রম করিয়া প্রেমাবেশে পাগল হইতেন, সেইস্থানে ভারতচন্দ্রের শিষ্যগণ সমস্ত শীলতার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া লালসা-রাক্ষসীকে ষোড়শোপচারে পূজা করিতে লাগিলেন—সাহিত্যের এই অংশ অতি কদর্য। এই সময় নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গদেশের যুগাবতার। বঙ্গদেশ তখন বর্গীর হাঙ্গামে অস্থির ছিল। ইহার কিছু পরে নবদ্বীপে যে সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাব হয়, তাহাতে এক-তৃতীয়াংশ লোক নষ্ট হইয়া যায়।…এই সময় ভারতচন্দ্র স্বীয় প্রভু, 'সদা জ্যোৎস্নাময় দুই পক্ষ'-সেবী নৃপনন্দনের জন্য কামোদ্দীপক বটিকা প্রস্তুত করিতে-ছিলেন। জাতীয় চরিত্রের এই হীনতায় ভাবী রাষ্ট্রবিপ্লবের পথ সুগম হইয়াছিল।"
>
> "কিন্তু দোষে গুণে সৃষ্টি। পৌরুষতরুর ভগ্নকাণ্ড বেষ্টন করিয়া 'ললিত লবঙ্গলতার' ন্যায় সুকুমার বিদ্যাগুলি লতাইয়া উঠিল। কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় বিশ্রাম খাঁ গায়েনের ওস্তাদি-গানের মূর্চ্ছনা, গদাধর তর্কালঙ্কারের পুরাণ-পাঠ, ও ভারতচন্দ্রের কবিতা দেশময় যে মধুরভাব বিকিরণ করিতে লাগিল, তাহা এই রাজনৈতিক বাদলের মধ্যে মনোরম রৌদ্রের মতো মৃদুহাস্য করিতেছিল। নবদ্বীপ হইতে একদা নিঃস্বার্থ ও নির্মল প্রেমের রপ্তানি হইত, এখন নবদ্বীপাধিকার হইতে ভারতচন্দ্রের কবিতা, শান্তিপুরে ধুতি ও

কৃষ্ণনগরের পুতুল বস্তায়-বস্তায় বিক্রয়ের জন্য দেশে-দেশে প্রেরিত হইতে লাগিল।"

সেই অবক্ষয়ী সমাজ ও যুগের আরও কথা :

"বস্তুতঃ বাংলা কবিতা এখন আর 'কৃষকের গান' নহে। এখন বঙ্গভাষা স্বভাবসুন্দরী লজ্জাবতী পল্লীবধূটির মত শুধু পল্লী-কবির আদরের জিনিস নহে। ইহার প্রতি সংস্কৃত ও ফার্সীর বড় বড় পণ্ডিতগণের নজর পড়িয়াছে; এখন বঙ্গভাষা রাজসভায় অনুগৃহীতা···সলজ্জ গ্রাম্য সৌন্দর্য ও নিষ্কাম প্রেমের আবেগ ইহা পল্লীগ্রামে ফেলিয়া আসিয়াছে; রাজসভাতে ইহার কামনাপূর্ণ ক্রীড়ায় দর্শকবৃন্দের চিত্তে উত্তপ্ত মদিরার উল্লাস প্রবাহিত হয়, এবং নীলনিচোলের অসংযত বিক্ষেপে নানা আভরণের জ্যোতি ফুটিয়া ওঠে।

"কবিগণ এখন বুদ্ধিসাগর মন্থন করিয়া রূপবর্ণনার উৎপত্তি করেন। যিনি কল্পনার কুহক সৃষ্টি করিতে যত পটু, তিনি তত প্রশংসনীয়; প্রকৃত রূপের আর কে খোঁজ করে।···বাঙালি-কবি শুধু সংস্কৃতের অনুকরণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, ফার্সী ও উর্দু হইতেও ইচ্ছাক্রমে সংগ্রহ করিয়াছেন।···

"বঙ্গসাহিত্যে সৌন্দর্যের আদর্শের খর্বতার সঙ্গে করুণ প্রভৃতি রসের ধারা স্তিমিত হইয়া পড়িল। ভারতচন্দ্রের রতি সামান্য গণি-কার ন্যায় কৃত্রিম সুরে পতিবিয়োগ-বিলাপ করিতেছে—'আহা আহা, হরি হরি, উহু উহু মরি মরি, হায় হায়, গোসাঞি গোসাঞি।'—ইহা করুণ রসের বিদ্রূপ ভিন্ন কি বলিব?·· গম্ভীর-ভাব বিরচনে ভারতচন্দ্র অনভ্যস্ত; অন্নদামঙ্গল-রূপ ধর্মমণ্ডপে তিনি বাঈনাচ দেখাইয়াছেন।"

"বিদ্যাসুন্দরের সিঁদকাটা বিলাসের অভিনয় ও কুট্টনীসংযোগে গৃহস্থের বাড়ির কন্যাকে বশীকরণ—এ সমস্ত সম্ভবতঃ বিদেশী সাহি-ত্যের প্রভাবের পরিচায়ক। ফার্সী-অনুরাগী ধর্মভীরু কবিগণ চণ্ডী-পূজার বিল্বপত্র কাণে গুঁজিয়া বিদেশী কেচ্ছা শুনাইয়াছেন, তাঁহা-

দের বক্ষঃস্থলে লম্বমান পৈতা, চন্দনচর্চিত ললাট, কর্ণলগ্ন বিল্বপত্র ও মুখে—'কালী কালী কালী কালিকে ; চণ্ডমুণ্ডী মুণ্ডখণ্ডী, খণ্ড-মুণ্ড মালিকে।'—প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ শুনিয়া শ্রোতৃগণ বিদ্যাসুন্দর পূজামণ্ডপে গাওয়াইয়াছেন।"

এই 'অশ্লীল মিষ্টভাষী সাহিত্য' সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্রের কঠিনতম বাক্যগুলি এই :

"বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কাব্য নৈতিক জীবনের ভগ্নপতাকা, বিজাতীয় আদর্শ ও কুরুচি-কলুষিত। কাচের মূল্যে বিকাইবার যোগ্য। কিন্তু ইহাদের ছাঁচে-ঢালা সুন্দর মার্জিত ভাষার জ্যোতিতে আদর্শের হীনত্ব পাঠকগণের উপলব্ধি হয় নাই, এক যুগ ভরিয়া এই কাব্যগুলি পাকা সোনার মূল্যে বিকাইয়াছে।"

স্বয়ং কবি ভারতচন্দ্র যদি উপরের মধুবচন লাভ করেন, তাহলে তাঁর অযোগ্য অনুকারীদের সম্বন্ধে নিম্নের কথাগুলি নিতান্তই অল্পকথা :

"শুধু কঠোর সমালোচনা করিয়া নিবৃত্ত হইলে উক্ত কাব্য-লেখকগণের যথোচিত শাস্তি হয় না, তাঁহারা নৈতিক আদালতে বেত্রাঘাতযোগ্য।[৬৩]

৬৩। ভারতচন্দ্রের অনুকরণে রচিত গ্রন্থ 'চন্দ্রকান্ত', 'কামিনীকুমার', 'বনতারা' প্রভৃতির আলোচনায় উপরের মন্তব্য করার পরে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন, এগুলি 'জাতীয় অধোগতির শেষ চিহ্ন।' এইসব গ্রন্থের সঙ্গে দেবদেবীর যোগ দেখানো হয়েছে বলে দীনেশচন্দ্র সমূহ ধিক্কার দিয়ে বলেছেন : 'এই তিনখানি কাব্যেই কালীনামের মাহাত্ম্য কীর্তিত আছে। কালীনামের সংস্রবহেতু আমাদিগের বৃদ্ধ-গণ এইসব পুস্তকের শৃঙ্গাররসের মধ্যেও আধ্যাত্মিকত্ব দেখিয়াছেন এবং প্রণিপাত পুরঃসর নিষ্কাম ধর্মপিপাসার সহিত উপাখ্যানভাগ পাঠ করিয়াছেন।' বাংলা সাহিত্যের 'নারী চরিত্রগুলিতে [যখন] হীন প্রবৃত্তির [এই] অসভ্য উল্লাস', যখন 'দেবদেবীগণ...এইভাবে কদর্য রুচির আবরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন পৌত্ত-লিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে মহাপুরুষ রামমোহনের আগমনের সময় হইয়াছিল সন্দেহ নাই।' →

॥ ১৩ ॥

ভারতচন্দ্রকে বাঁচাতে পারতেন একজন—ভারতসূর্য—মানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু তিনি সে ইচ্ছা করলেন না, নৈতিক ও সাম্প্রদায়িক কারণে। শাক্তসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ছিল স্বাভাবিক অপ্রীতি। এবং দৈহিক ব্যাপার সম্বন্ধে শুচিবাতিকতা না থাক, ছিল রুচিবাতিকতা। যৌবনের প্রবল ক্ষুধায় দেহমাংস মুখে তুলেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, ক্লান্ত বৈরাগ্যের সঙ্গে (কবির পক্ষে যেটুকু বৈরাগ্য সম্ভব!) ইনি বলেছেন—'ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে তো মানব।' না, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নিমজ্জমান ভারতচন্দ্রের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না।

কিন্তু একদা, রবীন্দ্রনাথ যখন সদ্য-যুবক, ষোল-সতর বছর বয়স—তখন তিনি গোলে হরিবোল দিয়ে ভারতচন্দ্রকে বরবাদ করতে রাজি

দীনেশচন্দ্রের এই নীতি-বিহ্বলতা নিয়ে কিছু বিদ্রূপ করেছেন সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জন দাশ (তখনও 'দেশবন্ধু' হন নি):

"যাঁহারা বাংলাসাহিত্যের আধুনিক ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহারা ভারতচন্দ্র ও তদনুগামীদের হস্তে হিন্দুর দেবদেবীর নানারূপ অশ্লীল আচরণে বড় ক্ষুণ্ণ হইয়া, দেবদেবীবিরোধী রাজা রামমোহনের আবির্ভাবকে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাহিত্যিকের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া যদি অপাপবিদ্ধ দেবদেবীগণ গর্হিত অশ্লীল আচরণে প্রবৃত্ত হন, তবে পরিতাপের বিষয় সন্দেহ কি! কিন্তু হতভাগ্য দেবদেবী-জন্য আর একটা ধর্ম ও সমাজসংস্কারের আখড়া খুলিবার ব্যবস্থা করিলেই তো চলিত! একেবারে যে কালাপাহাড়ী মুদ্গর রামমোহন তাহাদের বিরুদ্ধে চালাইলেন, তাহাতে ভ্রষ্ট দেবদেবীদের চরিত্র সংশোধনের কোনোরূপ সুব্যবস্থা না করিয়া তাঁহাদিগকে একেবারে প্রাণে মারা বড়ই নিষ্ঠুর কার্য হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।"

পুনশ্চ: "ভারতচন্দ্রে কি অশ্লীলতা ছাড়া আর কোনো গন্ধই পাওয়া যায় না? কি তীব্র আঘ্রাণশক্তি!...[ভারতচন্দ্র লিখেছেন] এই বিশ্বসৃষ্টি শিব আর শক্তির কেলিপ্রসূত। এই 'কেলি' শব্দটির ভিতরে যদি কোনো সাহিত্যের ইতিহাসলেখক কোনো কিছু গন্ধ পান, তবে আমরা নাচার।...ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা জন্ম দিল রামমোহনের শ্লীলতাকে? প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল, তুলিলেই কে জানে কি গরল উঠিবে?" ['শ্রীরামপ্রসাদ: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অপ্রকাশিত রচনা'; গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী সম্পাদিত]

হননি। ঐ বয়সেই রবীন্দ্রনাথ অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ; চমকপ্রদ এক দীর্ঘ রচনা লিখেছিলেন মেঘনাদবধ কাব্যকে আক্রমণ করে (ভারতী পত্রিকায় ১২৮৪ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)—যা বক্তব্যে আংশিক এবং অংশে অকাট্য—সেই রচনায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেঘনাদবধ কাব্যালোচনার উল্লেখ ছিল, এবং হেমচন্দ্র যেভাবে মধুসূদনের তুলনায় ভারতচন্দ্রকে হতাদর করেছেন, তার প্রতিবাদও ছিল :

> "হেমবাবু কহিয়াছেন, 'বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্র-রচিত সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু যাহাতে অন্তর্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, তাদৃশ ভাব তাহাতে কই ?' সত্য, ভারতচন্দ্রের ভাষা কৌশলময়, ভাবময় নহে, কিন্তু [মধুসূদনের] 'জানি কেন তুই' ইত্যাদি পড়িয়া আমরা ভারতচন্দ্রকে মাইকেলের নিমিত্ত সিংহাসনচ্যুত করিতে পারি না।"[৬৪]

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর পরবর্তী দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে ভারতচন্দ্রের কাব্যের উপরে বিস্তারিত মনোযোগ দেবার সুযোগ নেন নি—কোনো সন্দেহ না রেখে তার কারণ—ভারতচন্দ্রের 'অশ্লীলতা।' একবার তিনি একটি চারুবাক্যে ভারতচন্দ্রকে সম্মানিত করেছেন, যেটি এখন ভারত-

---

৬৪। ইন্দ্রজিৎ পঞ্চম সর্গে প্রমীলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যুদ্ধে যাচ্ছেন। বলাবাহুল্য তিনি গজেন্দ্রগামী এবং তাঁর 'সিংহ-জিনি মধ্য সরু।' তাঁর দূরগত মূর্তি দেখে প্রমীলা নিজ অলঙ্কারপ্রীতি প্রচুর বাড়িয়ে নিয়ে বললেন :

'জানি আমি কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্‌রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি—
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি
অভিমানি ? সরু মাজা রে কে বলে
রাক্ষস-কুল-হর্যক্ষে হেরে যার আঁখি,
কেশরি ?'…

তরুণ রবীন্দ্রনাথ এই 'কৃত্রিমতাময় রোদন' দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'এই কি হৃদয়ের ভাষা ? হৃদয়ের অশ্রুজল ?' এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেছিলেন—এহেন ভাষাকারের পক্ষে তিনি ভারতচন্দ্রকে খারিজ করতে পারেন না।

চন্দ্রের সমালোচনায় প্রবচনবাক্য, সেটি পরে উপস্থিত করব, কিন্তু তাঁর সেই সমাদর ভারতচন্দ্রের বাণীশিল্পের কণ্ঠেই মাল্যদান করেছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথমবয়সের ধারণাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরেও বজায় রেখেছেন। মধুসূদনের কাব্য সম্বন্ধে যে-অকরুণ সমালোচনা প্রথম যৌবনে করেছিলেন, পরে সেজন্য খুব সংকোচ প্রকাশ করেও, মধুসূদনের সাহস এবং বিদ্রোহ ভিন্ন আর কিছুকে প্রশংসাবস্তু করতে পারেন নি। ভারতচন্দ্রও সেইভাবে পরে রবীন্দ্রনাথের কিছু হিসেবী প্রশংসা মাত্র পেয়েছেন।

সাহিত্যে অশ্লীলতা-বিতর্ক যখনই উঠেছে তখন নিশ্চয় ভারতচন্দ্রের নাম রবীন্দ্রনাথের মনে উদাহরণ হিসাবে এসে থাকবে। তাঁর নিজের কাব্যের বিরুদ্ধেও অশ্লীলতা বা দুর্নীতির অভিযোগ কম ওঠে নি। আবার অন্যের রচনায় অশ্লীলতার মীমাংসায় তাঁকে আহ্বানও করা হয়েছে (যেমন শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাস করেছিলেন)। স্বভাবতঃই এই প্রশ্নে সময়-বিশেষে তার মন উদ্বেজিত ছিল। তাঁর জীবনের শেষ পর্বে তরুণ বাঙালি-সাহিত্যিকেরা যখন 'য়োরোপীয়' সাহিত্যের প্রভাবে তাঁদের কলমকে সর্বত্রগামী করেছিলেন, যার ফলে বেশ-কিছু একান্ত গোপনীয় প্রকাশ্য সাহিত্য রচিত হয়েছিল, তা রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত না করে পারে নি। কয়েকটি লেখায়[৬৫] তিনি ঐসব 'ল্যাঙট-পরা গুলি-পাকানো ধূলো-মাখা আধুনিকতা'কে বেআব্রু করেছিলেন। তিনি মানতে রাজি হননি, 'নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।' ঘৃণার সঙ্গে বলেছেন, ওগুলো 'সাহিত্যে রসের হোলিখেলায় কাদামাখামাখির' ভোজপুরী 'মাতলামি।' রিয়ালিটির নামে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির নামে, যখন ঐসব কাণ্ড করা হচ্ছিল, জোলা হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন কচি কাঁচা সাহিত্যিকেরা (তাঁরা বদ্ধ জলা পর্যন্ত হতে পেরেছিলেন), তখন রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলেন : যে-পাশ্চাত্ত্যে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাব, সেখানেই ও-বস্তুকে মনে হয়

৬৫। যথা, 'সাহিত্যধর্ম' (১৩৩৪ শ্রাবণ)।

সাহিত্যলক্ষ্মীর বস্ত্রহরণে দুঃশাসনী লালসা, আর এদেশে তো 'অন্তরে-বাহিরে, বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোভাবেই প্রবেশাধিকার পায়নি' —এদেশের সাহিত্যের এই 'ধার-করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে !'

এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ ভারতচন্দ্রের নাম করেছেন—সাহিত্যে লালসার উত্তেজনা যে স্থায়িত্বলাভ করে না, তা বোঝাতে :

"মাঝে-মাঝে এক-একটা যুগে বাহ্য কারণে বিশেষ কোনো উত্তেজনা প্রবল হয়ে ওঠে। সেই উত্তেজনা সাহিত্যের ক্ষেত্র অধিকার করে। য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময় সেই যুদ্ধের চঞ্চলতা কাব্যে আন্দোলিত হয়েছিল। সেই সামরিক আন্দোলনের অনেকটাই সাহিত্যের নিত্যবিষয় হতে পারে না।…আজকালকার য়ুরোপীয় সাহিত্যে যৌনমিলনের দৈহিকতা নিয়ে খুব যে একটা উপদ্রব চলছে, সেটার প্রধান প্রেরণা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, রেস্‌টোরেশন যুগে সেটা ছিল লালসা। কিন্তু সেই যুগের লালসার উত্তেজনাও যেমন সাহিত্যের রাজটীকা চিরদিনের মতো পায়নি, আজকালকার দিনের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ঔৎসুক্যও সাহিত্যে চিরকাল টিকতে পারে না।

"একদিন আমাদের দেশে নাগরিকতা যখন খুব তপ্ত ছিল তখন ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের যথেষ্ট আদর দেখেছি। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মধ্যেও সে ধাঁজ ছিল। তখনকার দিনের নাগরিক-সাহিত্যে এ জিনিসটার ছড়াছড়ি দেখা গেছে। যারা এই নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল, তারা মনে করতে পারত না যে, সেদিনকার সাহিত্যের রসাকাঠের এই ধোঁয়াটাই প্রধান ও স্থায়ী জিনিস নয়, তার আগুনের শিখাটাই আসল। কিন্তু আজ দেখা গেল, সেদিনকার সাহিত্যের গায়ে যে কাদার ছাপ পড়েছিল, সেটা তার চামড়ার রঙ নয়, কালস্রোতের ধারায় আজ তার চিহ্ন নেই।" [সাহিত্য-ধর্ম।']

এই প্রবন্ধ রচনার ৩৫ বছর আগে, ১২৯৯ সালে, 'মানবপ্রকাশ'

প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভারতচন্দ্র (বা জোলা) প্রভৃতিকে কেন অশ্লীল বিবেচনা করেন, তা যথেষ্ট গভীরতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেন। ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অপবাদ অনেকেই দিয়েছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো করে তার গভীর কারণকে কেউ উপস্থিত করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধে বলতে চেয়েছিলেন—মানুষ সাহিত্যে চায় সমগ্র মানুষকে। সমগ্র মানুষকে যেহেতু একালে পাওয়া সম্ভব নয়, তাই তার প্রতিনিধির আকারকে সাহিত্যে ধরতে চেষ্টা করা হয়। কতকগুলি মানসিক বৃত্তি আছে, যেমন, ভালবাসা, স্নেহ, দয়া, ঘৃণা, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি, যাদের বলা যায় জাতিতে 'রাজবংশীয় ক্ষত্রিয়'—উক্ত প্রতিনিধি-মানুষের প্রকৃতির উপর অবস্থানুসারে এদের একাধিপত্য ঘটে। আবার কতক-গুলি বৃত্তি আছে, যারা 'শূদ্র দাস', তারা সাহিত্যের রাজসিংহাসন দেশের দুর্বলতার সময়ে কখনো-কখনো হরণ করে নিতে সমর্থ হলেও 'মানবইতিহাসে কখনো কোনো স্থায়ী গৌরব লাভ করেনি।' পেটুকতা, ধরা যাক, ঐ রকম শূদ্র প্রবৃত্তি। 'যেমন পেটুকতা, অন্য অনেক শারী-রিক বৃত্তিও তেমনি। পেটুকতা অসত্য নয়, মানুষের অনেক মহৎ বৃত্তির তুলনায় তা 'অধিকতর সাধারণব্যাপী', কিন্তু তাকে 'সমগ্র মানুষের প্রতিনিধি করতে আমাদের একান্ত আপত্তি।' তেমনি লালসা নামক প্রবৃত্তিটি। ঐ প্রবৃত্তিকে সাহিত্যের প্রাণ করতে চাইলে সাহিত্যের সমগ্রতা ক্ষুণ্ণ হয়, যদিও অন্যান্যের সঙ্গে মিশে তা অবস্থান করলে কেউ আপত্তি করে না। সেইজন্য মহৎ সাহিত্যের খাঁজে-খাঁজে তথাকথিত অশ্লীলতার অনেক নমুনা পাওয়া সম্ভব কিন্তু দেহের খাঁজকে কে কবে সমগ্র দেহ বলেছে। রবীন্দ্রনাথ তাই বললেন :

> "সাহিত্যের মধ্যে শেক্সপীয়রের নাটকে, জর্জ এলিয়টের নভেলে, সুকবিদের কাব্যে সেই প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব মুক্তিলাভ করে দেখা দেয়। তারই সংঘাতে আমাদের আগাগোড়া জেগে ওঠে। আমরা আমাদের প্রতিহত হাড়গোড়-ভাঙা ছাইচাপা অঙ্গহীন জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করি।
>
> "এইরূপ সুবৃহৎ অনাবরণের মধ্যে অশ্লীলতা নেই। এইজন্য

শেক্সপীয়র অশ্লীল নয়, রামায়ণ মহাভারত অশ্লীল নয়। কিন্তু ভারতচন্দ্র অশ্লীল, জোঁলা অশ্লীল ; কেননা তা আংশিক অনাবরণ।"

এই উদ্দেশ্যমূলক আংশিক উপস্থাপনের বিকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ আর একটি প্রবন্ধে আঘাত করেছেন। 'গ্রাম্যসাহিত্য' (১৩০৫ ; 'লোক-সাহিত্যে'র অন্তর্ভুক্ত) প্রবন্ধে তিনি হরগৌরীর গান এবং রাধাকৃষ্ণের গানের মর্মসত্যকে উদ্ঘাটন করতে গিয়ে এই কথাটাই বলতে চেয়েছেন, উভয় ক্ষেত্রেই আত্মস্ফূর্তির পথে সমাজ নামক একটি প্রবল বাধা আছে। সমাজের বাধার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী প্রেম কিভাবে বৈষ্ণবগানে উচ্ছ্বসিত হয়েছে, তার অপূর্ব বিশ্লেষণ তিনি করেছেন। বৈষ্ণবপ্রেম পরকীয়া, তারই গৌরব বৈষ্ণবসাহিত্যে ঘোষিত, 'সে গৌরব সমাজনীতির হিসাবে নয়,…তাহা নিছক প্রেমের হিসাবে। ইহাতে যে আত্মবিস্মৃতি, বিশ্ব-বিস্মৃতি, নিন্দা ভয় লজ্জা শাসন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য, কঠিন কুলাচার লোকাচারের প্রতি অচেতনতা প্রকাশ পায়, তদ্দ্বারা প্রেমের প্রচণ্ড বল, দুর্বোধ রহস্য, তাহার বন্ধনবিহীনতা, সমাজসংসার স্থান-কাল-পাত্র এবং যুক্তিতর্ক-কার্য-কারণের অতীত একটা বিরাট ভাব পরিস্ফুট হইয়া ওঠে।' এই 'সর্বনাশী, সর্বত্যাগী, সর্ববন্ধনচ্ছেদী' প্রেম পরকীয়া বিধায় সমাজের পক্ষে আপাততঃ অহিতকর মনে হলেও বস্তুত তা নয় বলেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। মানুষ সমাজসৃষ্টি করলেও মানবপ্রকৃতি সমাজ-অসহিষ্ণু। সমাজ ও তার শাস্ত্র তাকে আবদ্ধ করতে গেলে বিদ্রোহ করে বের হয়ে আসার চেষ্টায় যে উৎপাত বাধায়, তার বেগকে অনেকটা প্রশমিত করে দিয়েছে এই ধর্মানুমোদিত পরকীয়া প্রেমের মানসিক আস্বাদন। রবীন্দ্রনাথ অনন্যকরণীয় ভাষায় বলছেন :

"বৈষ্ণবকবিরা সেই বন্ধননাশী প্রেমের গভীর দুর্নিবার আবেগকে সৌন্দর্যক্ষেত্রে অধ্যাত্মলোকে বহমান করিয়া তাহাকে অনেক পরিমাণে সংসারপথ হইতে মানসপথে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন।…তাঁহারা কামকে প্রেমে পরিণত করিবার জন্য ছন্দোবদ্ধ কল্পনার বিবিধ পরশপাথর প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়বিকার কোথাও স্থান পায় নাই তাহা বলিতে পারি

না। কিন্তু বৃহৎ স্রোতস্বিনী-নদীতে যেমন অসংখ্য দূষিত ও মৃত পদার্থ প্রতিনিয়ত আপনাকে আপনি সংশোধন করে, তেমনি সৌন্দর্য ও ভাবের বেগে সেই সমস্ত বিকার সহজেই শোধিত হইয়া চলিয়াছে।"

অতঃপর বৈষ্ণব পরকীয়া প্রেমের সঙ্গে আপাত-সাদৃশ্যযুক্ত বিদ্যা-সুন্দরী অসামাজিক প্রেমের তুলনা :

"বরঞ্চ বিদ্যাসুন্দরের কবি সমাজের বিরুদ্ধে যথার্থ অপরাধী। সমাজের প্রাসাদের নীচে তিনি হাসিয়া-হাসিয়া সুরঙ্গ খনন করিয়াছেন। সে সুরঙ্গ-মধ্যে পূত সূর্যালোক এবং উন্মুক্ত বায়ুর প্রবেশাধিকার নাই। তথাপি এই বিদ্যাসুন্দর কাব্যের এবং বিদ্যাসুন্দর যাত্রার এত আদর আমাদের দেশে কেন? উহা অত্যাচারী কঠিন সমাজের প্রতি মানবপ্রকৃতির সুনিপুণ পরিহাস। বৈষ্ণবকবি যে জিনিসটাকে ভাবের ছায়াপথে সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, ইনি সেইটাকে সমাজের পিঠের উপরে দাগার মত ছাপিয়া দিয়াছেন; যে দেখিতেছে, সেই কৌতুক বোধ করিতেছে।"

এই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ অন্নদামঙ্গল গানের রূপ-সৌন্দর্যের উপরে তাঁর অধুনাখ্যাত মন্তব্যটি করেছেন, যা পরবর্তী 'বিদ্যাবিদগ্ধ রূপসুন্দর কাব্য' অধ্যায়ে আমরা উদ্ধৃত করব।

একই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আর একটি প্রয়োজনীয় আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন, কিন্তু তার বিস্তার এখানে বা অন্যত্র করেন নি। তা না করার মূলে ছিল, আমরা অনুমান করি, রবীন্দ্রনাথের মনের দ্বিধা।

গ্রাম্যসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ এবং ঊর্ধ্বপ্রকাশিত অংশ থাকে। নিম্নাংশে সে সাহিত্য 'বিশেষরূপে সংকীর্ণরূপে দেশীয়, স্থানীয়' সে অংশ উপভোগ করতে পারে কেবল দেশীয় মানুষেরাই; আর সেই 'প্রাদেশিক নিম্নস্তরের' উপরে যে-অংশ ঊর্ধ্বে উত্থিত থাকে, তা সার্বভৌমিক। কিন্তু 'এইরূপ নিম্নসাহিত্য এবং উচ্চসাহিত্যের মধ্যে বরাবর ভিতরকার একটি যোগ আছে।' রবীন্দ্রনাথের মতে, মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্র যতই পণ্ডিত হোন

রাজসভার আশ্রয় পান—তাঁদের সাহিত্যের মধ্যে সার্বভৌমিকতা অপেক্ষা প্রাদেশিকতার ছাপই অধিক। রবীন্দ্রনাথের মুখেই তাঁর কথা শোনা যাক :

"নিচের সহিত উপরের এই যে যোগ, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অন্নদামঙ্গল ও কবিকঙ্কণের কবি [অর্থাৎ কবিকঙ্কণ] যদিচ রাজসভার কবি, যদিচ তাঁহারা উভয়ে পণ্ডিত, সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে বিশারদ, তথাপি দেশীয় প্রচলিত সাহিত্যকে বেশি দূর ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। অন্নদামঙ্গল ও কুমারসম্ভবের আখ্যানে প্রভেদ অল্প কিন্তু অন্নদামঙ্গল কুমারসম্ভবের ছাঁচে গড়া হয় নাই। তাহার দেবদেবী বাংলাদেশের গ্রাম্য হরগৌরী। কবিকঙ্কণচণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, মনসার ভাসান. সত্যপীরের কথা, সমস্তই গ্রাম্যকাহিনী অবলম্বনে রচিত। সেই গ্রাম্য ছড়াগুলির পরিচয় পাইলে তবেই ভারতচন্দ্র-মুকুন্দরাম-রচিত কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবার পথ হয়। রাজসভার কাব্যে ছন্দ মিল ও কাব্যকলা সুসম্পূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু গ্রাম্য ছড়াগুলির সহিত তাহার মর্মগত প্রভেদ ছিল না।"

ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হবে না। ভারতচন্দ্র কতখানি মঙ্গলকাব্যের কবি আর কতখানি তা নন—সেই আলোচনা দীর্ঘবিস্তারিত। ভারতচন্দ্রকে মঙ্গলকাব্যের দায় ২ইতে হয়েছিল, কিন্তু তার প্রাদেশিকতা বা গ্রাম্যতাকে তিনি নাগরিকতার দ্বারা অতিক্রম করেছিলেন—সেই তাঁর প্রশংসা বা নিন্দার কারণ। ভারতচন্দ্রের অত্যুজ্জ্বল নাগরিকতাকে এই প্রবন্ধের অন্যত্র স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই স্বীকার করেছেন।

কিন্তু উদ্ধৃত অংশে আমরা একটি প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি পাই—দেশীয় ছড়ার জীবনছন্দের মধ্যে রয়েছে ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রাণছন্দের পূর্বধ্বনি। কোথায় কিভাবে তা রয়েছে, রবীন্দ্র·াথের রচনায় তার অধিক বিশ্লেষণ নেই। তবে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে অসচেতন ছিলেন না, তার প্রমাণ তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে (১৩০৯) আছে। সামা-

জিক বিপর্যয়, শক্তের অত্যাচারের সঙ্গে বাংলার শাক্ত মঙ্গলসাহিত্যকে যুক্ত করার পরে তিনি লিখেছেন :

"তখনকার বিভীষিকাগ্রস্ত পরিবর্তনব্যাকুল দুর্গতির দিনে শক্তিপূজারূপে এই-যে প্রবলতার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা আমাদের মনুষ্যত্বকে চিরদিন পরিতৃপ্ত রাখিতে পারে না।...যথার্থ ভক্তি সুতীব্র কঠিন শক্তিকে গোড়ার দিকে যদি-বা প্রাধান্য দেয়, শেষকালে তাহাকে উত্তরোত্তর মধুর কোমল ও বিচিত্র করিয়া আনে। বাংলাদেশে অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশ মাতা অন্নপূর্ণার রূপে, ভিখারীর গৃহলক্ষ্মীরূপে, বিচ্ছেদবিধুর পিতামাতার কন্যারূপে—মাতা, পত্নী ও কন্যা—রমণীর এই ত্রিবিধ মঙ্গলসুন্দর রূপে—দরিদ্র বাঙালির ঘরে রসসঞ্চার করিয়াছেন, চণ্ডীপূজার সেই পরিণাম-রমণীয়তার দৃশ্য দীনেশবাবু তাঁহার এই গ্রন্থে ['বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'] বঙ্গসাহিত্য হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ধার করিয়া দেখান নাই। কালিদাসের কুমারসম্ভব সাহিত্যে দাম্পত্যপ্রেমকে মহীয়ান করিয়া এই মঙ্গলভাবটিকে মূর্তিমান করিয়াছিল। বাংলাসাহিত্যে এই ভাবের সম্পূর্ণ পরিস্ফুটতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তথাপি বাঙালির দরিদ্র-গৃহের অবতারণা কবিকঙ্কণচণ্ডীতে কিয়ৎ পরিমাণে আপনাকে অঙ্কিত করিয়াছে, অন্নদামঙ্গলও তাহার উপর রঙ ফলাইয়াছে। কিন্তু মাধুর্যের ভাব গীতিকবিতার সম্পত্তি। চণ্ডীপূজা ক্রমে যখন ভক্তিতে স্নিগ্ধ ও রসে মধুর হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন তাহা মঙ্গলকাব্য ত্যাগ করিয়া খণ্ড খণ্ড গীতে উৎসারিত হইল। এই সকল বিজয়া-আগমনীর গীত ও গ্রাম্য খণ্ডকবিতাগুলি বাংলাদেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।"

এই উদ্ধৃতি উপস্থিত করার পরে আমরা আক্ষেপ করে এই কথাই বলতে পারি—চণ্ডীপূজার পরবর্তী পরিণামরমণীয়তা, যা মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্রের কাব্যে ফুটে উঠেছে, তাকে কেবল দীনেশচন্দ্রই নন, রবীন্দ্রনাথও উদ্ধার করে আনবার চেষ্টা করেন নি, যদিও প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের উপরে রবীন্দ্রনাথের রচনার পরিমাণ নিতান্ত অল্প নয়।

রবীন্দ্রনাথ, উদাহরণ দিয়েই বলা যাক, ভারতচন্দ্র-রচিত 'অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা' অংশটিকে তাঁর মনোযোগের মর্যাদায় ভূষিত করেন নি, যা বহুদিন ধরে কিন্তু কাব্যরসিক বাঙালিকে ভাববিহ্বল করে রেখেছে। অন্নদামঙ্গলের শিব-উমার সংসারদৃশ্যের রসবিশ্লেষণেও তিনি ব্যাপৃত হন নি, যদিও তিনি গ্রাম্য ছড়ার অন্তর্গত শিব-উমার সংসার-দৃশ্যের অতি অপূর্ব বর্ণনা করে গেছেন।

কেন করেন নি, তার কারণ এই প্রসঙ্গের গোড়ায় উল্লেখ করেছি —শাক্তকাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সহজাত মানসিক বিরূপতা। পুরানো বাংলাসাহিত্যের আলোচনাকালে তিনি বৈষ্ণবসাহিত্যকে বহুমান দিয়েছেন। বৈষ্ণবসাহিত্যের গুণগৌরব আমরা স্বীকার করি। গীতিকবি হিসাবে উক্ত সাহিত্যের গীতিধর্মিতা সম্বন্ধে তাঁর স্বাভাবিক সহানুভূতির সম্ভাবনার কথাও জানি, কিন্তু কাব্য-হিসাবে মনসামঙ্গল এবং কবি-হিসাবে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র তাঁর কাছে অধিক মর্যাদা পেতে পারতেন। তিনি অভিযোগ করেছেন—শাক্তকাব্য জাতিকে শক্তি দেয়নি, বীর সৃষ্টি করেনি—এই কথা বলবার সময়ে চাঁদ সদাগরের কঠিন উন্নত চরিত্র তাঁর স্মরণে কেন এল না জানি না।

শাক্তসাহিত্য সম্বন্ধে নিজের বিতৃষ্ণার কারণ রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। কিছু উদ্ধৃতিতে আমাদের কাজ চলে যাবে। 'বাংলা ভাষা-পরিচয়' গ্রন্থের একস্থানে তিনি বলেছেন :

> "মঙ্গলকাব্যের ভূমিকাতেই দেখি, কবি চলেছেন দেশ ছেড়ে। রাজ্যে কোনো ব্যবস্থা নেই, শাস্ত্রকর্তারা যথেচ্ছাচারী। নিজের জীবনে মুকুন্দরাম রাষ্ট্রশক্তির যে পরিচয় পেয়েছেন, তাতে তিনি সবচেয়ে প্রবল করে অনুভব করেছেন, অন্যায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা। বিদেশে উপবাসের পর স্নান করে তিনি যখন ঘুমোলেন, দেবী স্বপ্নে তাঁকে আদেশ করলেন, দেবীর মহিমাগান রচনা করবার জন্য। সেই মহিমাকীর্তন ক্ষমাহীন, ন্যায়ধর্মহীন ঈর্ষাপরায়ণ ক্রূরতার জয়কীর্তন। কাব্যে জানালেন, যে শিবকে কল্যাণময় বলে ভক্তি করা যায়, তিনি নিশ্চেষ্ট, তাঁর ভক্তদের পদে-পদে পরাভব। ভক্তের

অপমানের বিষয় এই যে, অন্যায়কারিণী শক্তির কাছে সে ভয়ে মাথা করেছে নত, সেইসঙ্গে নিজের আরাধ্য দেবতাকে করেছে অশ্রদ্ধেয়।...মনসামঙ্গলের মধ্যেও এই একই কথা। দেবতা নিষ্ঠুর, ন্যায় ধর্মের দোহাই মানে না, নিজের পূজা প্রচারের অহঙ্কারে সব দুষ্কর্মই সে করতে পারে।"

রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বলতে চেয়েছেন, সমাজ বা রাষ্ট্রের মাৎস্য-ন্যায়ের রূপ ফুটেছে মঙ্গলকাব্যে—শক্তিচর্চায় অসমর্থ দুর্বল পরিত্রাণ চেয়েছে শক্তিদেবীর কাছে মঙ্গলগান ঘুষ দিয়ে। অর্থাৎ জনসাধারণের ধর্মানুভূতি নয়, বিশ্বব্যাপী দুর্জ্ঞেয় শক্তির সম্বন্ধে কোনো রহস্যচেতনা নয়, কেবল সমাজ বা রাষ্ট্রের আপৎকালেব প্রতিক্রিয়া ফুটেছে মঙ্গল-কাব্যে। এই ব্যাখ্যা কি সর্বথা গ্রাহ্য হবার যোগ্য? দেবীকে শুধুই নিগ্রহদেবী ভেবে নিয়ে তাঁর কাছে বাঁচবার জন্য কাতর প্রার্থনা করা হয়েছিল—সত্যই কোনো ভক্তির অনুভূতি ছিল না? কথাটা কি সত্য? 'লীলা' নামে একটা ঐতিহ্যাশ্রয়ী অনুভূতি ভারতীয় মনে জাগ-রূক আছে—শক্তিলীলার মধ্যে কি তার কোনো স্থান নেই—যে-লীলা-বাদে বিশ্বাস থাকার জন্যই, অপরপক্ষে আমরা জানি, বৈষ্ণবের পক্ষে অবিচারী কৃষ্ণের বহুতর অনুচিত আচরণকে সানন্দ অনুরাগের চোখে দেখা সম্ভবপর হয়েছে। তান্ত্রিক-বাঙালির মৃত্যুপূজারী ভক্তির আত্মোৎ-সর্গ-প্রবৃত্তিকেই বা বিস্মৃত হব কিভাবে, পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ যার চরম বাণীরূপ দান করেছেন—'সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখ-বনমালী তোমার মায়ার ছায়া।'

এসব কথা উত্থাপন করছি—রবীন্দ্রনাথেব পক্ষে কেন মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্রের কাব্যরস উপভোগ করা সম্পূর্ণ সম্ভব নয়, তা দেখিয়ে দেবার জন্য। বাঙালির মাতৃভাবনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনের আংশিক অসাড়তা এই সকল কাব্যের প্রতি সুবিচারে তাঁকে উদাসীন রেখেছিল।

দু'একটা কথা এখানে বাড়তি বলে নিতে চাই, ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে যা হয়ত সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক হবে না, কিন্তু মঙ্গলকাব্যবিচারে সেগুলি

প্রয়োজনীয় কথা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মদৃষ্টি-অনুযায়ী মঙ্গলকাব্যের যে মূঢ় অবিচারী শক্তির প্রতি ধিক্কার জানিয়েছেন, তা কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের উপযোগী উপাদান হতে পারত, কিন্তু হয় নি, ঐ সকল শক্তি-দেবী সম্পর্কে বাঙালির মনে ভক্তির অনুভূতি ছিল বলেই। গ্রীকসাহিত্যে যুক্তিবোধহীন খেয়ালী স্বার্থপর দেব-দেবী ভয়ভীষণ নিয়তিলীলার চেতনা দান করেছেন। বাংলা মঙ্গলসাহিত্যের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাকারে তা ঘটতে পারত, ঘটেনি এইজন্য যে, গ্রীক দেবদেবীর অননুরূপ এদেশের দেবদেবীগণ সাধারণ মানুষের ভক্তি আকর্ষণ করে আছেন। সুতরাং এঁদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পাঠক বা শ্রোতার সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারে না; সে-সংগ্রাম মঙ্গলশক্তির বিরুদ্ধে অমঙ্গলের সংগ্রামের রূপ নিয়েই মানুষের কাছে হাজির হয়। দেবতারা এদেশের জনমানসে অবিবেকী নিয়তিশক্তির বিগ্রহ নন, সেইজন্য তাঁদের বিরুদ্ধে এদেশীয় মানুষের সংগ্রাম ও পরাজয়ের কাহিনী পাশ্চাত্ত্য অর্থে ট্রাজিকমহিমা লাভ করে নি।

॥ ১৪ ॥

বিংশ শতাব্দে পৌঁছে ভারতচন্দ্র কিছু সুদিনের মুখ দেখলেন—কয়েকজন লেখক তাঁর সমর্থনে তরবারি হাতে নিলেন। এবং ভারতচন্দ্রের সত্যকার মূল্যায়ন আরম্ভ হল। এমন হবার কারণ এই—ভারতচন্দ্র এখন আর সাহিত্যের নিয়ন্ত্রী শক্তি নন—তাঁর সাহিত্য উত্তম সাহিত্য-নমুনা, কিন্তু ইতিহাসের যাদুঘরে রক্ষিত, বর্তমানে ব্যবহার্য নয়। উনিশ শতকের শেষ চল্লিশ বৎসরে মধুসূদনেব কবিমহিমা ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভারতচন্দ্রকে সর্বোচ্চ কবিপদবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে, এমনকি সমালোচকদের 'স্বাভাবিকতা'-প্রীতি নিতান্ত মধ্যযুগীয় মুকুন্দরামকেও বনমাল্যে ভূষিভ করেছে—সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক প্রতিভা কাব্যসাহিত্যের যে-নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে, সেদিকে অগ্রসর হবার সময়ে পিছন ফিরে ভারতচন্দ্রকে নমস্কার করবার প্রয়োজন পর্যন্ত নেই। এখন নতুন যুগ, নতুন চেতনা, নতুন কবি।

ঠিক এমন সময়েই সমালোচকগণের মধ্যে সুবিচারবাসনার উদ্রেক হয়। নেবার দায় না থাকলে দেবার উদারতা জাগে। তাই ভারতচন্দ্রকে তাঁর পাওনা ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছা কারো-কারো মধ্যে জাগল। তাঁদের একজন, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সাহিত্য পত্রিকায় ১৩১১-১৩ সালে দীর্ঘ কয়েকটি প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের পক্ষ সমর্থনের প্রবল চেষ্টা করেছিলেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদকে পেয়ে স্বর্গস্থ (কিংবা নরকস্থ) ভারতচন্দ্র কতখানি সুখবোধ করেছিলেন জানি না, কারণ প্রচুর সাহিত্যচেষ্টা সত্ত্বেও হেমেন্দ্রপ্রসাদ সাহিত্যিক নন। তবে 'সংবাদ-সাগর' উপাধিটি যেহেতু কেউ তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না, তাই ঐসকল প্রবন্ধ বেশ-কিছু সংবাদ সরবরাহ করেছিল, যার কোনো-কোনোটা পরে অন্যের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে।

ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগেব অনেকগুলি হেমেন্দ্রপ্রসাদ খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছেন, তার একটি—ভারতচন্দ্র নাকি বর্ধমান-রাজকন্যাকে দিয়ে কেলেঙ্কারী করিয়েছেন। অভিযোগটি পুবাতন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ যদিও বলতে চেয়েছেন, রমেশচন্দ্র দত্তই প্রথম এই অভিযোগ করেন (১৮৭৭ খ্রীঃ), আমরা কিন্তু দেখতে পাই, তার অনেকদিন আগে রাজেন্দ্রলাল মিত্র চৈত্র ১৭৮০ শকে বিবিধার্থ সংগ্রহে লিখেছেন, 'কথিত আছে যে, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কোনো প্রধান পরিবারের দোষোদ্ভাবণের নিমিত্ত লিখিত হইয়াছিল।'[৬৬] রাজেন্দ্রলাল যদি 'কথিত আছে' লেখেন, ধরে নিতে হবে, উক্ত অভিযোগ আরও পুরাতন। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর পুস্তকে (১৮৭২) এই বিষয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করে, অনেক ইতস্ততঃ করার পরে, প্রায় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন—উক্ত প্রবাদের মধ্যে কিছুটা সত্যতা থাকলেও থাকতে পারে।[৬৭] এক্ষেত্রে হেমেন্দ্রপ্রসাদের বিশেষ আপত্তি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

৬৬। সাহিত্য-সাধক চরিতমালা: রাজেন্দ্রলাল—পৃঃ ৫৬

৬৭। "অনেকে বলিয়া থাকেন যে, বর্ধমানাধিপের প্রতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ঈর্ষাভাব ছিল। সেইহেতু তিনি উক্ত রাজকুলে কলঙ্কারোপ করিবার অভিপ্রায়ে আপন সভাসদ ভারতচন্দ্রের দ্বারা বিদ্যাসুন্দরের উপখ্যান মনোমতরূপে বর্ণনা করান এবং

বিরুদ্ধে, যিনি 'অত্যন্ত অসংযত ভাষার ব্যবহার' করে ঐ অভিযোগ সমর্থন করার চেষ্টা করেছেন।[৬৮] হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উক্ত বক্তব্য বেরিয়েছিল জ্যৈষ্ঠ ১৩০০, সাহিত্য পত্রিকায় 'কবি কৃষ্ণরাম' প্রবন্ধের মধ্যে। তার কয়েক মাস আগেই একই পত্রিকায় চৈত্র ১২৯৯ সংখ্যায় অধিকতর তীক্ষ্ণ নিপুণ আক্রমণ চালিয়েছিলেন নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি এই প্রসঙ্গটিকে সাধারণ জীবনীঘটিত সংবাদ থেকে সরিয়ে

বর্ধমানেব রাজবংশীয়েরাও ঐ উপাখ্যানকে আপনাদের বংশের কলঙ্ককর বোধ করিয়া অনেকদিন পর্যন্ত বর্ধমান নগরের মধ্যে বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা করিতে দেন নাই। কিন্তু একথা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বীরসিংহ নামে বর্ধমানে কোনো রাজা ছিলেন কিনা সন্দেহস্থল। থাকিলেও তাঁহার সহিত বর্ধমান রাজপরিবারের কোনো-রূপ সম্পর্ক ছিল, এমত বোধ হয় না।" (রামগতি)

এর পরেই কিন্তু রামগতি বলতে চেয়েছেন, যদি ও-বস্তু ঘটেই থাকে, কলঙ্কের কি আছে? স্বয়ং কালী যার সঙ্গে জড়িত তাতে কালি লাগে কখনো? বরং উল্টোই হবে, ওর ফলে কুল হয়েছে 'পবিত্র, মহোজ্জ্বল, পরম গৌরবান্বিত ও চির-স্মরণীয়।' তবে—হাঁ, 'একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতচন্দ্র বর্ধমান-রাজভবনে কর্মচারীদিগের চক্রান্তে পড়িয়া বহুল ক্লেশভোগ করিয়াছিলেন, সেই ক্রোধে সুন্দরকে দেখিয়া নাগরীগণের স্ব-স্ব পতিনিন্দাকরণাবসরে মুন্সী, বক্সী, পোদ্দার, দপ্তরী পর্যন্ত সকল রাজকর্মচারীর স্ত্রীগণের চরিত্রের প্রতি গুণাকর কটু কটাক্ষপাত করিয়াছেন।"

৬৮। "বর্ধমানের সঙ্গে বিদ্যাসুন্দরঘটিত কলঙ্কের যোগাযোগ কুটিল, মুখুটী-বংশীয় ভারতচন্দ্রের কল্পনাপ্রসূত। ভারতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন।…মুখুর্যেরা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বড়ই কুটিল। কথায় আছে, 'মুখুটী কুটিল বড় বন্দ্যঘাটী সাদা।' এ কবিতা আর অধিক উদ্ধৃত করিব না। ভারত জাতিতে মুখুর্যে, তাহাতে বর্ধমানরাজ তাঁহার পিতাকে সর্বস্বান্ত করেন, এবং তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। সুতরাং তাঁহার রাগ বাড়িয়া যায়, তাই বিদ্যাসুন্দরের কেলেঙ্কারী বর্ধমানরাজের ঘাড়ে চাপাইয়া ভারত তাহার অনেকটা প্রতিশোধ লয়েন। বর্ধমানরাজ যে, ভারত-চন্দ্রের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেকথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা যে, নিশ্চয়ই বর্ধমানে ঘটিয়াছিল, এ ধারণা অনেকেরই আছে।" ['কবি কৃষ্ণরাম': হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]

এনে সাহিত্যপ্রসঙ্গের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য—উদ্দেশ্যের সংকীর্ণতা বা নীচতা মহৎ সাহিত্যের পরিপন্থী। ভারতচন্দ্র সাহিত্যে সেই অসৎ মনোভাব সঞ্চারিত করেছিলেন।[৬৯] হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এইসকল আক্রমণের মোকাবিলা করতে পেরেছিলেন কিনা সে বিচারের ইচ্ছা নেই। কেবল আমরা জানি, বর্ধমানের সঙ্গে বিদ্যাসুন্দরের যোগ আছে বলে এখনো অনেকে 'একা যাব বর্ধমান্ করিয়া যতন' বলতে-বলতে টিকেট কেটে ফেলেন। বর্ধমানকে সাহিত্যের ভূগোলে ভূস্বর্গ ভারতচন্দ্রই করেছেন। ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ—তিঁনি পরস্বাপহরণ করেছেন—প্রধান উত্তমর্ণ মুকুন্দরাম। ভারত-মুকুন্দরাম প্রসঙ্গ পরে আবার আনব। এখানে এইটুকু অগ্রিম বলে নেওয়া যেতে পারে, উক্ত অভিযোগ সাহিত্যের অভিযোগ হতে পারে না, কারণ কাঁচামালকে পাকামালে পরিণত করার পারমিট বহুদিন আগেই সাহিত্যিকেরা পেয়ে আছেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ তা দেখিয়েও দিয়েছেন। এই লেখকের আসল প্রয়াস—ভারতচন্দ্রকে অশ্লীলতার অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া। এক্ষেত্রে দুটি যুক্তি দেখিয়েছেন :

এক, ভারতচন্দ্র কালদোষে অশ্লীল, যেমন শেক্সপীয়র,[৭০] দুই, ভারতচন্দ্রের কাব্য আসলে আধ্যাত্মিক-রূপক, মোটেই লৌকিক ব্যাপার নয়। হেমেন্দ্রপ্রসাদের এই বক্তব্যে স্পষ্ট স্বতোবিরোধ আছে—আধ্যাত্মিক-

---

৬৯। "ভারতের কাব্য ব্যঙ্গকাব্য। কিন্তু হোরেস ড্রাইডেন প্রভৃতি ব্যঙ্গকারগণের মতে, ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ (Lampoon) সকল সময়ে অনুমোদনীয় নহে। ব্যক্তিবিশেষ সমাজের পীড়াদায়ক না হইলে ব্যক্তিগত ব্যঙ্গকাব্য অভদ্রতা। ভারতের বিদ্যা-সুন্দর-রচনা—ভীরুর বৈরনির্যাতন। ভারতচন্দ্র ব্যঙ্গকাব্যের নিয়ম ব্যতিরেকে বাঙালীর ড্রাইডেন।" [ভারতচন্দ্র : নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়]

৭০। শেক্সপীয়ারের কালের নাট্যামোদীদের বিষয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদ-সংকলিত বিবরণটি বড়ই উপভোগ্য :

"শেক্সপীয়র স্বয়ং রঙ্গালয়-সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রঙ্গালয় টেমস নদীর তীরে অপরিচ্ছন্ন স্থানে সংস্থাপিত ও কর্দমাক্ত পয়ঃপ্রণালীতে বেষ্টিত ছিল।…বৃষ্টি হইতে অনাবৃতস্থানে উপবিষ্ট দর্শকগণ বারিসিক্ত হইত। পথিপার্শ্বে মুক্ত পয়ঃপ্রণালীর দূষিত

রূপকই যদি হয় তাহলে কালদোষে কাব্যমধ্যে অশ্লীলতাদোষ এসে গেছে, প্রমাণ করবার জন্য অত ব্যস্ততা কেন ?

হারাণচন্দ্র রক্ষিত তাঁর 'ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা-সাহিত্য' (আশ্বিন ১৩১৮) গ্রন্থেও ভারতচন্দ্রের হয়ে অনেক লড়াই করেছেন। হারাণচন্দ্র এককালে কিছুটা লেখকখ্যাতি পেয়েছিলেন (কেন কে জানে !) এবং রক্ষণশীল বলেই তাঁর দুর্নাম ছিল, সুতরাং তিনি ভারতচন্দ্রের পক্ষসমর্থন করছেন, বিস্ময়ের কথা মনে হতে পারে। তাহলেও ঘটনা তাই। একটি বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করি, সেকালের আধুনিকেরা ছিলেন অশ্লীলতা-বিরোধী আর রক্ষণশীলেরা তথাকথিত অশ্লীল সাহিত্যের আস্বাদক ; উল্টোদিকে, একালের আধুনিকেরা মুক্তপুরুষ, শ্লীলতার সংস্কারকে ত্যাগ করেছেন, আর রক্ষণশীলেরা ঐ ত্যক্ত বস্তু আঁকড়ে থাকতে ব্যাকুল !!

হারাণচন্দ্র অন্য অনেকের মতো ভারতচন্দ্রকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষা-শিল্পী মনে করতেন, কেবল তাই নয় : 'প্রকৃত মহাকবি আখ্যা যদি কাহাকে দিতে হয়, তবে আমরা নিঃসঙ্কোচে ভারতচন্দ্রকে দিব।' যেসব রুচিবাগীশ সাহিত্যিক অশ্লীলতার অপবাদে ভারতচন্দ্রকে নির্বাসন দিতে চান, তাঁদেরই সাহিত্যের মধ্যে, হারাণচন্দ্রের মতে, 'শতগুণে অধিক

বায়ুতে তাহারা অভ্যস্ত ছিল, তাহারা সহজে অসুস্থ হইত না। অভিনয় আরম্ভের পূর্বে দর্শকগণ মদ্যপান করিত, ফলাহার করিত। সময়-সময় পরস্পরকে প্রহারও যে করিত না এমন নহে। কখনো-কখনো অভিনেতাকে প্রহৃত হইতে হইত। সময়-সময় কবিকে কম্বলে তুলিয়া উৎক্ষিপ্ত ও পাতিত করাও হইত। মদ্যপানের পর মত্ততা গাঢ় হইলে দর্শকদিগের বমনাদির জন্য মুক্তমুখ পিপা আনয়ন করা হইত। দুর্গন্ধে লোক অস্থির হইলে রঙ্গমঞ্চে গন্ধকাষ্ঠ জ্বালাইয়া ধূমে দুর্গন্ধ দূর করা হইত। রাজা-প্রজা সকলেই সমান। সকলেরই সংযমের অভাব স্বপ্রকাশ। ভদ্রসমাজের উচ্চতরস্থদিগের গৃহে যে-সঙ্গীত গীত হইত এখন তাহা কেবল মদ্যবিক্রয়বিপণীতে শ্রুত হয়। এই সমাজের জন্য, এইসব দর্শকের জন্য, শেক্সপীয়ার তাঁহার নাটক রচনা করিয়াছিলেন।" ['ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা' ; সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২]

পূতিগন্ধময় পাপ-আবর্জনারূপ অশ্লীলতা প্রচ্ছন্নবেশে রহিয়াছে।' এখানে অন্যান্যদের বাদ দিয়ে 'বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের দুইজন বাঘা-ভাল্‌কো লেখকের' রচনা থেকে 'বিদ্যাসুন্দর হইতে শতগুণ পঙ্কিল চরিত্র উদ্ধৃত' করে দেখাতে চেয়েছেন। যথা—বঙ্কিমচন্দ্রের দেবেন্দ্র দত্ত বৈষ্ণবী সেজে ভদ্রলোকের অন্দরে প্রবেশ করে কাঁটাবনে কলঙ্কের ফুল তুলতে চেয়েছিল, এই অংশটির এবং 'রবীন্দ্রনাথের বড় আদরের চোখের বালির প্রচ্ছন্না রঙ্গিনী বিনোদিনী দুটো ভদ্রঘরের ছেলেকে লইয়া দীর্ঘকাল লাট্টু খেলা' খেলেছিল—এই বিষয়টির উল্লেখ করেছেন। এইসব দৃষ্টান্ত দেওয়ার পরে হারাণচন্দ্রের প্রশ্ন—'প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ববর্তী কবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচনায় যে কি মহাপাতক হইয়াছিল, বুঝিতে পারিলাম না।'

হারাণচন্দ্রের মতে, দোষ বিশেষভাবে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের, যিনি বঙ্কিমের আমলের বঙ্গদর্শনে ভারতচন্দ্রকে 'জাহান্নামে পাঠানোর' ব্যবস্থা করেছিলেন বঙ্কিমের সমর্থনে। ক্ষতি খুবই হয়েছিল। একে অক্ষয় সরকার শক্তিশালী লেখক, তায় বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতি—যে-'বঙ্কিমচন্দ্রের ইঙ্গিতে, তাঁহার ঈষৎমাত্র অঙ্গুলিহেলনে শিক্ষিতসমাজ ওঠবোস করিত। ...সেই বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন যখন ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে, তখন আর ভারতের মূল্য কোথায়?'

হারাণচন্দ্র তাঁর 'বন্ধুবর' দীনেশচন্দ্রকে নিয়েও পড়েছেন। দীনেশচন্দ্রের কিছু বক্তব্য আগে উদ্ধৃত করেছি। হারাণচন্দ্র তার তাবিফ করে বলেছেন—'সর্বাপেক্ষা বাহাদুরী দেখাইয়াছেন আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন। তিনি একেবারে অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া—উলঙ্গভাবে ভারতের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছেন।...আমাদের অকৃতজ্ঞতা-পাপের সীমা নাই—বঙ্গের সর্বপ্রধান মহাকবিকে সামান্য অশ্লীলতার ধুয়া ধরিয়া আমরা তাঁহাকে কোথায় ফেলিয়াছি!'

হারাণচন্দ্রের সোজা প্রশ্ন—আদিরসের সঞ্চার করতে গিয়ে কি কবি গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীর সুর আনবেন? 'বিবাহের বাসরশয্যায়, শ্যালি-শালাজের সম্মুখে, বরের মুখে শ্মশানবৈরাগ্যের গান কেমন শোনায়?

অথবা শ্মশানে স্নেহাস্পদ আত্মীয়ের শবদাহ করিবার সময়ে নিধুর টপ্পাই-বা কেমন মানায় ?

অতঃপর খোলাখুলি প্রতি-আক্রমণ :

"বিদ্যাসুন্দরের আদিরসের আধিক্য আমরাও স্বীকার করি ; আদর্শমূলক কাব্যও ইহা নয়, তাহাও মানি ;—গল্পের উদ্ভাবনা ভারতের নিজের নয়, তাহাও জানি ; কিন্তু তাহাতে কবিত্বের কি যায়-আসে ? চরিত্রচিত্রণের তাহাতে কি অঙ্গহানি হয় ? আদি-রসের আধিক্য দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিলে কালিদাসের শকুন্তলাও পড়া উচিত হয় না ; শেক্সপীয়রের রোমিও জুলিয়েট অথবা ক্লিওপেট্রার পাতাও মুড়িতে হয় ; আর বাঙ্গালার হেম-নবীন-রবীন্দ্র-বঙ্কিম—ইহাদিগকেও দূর হইতে নমস্কার করিতে হয়। বলিবে—'বিদ্যাসুন্দর অশ্লীল—উহাতে বিপরীতবিহার অবধি আছে।' আমি বলিব, ঐটি তোমার বড় ভাল লাগিয়াছে বলিয়া, এবং মনে-মনে তুমি উহার রসটি সম্পূর্ণ উপভোগ করিয়াছ বলিয়াই, কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ 'অশ্লীল' বলিয়াই প্রকারান্তরে তুমি কবিকে ব্যাজস্তুতি করিতেছ ! নইলে অত-শত ছাড়িয়া, যে অন্নদা-মঙ্গল বা অন্নপূর্ণামাহাত্ম্য—অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা, শিব-বিবাহ, দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গ, ব্যাসের কাশীনির্মাণ, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত —অত সুন্দর-সুন্দর সেইসব বীর-করুণ-শান্ত রস ভুলিয়া গিয়া—ঐটিই তোমার মনে জাগরূক হইবে কেন ?"

হারাণচন্দ্র রক্ষিত অবশ্যই গণ্য লেখক নন, এবং তাঁর উচ্ছ্বাসবহুল বিচারশূন্য রচনাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়াও সম্ভব নয়, কিন্তু তাঁরও রচনার মধ্যে একটা শক্তির অংশ ছিল, সেখানে তাঁকে, রক্ষণশীল মানুষটিকে, মনে হয় আধুনিক। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে প্রায় শত বৎসরের নানা আলো-চনা পরীক্ষা করবার সময়ে আমরা লক্ষ্য করেছি, লেখকদের মনের কুরুক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে মুকুন্দরামের সর্বদাই একটা দ্বৈরথ সমর চলেছে। এই লড়াইতে ওঠা-পড়া আছে—কখনো মুকুন্দরাম উপরে, কখনো ভারতচন্দ্র। 'স্বাভাবিকতা'-ভক্তরা মুকুন্দরামকে উপরে দেখেন,

আর শিল্পরসিকেরা ভারতচন্দ্রকে। বিস্ময়কর এই—হারাণচন্দ্র প্রত্যাশিতভাবে স্বাভাবিকতা-ভক্ত নন। হারাণচন্দ্রের 'এই বিষয়ক বক্তব্য আমরা কিছু বেশি পরিমাণে উপস্থিত করব, কারণ অতঃপর ভারতচন্দ্রের সমর্থকেরা এই বিশেষ ক্ষেত্রে হারাণচন্দ্রের কথারই প্রতিধ্বনি করবেন, অবশ্য উজ্জ্বলতর ভাষায় :

"অক্ষয়বাবু লিপিকুশল বটেন [অক্ষয় সরকারের ভারতচন্দ্র-বিরোধী রচনা উদ্ধৃত করার পরে হারাণচন্দ্র লিখেছেন], লেখাও তাঁহার চমৎকার বটে, কিন্তু তাঁহার বিচার বা বিশ্লেষণ এখানে তেমন পাকা নয়। ফলে তাঁর দেখাদেখি—রামু শামু দামু যে-কেহ কবিকঙ্কণ বা ভারতচন্দ্রের কথা লিখিতে যায়, সেই কবিকঙ্কণকে বড় করিয়া ভারতকে সর্বপ্রকারে নিম্নে ফেলিয়া দেয়!...'বাপকে বড় করিতে হইবে বলিয়াই খুড়াকে ছোট করিতে হয়?' বাপ তো বড় আছেনই; বলিলেও আছেন, না বলিলেও আছেন। পরন্তু পিতৃব্যও যদি সেই পিতৃগুণে—অথবা তাঁহার অপেক্ষা অধিক গুণে গুণবান হন—ধর্মনিষ্ঠ সন্তানের কি তাহাও মানিয়া লওয়া কর্তব্য নয়? কবিকঙ্কণও তো বড় আছেনই; ভারত তাঁহা হইতে মূল আখ্যান, ভাব ও চরিত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন—তাহাও ঠিক; —সে তো সকলেরই জানা কথা—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, সবটা জড়াইয়া ধরিলে, ভারত বড় নয় কি? নিরপেক্ষ হইয়া, সত্যের পানে চাহিয়া, এটি বলিতে হইবে। তোতাপাখির মতো পরের কথা আবৃত্তি করিলে চলিবে না। 'অমুক বলিয়াছেন,' 'অমুকের মতো পণ্ডিতব্যক্তি এই মত দিয়াছেন'—ইহা বলিলেও শুনিব না।...

"অক্ষয়বাবু কবিকঙ্কণের বড় ভক্ত, তাহা আমরা অনেককাল হইতে জানি। তাঁহার 'নবজীবন' নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে একসময়ে তিনি কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সহিত অনেক মসী-যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাও অবগত আছি। রবীন্দ্রবাবুও তাহার উত্তর বোধহয় তৎকালিক 'বালক' নামক মাসিকপত্রে দিয়াছিলেন, তাহারও কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি;—সত্যের অনুরোধে বলিব, সে

বিষয়ে আমরা রবীন্দ্রবাবুর সহিত একমত। অক্ষয়বাবু কবিকঙ্কণকে বড় করিতে গিয়া যেন নিজেই নিজেকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। সেই—'দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান। আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান॥'—ইহা খাঁটি কবিত্ব বলিয়া অক্ষয়বাবু স্বীকার করেন; রবীন্দ্রবাবু বলেন, ঘটনাটি ঠিক-ঠিক হইলেও, এরূপ বর্ণনা কবিত্বের পরিচায়ক নহে। বলাবাহুল্য এ বিষয়ে রবীন্দ্রবাবুর উক্তিই ঠিক।"[৭১]

"কবি মুকুন্দরাম…প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, মনের কপাট খুলিয়া মা-নাম গাহিয়াছিলেন।…অবশ্য ভাবের কাণ লইয়া, একটু ধৈর্য ধরিয়া কবিকঙ্কণের এই মাতৃগীতি শুনিতে হইবে। নহিলে সত্যের অনুরোধে বলিব, এই কাব্য পড়িতে-পড়িতে ধৈর্যচ্যুতি হয়। মূল প্রসঙ্গ ছাড়িয়া অনেক অবান্তর বিষয়ের বর্ণন-

---

৭১। হারাণচন্দ্র, চৈত্র ১২৯৩-এ লেখা রবীন্দ্রনাথের 'কাব্য: স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট' প্রবন্ধের মধ্যে মুকুন্দরাম সম্বন্ধে মন্তব্যের উল্লেখই করেছেন। এক সমালোচক কবিকঙ্কণের 'দুঃখ করো অবধান, দুঃখ করো অবধান, আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান' অংশটি উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, 'কবিকঙ্কণের দারিদ্র্যদুঃখবর্ণনা—যে কখনো দুঃখের মুখ দেখে নাই, তাহাকেও দীনহীনের কষ্টের কথা বুঝাইয়া দেয়।' 'ইহাই সার্থক প্রতিভা।' তরুণ রবীন্দ্রনাথের কাছে এই 'কথাগুলি হয় গোঁড়ামি, না-হয় তর্কের মুখে অত্যুক্তি' বলে মনে হয়েছিল। তীব্র বিদ্রূপ করে লিখেছিলেন: "ইহার মধ্যে অনেকখানি আমানি আছে, কিন্তু কবির অশ্রুজল নাই। ইহাই যদি সার্থক কবিত্ব হয় তবে 'তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে'—সে তো আরো কবিত্ব। ইহার ব্যাখ্যা এবং ভাষ্য করিতে গেলে হয়ত ভাষ্যকারের করুণরস উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সকলেই স্বীকার করিবেন, ইহা কাব্যও নহে, কাব্যিও নহে, যাঁহার নামকরণের ক্ষমতা আছে, তিনি ইহার আর-কোনো নাম দিন। যিনি ভঙ্গি করিয়া কথা কহেন তিনি না-হয় ইহাকে কাব্যি বলুন, শুনিয়া দৈবাৎ কাহারও হাসি পাইতেও পারে।"

এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মত পরেও বদলায়নি—কেবল বয়োগুণে ভাষাকে কিছু নরম করেছিলেন। বৈশাখ ১৩৩৫-এ লেখা 'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধে তিনি একই কথা কিঞ্চিৎ মার্জিত আকারে আবার বলেছেন।

হেতু এবং ভাষায় অপরিস্ফুটতা-নিবন্ধন এ ত্রুটি হইয়া পড়িয়াছে। ভাষা সর্বত্র মার্জিত নয়, লিপিকুশলতা ও রচনানৈপুণ্যও তেমন উচ্চাঙ্গের নয়—সেও এক কারণ।

"একটা বড় কঠিন কথা এখানে বলিয়া ফেলিব। কথাটা স্বাভাবিকতা (Natural) লইয়া। একদল লোক আছে, তাহারা, তলাইয়া না বুঝিয়া যখন-তখন এই কথাটা বড় বেশিমাত্রায় ব্যবহার করে, আর সাধারণ লোকসমাজে খুব বাহবা পায়। 'অমুক চরিত্রটি বড় স্বাভাবিক'; 'অমুক অভিনেতা বড় স্বাভাবিক অভিনয় করে', 'অমুকের কণ্ঠস্বব স্বভাব হইতে গৃহীত'; 'অমুকের চিত্রবিদ্যা—স্বভাবের নিখুঁত ছবি';—ইত্যাদি। এখন জিজ্ঞাস্য—এই 'স্বাভাবিকতাটিতে' তাঁহারা কি বুঝেন—কি দেখিতে পান? সংসাব বা সমাজ অথবা চতুষ্পার্শ্বের লোকমণ্ডলী যেমন আছে, ঠিক তেমনটি দেখিতে পাইলেই কি ঐ প্রশংসাসূচক স্বাভাবিক আখ্যা দেওয়া যায়?—অথবা তাহার সহিত একটু রঙ ফলাইয়া একটু কলাকৌশল (Art) দিয়া তাহা দেখাইলে অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয়? নিশ্চয়ই শেষের কথাটা সত্য—স্বভাবের সহিত একটু কলাকৌশল থাকিলেই লোকের মনোরম্য হয়। সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রবিদ্যা, অভিনয়, চরিত্রের উন্মেষণ সকলই এই পর্যায়ভুক্ত। Nature-এর সহিত একটু Art-এর সম্বন্ধ রাখা চাই। সমঝদার শ্রোতা, পাঠক, দর্শক সকলেই ইহা বুঝেন। বুঝে না, অথবা বুঝিয়াও মানিতে চাহে না—কেবল কতকগুলা চিন্তাহীন প্রাণী।···

"কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের এরূপ একশ্রেণীর সমালোচক আছেন তাঁহারা 'স্বাভাবিক, স্বাভাবিক' করিয়া মুকুন্দরামকে এত উচ্চে তুলেন যে, তাঁহার পরবর্তী ভারতপ্রসিদ্ধ ভারতচন্দ্রকে তাঁহারা দূর্-দূর্ করিয়া তাড়াইয়া দেন, 'ভদ্রসাহিত্য' হইতে তাঁহাকে 'নির্বাসিত' করিতে চেষ্টা পান। কেন যে তাঁহারা কবিকে এতটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন, কারণ তো ভাবিয়া পাই না। অথচ ভারতের তুলনায় কবিকঙ্কণের যে দোষ ও ত্রুটি, কৌশলপূর্বক তাহার সমর্থন করিয়া,

প্রকারান্তরে ভারতকেই অপদস্থ করিতে প্রয়াস পান। অনেকদিন হইতে 'সাহিত্যিক দলের' এই একদেশদর্শিতা দেখিয়া আসিতেছি।...

"কবিকঙ্কণ বঙ্গের একজন মহাকবি, কৃত্তিবাস অপেক্ষাও উচ্চ আসনে বসাইতে প্রস্তুত আছি।...কিন্তু তাঁহার সেই যশ মলিন হইতেছে কেন?...বনবিহঙ্গের কাকুলি মধুর বটে কিন্তু একঘেয়ে—সব সময়ে তাহা ভাল লাগে না। গৃহপালিত, সুশিক্ষিত মানব-কণ্ঠের অনুকরণকারী পক্ষীর গানও কখনো-কখনো কাণ পাতিয়া শুনিতে সাধ হয়। কেননা, তাহার ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর ও স্বরসঙ্গীত তো আছেই, তাহার উপর শিক্ষাগুণে সে যে মানব-কণ্ঠেরও অনুকরণ করিয়া গান গাহিতে শিখিয়াছে, তাহাও কি শ্রোতব্য নয়? এমন না হইলে শিক্ষার মাহাত্ম্য থাকে কিরূপে? সকলেই যদি বুনো জঙ্গলী হইয়া বেড়ায়—সমাজে তাহা হইলে শিল্প-সঙ্গীত-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় কিরূপে?

"মনে করুন, রাফেলের একখানি চিত্র—সমুদ্র ও আকাশের মধ্যবর্তী পথে একখানি অর্ণবপোতের ছবি—চিত্রখানি দেখিবা-মাত্র নয়ন মন মুগ্ধ হইল। কোন্ গুণে? চিত্রের একমাত্র স্বাভা-বিকতা-গুণে—না, তাহার সহিত চিত্রকরের অসামান্য উদ্ভাবনী-শক্তি গুণে? চিত্রের সেই রঙ, রেখা, লেখা, তুলিটানা—চিত্রকরের সেই মনঃসংযোগ, অনুরাগ বা একনিষ্ঠা, সর্বোপরি স্বভাবের ধ্যান—এই সবটা জড়াইয়াই চিত্রের মনোহারিত্ব?...সাহিত্য ও কবিতা সম্বন্ধেও এই কথা সম্পূর্ণ প্রয়োজ্য। শিক্ষা ও সংস্কারগুণে ভাব ও ভাষা মার্জিত হইয়া অপূর্ব শ্রী ধারণ করে; নচেৎ কেবলমাত্র প্রাকৃত ভাষায় ও চলিত কথাবার্তায় তাহার গাম্ভীর্য নষ্ট হয়, চিত্রের সজীবতা থাকে না।...শিল্প ও কারুকার্যও যে ঐশ্বরিক-শক্তির একটা বিকাশ—সহসা এ ভাব কেহ ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। যদি তা না হইত, তবে পুরীতে সমুদ্রদর্শন করিয়া লোকে কেন আবার কষ্ট স্বীকার করিয়া ভুবনেশ্বরের মন্দিরের কারুকার্য দেখিতে যায়?...প্রত্যক্ষবাদী স্থূলদর্শী লোকের...[মুকুন্দরাম-

শ্রেণীর রচিত] Realistic কাব্য ভাল লাগিলেও ধ্যানের বিষয় ইহাতে অল্পই আছে। আবার সে ধ্যানও খুব উচ্চাঙ্গের নহে। যাহা ভাবিতে-ভাবিতে তন্ময় হইয়া যাইতে হয়…এমন ভাবের কোনো আদর্শ চিত্র (Idealistic sketch) ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। খুল্লনার বারমাস্যার দুঃখবর্ণনা চলিতেছে তো চলিতেছেই—তাহা খুব দারিদ্র্যবঞ্জক হইলেও গভীর নয়।…যাহা পাঠে হৃদয়ে কোনো ভাবের ছবি উঠিল না, তাহা উচ্চশ্রেণীর কবিতা বলিব কিরূপে? …[বারমাস্যায়] 'আমার দুঃখ যদি প্রত্যক্ষ করিতে চাও তো ঐ আমানি খাওয়ার গর্ত বিদ্যমান রহিয়াছে দেখো'—এটা কি বড়ই দুঃখের চিত্র? তাহা হইলে, আমানিও যার জুটে না, আমানি খাবার গর্ত-পরিমাণ ভূমিও যার নাই, এমন সহস্র-সহস্র দীনদরিদ্র নিরাশ্রয়, অন্নসত্রের কাঙালী—তাহাদের কথা ভাবিলে তো আরও দারিদ্র্যের ছবি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া ওঠে!…বরং কবি যেখানে ভক্তিভাবে ভবানীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন…সেইসব বর্ণনা পাঠ করিয়া অন্তর দ্রব হয়।…বিশেষ, কবির কালীয়দহে কমলে-কামিনীর চিত্রটি এ-বিষয়ে অতুল্য। কেননা এখানে স্বভাবের শোভার সহিত একটু কলাবিদ্যার (Art) মিশ্রণ হইয়াছে।"

॥ ১৫ ॥

মুকুন্দ-ভারত ভক্তগণের বিবাদকথা এইখানে সেরে নেওয়া যেতে পারে। এ বিবাদ অবশ্য থামাবার নয়; যেহেতু যদি থেমে যায়, তাহলে সমালোচকরা বেকার হয়ে পড়বেন। এই বিতর্কের কিছু উল্লেখ ইতি-মধ্যে করেছি। এখন আরও কিছু করব—তবে মোট পরিমাণের তুলনায় এটা অপ্রচুরই হবে। আমি কয়েকটি নির্বাচন করছি।

গোড়াতেই পূর্বপরিচিত হরচন্দ্র দত্তের রচনার কথা স্মরণ করা যাক, যিনি ভারতচন্দ্রীয় কুরুচিকে আক্রমণ করে 'সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বিতর্কের সূত্রপাত করেছিলেন। বিস্ময়ের কথা, ইনি সাহিত্যিক-হিসাবে মুকুন্দরামের উপরে স্থাপন করেছেন ভারতচন্দ্রকে। উভয়ের তুলনা-

কালে কারুণ্য ও কোমল অনুভূতি প্রকাশে মুকুন্দরামের অতুলনীয় শক্তির কথা স্বীকার করেও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতচন্দ্রকেই দিতে হবে। ভারতচন্দ্রের প্রতিভা মুকুন্দরামের তুলনায় বহুমুখে ব্যক্ত এবং তা কাব্যভাবনা-প্রকাশে অধিক স্ফূর্ত। হরচন্দ্র বলেছেন, ভারতচন্দ্রের ছিল যথার্থ সৃষ্টিশীল প্রতিভা, যা একেবারে দৈবীশক্তি।—মুকুন্দরাম সেখানে অনেক পেছিয়ে আছেন। মুকুন্দরাম কিভাবে নিসর্গপ্রকৃতির মধ্যে বিচরণ করেন, কিভাবে তাঁর বর্ণনায় শান্ত স্বচ্ছতা, সুকোমল সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পাঠককে আচ্ছন্ন করে রাখে, তার ব্যাখ্যা করেও হরচন্দ্র দত্ত, ভারতচন্দ্রের রচনার বৈচিত্র্য, কাউপার-কথিত স্নেহমসৃণতা না থাকলেও স্টাইলের সুব্যক্ত যাথার্থ্য, ভিন্নধর্মী বিষয়গুলির বর্ণনাতেও অসাধারণ কৃতিত্বের শক্তি-গরিমার স্বীকৃতি দিয়েছেন, বলেছেন যে, এসব বস্তু দেখার পরে বলতেই হয়—প্রতিভার স্বর্গীয় অধিকার ছিল তাঁর।[৭২]

সাহিত্যের আলোচনা হরচন্দ্র দত্ত সাহিত্যের ভাষাতেই করেছিলেন—'সাদা কালো দুটো কথা আছে মাত্র এই জানি'-রীতিতে একজনকে সাদা সুতরাং অপরকে কালো করে ছাড়েননি, যা বাংলা-সাহিত্যের অনেক সমালোচকের দস্তুর।

৭২.। "Although Kavikankan is at times more pathetic and soft than any Bengali author we have met with, yet the palm of superiority must undoubtedly be awarded to his great rival. The genius of Bharat Chandra was more versatile and more prolific of poetical thoughts. He had the creative power, 'The Vision and the Faculty Divine', in a more eminent degree. Kavikankan loves to depict in words, which become tender thoughts, the sorrows of a lovelorn damsel, the forests in spring, a moonlight bank, or a beautiful landscape. The apsaras of heaven and the nymphs of the wood, are his favourite companions. Purling streams, and flowering declivities ; the song of the kokila, and the hum of the bee ; sylvan solitude and the breeze laden with fragrance, are to him more than delights. There is a calm transparency, a tender beauty in his narrative,

এবার মুকুন্দরাম-প্রেমিকদের বক্তব্যের কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক। আমি বিশেষভাবে তাঁদের লেখারই উল্লেখ করছি, যাঁরা বহুল উদ্ধৃত।

রাজনারায়ণ বসু বলেছেন :

"অনেক স্থানে ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণের ছায়া মাত্র। উদ্ভাবনী শক্তিতে কবিকঙ্কণ ভারতচন্দ্র অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে।...কবিকঙ্কণের ন্যায় ভারতচন্দ্রের যদি উদ্ভাবনীশক্তি থাকিত, তাহা হইলে কবিকঙ্কণ বিদ্যা ও কুলশীল উভয় গুণসম্পন্ন জামাতার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ভারতচন্দ্র তাহাই হইতেন —'গজদন্ত কনকে জড়িত।'...প্রতিভাবিষয়ে তিনি [মুকুন্দরাম] বাংলাভাষার অদ্বিতীয় কবি। ভারতচন্দ্র তাঁহাকে অনেকস্থলে অনুকরণ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের অনেক স্থানের ভাব পার্সি ও সংস্কৃত হইতে নীত। এশিয়া কিংবা ইউরোপখণ্ডের এমন কোনো কবি নাই যাঁহাকে মাইকেল মধুসূদন অনুকরণ করেন নাই। স্বকপোল-রচনাশক্তি বিষয়ে মোটাধুতি ও দোব্‌জা-পরিধানকারী দামুন্যার দরিদ্র ব্রাহ্মণ—শোভন ধুতি ও উড়ানি পরিধানকারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুসভ্য সভাসদ ভারতচন্দ্র এবং কোট্‌-পেন্ট্‌লন পরিধানকারী মাইকেল মধুসূদনকে জিতিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই।" ['বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা'।]

---

which fascinate every reader, and which are seldom, if ever interrupted. Bharat Chandra is far more varied, and his style, although less of what Cowper calls 'creamy smoothness' is always falicitous and appropriate to the subject matter. He describes, with equal truth, the court of a puissant prince, an evening cloudless and serene, a beautiful woman, the gathering tempest, the peal of the trumpet and the neighing of war-steeds. The passages of imitative harmony, which we have met with in his works, have convinced us, and will, doubtless, convince all who read them, that Bharat Chandra was one of the gifted of heaven." [*Bengali Poetry* : Hara Chandra Dutta ; Calcutta Review, January, 1852].

রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'লিটারেচর অব বেঙ্গল'-এর মধ্যে অনেকখানি স্থান নিয়ে উভয়ের তুলনা করেছেন। পরবর্তীকালে এই তুলনা করতেই তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন বাংলায়—'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র' (সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা, মাঘ ১৩০১)। শেষোক্ত রচনায় তাঁর সিদ্ধান্ত:

> "গুণাকর পত্রে-পত্রে কবিকঙ্কণের নিকট ঋণী। কবিকঙ্কণের কবিত্ব পত্রে-পত্রে নকল করিয়াছেন, কবিকঙ্কণের স্বাভাবিক ও সুন্দর বর্ণনাগুলি অলঙ্কার দিয়া কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। কবিকঙ্কণের কাব্য সরল, স্বাভাবিক ও সুপাঠ্য; গুণাকরেব কাব্য অধিকতর সুললিত, কিন্তু অস্বাভাবিক এবং অনেক স্থানে অপাঠ্য।"

ভারতচন্দ্র কিভাবে মুকুন্দরামের 'সরল স্বাভাবিক' বস্তুকে কৃত্রিম বর্ণনার দ্বারা. অশ্লীল অভিপ্রায়ের দ্বারা, 'অপাঠ্য' করে তুলেছেন, তা অনুমানে না রেখে প্রমাণের পর্যায়ে নিয়ে যেতে রমেশচন্দ্র অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। মুকুন্দরামের একটি দীর্ঘ বর্ণনা উদ্ধৃত করার পরে তিনি লিখেছেন, 'বর্ণনাটিতে বিশেষ সৌন্দর্য নাই, কিন্তু রচনাটি সরল ও স্বাভাবিক।' বস্তুতঃ, 'স্বাভাবিক' শব্দটি রমেশচন্দ্রের সাহিত্যের গায়ত্রীমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যার ভূয়োভূয়ঃ উচ্চারণের পরে তিনি প্রবন্ধশেষ করেছেন এই বলে:

> "আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, মুকুন্দরামের নায়ক-নায়িকার ন্যায় নরনারী আমরা প্রতিদিন বিশ্বসংসারে দেখিতে পাই। ধনপতির ন্যায় বিষয়ী, লহনা ও খুল্লনার ন্যায় সপত্নী, ভাঁড়ু দত্তের ন্যায় প্রবঞ্চক, দুর্বলার ন্যায় দাসী, আমরা সংসারে সর্বদাই দেখিতে পাই। সংসার দেখিয়া মুকুন্দরাম নায়ক-নায়িকা চিত্রিত করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র অসাধারণ পণ্ডিত, অসাধারণ চতুর, বাক্য-বিন্যাসে অসাধারণ ক্ষমতাশালী, কিন্তু তাঁহার নায়ক-নায়িকাগুলি কি সংসারের নরনারী? হীরার ন্যায় চতুরা মালিনী, সুন্দরের ন্যায় বিলাসপরায়ণ নায়ক, বিদ্যার ন্যায় বিলাসিনী নায়িকা, সংসারের সচরাচর নরনারী নহে। মুকুন্দরাম সংসারের কথা বলিয়াছেন;

ভারতচন্দ্র কুৎসিত সমাজবিশেষের কুৎসিত রসিকতা বর্ণনা করিয়াছেন।"

ইংরেজি গ্রন্থেও রমেশচন্দ্র একই কথা আগে-ভাগে বলে এসেছিলেন, যার মধ্যে মুকুন্দরামের প্রাকৃতিকতার তুলনায় ভারতচন্দ্রের আত্মভাবময় ব্যক্তিত্বচিহ্নিত রচনার সাধ্যমত নিন্দা তিনি করেছেন, যদিও একালে সেটা ব্যাজস্তুতির মতো প্রতীয়মান হবে, কারণ আমরা ভাবতে চাই, ঐ আত্মভাবনা নিজ রচনায় প্রবেশ করানোর জন্যই পুরাতন সাহিত্যের কবি ভারতচন্দ্র একালেরও কবি।[৭৩]

গঙ্গাচরণ সরকার মুকুন্দরামের কাছে ভারতচন্দ্রের ঋণের বিষয়টি দৃষ্টান্তযোগে প্রমাণ করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। কৈলাসচন্দ্র ঘোষ যে বলেছেন, মুকুন্দরামের কাছে ভারতচন্দ্র 'তিষ্ঠিতেও পারেন না'—তার উল্লেখ করেছি। তারপর পাচ্ছি বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। ভারত-

৭৩। "We confess, though few perhaps will agree with us in this opinion, that Bharat Chandra's artificial and polished strains strike us as vapid when compared with the true pathos and the simple and faithful pictures from nature, with which Mukunda Ram's works are replete. Mukunda Ram draws from nature, Bharat Chandra tinges his pictures with his own gorgeous colouring. The former allows things to appear as they are and to speak for themselves; the more polished Bharat Chandra can never reconcile himself to such inartistic proceeding, he would fain invest them with a beauty not their own, and instead of allowing them to speak for themselves, he would fain lend them the music of his own lyre. Bharat Chandra is therefore the more polished and skillful poet, Mukunda Ram the truer painter, and there is a great deal in that. Open any page of Mukunda Ram's works and mark the pictures he has drawn. Read Bharat Chandra from cover to cover, and what is there which you will compare with these [of Mukunda Ram's] simple truthful pictures?"

[*Literature of Bengal* (1877) : Ar Cy Dae (Romesh Chunder Dutt)]

চন্দ্র রায়' প্রবন্ধে তিনি মুকুন্দরামের কাছে ভারতচন্দ্রের ঋণের কথা বললেও ভাষা মোটামুটি নরম রেখেছেন,[১৪] যা রাখতে পারেন নি নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায় :

"শিবনিন্দা, অন্নদা-পাটনী সংবাদ প্রভৃতি বর্ণনার কঙ্কাল কবিকঙ্কণ হইতে—ভারতচন্দ্র তাহাতে মাংসযোজনা করিয়াছেন মাত্র। ইহা যদি স্বর্ণ হয় তবে তাহা কবিকঙ্কণের—ভারতচন্দ্র পালিশ করিয়াছেন।"

এই কথাটা কিন্তু ভারতচন্দ্রের প্রচণ্ড ভক্ত রামগতি ন্যায়রত্নও পূর্বাহ্ণে প্রকারান্তরে স্বীকার করে রেখেছেন, যখন তিনি বলেছিলেন, 'অনেকস্থলেই ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণের চণ্ডী এবং বোধহয় কোনো স্থলে রামেশ্বরের শিবায়ন হইতেও অস্থিসংকলন করিয়া তদুপরি মাংসযোজনা করিয়াছেন।' আর এক জায়গায় তিনি আরও মুক্তকণ্ঠ :

"কবিকঙ্কণ বাঙ্গলাভাষার সর্বপ্রধান কবি।...অন্যের কথা দূরে থাকুক, কবিত্ববিষয়ে ভারতচন্দ্রের যে এত গৌরব, এবং আমাদেরও ভারতচন্দ্রের প্রতি যে এত শ্রদ্ধা আছে, চণ্ডীপাঠের পর অন্নদামঙ্গল পাঠ করিলে সে-গৌরব ও সে-শ্রদ্ধার অনেক হ্রাস হইয়া যায়। সংস্কৃতে যেমন মাঘ-কবি ভারবির কিরাতার্জুনীয়কে আদর্শ করিয়া শিশুপালবধের রচনা করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রও সেইরূপ কবিকঙ্কণের চণ্ডীকে আদর্শ করিয়া অন্নদামঙ্গলের রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে উভয়েরই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, দক্ষযজ্ঞ, পার্বতীর জন্ম-তপস্যা-বিবাহ, হরগৌরীর কন্দল প্রভৃতি প্রায় একরূপ ধরনেই লিখিত। তদ্ভিন্ন শাপভ্রষ্ট নায়ক-নায়িকার জন্মপরিগ্রহ,

---

১৪। "অন্নদামঙ্গলের শেষ ভাগ দেখিলে মনে হয়, যেন ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের অনুকরণ করিয়াছেন! ভারতচন্দ্রের যে মৌলিকতা নাই, এমন কথা আমরা বলি না, কিন্তু তাঁহার চরিত্রচিত্রণে, রন্ধনাদিবর্ণনে সহজেই কবিকঙ্কণকে মনে পড়ে। কবিকঙ্কণের শ্রীমন্তোপাখ্যান যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাহারাই বুঝিতে পারিবেন, অন্নদামঙ্গলে অল্পবিস্তর অনুচীকির্ষা উপলব্ধি করা যায় কিনা!"

['ভারতচন্দ্র রায়' : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; 'ভারতী ও বালক', ফাল্গুন, ১২৯৬]

ভগবতীর বৃদ্ধাবেশধারণ, মশানে পিশাচসেনার সহিত রাজসেনার যুদ্ধ, চৌত্রিশ অক্ষরে স্তব, ঝড়বৃষ্টিদ্বারা দেশবিপ্লাবন, শব্দশ্লেষসহকারে ভগবতীর আত্মপরিচয়দান, দেশগমনোৎসুক পতির নিকট পত্নীর বারমাস-বর্ণন, পুরুষ-সুদর্শনে কামিনীদিগের নিজ নিজ পতিনিন্দা, দাসীর হাট করার পরিচয় দেওয়া ইত্যাদি ভূরি-ভূরি বিষয়, ও ভঙ্গপয়ার, ঝাঁপতাল, একাবলী প্রভৃতি ছন্দসকল ভারতচন্দ্র যে চণ্ডী হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ঐ দুই গ্রন্থের পাঠমাত্রেই বুঝিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন ভারতচন্দ্র মধ্যে-মধ্যে আদিরসের যেরূপ নিরবগুণ্ঠন বর্ণনা করিয়াছেন, কবিকঙ্কণ সেরূপ করেন নাই। তিনি অসাধারণ পরিহাসরসিক হইয়াও তত্তৎস্থলে বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত লেখনীচালনা করিয়াছেন। বর্ধমানে সুন্দরকে দেখিয়া নাগরিক কামিনীরা নিজ-নিজ পতির নিন্দাকরণপ্রসঙ্গে কি জঘন্য মনোবৃত্তিরই প্রকাশ করিয়াছিল! কিন্তু মনোহর-বেশধারী শিবকে সন্দর্শন করিয়া ওষধি-প্রস্থ-বিলাসিনীরাও দুঃসহ দুঃখাবেগে স্ব স্ব পতির নিন্দা করিয়াছিল সত্য, কিন্তু সেরূপ কুৎসিত আশয়ের কিছুমাত্র প্রখ্যাপন করে নাই—বরং অদৃষ্টের দোষ দিয়া পাতিব্রত্যপক্ষই সমর্থন করিয়াছিল—

যে হোক সে হোক নারীর স্বামী তো ভূষণ।
পতিসেবা করো সবে যেন নারায়ণ॥

ইহা কবির সামান্য বিমলরুচিতার কার্য নহে।”[৭৫]

কবিকঙ্কণের প্রতি সমূহ শ্রদ্ধার গুরু কারণটি রামগতি শেষ বাক্যে একেবারে খুলে ধরেছেন—পতি পরম গুরু !!

ভারতচন্দ্রকে আসামী করে বিচারকের আসনে দীনেশচন্দ্র সেন বসেছিলেন, আগেই জেনেছি। কবিকঙ্কণের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের তুলনা করার কালেও ঐ বিচারককণ্ঠ আমরা শুনতে পেয়েছি। ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণকে চাপা দিয়েছেন—এই মহা অভিযোগ। দীনেশচন্দ্রের দৃঢ়

৭৫। ‘বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব’।

বিশ্বাস—শেষ পর্যন্ত মেঘ কেটে যাবে, কবিকঙ্কণ-সূর্য আবার উঠবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই, যেমন আগেও অনেক সাহিত্য-সূর্য ফুটে বেরিয়েছেন সাময়িক অনিশ্চয়ের মেঘ-কুয়াশা কাটিয়ে :

"কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপতির যশে চণ্ডীদাসের যশ কিছু ঢাকা পড়িয়াছে। তাহা হওয়া বিচিত্র নহে। কালিদাসের যশে ভবভূতি ঢাকা পড়িয়াছেন, ভারতচন্দ্রের যশে কবিকঙ্কণ ঢাকা পড়িয়াছেন, কতক দিনের জন্য পোপের যশে শেক্সপীয়র ঢাকা পড়িয়াছিলেন। চারু চিত্রপটখানা দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হয়, কিন্তু মানস সৌন্দর্য ও গরিমা সেরূপ সহজে আয়ত্ত হইবার বিষয় নহে।"

সাহিত্যে চৌর্য নতুন সংবাদ নয়।[৭৬] ভারতচন্দ্র চোর-কবির কবি। সুতরাং ঐ অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে না উঠলেই অস্বাভাবিক হত। দীনেশচন্দ্র ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে সুবিচার করতে ইচ্ছুক হয়ে অকস্মাৎ দেখেছেন—এই গহনপথগামী কবি একটি ক্ষেত্রে অন্ততঃ মহাজনদের সহযাত্রী!—

"মাধবাচার্য প্রভৃতি পূর্ববর্তী চণ্ডীলেখকগণের নিকট মুকুন্দরাম নানা বিষয়ে ঋণী।...ভারতচন্দ্র স্বীয় নায়ক সুন্দরের মতো সিঁধ কাটিয়া চুরি করিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠে যে যশের মুক্তামালা, তাহা তিনি ইহলোকে নিজের বলিয়াই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যেখানে ন্যায়ের উচিত তুলাদণ্ডে প্রকৃত অধিকারের ভাগ হয়,

---

৭৬। চোরের সতীত্ব আশা করা যায় না, বিশেষত সে যদি হয় ভারতচন্দ্রের মতো হৃদয়চোর। ঘরে-ঘরে তার গতায়াত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভারতচন্দ্রকে আর এক অকুস্থলে গ্রেপ্তার করেছেন :

"অবৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে ভারতচন্দ্রের নাম বড় নাম। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজকবি ছিলেন। তাঁহার ভাষা অনুকরণের অতীত, ধীশক্তি প্রখর এবং প্রতিভা সর্বতোমুখী। বিদ্যাসুন্দর তাঁহার নিজের নহে, ধারকরা জিনিস। ধারও আবার মূল সংস্কৃত হইতে নহে। মূল সংস্কৃত হইতে যদিই বিদ্যাসুন্দর ধারকরা হয়, তবে ভারতচন্দ্রের পূর্বে অন্য লোক তাহা ধার করিয়াছিল, তিনি ধারকরা জিনিস আবার ধার করিয়াছেন। যথেষ্ট সুদসমেত শোধ দিয়াছেন সত্য কিন্তু জিনিসটা ধারের

সেখানে সেই বড় মুক্তাছড়ার একটি মুক্তাও তাঁহার থাকিবে কি-না সন্দেহ। বঙ্গসাহিত্যের কথা ছাড়িয়ে দিলেও দেখা যায়, কালিদাস পদ্মপুরাণ হইতে, শেক্সপীয়র হলিন্‌সিয়াড হইতে, মিল্টন ইলিয়াড-প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বিষয় এবং উপকরণ অবাধে সংগ্রহ করিয়াছেন। এইসব পরস্বাপহারক দস্যু কাব্যজগতে লব্ধযশা ও শ্রেষ্ঠ কেন? ইহার একমাত্র উত্তর—ইঁহারা প্রতিভার রাজদণ্ড লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা যাহা স্পর্শ করিয়াছেন, তাহাতেই ইঁহাদের অধিকার বর্তিয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজগণ সকলেই এক প্রকার দস্যু।"

সজ্জনসহবাসের এমন সৌভাগ্য ভারতচন্দ্র বেশীক্ষণ পেতে পারেন না, দীনেশচন্দ্রের সহায়তায় অন্ততঃ। সুতরাং সুর চড়ল :

"চণ্ডীকাব্যের পূর্বভাগে শিব-বিবাহাদি বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশ নানা কবি নূতন করিয়া গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—ভারতচন্দ্রের অনুকরণ তন্মধ্যে বিশেষ প্রশংসাযোগ্য হইয়াছে। কিন্তু এক শ্রেণীর কবির কথার লালিত্যে কর্ণ মুগ্ধ হইয়া যায়, অপর এক শ্রেণীর ভাবের উচ্ছ্বাসে হৃদয় তৃপ্ত হয়। শুধু শব্দের মাধুর্য যে-সকল পাঠকের নিকট কাব্যের উৎকর্ষের একমাত্র মানদণ্ড নহে, তাঁহাদেব নিকট মুকুন্দরামের 'কাম ভস্ম', 'শিববিবাহ' প্রভৃতি অংশ গাঢ়রসের আকর বলিয়া বোধ হইবে; তিনি ভারতচন্দ্রের 'পতিশোকে রতি কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে, ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে' প্রভৃতি

ধার। তিনি কাহার নিকট বিদ্যাসুন্দরের গল্পটি গ্রহণ করিয়াছেন? ··এই প্রবন্ধের শীর্ষদেশে যে মাননীয় মহাপুরুষের নাম [কবি কৃষ্ণরাম] দৃষ্ট হইতেছে, তিনিই বাংলায় বিদ্যাসুন্দর প্রথম প্রচারিত করেন।"

['কবি কৃষ্ণরাম'; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০]

এই লেখার জন্য "যোগেশবাবু তাঁহাকে [হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে] আক্রমণ করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রারম্ভে ছিল—'এবার ককনী কোকিল নয়, কলেজী কাকাতুয়া।" [হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—'আঠারশো একানব্বই'; গল্প-ভারতী, আশ্বিন, ১৩৫৮; গোস্বামীর গ্রন্থে উদ্ধৃত; পৃ. ১২৯]।

উচ্ছলিত কামকলাপূর্ণ পদবিন্যাস ফেলিয়া সেইপ্রসঙ্গে মুকুন্দরামের রচিত 'মোর পরমায়ু লয়ে, চিরকাল থাক জিয়ে, আমি মরি তোমার বদলে' প্রভৃতি সরল উক্তির মধ্যে প্রকৃত শোকের তীব্রতা বেশী অনুভব করিবেন। যাঁহারা শুধু ভাষার মিষ্টত্বের খোঁজ করেন, তাঁহারা জয়দেব ও ভারতচন্দ্র পাঠ করুন, চণ্ডীদাস ও কবিকঙ্কণের কবিতাস্বাদ করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই।"[৭৭]

চৌর্যপ্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের পক্ষে উকিল অবশ্য দু'একজন পাওয়া গিয়েছে—কোন্ অপরাধী এ-পর্যন্ত তা না পেয়েছে? রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতচন্দ্রের পক্ষে যাঁর সওয়াল আমরা বিশেষ মূল্য দিয়ে আগে উপস্থিত করেছি, তিনি যে আলোচ্য বিষয়ে দু'চারটি কথা বলবেন, ধরে নিতে পারি, কিন্তু মুকুন্দ-ভারত দ্বন্দ্বে পরিষ্কার ভারতের পক্ষে রায় আমরা হারাণচন্দ্র রক্ষিতের লেখাতেই প্রথম পেয়েছি, তাঁর লেখার এই দৃঢ় যুক্তিপূর্ণ অংশটি ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি—কিন্তু এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ রচনা প্রমথনাথ বিশীর। তাঁর 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধটি[৭৮] সমগ্র ভারতচন্দ্র সমালোচনার ধারায় মূল্যবান সংযোজন, যার মধ্যে ১৯৪৫ সালের শক্তিশালী এক লেখককে পাচ্ছি যিনি তীক্ষ্ণতম ভাষায় বাঙালি-পাঠকের মুকুন্দরাম-সংস্কারকে বিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং সাহসিক সে চেষ্টা। প্রায় তিরিশ বছর আগে প্রকাশিত উক্ত রচনার বক্তব্যে শ্রীযুক্ত বিশীর এখনো বিশ্বাস আছে কি-না জানিনা (তিনি বলেন, মতের ক্ষেত্রে তিনি সদাই ডায়ন্যামিক), কিন্তু আমাদের কাছে বাঙালি সাহিত্যসমালোকগণের বহুতর মুকুন্দমঙ্গলকাব্যের পাশে এই মুকুন্দ-বধকাব্য কম চিত্তাকর্ষক বা কম চিন্তাউদ্বোধক নয়।

শ্রীযুক্ত বিশী লিখেছেন :

"বলাবাহুল্য পুরাতন অবৈষ্ণব বাঙালি-কবিগণের মধ্যে ভারতচন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ। বলাবাহুল্য কিন্তু বলা আবশ্যক, কেননা এ-

---

৭৭। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'; দীনেশচন্দ্র সেন।

৭৮। 'ভারতচন্দ্র' ('বাঙালি ও বাংলাসাহিত্য' ১৯৪৫): প্রমথনাথ বিশী।

পর্যন্ত আমরা কেহই কবিকে সেই উচ্চ সম্মান সম্পূর্ণ দিতে চেষ্টা করি নাই।[৭৯]

এই প্রবন্ধে প্রমথনাথ বাঙালি-সমালোচকগণের মুকুন্দরাম-খ্যাপামির চিকিৎসাচেষ্টা যথেষ্ট করেছেন। মুকুন্দরামকে যাঁরা ভারতচন্দ্রের তুলনায় বড় করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁরা সকলে খুব পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিক, তাই 'তাঁহারা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া সাহিত্য ও ইতিহাসের মধ্যে গোল করিয়া ফেলিয়াছেন।' ষোড়শ শতাব্দীর সমাজের অনেক কথা যেহেতু আমরা মুকুন্দরামের লেখা থেকে জানতে পারি, যেহেতু 'অজ্ঞাত যুগের ইতিহাসের অমূল্য উপাদান' তিনি আমাদের দিয়েছেন, সেজন্য "আমরা তাহার মূল্যস্বরূপ শ্রেষ্ঠ কবিত্বের সম্মান তাঁহাকে দিয়া বসিয়াছি। 'সত্যরত্ন দিলে তুমি পরিবর্তে তার' আমরা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবিখ্যাতি দান করিয়াছি। কবিকঙ্কণের অনেকগুলি রত্নই ঐতিহাসিকদের কৃতজ্ঞতার দান।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিশী আরও বলেছেন, কাব্যকে কাব্য রেখে কি পরিমাণে তথ্য মিশানো যায়, তার হিসেব জানতেন না মুকুন্দরাম, সেটা 'তাঁর কাব্যপ্রতিভার অভাব সূচনা করে।' 'দুধে জল দেয় না এমন গোয়ালা বোধকরি গোকুলেও ছিল না' তাহলেও দেখতে হবে, জল যেন দুধকে জলাঞ্জলি না দেয়। "ঐতিহাসিকদের কাছে দুধের অপেক্ষা জলের দাম বেশী; তাই ভারতচন্দ্র 'মন্দ নয়, বেশ, মাঝে-মাঝে চমৎকার, বিশেষ করিয়া অমুক স্থানটায়' ইত্যাদি—আর মুকুন্দরাম শ্রেষ্ঠ কবি।"

মুকুন্দরামের জয়ধ্বজাতে লেখা আছে—বস্তুনিষ্ঠা। তাকে শ্রীযুক্ত বিশী এইভাবে ধুয়েছেন:

"আধুনিক সাহিত্যের ভাষায় মুকুন্দরাম ছিলেন বস্তুনিষ্ঠ (Realistic) কবি। কিন্তু বাংলাসাহিত্য মূলতঃ রোমান্টিক। কবির

৭৯। কথাটা যে ঠিক নয়, উক্ত শ্রেষ্ঠত্ব সম্মান যে, ভারতচন্দ্রকে অনেকেই দিয়েছেন, তা প্রচুর তথ্যযোগে আমরা দেখিয়ে এসেছি।

সাহিত্যধর্ম ও দেশের সাহিত্যধর্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাঁহার দশা হইয়াছিল দুই নৌকায় পা দিবার মতো। এই দুর্দশার জন্য তিনি এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। আদিতে যে উপাদান লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন, অন্তেও তাহা উপাদানরূপেই রহিয়া গিয়াছিল। ঐতিহাসিকদের ভোজ এই অসার্থক উপাদানের প্রাচুর্যে।

"উপাদানের সৌভাগ্য মুকুন্দরামের মতো অল্প কবির ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। কালকেতু ব্যাধ ও ধনপতি সদাগর। আজকালকার ভাষায় প্রলিটারিয়েট ও এরিস্টোক্রেটা। বাংলাসমাজের নিম্নতম হইতে উচ্চতম সুরসপ্তক তাঁহার আয়ত্ত ছিল। কিন্তু কবি কেবল গলাই সাধিলেন, সুর বাহির করিতে পারিলেন না। কিন্তু আমরা কি মুকুন্দরামের তৎকালীন চিত্র পাই না? চিত্রই পাই, কাব্য নয়। তৎকালীন চিত্র পাই, চিরকালীন কাব্য নয়। এই তৎকালীনতার জন্য মুকুন্দরাম অমর হইয়া আছেন। তাঁহার অমরতা তাঁহার ব্যর্থতার উপরে প্রতিষ্ঠিত।"

শ্রীযুক্ত বিশীর মতে, এক ভাঁড়ু দত্ত বাদে মুকুন্দরামের অন্য সকল চরিত্রই 'অপসৃষ্টি।' 'কালকেতুর মতো বিকট একটা বিদূষক বীর' যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর বিষয়ে যত কম বলা যায় ততই ভাল। বিশী-মহাশয়ের সেই কম কথার কিছু কথা:

"মুকুন্দরামের প্রধান দোষ গ্রাম্যতা—কি ভাবে, কি ভাষায়, কি চরিত্রঅঙ্কনে; অবশ্য কল্পনায় নয়, তার কারণ কল্পনাশক্তি তাঁহার স্বল্প। সাহিত্যে যে *Urbanity* আমাদের আদর্শ, পুরাতন কবিদের মধ্যে একমাত্র ভারতচন্দ্রে তাহা পাই। মুকুন্দরাম *sub-urbanity*-তেও পৌঁছিতে পারেন নাই। একদল আছেন যাঁহারা বলেন, মুকুন্দরামের বৈশিষ্ট্য, তিনি তৎকালীন লৌকিক ভাষায় কাব্য লিখিয়াছেন। অবশ্য ইহা মুকুন্দরামের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু সাহিত্যের নহে।...মুখের ভাষা কাব্যের ভাষার উপাদানমাত্র, তাহা 'আদর্শায়িত' হইয়া উঠিয়াই কাব্যের ভাষায় পরিণত হয়।

মুকুন্দরামের ভাষায় এই আদর্শীকরণ নাই।"

সুতরাং শ্রীযুক্ত বিশীর সিদ্ধান্ত—সাহিত্যোধ্ব হিসাবে ভারতচন্দ্রই একমাত্র মঙ্গলকবি। চণ্ডীদাসের আগে অনেকে বৈষ্ণবপদ লিখলেও যেহেতু চণ্ডীদাস 'প্রথমবারের জন্য বৈষ্ণবপদের একটা স্থায়ী ঠাট' গড়ে দিতে পেরেছিলেন, সেইজন্য তিনি পদসাহিত্যের 'আদিকবি', তেমনি—

> "ভারতচন্দ্রের পূর্বে বহুসংখ্যক কবি মঙ্গলকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সকলেই মুকুন্দরামের মতো ভুল করিয়াছেন। বাংলার সাহিত্যধর্ম না বুঝিয়া কবিযশঃপ্রার্থীরা বস্তুনিষ্ঠ কাব্য-রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সাহিত্যধর্মবিরোধী কাব্য পূর্ণতালাভ করিতে পারে নাই। ভারতচন্দ্রই প্রথম মঙ্গলকাব্য-প্রণেতা যিনি সাহিত্যধর্মের সহিত নিজস্ব কবিপ্রতিভার সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি মঙ্গলকাব্যের আদি-কবি। ইতিহাসের তারিখ হিসাবে দেখিলে তাঁহাকে প্রায় শেষ মঙ্গলকাব্যরচয়িতা বলা যাইতে পারে। কিন্তু সে বিচার অবিচার হইবে।...
>
> "চণ্ডীদাস বৈষ্ণব পদসাহিত্যকে অমরতার পথে দাঁড় করাইয়া দিয়াছিলেন। তখন হইতে সে পথে চলা তেমন কষ্টকর ছিল না। সকলেই যে অমরতার স্বর্গে উপনীত হইয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু একথা আমরা বুঝিতে পারি, তাঁহারা সকলেই অমরতার পথিক। ভারতচন্দ্রও তেমনি মঙ্গলকাব্যকে প্রথমবারের জন্য অমরতার পথে স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, তিনি নিজে অমর হইয়াছেন, অন্যকে অমরত্বের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। সে পথে চলিয়া কেহ অমর হয় নাই, ইহা সত্য নহে—সে-পথে আর চলাই হয় নাই। কাজেই ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের আদিকবিও বটে, শেষ কবিও বটে।"

প্রমথনাথ বিশী যা বলেন, সন্দেহ না রেখেই বলেন। কেবল ধারালো করে বলেন না, গভীর করেও বলেন। উত্তম সমালোচনার লক্ষণ—তা হয় রোচক, নয়-প্ররোচক। প্রমথ বিশীর রচনা পাঠান্তে তা স্বীকার করতে হয়। ভারতচন্দ্রের ভাষা, রচনারীতি, রোমান্টিকতা

ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি আর যা বলেছেন, অন্য অধ্যায়ে তার আলোচনা করব। এখানে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি, যার মধ্যে তাঁর কল্পনাময় রচনাশক্তির চমৎকার দৃষ্টান্ত আছে :

"বৃটিশ শাসনে বাংলার সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন না ঘটিলে পরবর্তী মঙ্গলকাব্য মুকুন্দরামের প্রবর্তিত বস্তুনিষ্ঠ পথ ছাড়িয়া ভারতচন্দ্রের পথ ধরিয়া চলিত। কিন্তু যে-পথ প্রবর্তিত হইল, অথচ প্রচলিত হইল না, সে-পথ অমরত্বের দিকে নিষ্ফল তর্জনী-সংকেতের মতো পড়িয়া আছে, আর সেই পথের একান্তে বাংলার সুদীর্ঘ করুণ ইতিহাসের যে অশ্বশিলাখণ্ডে কালির অক্ষরে খোদাই করা আছে ১৭৫৭, তাহারই নিকটে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার স্বাভাবিক বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি সহসা দেশব্যাপী বিষাদের আভাসে অর্ধবিকশিত অবস্থায় থামিয়া গিয়াছে।"

॥ ১৬ ॥

ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনার পরিমাণ নিতান্ত অল্প নয়, সুতরাং সবকটির উল্লেখ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবও নয়। তাছাড়া নিশ্চয় অনেক কিছু আমাদের দৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেছে। সাহিত্যের ইতিহাসগুলিতে ভারতচন্দ্রের বিস্তারিত আলোচনা অপেক্ষিত, এবং তা কদাপি উপেক্ষিত হতে পারে না বাংলা ছন্দ ও অলঙ্কারের আলোচনার মধ্যে। সুতরাং দেখতে পাই, কেবল দীনেশচন্দ্র সেন নন, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য,ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ ভূদেব চৌধুরী ভারতচন্দ্রের উপরে লিখেছেন। ডঃ সুকুমার সেনের রচনায় দু'একটি নূতন সংবাদ আছে ; ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সমগ্র মঙ্গলকাব্যধারায় স্থাপন করে ভারতচন্দ্রের বিচারের চেষ্টা করেছেন ; ডঃ ভূদেব চৌধুরী সংক্ষেপে কিছু গাঢ় কথা বলেছেন ; এবং ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথাসম্ভব বিস্তৃত তথ্যসন্নিবেশের সঙ্গে এমন কিছু মন্তব্য করেছেন, যা সরসতায় উপভোগ্য এবং গুরুত্বে বিবেচনাযোগ্য। ভারতচন্দ্র সম্পর্কে গবেষণাও হয়েছে, তা গ্রন্থাকারেও বেরিয়েছে, যথা

ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ'। অত্যন্ত মূল্যবান গবেষণা করেছেন ডঃ মদনমোহন গোস্বামী, যাঁর গ্রন্থের বহুল উল্লেখ বর্তমান গ্রন্থমধ্যে রয়েছে। ডঃ ভবতোষ দত্ত তাঁর 'কবিজীবনী'র মধ্যে ভারতচন্দ্র বিষয়ে আলোচনায় প্রশংসনীয় তথ্যনিষ্ঠা দেখিয়েছেন। বাংলা-সাহিত্যের প্রধান সমালোচকদের অন্যতম মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'বাংলা কবিতার ছন্দ' গ্রন্থের একটি অধ্যায় ভারতচন্দ্রের ছন্দ ও ভাষাশক্তির সানুরাগ বিশ্লেষণে ব্যয় করেছেন, এবং ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভারতচন্দ্র-বিষয়ক রচনায় (ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের পূর্বোক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় এবং পরে তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যে) যা বলেছেন তার মধ্যে নূতনত্ব কিছু না থাকলেও গুরুভার রচনাহিসাবে তার মূল্য স্বীকার করতে হবে। কালিদাস রায়ের ভারতচন্দ্র-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে ('প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, দ্বিতীয়াংশ'-এর অন্তর্ভুক্ত) পরিচিত বক্তব্যের অনুত্তেজিত সুষ্ঠু পরিবেশন আছে, অধিকন্তু আছে ভারতচন্দ্রের ধর্মধারণার বিষয়ে কিছু ধীর সিদ্ধান্ত।

এক্ষেত্রে একজন লেখকের রচনার কিছু বিশেষ উল্লেখ করতে চাই। শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার মনস্বী ব্যক্তি, রাজনৈতিক মতে মার্কসবাদী; সুতরাং বৃহত্তর সমাজমানসের সঙ্গে সাহিত্য কি পরিমাণে যুক্ত আছে বা নেই, স্বতঃই তাঁর রচনায় সে বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করে—তিনি কী বলেছেন তা মনোযোগের বিষয় হওয়া উচিত। 'বাংলাসাহিত্যের রূপ-রেখা'র (প্রথম খণ্ড) মধ্যে তিনি ভারতচন্দ্রের স্টাইলের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন, তার দ্বারা নতুন কিছু করেন নি, এবং দেবদেবীকে নিয়ে ভারতচন্দ্র ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন—তাঁর এই বক্তব্যেও অভিনবত্ব নেই, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মধ্যে আধুনিকতার লক্ষণ সম্বন্ধে যা বলেছেন, সে-বস্তু একেবারে মৌলিক না হলেও সজীব চিন্তায় উদ্দীপ্ত :

> "ভারতচন্দ্রকে আধুনিক যুগের কবি বলাও অসম্ভব, মধ্য-যুগের শেষ কবি বলাও দুঃসাধ্য। তাঁর মনের গড়নে আবেগবাহুল্য নেই—সেখানে বুদ্ধির প্রাখর্যই প্রবল, ধর্মবোধে তিনি ভারাক্রান্ত নন, দেবদেবীরা মানবমানবীর মতোই তাঁর নিকটে রসিকতার

উপাদান। ঐহিকতা (secularity) তাঁর চিন্তার ও কাব্যের স্বাভাবিক গুণ। তিনি কালিকাকে দিয়ে সুন্দরকে ত্রাণ করান, কিন্তু বিদ্যা ও সুন্দরের বিহারকে বৃন্দাবনী অপার্থিবতায় 'শোধন' করিয়ে নেন না। বিদ্যা-সুন্দরের প্রণয় ব্যাপারকে রক্তমাংসের যুবকযুবতীর অত্যন্ত সহজ ও বাস্তব যৌনসম্ভোগ রূপেই ভারতচন্দ্র চিত্রিত করেছেন। এই বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, এই ঐহিকতাবাদ ও প্রণয়রচনায় বাস্তবতাবাদ—আধুনিক কালধর্ম।"

• গোপাল হালদার-মহাশয় আরও মনে করেছেন, ভারতচন্দ্র 'অশ্রু-বিলাসী বাঙালিজাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক', যদিচ 'একালের রুচি ও নীতিতে ভারতচন্দ্রের আদিরসাত্মক বর্ণনা···দোষাবহ ঠেকবে।' কিন্তু তাহলেও যদি তাঁকে একালের মানুষ উপভোগ করতে না পারে, বুঝতে হবে 'উপভোগশক্তি সুস্থ নেই।' এসব কথা বলার পরেও তাঁকে বলতে হয়েছে, ভারতচন্দ্রের কাব্য কৃত্রিম (যদিও সে 'কৃত্রিম যৌন-বিলাস' তাঁর কাছে 'ব্রজলীলার ভাবালুতায় রসানো কৃত্রিম প্রণয়গীতে'র তুলনায় অনেক ভালো)—যে কথা বলার ফলে স্বতঃবিরোধ ঘটে যাচ্ছে, শ্রীযুক্ত হালদার তা খেয়াল করে দেখেন নি। 'যুবক-যুবতীর অত্যন্ত সহজ ও বাস্তব যৌনসম্ভোগ' কিভাবে কৃত্রিম হয় আমরা জানি না।' আসলে শ্রীযুক্ত হালদারের কাছে জীবনাদর্শ ও জীবন এক কথা, যার জন্য এক যুগের বাস্তব ব্যাপারকে অন্য যুগের ভিন্ন ভাবানুগত্যে গঠিত তাঁর মন কৃত্রিম বলে চিহ্নিত করেছে। যতদূর মনে হয়, আমরা যাকে অনুচিত বলি, তাকেই তিনি এখানে কৃত্রিম বলতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর চিন্তাশক্তি আছে। সুতরাং কৃত্রিমতাপ্রসঙ্গে যা বলেছেন দেখা যাক:

"ভারতচন্দ্রের কবিতা একালের নয়,—তা অষ্টাদশ শতকের ছাড়া আর কোনো কালের নয়। কৃত্রিম কালের তা কৃত্রিম সৃষ্টি—তার মানুষও কৃত্রিম। এ-কৃত্রিমতা ভারতচন্দ্রের একান্ত গুণ নয়। প্রথমতঃ তা নবাবী আমলের গুণ—যখন মধ্যযুগ শেষ হয়েছে, অথচ যুগান্তর সংঘটিত করতে সমাজশক্তি অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ, এ হচ্ছে রাজসভার গুণ, যেখানে কৃত্রিমতা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ; তন্মধ্যে

বিশেষ করে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার গুণ। কৃষ্ণচন্দ্র যতই চতুর হোন, জীবনে কোনো গভীরতা বা দায়িত্ববোধের নামগন্ধ তাঁর ছিল বলে প্রমাণ নেই। ভারতচন্দ্র সেই রাজসভায় খাপ খেয়ে গিয়েছেন আশ্চর্য রকমে, তা স্পষ্ট দেখি। বৈদগ্ধ্যে, বুদ্ধির ছটায়, বাক্যের ঘটায়, সব্যঙ্গ রসিকতায় (wit), বিকার-বিলাসিতায় তাঁকে সে যুগের মুখপাত্র মনে করতে পারি। বিশেষ করে লক্ষ্য করতে পারি, তাঁর মধ্যে একটা অগভীরতা, আসর জমাবার চেষ্টা, চটক লাগাবার, এবং চমক লাগিয়ে মজা দেখবার ছেলেমানুষ-সুলভ প্রবৃত্তিও। এদিক থেকে দেখলে মনে হবে, আসলে বিদ্যাসুন্দর 'বিষপুষ্প' নয়, ও হচ্ছে কাগজের ফুল।…

"কৃত্রিমতার জন্যই ভারতচন্দ্র বড় বলে গণ্য হবার অযোগ্য। এ কাব্যে প্রাণ নেই, জীবনের স্ফূর্তি নেই, এবং মানুষ নেই, আর মানুষ না থাকলে কোনো লেখা আধুনিক যুগের কাব্য হয় না। রাজসভায়—সেই নবাবী আমলের শাসক-আশ্রয়ে—বড় কবি তখন জন্মাতে পারে না, বাঁচতে পারে না, স্থির থাকতেও পারে না। কিন্তু ভারতচন্দ্রকে দেখি, তিনি সে রাজসভাতেই কবিহিসাবে জন্মেছেন, বেঁচেছেন, বেশ খোশমেজাজে বসে-বসে সরু সুতো কেটেছেন;—নতুন নাগরীয় আসরের রসিক-পুরুষদের তোষণ করেছেন, মেজে-ঘষে ঝকঝকে তকতকে কথার উপরে কথা চাপিয়ে পলাশীর প্রাক্‌ক্ষণে বাঙালি শাসকগোষ্ঠীর আসর জমিয়েছেন, এবং মৃত্যুর পরে পলাশীর রক্তসন্ধ্যায়—সেই ধ্বসে-পড়া, গলে-পড়া, নবাবী আমলের মৌতাতে ঝিমন্ত বাঙালী 'জমিদার' ও তৎপরবর্তী কলকাতার 'বাবু'-সমাজে—এবং তাদের অনুগত 'ভদ্র'-সমাজের মধ্যে—রেখে গিয়েছেন এই মৌতাতের ভাণ্ড আর রঙিন কাগজের ফুল; নিষ্প্রাণ এবং অনেকাংশে আজকের দিনে নির্বিষও।"

পুনশ্চ আমাকে প্রশ্ন করতে হচ্ছে—হালদার-মশাইয়ের অতি চমৎকার রচনা পড়বার পরে, মুগ্ধতার মধ্যেও—এই কাগজ-কুসুমিত কৃত্রিম কাব্যটি কিভাবে এখনও, রচনার দুশো বছর পরেও, প্রচণ্ডভাবে

বাংলার পাঠকসমাজকে টান দেয়, যে-বিষয়ে শ্রীযুক্ত হালদারই নিম্নের সাক্ষ্য দিয়েছেন :

"বাংলাদেশের এমন কোনো ছাত্রছাত্রী নেই, যে এ-কাহিনী না জানে, চুরি করেও এই বিদ্যাসুন্দর না পড়েছে। এমন পাঠকও নেই যে স্বীকার করবে না—এ কবির কবিত্ব অনন্যসাধারণ।"

ভারতচন্দ্রের কোনো গভীর জীবনবোধ ছিল কিনা, সে প্রশ্নের মীমাংসা আমরা অন্যত্র করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যের উগ্র ভোগাকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে জীবনক্ষুধাই প্রকাশ পেয়েছে তা ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সুপ্রবীণ লেখকও অস্বীকার করতে পারেন নি।[৮০] এক্ষেত্রে আমরা বুঝতেই পারছি, গোপাল হালদার-মশাই তাঁর নিজের বিশেষ জীবনদর্শনের পক্ষেই কথা বলেছেন, কিন্তু বলেছেন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে :

৮০। "মনে হয় যে, তাঁহার নৈসর্গিক কবিপ্রতিভা ও জীবনঅভিজ্ঞতা হইতে অর্জিত রুচি তাঁহাকে এই ধরনের কাব্য লিখিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল।··· শুধু বর্ণনার কৌশল বা শব্দ ও ছন্দের পারিপাট্যই তাঁহার অভাবনীয় সাফল্যের কারণ নহে। ইংরাজীতে যাহাকে gusto বলে, সেই জীবনরস-উচ্ছলতার সবটুকু উপভোগশক্তি দিয়া তিনি এই কলুষিত অথচ মোহকারী সৌন্দর্যের চরম স্বাদুতা আস্বাদন করিয়াছেন। এই উচ্ছৃঙ্খল যৌবনমাদকতার রূপসজ্জাময় প্রতিবেশ-রচনায়, সংলাপে, গানে, সহায়ক পাত্রপাত্রীর নিপুণ সমাবেশে, বর্ণনা-বিবৃতিতে উপচাইয়া-পড়া রসসঞ্চারে তিনি সমগ্র কাব্যটিকে একটি কামকলাবিলাসের পীঠ-স্থানের মর্যাদা দিয়াছেন। তাছাড়া কবির নিজের হাবভাব-কটাক্ষে, তির্যক ইঙ্গিত ও সংকেতে, ঈষৎ শ্লেষাত্মক মন্তব্যে, সমাজজীবনের গ্লানিকর, ছেঁড়া তালি দেওয়া নীচের দিকের উদ্‌ঘাটনে, বাস্তব লবণ-সংযোগে কৃত্রিম আদর্শবাদক্লিষ্ট রুচির বিস্বাদ দূরীকরণে এমন একটা সোৎসাহ সমর্থন ও বর্ণিত বিষয়ের সহিত একাত্মতার নিদর্শন পাওয়া যায় যে, ইহাতে যে মধ্যযুগীয় ভাব-কুম্ভকর্ণের ষড়শতাব্দব্যাপী নিদ্রা-ভঙ্গ হইয়াছে, কবিচিত্তে যে নূতন ক্ষুধা, রসনা-পরিতৃপ্তির নূতন প্রেরণা অনুভূত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।"

[ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত ভূমিকা ; ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ' গ্রন্থের।]

"'কাব্য রস লয়ে', ভারতচন্দ্র এই কথাটা জানতেন; কিন্তু কথাটার অর্থ আজ বদলে গেছে। তিনি শোনেনও নি তখন—এ-রস 'জীবনরস', এবং 'মানবরস'—সর্বরসসার। মধ্যযুগের মানসে সেই সত্য সহজে অনুভূত হতে পারে না; অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় তার আভাস মেলাও অসম্ভব।…মুকুন্দরামের মধ্যে মানুষের যতটুকু পরিচয় দেখা গিয়েছিল, ভারতচন্দ্রে তাও আর নেই। সেই চরিত্রচিত্র কয়েকটা সব্যঙ্গ রেখাচিত্রে পরিণত হয়েছে। এই রেখায় ধার আছে কিন্তু রূপ নেই। একবার মাত্র ভারতচন্দ্র জীবনে হঠাৎ একটি জীবন্ত স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। হয়ত তাঁর নিজের মনে নেই তার কথা—পাঠকেরই মনে বেঁচে রয়েছে সেই সরল বাঙালি-মাঝি ঈশ্বরী পাটুনী, আর অবজ্ঞাত বাঙালি-জনশ্রেণীর সেই সত্য প্রার্থনা—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' চিরকালের মূঢ় ম্লান মূক বাঙালির সমস্ত বাস্তব ও আধ্যাত্মিক ইতিহাসও এই কথাটিতেই ভাষা পেয়েছে—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'"

॥ ১৭ ॥

ভারতচন্দ্র-বিষয়ে উত্তম রচনা, বিস্ময়ের কথা, বাংলা অপেক্ষা ইংরেজিতে কম হয় নি, হয়ত বেশিই হয়েছে। ওয়েঙ্গার, হরচন্দ্র দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, গৌরদাস বৈরাগী, প্রমথ চৌধুরী এবং জে সি ঘোষের লেখার কথা এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে আসে। শেষোক্ত দু'জনের লেখার আলোচনা করেই এই দীর্ঘ অধ্যায়ের সমাপ্তি করব।

উক্ত দুইজনের শেষোক্ত জে সি ঘোষ তাঁর *Bengali Literature* (১৯৪৮) গ্রন্থে অনেকখানি অংশ নিয়ে ভারতচন্দ্রের আলোচনা করেছেন, এবং যে-কয়েকজন কবির বিষয়ে তাঁর রচনা উত্তম, তাঁদের একজন ভারতচন্দ্র। জে সি ঘোষের রচনায় অপসমালোচনার যথেষ্ট নিদর্শন আছে, যথা বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে তাঁর দায়িত্বহীন কটু নিন্দা, কিন্তু ভারতচন্দ্রকে সত্যই সমাদরের সঙ্গে তিনি গ্রহণ করেছেন। তাঁর কথা

মানি বা না-মানি, তাঁর রচনাগুণকে আমরা স্বীকার করব এবং সবিনয়ে জানিয়ে দেব, ঘোষ-মহাশয় তাঁর ভাবনায় সম্পূর্ণ মৌলিক নন—প্রায় তেত্রিশ বৎসর আগে প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর ইংরেজি প্রবন্ধের দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত, তাঁর ঋণ অনেক সময়েই আক্ষরিক এবং—অধিকতর বিস্ময়ের সঙ্গে বলতে পারি—যেখানেই তিনি প্রমথ চৌধুরীকে ত্যাগ করেছেন, সেখানেই তাঁর পদক্ষেপ অসংলগ্ন হয়ে পড়েছে। তবু তাঁর রচনায় সজীবতা আছে, দীপ্ত ব্যক্তিকতা আছে, অর্থাৎ স্টাইল আছে, যার যোগে তিনি ইংরেজি-ভাষী বা ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ পাঠকের কাছে ভারতচন্দ্রকে বিবেচনাযোগ্য কবিরূপে প্রতীয়মান করতে পেরেছেন।

এবং আধুনিক বাঙালি পাঠকের কাছে (যাঁরা, যে-সাহিত্যের উত্তম সমালোচনা নেই, তাকে সাহিত্যই মনে করেন না) ভারতচন্দ্রকে গ্রহণ-যোগ্য করেছেন প্রমথ চৌধুরী। এর পিছনে ঐতিহাসিক কারণও আছে। ব্রাহ্ম-নীতিবাদ যখন কিছু উগ্রতা হারিয়ে, অথচ পরিশীলন আয়ত্ত করে, প্রতিভার সূতিকাগার ঠাকুরপরিবারে আশ্রিত ছিল; সে পরিবারে যেহেতু ভারতচন্দ্র প্রত্যাখ্যাত সুতরাং বাংলাসাহিত্যেও তিনি নির্বাসিত—এমন একটা ধারণা যখন গড়ে উঠেছে; তখন এই পরিবারের জামাতা প্রমথ চৌধুরী তাঁর মহাকবি-শ্বশুর রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখলেন (*The Story of Bengali Literature*, 1917), এবং তাতে ভারতচন্দ্রের গুণ-দোষের মধ্যে গুণাধিক্যের কথাই বেশি বললেন, তখন ভারতচন্দ্র যেন রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি লাইন ধরে খাড়া হয়ে উঠলেন—'ভস্মঅপমানশয্যা ছাড়ো পুষ্পধনু।'

তাছাড়া প্রমথ চৌধুরী খুব লেখাপড়া-জানা লোক, ব্যারিস্টারী পাস করেও প্রাকটিশ না করে, বই পড়ে জীবন কাটিয়ে দেবার সামর্থ্য এবং বাসনা আছে তাঁর, ফরাসি সাহিত্য তিনি গুলে খেয়েছেন—এ ধরনের একটা ধারণাও বিদগ্ধমহলে অল্পবিস্তর চলিত ছিল। এহেন প্রমথ চৌধুরী যদি ভারতচন্দ্রকে বড় কবি বলেন তাহলে কথাটা ধর্তব্যের

মধ্যে আসে। এবং তিনি সত্যই ভারতচন্দ্রের সুন্দরাশ্রিত কাব্যের পক্ষে সুন্দর কিছু বাগ্‌দান করেছিলেন উক্ত ইংরেজি প্রবন্ধে। তাই নয়, বাংলা-তেও তারপরে 'ভারতচন্দ্র' নামে একটি প্রবন্ধ লিখলেন (১৩৩৫ শ্রাবণ); এবং আরও নানা প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের প্রসঙ্গ অল্পবিস্তর আনলেন, যেমন ধরা যাক, 'চিত্রাঙ্গদা' (১৩৩৪ চৈত্র) প্রবন্ধে, যেটি রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্যের আলোচনা, যে-কাব্যটি (কবিগুরুর যে-কাব্যটি!) অশ্লীল বলে চিহ্নিত হয়েছিল।

প্রমথ চৌধুরী, আমাদের বিবেচনায় ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সমালোচক। একথা বলছি কেবল এইজন্য নয় যে, তিনি উত্তম ইংরেজিতে এবং বাংলায় ভারতচন্দ্রের বিষয়ে লিখেছেন। অধিকন্তু একথা স্বীকার করতে হবে, তিনি এমন-কিছু বলেছেন, যা পূর্বে বলা হয় নি। ভারতচন্দ্রের নব-মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সে-কথাগুলির মূল্য অপরিসীম। প্রমথ চৌধুরীর রচনার মধ্যে লক্ষণীয় এই—তাঁর লেখা থেকে মনে হবে না তিনি বিচারকের উঁচু আসন থেকে বিচার ঘোষণা করেছেন, (কবির জজিয়তি করা আমার স্বভাব নয়, তিনি বলেছেন), কিংবা মুরুব্বির মতো পিঠ চাপড়েছেন, কিংবা বশংবদের মতো গুণানুবাদ করেছেন, কিংবা তোয়াজ করেছেন স্তাবকের মতো। তাঁর লেখার ভঙ্গিতে মনে হয়, ভদ্রলোকের সম্বন্ধে ভদ্রলোক কথা বলছেন একই জমিতে দাঁড়িয়ে—সভ্য শালীন বিদগ্ধ মর্যাদাময়ভাবে। কেউই করুণার প্রার্থী নন—কি কবি, কি সমালোচক।

ভারতচন্দ্রের ভাষা, অলঙ্কার ও ছন্দোভঙ্গির সম্বন্ধে ইতিপূর্বে অনেক চমৎকার কথা বলা হয়েছে; এমন-কি ভাবের দিক থেকে ভারতচন্দ্র বাংলাসাহিত্যে সেক্যুলার-ভাবের প্রবর্তক সে কথাও।[৮১] কিন্তু অধি-

---

৮১। সোমপ্রকাশ পত্রিকার ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ সংখ্যায় 'সাহিত্য ও সুরুচি' রচনার মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের বিচারে যথেষ্ট আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই:

"প্রাচীনতম বাঙ্গালা কাব্যসমূহ ধর্মমূলক। ধর্মহীন কাব্য প্রথম বোধহয় কবিবর ভারতচন্দ্রই বাঙ্গালা ভাষায় সর্বপ্রথম রচনা করেন। তাঁহার অন্নদামঙ্গল, চোর পঞ্চাশৎ প্রভৃতি গ্রন্থ ধর্মমূলক কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গে ধর্মের কোনো মূলগত

কাংশ সমালোচনা ভারতচন্দ্রের শিল্পসাফল্য এবং নীতিদুষ্টির নিন্দায় বা নিন্দার নিন্দায় সীমাবদ্ধ ছিল। ওয়েঙ্গার একটি জিনিস অনেক আগেই যোগ করে দিয়েছিলেন—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের রোমান্টি-কতা। বিদেশীয় সাহিত্যের রোমান্টিক চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় থাকার জন্য অবিলম্বে ঐ কথাগুলি তিনি বলতে পেরেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর রচনায় এইসব বস্তুর অল্পবিস্তর সমাবেশ অবশ্যই আছে—কিন্তু তিনি এইসঙ্গে এমন অপূর্ব বুদ্ধির দীপ্তি যোগ করে দিয়েছিলেন, যাতে কিছু-জানা বিষয়ও অভিনব আলোকস্পর্শে নবমূর্তি পেয়েছিল।

প্রমথ চৌধুরীর রচনার বিষয়বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বলার আগে আলোচ্য বিষয়ে লেখা তাঁর ইংরেজি রচনাংশ তুলে ধরতে চাই—সেটির মূল্যের জন্য এবং দুষ্প্রাপ্যতার জন্য :

> "....You have seen that the whole of our poetic literature was intimately connected with religion, and thereby had assumed not only a semi-religious, but almost a sectarian character.
>
> "But there is one striking exception to this rule. There is a unique book, the Vidya Sundar of Bharat Chandra—unique both in its merits and faults,—which marks the birth of secular spirit in our literature. I have already

---

সম্পর্ক নাই। তিনি যে-সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তখন ধর্ম-কাব্যসমূহই বঙ্গীয় সাহিত্যভাণ্ডারের প্রধান রস। ভারতচন্দ্র তাহাদের আদর্শ গ্রহণ না করিয়া করেন কি! (অথচ) তখনকার কবিতায় গৃহীত সবই শরীর-বর্ণনা ও শরীরের বৃত্তি-সমূহের বর্ণনা। তখনকার প্রেমের আদর্শ দেহজ প্রীতি। ...বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির রাধাকৃষ্ণের প্রেমের আদর্শে ভারতচন্দ্রের সময়ের লোকদিগের প্রেমের ভাব গঠিত হইয়াছিল। [কিন্তু] তিনি ধর্মকাব্য লিখিতে গিয়া বিদ্যাসুন্দর লিখিলেন। বিদ্যাসুন্দরের দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের নয় কিন্তু বাঙালি সমাজের অনিষ্ট ঘটিল।...বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের ভাব ভারতচন্দ্র গ্রহণ করিলেন কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম গ্রহণ করিলেন না। তাহাতেই বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির লেখাতে যে অনিষ্ট হয় নাই, ভারতচন্দ্রের কাব্যে তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক অনিষ্ট হইয়াছে।"

said that an epic poem pertakes of the character of architecture ;—what Bharat Chandra has given us is a piece of literary sculpture The Vidya Sundar is a love story, a novel in verse. And the love he treats of has nothing spiritual or ideal about it, but is of the common mundane passion which lends itself to humorous and even indelicate treatment. To Bharat Chandra, love in an amusing episode in a man's life, and he has not failed to draw all the fun he could out of his subject. Bharat Chandra's poem, if I may say so, is a study in nude—not of Psyche, but of Venus Pandemos. He has not forgotten to give the conventional mythological frame to his picture. But he handles the gods and goddesses with such dexterous irreverence, that in his hands the sacred drama of the Hindu pantheon degenerates into a secular comedy. The son of a Rajah himself, and the Court-Poet of another Rajah, Krishna Chandra—one of the principal actors in the drama of Plassay,—he embodies in his works all the outer elegance and all the inner corruption of a decadent aristocratic society. Gay and frivolous, cultured and cynical, witty and perverse, Bharat Chandra represents the utterly secular spirit of 18th century poetry. However paradoxical it may sound, there is no gainsaying the fact that he had a typical Latin soul, and there is nothing indefinite or incohate, shadowy or mystical about his poetry, which is as brilliant, as it is transparent.

Bharat Chandra's reputation is under a cloud now. The English educated community have no stomach for a literature which is neither clean no healthy. A subtle and persistent odour of decaying morals and dying faith pervades the whole poem, which makes the modern reader feel uncomfortably squeamish. I have no hesitation in admitting that Bharat Chandra's masterpiece is a *fleur de mal*, but it is a flower all the same, many petalled and of perfect form. In the whole field of ancient Bengali literature, there is nothing which can be compared to it as a work of art. With the solitary exception of Rabindranath

Tagore, no Bengalee poet has ever shown such mastery over verse forms. In sheer technical skill, I doubt if he has any superior, even amongst the Neo-Parnassian poets of France. I know the modern mind has a prejudice against technique. It is considered as something artificial and mechanical, but that is because the modern mind does not appreciate the abiding value of conscientious work. The time-spirit of this age is in such a tremendous hurry to get on, that it has no leisure to create or appreciate anything permanent.

As regards Bharat Chandra's language, there is nothing more limpid more bright, more graceful or more elegant in the whole range of Bengali literature. Our people did not know what a plastic material they had in their own language, till Bharat Chandra moulded it into shapes of perfect beauty, so firm in outline, so symmetrical in structure Bharat Chandra as a supreme literary craftsman, will ever remain a master to us writers of the Bengali language. He was not only the finest artist, but the keenest intellect of the Bengali literature of pre-British days. He knew the world and its affairs, as no predecessor of his ever did. He paints a harrowing picture of the limitless anarchy of his time, which proclaims loudly that the old order must change, giving place to the new, if the Bengalee people were to live and grow. In a lyric of rare beauty and sincerity Bharat Chandra addressing the God says, that the game you play every day is not good for every day, so play something new after my heart. His prayer was heard, and within a year of Poet's death, the battle of Plassey was fought and won by the English.[৮২]

৮২। জে সি ঘোষ তাঁর অতি চমৎকার ভারতচন্দ্র আলোচনায় প্রমথ চৌধুরীর দ্বারা চালিত ছিলেন, একথা বলেছি। তাঁর ঋণ কেবল বিষয় বা ভাবনার ক্ষেত্রে নয়, ভাষার ব্যাপারেও, তা একটু দেখিয়ে দিতে চাই, বিশেষ এই কারণে যে, তিনি অন্যমনস্ক হয়ে প্রমথ চৌধুরীর নাম করতে ভুলে গেছেন। অবশ্য, বড়

প্রথমেই দেখি—প্রমথ চৌধুরী স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন—ভারতচন্দ্র বাংলাসাহিত্যের সর্বকালীন শ্রেষ্ঠদের একজন। একথা বলেই তিনি থামেন নি ; বলেছেন—পৃথিবীর অন্য সাহিত্যিকদের মধ্যেও তাঁর স্থান পাতা আছে। প্রথম প্রসঙ্গ এই :

"আব একটি কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, [ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পরে] গত একশ আশি বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সভ্যতায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। দেশ এখন ইংরেজের রাজ্য ; আমাদের কর্মজীবন এখন ইংরেজ-রাজের প্রবর্তিত মার্গ অবলম্বন করেছে। ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার ফলে আমাদের মনোজগতেও বিপ্লব ঘটেছে। অথচ দেশের লোকের জীবনে ও মনে

মন একইরকম ভাবে, আমরা জানি—যদি জে সি ঘোষ প্রমথ চৌধুরীর লেখা না পড়ে ঐ প্রকার লিখে থাকেন তাহলে আরও জানব—বড় মন একই ভাষায় লেখে!

জে সি ঘোষের কয়েকটি লাইন :

"Krishnachandra's court was typical of the outer elegance and inner corruption of the aristocracy of the age···Bharatchandra's sharp intellect shines through every page of his work, and the classicist character of his genius is every-where in evidence. More even than Mukundaram does he represent the birth of the secular and rational spirit of our literature. There is nothing vague or shadowy about his poetry, it is as brilliant as it is transparent. His attitude towards the gods and goddesses can be irreverent····Love, as he depicts it··· has nothing ideal, spiritual or mystical about it ; it is, on the contrary, very much common earthly passion····*Vidya Sundar* is a *fleur de mal*, but it is a beautiful flower all the same, bright-hued, many petalled and of perfect form. It is unique in our literature a a work of art···Rabindranath Tagore is his sole rival in technical skill, but Rabindranath himself would freely acknowledge Bharatchandra his master in the handling of Sanskrit verse-form.

[*Bengali Literature* (1948) : J. C. Ghosh]

এই খণ্ডপ্রলয়ের মধ্যেও ভারতচন্দ্র চিরজীবী হয়ে রয়েছেন। এরই নাম সাহিত্যে অমরতা।" ['ভারতচন্দ্র']

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ ঃ

"আমার বিশ্বাস, ভারতচন্দ্র যদি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে তাঁর প্রতিভা অনুকূল অবস্থার ভিতর আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠত, এবং তাঁর রচনা ফরাসি-সাহিত্যের একটি মাস্টারপিস্ বলে গণ্য হত।" ['ফরাসি-সাহিত্যের বর্ণপরিচয়' ।

ইংরেজি প্রবন্ধে দেখেছি, প্রমথ চৌধুরী মনে করেন, নিছক রচনা-শৈলীর বিচারে ফ্রান্সের নয়া পার্নাশিয়ান কবিগণের মধ্যেও ভারতচন্দ্রকে অতিক্রম করতে সমর্থ, এমন কেউ আছেন কি-না সন্দেহ।

'সাহিত্যে অমরতা'-প্রাপ্ত ভারতচন্দ্রের 'অমরতার কারণ আবিষ্কার করাই', প্রমথ চৌধুরী মনে করেন, সমালোচকের কর্তব্য। এই চেষ্টায় তিনি প্রধানতঃ উক্ত অমরত্বের জ্ঞাত কারণটিকেই নিজস্ব দীপ্ত ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন—ভারতচন্দ্রের ভাষা ও রচনারীতির সেই হীরকদ্যুতির কথা অন্য অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব। এখানে এইটুকু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, প্রমথ চৌধুরী মনে করেন, ভারতচন্দ্র কেবল পুরাতন সাহিত্যের উত্তম এক নমুনা নন—সাহিত্যরীতির দিক দিয়ে এখনো অনুসরণীয় আদর্শ। ভারতচন্দ্রের সাহিত্য রোমান্টিক না রিয়ালিস্টিক, সে সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্যের আলোচনাও যথাসময়ে করব। এখানে দেখে নিতে চাই—ভারতচন্দ্রের কাব্যের মূল চরিত্র সম্বন্ধে তিনি কি বলতে চেয়েছেন।

অন্য অনেকের মতো তিনি বিদ্যাসুন্দরকে সেক্যুলর কমেডি মনে করেন। তা যে, কাব্যে উপন্যাস, তাও বলেছেন, এবং অনবদ্যভাবে বিদ্যাসুন্দরের প্রেমপ্রকৃতির রূপাঙ্কন করেছেন। যথা—বিদ্যাসুন্দর প্রেমের গল্প ; সে প্রেম আধ্যাত্মিক বা আদর্শায়িত ব্যাপার নয়, নিতান্ত সাধারণ পার্থিব কামনা—সরস, সহাস, এমন কি ভঙ্গিতে অশিষ্ট। কবির কাছে প্রেম মানুষের জীবনের মহা স্ফূর্তির কাণ্ড, তার ভিতর থেকে যত-কিছু মজা টেনে বার করা সম্ভব তা তিনি করেছেন। ভারতচন্দ্রের

কাব্য যেন বিবসনাগণের সৌন্দর্যচর্চা—সাইকীর নয়, ভেনাস প্যাণ্ডি-মোর। স্ফূর্তিবাজ ও লঘুচেতা, বিদগ্ধ ও বিদ্বিষ্ট, বাকচতুর ও বিকৃতবুদ্ধি —এই কবি আঠারো শতকের বিশুদ্ধ সেক্যুলার মেজাজের প্রতিনিধি। শুনতে যত উদ্ভটই মনে হোক, এ-কথায় 'না' করা যাবে না যে, তাঁর ছিল বিশুদ্ধ ল্যাটিন-প্রাণ। তাঁর কাব্যে অস্পষ্ট, অসংলগ্ন, ছায়াচ্ছন্ন বলে কোনো কিছু নেই, তা যেমন স্বচ্ছ, তেমনি দীপ্তোজ্জ্বল।[৮৩]

ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগের বিষয়ে প্রমথ চৌধুরী অনবহিত থাকতে পারেন নি। মাকিয়াভেলির মতোই 'যুগপৎ বড় লেখক ও দুষ্ট লেখক' হিসাবে ভারতচন্দ্রের খ্যাতি বা অখ্যাতি। মাকিয়াভেলির

৮৩। জে সি ঘোষ প্রমথ চৌধুরীর এই কথাগুলিরই প্রতিধ্বনি করেছিলেন যখন বলেছিলেন : ভারতচন্দ্রের মধ্যে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির খুবই অভাব, তিনি অংশকেই দেখান, পূর্ণকে নয়, এবং দেখান সেই অংশকে যা হাস্যকর। উজ্জ্বল বিশুদ্ধ বুদ্ধির দৃষ্টি তাঁর, যদিও তা আংশিক, অসামগ্রিক। যেন উচ্ছল হাসির মেজাজে এক দায়িত্বহীন অদম্য 'পাক্' (শেক্সপীয়ারের মিডসামার নাইটের রঙ্গিণী পরী—'Puck')—চেঁচিয়ে বলছে—হা ভগবান। কি নির্বোধ এই মর্ত্যের জীবগুলি!

একই ধরনের আরও কথা : বিদ্যাসুন্দর প্রেমকাব্য, কিন্তু ফ্রি-কমেডির মেজাজে রচিত। দায়িত্বহীন ও কৃত্রিম, বাক্‌চতুর ও পরিমার্জিত, প্রতি শব্দে ও প্রয়োগভঙ্গিমায় দ্যুতিবিকীর্ণ এই কাব্য প্রথম শ্রেণীর কমেডি অব ম্যানার্স (অর্থাৎ বনেদী সংস্কৃতির পরিশীলিত মনুষ্যের দীর্ঘ অভ্যস্ত আচার-আচরণের রসহাস্যপূর্ণ চিত্রণ)।

এই 'খেলারসে খেলে পাগল'-এর চেহারা, জে সি ঘোষের ইংরেজিতে :

"The author laughs at high society, but not in a corrective or reforming spirit, and has no morals to inculcate, no norms to uphold. He is moved by the spirit of pure fun, and his whole object is to amuse and entertain. He plays with everyone and everything, with gods and men and with love and sorrow, and he takes nothing seriously except his art."

কী চমৎকার লেখা! পড়লেই মনে হয়, জে সি ঘোষ ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে যে-কথা বলেছেন, তা তাঁর সম্বন্ধেও সত্য—লেখার শিল্পগুণ ছাড়া অন্য গুণের দিকে বেশি নজর দেবার ইচ্ছা তিনি করেন নি। তাই মুগ্ধতার মধ্যেও তাঁর বক্তব্যের বিষয়ে কিছু আপত্তি আমাদের পরে করতে হবে।

দুর্নামের কারণ তাঁর কূট রাজনৈতিক দর্শন এবং ভারতচন্দ্রের দুর্নামের কারণ তাঁর অশিষ্ট প্রেমদর্শন। এই দুর্নামের প্রশ্নে প্রমথ চৌধুরী বিশেষ বিচলিত নন। তিনি এদেশীয় মতে রসবাদী, বিদেশীয় মতে কলাকৈবল্যবাদী। অশ্লীলতাকে তিনি শরীর-সম্বন্ধে বিচার করতে আগ্রহী নন—তা আপত্তিকর যদি তা গ্রাম্য বা ভাল্‌গার হয়ে ওঠে, যদি তা 'রসের প্রতিবন্ধক হয়।' এই অর্থে 'অশ্লীলতা কাব্যের একটি স্পষ্ট দোষ।' তাঁর মতে, 'শ্লীলতা অশ্লীলতা সুরুচির কথা, সুনীতির কথা নয়।' একালে যে, 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা করার উগ্র বাসনা জেগেছে' তার পিছনের প্রেরণা—'ইংরেজি ওরফে খ্রীস্টানী সাধু মনোভাব।' 'ঘোর নৈতিক বলে বলে গণ্য' ইংরেজ-জাতি মর্যালিটিকে ইউটিলিটিতে পরিণত করতে গিয়ে সাহিত্যের স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়েছে[৮৪]—যে মধ্য-ভিক্টোরীয় নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পুরাতন ভারতীয় সাহিত্যের বিচার সম্ভবপর

৮৪। একেবারে জ্যান্ত সাহিত্যের চলিত ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দ ইংরেজের নৈতিক ভণ্ডামী এবং ফরাসীর প্রকৃষ্ট ইন্দ্রিয়চর্চার কথা বলেছেন, ফরাসির সঙ্গে অন্য জাতির চমৎকার কিছু তুলনাও করেছেন। আমি দু-এক লাইন তুলছি:

"আমাদের দেশে এই পারি-নগরীর বদনামই শুনতে পাওয়া যায়, এ পারি মহাকদর্য, বেশ্যাপূর্ণ নরককুণ্ড। অবশ্য একথা ইংরেজরাই বলে থাকে। · কিন্তু লণ্ডন বার্লিন, ভিয়েনা, নিউইয়র্কও ঐ বারবনিতাপূর্ণ, ভোগের উদ্যোগপণ। তবে তফাত এই যে, অন্যদেশের ইন্দ্রিয়চর্চা পশুবৎ, প্যারিসের—সভ্য পারির—ময়লা সোনার পাতমোড়া। বুনো শোরের পাঁকে লোটা আর ময়ূরের পেখমধরা নাচে যে তফাত, অন্যান্য শহরের পৈশাচিক ভোগ আর এ প্যারিস-বিলাসের সেই তফাত।

"ভোগবিলাসের ইচ্ছা কোন্ জাতে নেই বলো?… ইচ্ছা সর্বদেশে, উদ্যোগের ত্রুটি কোথাও কম দেখি না; তবে এরা সুসিদ্ধ হয়েছে, ভোগ করতে জানে, বিলাসের সপ্তমে পৌঁছেছে।

"তাও অধিকাংশ কদর্য নাচ তামাশা বিদেশীর জন্য।…ফরাসিরা বড় সুসভ্য, আদবকায়দা বেজায়, খাতির খুব করে, পয়সাগুলি সব বার করে নেয়, আর মুচকে মুচকে হাসে।

"…এরা আমোদপ্রিয়, কোনো বড় সামাজিক ব্যাপার নর্তকীর নাচ না হলে

নয়—কীথের এই বক্তব্যকে সাগ্রহে উপস্থিত করেছেন প্রমথ চৌধুরী।[৮৫] তিনি এইটেই স্পষ্ট করে বলতে চেয়েছেন, 'সেকালে কাব্য নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াত, সত্য অথবা শিবের হাত ধরে নয়।'

সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতার গোটা প্রশ্নটিকেই প্রমথ চৌধুরী অশ্লীল বলে উড়িয়ে দিয়েছেন: যদি কিছু অশ্লীল অর্থাৎ গ্রাম্য হয়, তাহলে তা সাহিত্য হয় কি প্রকারে? প্রশ্ন করেছেন (চিত্রাঙ্গদার বিরুদ্ধে অশ্লীল অপবাদের উত্তর দিতে গিয়ে)—বাস্তব জগতের চুরি আর সাহিত্যে বর্ণিত চুরি কি এক? কদাপি নয়। 'মৃচ্ছকটিক নাটকে পরের ঘরে সিঁদ কেটে চুরি করার চমৎকার বর্ণনা আছে এবং শর্বিলকের মুখে চুরিবিদ্যার একটি সরস গুণকীর্তন আছে।...অথচ অদ্যাবধি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি সংস্কৃতসাহিত্য হতে মৃচ্ছকটিকের ও-অংশ বহিষ্কৃত করবার প্রস্তাব করেন নি।...এর কারণ, সমাজে যা অধর্ম, কাব্যে তা রসে পরিণত হয়েছে। ফলে মৃচ্ছকটিক পড়ে কারও মনে চুরি করবার প্রবৃত্তি জন্মায় নি। মর‍্যালিটি হচ্ছে মানুষের ব্যবহারিক আত্মার জিনিস, আর কাব্য তার অন্তরাত্মার।'[৮৬] সুতরাং প্রমথ চৌধুরীর সিদ্ধান্ত: 'Erotic কাব্য বলে কোনো বস্তু নেই, কেননা যে-মুহূর্তে কবির কল্পনা কাব্য আকার ধারণ করবে, সেই মুহূর্তেই তা eroticism অতিক্রম করে।'

ভারতচন্দ্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মন স্বতঃই প্রাচীন নাগরিক জীবনের চিন্তায় প্রস্থান করেছে। সেকালে 'নাগরিক' শব্দের অর্থ ছিল কালচার্ড। 'বই পড়া' প্রবন্ধে তিনি বাৎস্যায়ন থেকে সেকালের বিদগ্ধ ব্যক্তির ছবি তুলেছেন তার মধ্যে সেকালীন নাগরিকের আর্ট-

---

সম্পূর্ণ হয় না।...ইংরেজ ওলবাটা-মুখ, অন্ধকার দেশে বাস করে, সদা নিরানন্দ; ওদের মতে এ বড় অশ্লীল, কিন্তু থিয়েটারে হলে দোষ নেই। এ কথাটাও বলি যে, এদের নাচটা আমাদের চোখে অশ্লীল বটে, তবে এদের সয়ে গেছে। নেংটি নাচ সর্বত্র, ও গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু ইংরেজ আমেরিকান দেখতেও ছাড়বে না, আর ঘরে গিয়ে গাল দিতেও ছাড়বে না।" ['প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য']

৮৫। 'কাব্যে অশ্লীলতা: আলঙ্কারিক মত।'

৮৬। 'চিত্রাঙ্গদা।'

চর্চার সুন্দর বিবরণ পেয়েছি, জেনেছি যে, তারা নীতিমান হতে আগ্রহী ছিল না, রুচিবান হওয়াই ছিল তাদের জীবনচর্যার লক্ষ্য। সেকালের নাগরিক বা বিট সম্বন্ধে ঐ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

"চরিত্রহীন অথচ কলাকুশল নাগরিকদের সেকালে সাধারণ সংজ্ঞা ছিল 'বিট'। এই বিটের একটি ছবি আমরা মৃচ্ছকটিকে দেখতে পাই। ঐ নাটকের রাজশ্যালক শকারের সঙ্গে বিটের তুলনা করলেই নিরক্ষর ও বিদগ্ধজনের প্রকৃতির তারতম্য স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। উভয়েই সমান বিলাসভক্ত, কিন্তু শকার পশু আর বিট সুজন। শকারের ব্যবহার দেখলে ও কথা শুনলে তাকে অর্ধচন্দ্র দিতে হাত নিশপিশ করে ; অপরপক্ষে বিটের ব্যবহারের সৌজন্য, ভাষার আভিজাত্য, মনের সরসতা এত বেশি যে, তাঁকে সাদরসম্ভাষণ করে ঘরে এনে বসাতে ইচ্ছে যায় দু'দণ্ড আলাপ করবার জন্য। বৈদগ্ধ্য যে একটি সামাজিক গুণ, একথা অস্বীকার করায় সত্যের অপলাপ করা হবে। মার্জিত রুচি, পরিষ্কৃত বুদ্ধি, সংযত ভাষা ও বিনীত ব্যবহার মানুষকে চিরকাল মুগ্ধ করে এসেছে এবং সম্ভবতঃ চিরকাল করবে। এ সকল বস্তু সমাজকে উন্নত না হোক, অলঙ্কৃত করে।"

প্রমথ চৌধুরীকে ভারতচন্দ্রের একগুঁয়ে সমর্থক মনে হবে না, যদি স্মরণ করিয়ে দিই, তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন :

"পরের মনোরঞ্জন করতে গেলে সরস্বতীর বরপুত্রও যে নট-বিটের দলভুক্ত হয়ে পড়েন তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ স্বয়ং ভারত-চন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য না হলে তিনি বিদ্যাসুন্দর রচনা করতেন না, কিন্তু তাঁর হাতে বিদ্যা ও সুন্দরের অপূর্ব মিলন সংঘটিত হত, কেন না knowledge এবং art উভয়ই তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল। বিদ্যাসুন্দর খেলনা হলেও রাজার বিলাসভবনের পাঞ্চালিকা—সুবর্ণে গঠিত, সুগঠিত এবং মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত। তাই আজও তার যথেষ্ট মূল্য আছে, অন্ততঃ জহুরীর কাছে।"[৮৭]

৮৭। 'সাহিত্যে খেলা।'

প্রমথ চৌধুরী অধিকন্তু স্বীকার করেছেন, ভারতচন্দ্রের কাব্যে অশ্লীলতা আছে, যদিও তা আর্টিস্টিক।[৮৮]

তাহলে তিনি ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে ঠিক কি বলতে চান? তাঁর যে-রকম নাগরিক মন তাতে নিরেট কোনো সিদ্ধান্তকে সম্ভবতঃ তিনি নিতান্ত স্থূল মনে করেন; 'রাগদ্বেষ' প্রকাশ করা তাঁর মতে সাহিত্য-সমালোচনা নয়। আমরা যতদূর বুঝেছি, তিনি মনে করেন, বিদ্যাসুন্দর 'অমর' সাহিত্য হয়েও সর্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্য নয়, এবং বিদ্যাসুন্দরের অমরত্বের ভিত্তি তার স্টাইলে—বিষয়ে নয়। প্রমথ চৌধুরী যেখানে ঐ কাব্যের ভাব-বক্তব্যের কথা বলতে গেছেন, সেখানে তাঁর অজান্তে স্ববিরোধ প্রকাশ পেয়েছে—তাঁর মতো আত্মসচেতন বুদ্ধিজীবীর লেখাতেও !!

প্রমথ চৌধুরীর কাছে ভারতচন্দ্রের সমাদর যে মুখ্যতঃ রীতির জন্যই. তা বোঝা যায় যখন তাঁকে বলতে শুনি: "কবিতা রচনার আর্ট নবীন কবিদের অনেকটা করায়ত্ত হয়েছে, একথা যদি সত্য হয়, তাহলে তাঁদের লজ্জা থাকার কোনো কারণ নেই। ভারতচন্দ্র মালিনীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে. 'আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে, এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।'—স্বয়ং ভারতচন্দ্রের কবিতার ঠাট যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহলে যে গুঁড়া অবশিষ্ট থাকে, তাতে ফোঁটা দেওয়া চলে না, কেননা সে গুঁড়া চন্দনের নয়। অথচ ভারতচন্দ্র যে কবি. সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।[৮৯]

একথা বোধহয় ঠিক যে, কাব্যে দেহের সৌন্দর্য থাকলেই প্রমথ চৌধুরী তাকে কাব্য বলতে রাজি (যদিও উল্টোপক্ষে আত্মার সৌন্দর্য আছে কিন্তু দেহের সৌন্দর্য নেই, এমন-কিছু তাঁর কাছে কাব্যপদবাচ্য নয়)—কিন্তু তিনি ভাবের সৌন্দর্যকে মূল্য দিতেন না এমনও মনে করা শক্ত, কেননা দেখতে পাই, উভয় সৌন্দর্যের সম্মিলনের ক্ষেত্রেই তিনি

৮৮। 'ভারতচন্দ্র।'

৮৯। 'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য।'

শ্রেষ্ঠ কাব্যের আবির্ভাব স্বীকার করেন। তিনি যখন বলেন, বিদ্যাসুন্দরে অশ্লীলতা আছে, তখন অবশ্যই মেনে নেন, সেখানে এমন কিছু আছে যা রসসৃষ্টির প্রতিবন্ধক। আগেই দেখেছি, কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন করতে হয়েছিল বলে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, ভারতচন্দ্রের কাব্যে 'নলেজ' ও 'আর্টের' সম্মিলন হয় নি এবং সরস্বতীর বরপুত্র হবার প্রতিভা ধরেও তিনি নট-বিট হয়ে রইলেন। 'রাজার বিলাসভবনের পাঞ্চালিকা' যতই সুবর্ণে গঠিত হোক, এবং পরবর্তী জহুরীদের কাছে যতই আদরের বস্তু হোক, সেটা যে চূড়ান্ত প্রতিভাকে প্রকাশ করে নি, তাও বলেছেন দেখতে পাই। 'অনুকূল পরিবেশে' পড়লে ভারতচন্দ্র ফরাসি সাহিত্যের মাস্টারপিস রচনা করতে পারতেন—তার মানে অনুকূল পরিবেশের অভাবের জন্য তাঁর সাহিত্য মাস্টারপিসের পর্যায়ে ওঠে নি।

মাস্টারপিস কাকে বলে, প্রমথ চৌধুরী বাংলাসাহিত্য থেকে তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা। যেমন সংস্কৃত সাহিত্যে—মেঘদূত বা কুমারসম্ভব। এই তালিকায় ওঠে নি বিদ্যাসুন্দরের নাম। 'চিত্রাঙ্গদা একটি স্বপ্নমাত্র, মানবমনের একটি অনিন্দ্যসুন্দর জাগ্রত স্বপ্ন। এ চিত্রাঙ্গদা সেকালের মণিপুরের রাজকন্যা নন, সর্বকালের মানুষের মনপুরীর রাজরাণী, হৃদয়নাটকের রঙ্গপাত্রী।' পুনশ্চ—'চিত্রাঙ্গদা-কাব্য মানুষের যৌবনস্বপ্নের একটি অপূর্ব এবং সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র।' পুনশ্চ—'এই চিত্রাঙ্গদার তুল্য এমন সুন্দর, এমন মর্মস্পর্শী যৌবনের কুসুমকাহিনী আর কোনো কবির মুখে কেউ কখনো শুনেছেন?' এ-কাব্য অশ্লীল, দুর্নীতিপূর্ণ? ধিক্কার দিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন 'চিত্রাঙ্গদা যে, রূপলোকের বস্তু, কামলোকের বস্তু নয়, তা যার অন্তরে চোখ আছে, তিনিই প্রত্যক্ষ করতে পারেন। যাদের তা নেই, অর্থাৎ যাঁরা অন্ধ, তাদের সঙ্গে তর্ক বৃথা।'

চিত্রাঙ্গদার সমর্থনে তিনি ভারতচন্দ্র উদ্ধৃত করেছেন:

"আমরা যাকে প্রেম বলি, তাও মনোজগতের বস্তু হলেও দেহের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত নয়। মানবপ্রেম শুধু চিদাকাশের কুসুম নয়, দেহ ও মন উভয় জগৎ অধিকার করেই তা বিরাজ করে।

তারপর দেহ-মনের বিভাগটা কি তেমন সুনির্দিষ্ট ? দেহের কোথায় শেষ ও মনের কোথায় আরম্ভ, তা কি আমাদের প্রত্যক্ষ ?

ভারতচন্দ্র বলেছেন—

ভূতময় দেহ নবদ্বার গেহ নর-নারী কলেবরে।
গুণাতীত হয়ে নানা গুণ লহে দোঁহে নানা খেলা করে।
উত্তম অধম স্থাবর জঙ্গম সব জীবের অন্তরে
চেতনাচেতনে মিলি দুই জনে দেহিদেহ রূপ ধরে।
অভেদ হইয়া ভেদ প্রকাশিয়া একি করে চরাচরে ॥

যদি কোনো কবির কল্পনায় দেহ-দেহীর ভেদাভেদজ্ঞান মূর্ত হয়ে ওঠে, তাহলে সে কবির কল্পনাকে কি শুধু দৈহিক বলা চলে ? যা কেবলমাত্র দৈহিক, তার অন্তরে সত্য আছে, কিন্তু সৌন্দর্য নেই। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করতেন যে, কামলোকের উপরে রূপলোক বলে আর একটি লোক আছে। যে ব্যক্তি তাঁর বর্ণিত বিষয়কে কামলোক থেকে রূপলোকে তুলতে পারেন, তিনিই যথার্থ কবি।”

চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে বিদ্যাসুন্দরের একটা অস্পষ্ট তুলনা আছে এবং অস্পষ্টভাবে (প্রমথ চৌধুরী অস্পষ্ট লেখেন, একথা স্পষ্ট করে লিখতে হল !!) ভারতচন্দ্রের ন্যূনতার কথা বলা হয়েছে ঃ

“কবিকঙ্কণ বলেছেন যে, চণ্ডীকাব্য তিনি লেখেন নি, কিন্তু চণ্ডী তাঁর হাত ধরে লিখিয়েছেন। ভারতচন্দ্রও ঐ একই কথা বলেছেন। তিনিও অন্নপূর্ণার আদেশে ও প্রসাদে অন্নদামঙ্গল রচনা করেছিলেন। বলাবাহুল্য এ চণ্ডী, এ অন্নপূর্ণা—সরস্বতী ব্যতীত অন্য কোনো দেবতা নন। কবিকঙ্কণ সরস্বতীর গুণবর্ণনা করতে করতে একটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করেছেন, যে তাঁর ‘বীণাগুণে তরল অঙ্গুলি।’ কবিকঙ্কণের অঙ্গুলি কিন্তু তরল নয়, স্থূল। আর ভারতচন্দ্রের অঙ্গুলি লঘু হলেও সে অঙ্গুলি কখনো বীণাগুণ স্পর্শ করেনি, কারণ তাঁর অঙ্গুলি ছিল মেরজাপ-মণ্ডিত। চিত্রাঙ্গদার কবির অঙ্গুলি যে, বীণাগুণে পূর্ণমাত্রায় তরল, তা যাঁর ভাষার সুরের কাণ আছে, তিনি চিত্রাঙ্গদার দু’লাইন পড়লেই বুঝতে পারবেন।

চিত্রাঙ্গদা একটি সম্পূর্ণ রাগিণী। এর কোথাও একটি বেসুরো কথা নেই, আর এ-ভাষার গতি যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি সলীল। ও-কাব্যের অন্তরে যেমন একটিও বেসুরো কথা নেই, তেমনি একটিও উচ্ছৃঙ্খল ছত্র নেই। এ-কাব্যের ধ্বনি এক মুহূর্তের জন্যও বাণীকে ছাপিয়ে কিংবা ছাড়িয়ে ওঠেনি। ভাষার সমতা ও ধ্বনির মসৃণতা-গুণে চিত্রাঙ্গদা মেঘদূত ও কুমারসম্ভবের স্বজাতীয় ও সমকক্ষ। এ ভাষা যেমন প্রসন্ন তেমনি সপ্রাণ, যেমন উজ্জ্বল তেমনি স্নিগ্ধ। এ ভাষা পরিপূর্ণ প্রাণের আবেগে মুক্তচ্ছন্দে অবলীলাক্রমে বয়ে যাচ্ছে। এ প্রবাহিণীর সুর ললিত, তাল মধ্যমান। এ কাব্য সরস্বতী নিজ হাতে লিখেছেন বললে আমরা সে কথায় অবিশ্বাস করতুম না।

"ভারত স্থানান্তরে বলেছেন যে, অন্নদা তাঁকে ভরসা দিয়েছিলেন যে, 'যে কবে সে হবে গীত, আনন্দে লিখিবে।' চিত্রাঙ্গদার কবি যার মুখ দিয়ে যা বলেছেন, তা সবই গীত হয়েছে। এ ভাষা কবির মুখে স্বয়ং বসন্ত দিয়েছিলেন।"

ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্যের স্ব-বিরোধিতার কথায় এখানে চলে আসতে পারি, যথা—কলাকৈবল্যবাদী তিনি, কাব্য-বিচারের সময়ে কবিজীবনী বা কবির পরিবেশের কথা আনতে রাজি নন, অথচ এড়াতেও পারেন না। 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন:

"ভারতচন্দ্রের কাব্যের যথার্থ বিচার করতে হলে তিনি যে রাজার ছেলে এবং কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ আর কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র যে দূষিত, এসব কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে হবে।"

ইংরেজি প্রবন্ধে অপরপক্ষে লিখেছিলেন (এক যুগ আগে লেখা সে প্রবন্ধের মত তাঁর অব্যাহত আছে বলে জানিয়েছেন): 'স্বয়ং রাজার ছেলে এবং অন্য এক রাজার (যে-রাজা পলাশীর নাটকের অন্যতম প্রধান এক অভিনেতা) সভাকবি ভারতচন্দ্র অবক্ষয়ী সমাজের সকল বহিরঙ্গ ঔজ্জ্বল্য এবং অন্তরস্থ দুর্নীতিকে প্রকাশ করেছেন।' বলাবাহুল্য তাই যদি করে থাকেন, তাহলে ঐ সকল বিষয়ে অনবহিত থেকে তাঁর কাব্য পাঠ করা কি করে সম্ভব? যদি সম্ভবই হয়, ওসব ফালতু কথার

উল্লেখ প্রমথ চৌধুরী করলেন কেন? ও-বিষয়ে তাঁর নিজের পক্ষেই যে, উদাসীন থাকা সম্ভব ছিল না তার প্রমাণ—বিদ্যাসুন্দরকে বহুদলবিশিষ্ট সর্বাঙ্গসুন্দর পুষ্প বলার পরেও তাঁকে বলতে হয়েছিল—বিষপুষ্প। তিনি অধিকন্তু বলেছিলেন, "প্রাক্-বৃটিশ পর্বের বাংলাসাহিত্যে তীক্ষ্ণতম মনস্বিতার অধিকারী এই কবি জগৎসংসারকে এমনভাবে জানতেন, যার মতো করে তাঁর পূর্ববর্তী কেউ জানেন নি। নিজ কালের অসীম অরাজকতার আতঙ্কজনক ছবি কবি এঁকেছেন, যা সরবে ঘোষণা করেছে—বাঙালি জাতিকে যদি বাঁচতে ও বাড়তে হয়, তাহলে পুরনো ব্যবস্থার অবশ্যই বদল চাই, অবশ্যই আনতে হবে নতুনকে। বিরল সৌন্দর্য ও আন্তরিকতায় ভরা একটি গীতিকবিতায় ভারতচন্দ্র ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য নহে ভাল তাহা, আমি যে খেলিতে চাই, সে খেলা খেলাও হে!' এবং দেখি, কবির মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে পলাশীর যুদ্ধ এবং ইংরেজের জয়।"

প্রমথ চৌধুরী যেখানে গীতিকবিতার মধ্যে (সবচেয়ে দায়িত্বহীন আত্মপর যে-সাহিত্য) ঐপ্রকার সমাজচেতনতা দর্শন করেছেন, সেখানে আখ্যান অংশে সে-বস্তু দেখার অধিকার নেই পাঠকের!! অথচ তা যে আছে তাঁর 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধ থেকেই দেখিয়ে দেওয়া যায়, যার মধ্যে তিনিই আবার উক্ত অধিকার থেকে রসিক সামাজিককে বঞ্চিত করার ইচ্ছা করেছেন!! উক্ত প্রবন্ধের অনবদ্য এক অংশে ভারতচন্দ্রের জীবনী উপস্থিত করে তিনি অপূর্ব ধিক্কার দিয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে যারা ভারতচন্দ্রকে সম্পন্ন বিলাসী কবি মনে করতে চান। ভারতচন্দ্রের দুঃখময় জীবনকথার উপসংহারে তিনি বলেছেন:

> "যিনি রাজার ঘরে জন্মগ্রহণ করে এগারো বৎসর বয়সে পর-ভাগ্যোপজীবী হতে বাধ্য হন, যিনি এগারো থেকে বিশ বৎসর পর্যন্ত পরের আশ্রয়ে পরান্নভোজনে জীবনধারণ করে বিদ্যা অর্জন করেন, তারপর আত্মীয়স্বজনের জন্য ওকালতি করতে গিয়ে কারারুদ্ধ হন, তারপর জেল থেকে পালিয়ে স্বদেশত্যাগ করে কটকে গিয়ে মারহাট্টাদের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন, তারপর শ্রীক্ষেত্রে

বৈষ্ণবশাস্ত্র চর্চা করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তারপর আবার গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবার জন্য প্রথমে ফুপ্লে সাহেবের দেওয়ানের, পরে কৃষ্ণনগরের রাজার নিকট আশ্রয় পান, আর তথায় মাসিক চল্লিশ টাকা মাইনের চাকর হয়ে কাব্য-রচনা করেন, এবং শেষকালে গঙ্গাতীরে বাস করতে গিয়ে আবার বর্ধমান-রাজার কর্মচারিগণ কর্তৃক নানারকম উৎপীড়িত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন, তিনি যে কতটা বিলাসের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছিলেন, তা আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন। এরূপ জীবন কল্পনা করতেও আমাদের আতঙ্ক হয়।"

এই জীবনকথা প্রমথ চৌধুরী উপস্থিত করলেন কেন—পাঠককে ভারতচন্দ্রের কাব্য থেকে তাঁর জীবনচ্ছায়া আবিষ্কার করতে প্ররোচিত করবার জন্য? মোটে নয়—'ঠিক তার উল্টো' :

"[ভারতচন্দ্রের জীবনের] ইতিহাসটি আপনাদের কাছে এইজন্য ধরে দিলুম যে [প্রথম চৌধুরী লিখেছেন], আপনারা সকলেই দেখতে পাবেন যে, তাঁর কাব্যের দোষগুণ তাঁর অসার চরিত্রের ফুল কিংবা ফল নয়, বরং ঠিক তার উল্টো। তাঁর কাব্যের চরিত্র যাই হোক, তাঁর নিজের চরিত্র ছিল অনন্যসাধারণ আত্মবশ। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর দুঃখময় জীবনের ছায়া তাঁর কাব্যের গায়ে পড়েনি। ব্যাপারটির প্রতি সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য। কারণ তথাকথিত ইংরেজি-শিক্ষার প্রসাদে আমাদের মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, মানুষের মন তার জীবনের বিকার মাত্র। বিশেষতঃ যারা অচেতচিত্ত, তাদের মনে এই ধারণা একেবারে বদ্ধমূল হয়েছে। তা যে হয়েছে তার প্রমাণ, এ-যুগে ইউরোপে বহু কবি আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁরা শুধু নিজের সুখদুঃখের গান গেয়েছেন—কখনো হেসে, কখনো কেঁদে। প্রথম পুরুষকে উত্তমপুরুষ গণ্যে তারই কথাই হয়েছে তাঁদের কাব্যের মাল ও মশলা। কিন্তু এদেরও এই স্ব-বস্তুটি যে-ক্ষেত্রে অহং, সে-ক্ষেত্রে তাঁরা অকবি, আর যে-ক্ষেত্রে আত্মা, সে-ক্ষেত্রে তাঁরা কবি। অহং ও আত্মা যে একবস্তু নয়, সে-

কথা কি এদেশে বুঝিয়ে বলা দরকার? ভারতচন্দ্র ছোট হোন, বড় হোন—জাতকবি, সুতরাং তাঁর অহং-এর পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই। ভারতচন্দ্রের কাব্যের যথার্থ বিচার করতে হলে তিনি যে রাজার ছেলে এবং কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ, আর কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র যে দূষিত, এসব কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে হবে।" [শেষ লাইনটি আগেও উদ্ধৃত।]

আমরা অবশ্যই অস্বস্তিতে পড়ি—সিদ্ধান্তহীনতা নিদ্রাহীনতার মতোই একটি ক্ষয়কারী অসুখ, যা আমাদের মধ্যে এক্ষেত্রে এসে যাচ্ছে। আমরা মুগ্ধ হয়ে প্রমথ চৌধুরীর অসাধারণ রচনাংশ পড়ি যেখানে তিনি বলেছেন, সাংসারিক জীবনের দুঃখকষ্ট ভোগ করে ভারতচন্দ্রের মনের আলো নেবেনি, আরও জ্বলে উঠেছিল। এই বক্তব্যের পক্ষে ভারত-চন্দ্রের স্ত্রীর পতিনিন্দার অংশ উদ্ধৃত করে বলেছেন:

> "এই ব্যাজনিন্দা হচ্ছে ভারতচন্দ্রের আত্মকথা। ঐ কথা শুনে আমরা দুটি জিনিসের পরিচয় পাই: রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ হয়েও তাঁর দারিদ্র্য ঘোচেনি এবং দারিদ্র্য তাঁকে নিরানন্দ করতে পারেনি, করেছিল শুধু 'প্রমোদের প্রভু।' [প্রমথ চৌধুরীর রচনা ক্রমেই দীপ্ততর] এ প্রভুত্ব হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের উপর আত্মার প্রভুত্ব। যথার্থ আর্টিস্টের মন সকল দেশেই সংসারে নির্লিপ্ত, কস্মিন-কালে বিষয়বাসনায় আবদ্ধ নয়। যে লোক ইউরোপে দ্বিতীয় শেক্স-পীয়ার বলে গণ্য, সেই Cervantes সের্ভান্তেসের জীবন বিষম দুঃখময় ছিল, অথচ তাঁর হাসিতে সাহিত্যজগৎ চির-আলোকিত। এই হাসিকে ইউরোপীয়েরা বলেন বীরের হাসি। এ-জাতীয় হাসির ভিতর যে বীরত্ব আছে তা অবশ্য পল্টনী বীরত্ব নয়, ব্যবহারিক জীবনের সুখদুঃখকে অতিক্রম করবার ভিতর যে বীরত্ব আছে, তাই। এ হাসির মূলে কি আছে ভারতচন্দ্র নিজেই বলে গিয়েছেন। তাঁর কথা হচ্ছে এই—
>
> চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ॥
> যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
> যে জন অচেতচিত্ত সেই সদা দুখী॥"

সবই বুঝলাম, কিন্তু বুঝলাম না একটা কথা—ভারতচন্দ্রের পরিবেশ না জানলে কবির সম্বন্ধে ঐ সুন্দর বিশ্লেষণ করা কি সম্ভব? এবং কবি কি সত্যই তাঁর সাহিত্যে সংশোধনী চেতনা আনতে চাননি? ঐ যে বীরের হাসির কথা প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, তা কি কেবল পারিপার্শ্বিকের উপরে কবির উঠবার ক্ষমতার প্রমাণ--উক্ত পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে পাঠককে সচেতন করবার কোনো প্রয়াস নয়? দেখা যাক। এই প্রবন্ধেই প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন ঃ

> "হাসি জিনিসটাই অশিষ্ট, তা সামাজিক শিষ্টাচারের বহির্ভূত। সাহিত্যের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, মনেরও হাসি। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রোক্তি।"

সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রোক্তির একটিমাত্র উদ্দেশ্যই সম্ভব—সমাজশোধন, যাকে অপরপক্ষে প্রমথ চৌধুরীর কলাকৈবল্যবাদ সাহিত্যের উপজাতের বেশি ভাবতে বারণ করে।

ভারতচন্দ্রের মূল্যায়নে প্রমথ চৌধুরীর আর একটি কথা গুরুত্ব পাবে। তিনি সকলকে নাড়া দিয়ে বলেছেন—'ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস কিন্তু আদিরস নয়, কারণ এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয়—মস্তিষ্ক, জীবন নয়—মন।' চমকপ্রদ কথা, যদিও সত্য নয়। ভারতচন্দ্রে হাস্যরস প্রচুর কিন্তু আদিরসের কোলেপিঠেবুকেই তার খেলা। তবু কথাটা ওভাবে ধাঁ করে প্রমথ চৌধুরী আনলেন কেন? কারণ—তিনি ভারতচন্দ্রকে যথাসম্ভব নতুন আলোয় ধুয়ে দিতে চান। ভারতচন্দ্রের কাব্যের আদিরসের ঝাঁঝ অনেক কমে যাবে, তিনি মনে করেছিলেন, যদি তার ভিতরকার হাস্যরসের আলো ও উত্তাপকে বাড়িয়ে দেওয়া যায়। সে কাজে তিনি বহুলাংশে সফল, যখন বলেন, 'ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার ভিতরে আর্ট আছে, অপরের আছে শুধু নেচার', (অর্থাৎ অন্যের যেখানে জঙ্গল, ভারতচন্দ্রের সেখানে উদ্যান—নাকি উপবন?), 'ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা গম্ভীর নয় সহাস্য।' প্রমথ চৌধুরীর উদ্দেশ্য বোঝা যায়—ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাকে কেন্দ্রচ্যুত করে কবিকে

কিছু ভদ্রস্থ করা। ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে সামাজিক সাধুজনের বিরক্তির কারণ তাঁর কাব্যের অশ্লীলতা নয়, তাঁর হাসির অশিষ্টতা, প্রমথ চৌধুরী বোঝাতে চেয়েছেন: 'হাস্যরস যে অনেক ক্ষেত্রে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে, তার পরিচয় অ্যারিস্টোফেনিস থেকে আরম্ভ করে আনাতোল ফ্রাঁস পর্যন্ত সকল হাস্যরসিকের লেখায় পাবেন। এর কারণ হাসি জিনিসটাই অশিষ্ট, কারণ তা সামাজিক শিষ্টাচারের বহির্ভূত।

ভারতচন্দ্রের বিষয়ে লেখার সময়ে ফরাসি সাহিত্যের কথাই প্রমথ চৌধুরীর মনে ঘুরছিল। সেজন্য ফরাসি সাহিত্যের সর্বোচ্চ হাস্যরসিকের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য জেনে নিতে পারি:

> "মোলিয়েরের নাটক ফরাসি-প্রতিভার সর্বোচ্চ নিদর্শন। মোলিয়ের ধর্মের আবরণ খুলে পাপের, বিদ্যার আবরণ খুলে মূর্খতার, বীরত্বের আবরণ খুলে কাপুরুষতার, প্রেমের আবরণ খুলে স্বার্থপরতার মূর্তি পৃথিবীর লোকের সুমুখে খাড়া করে দিয়েছেন। কিন্তু এসকল মূর্তি দেখে মানুষের মনে ভয় হয় না, হাসি পায়। মানুষের ভিতর যা-কিছু লজ্জাকর আর হাস্যকর, তাই মোলিয়েরের চোখে পড়েছে, আর যা তাঁর চোখে ধরা পড়েছে তাই তিনি অপরের নিকট ধরিয়ে দিয়েছেন।"

ভারতচন্দ্রকে কাদের পাশে রেখে প্রমথ চৌধুরী দেখবার চেষ্টা করেছেন বুঝতে অসুবিধা হয় না।

পদে-পদে প্রমথ চৌধুরীকে যিনি অনুসরণ করেছিলেন, সেই জে সি ঘোষ যতদূর মনে হয়, প্রমথ চৌধুরীর রচনার এই স্ব-বিরোধিতার বিষয়ে সচেতন ছিলেন। সুতরাং তিনি এক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন এই কথা বলে যে, ভারতচন্দ্রকে কোনো সময়েই সিরিয়াস ভাবা সম্ভব নয়। লোকটি আদি-মধ্য-অন্তে খেলোয়াড়। এহেন কবির কথাকে গভীরভাবে নিতে গিয়েছ কি মরেছ। রবীন্দ্রনাথ ভারতচন্দ্রকে সমাজশত্রু বিবেচনা করেছিলেন, যিনি সমাজের তলায় সুড়ঙ্গ কেটেছিলেন—জে সি ঘোষ তার উল্লেখ করে বলেন—এই ধরনের

কথা বললেই সোজা ভারতচন্দ্রের ফাঁদে ধরা পড়ে যেতে হবে। কারণ তাঁর বজ্জাতির কালে তাঁকে ভুল বুঝলেই তাঁব সবচেয়ে স্ফূর্তি। জে সি ঘোষ ভারতচন্দ্রকে কদাপি মারাত্মক মনে করেন নি, ক্ষেত্রবিশেষে তিনি ক্লান্তিকর অবশ্যই! তিনি যখন সমাজেব লেজের উপর পা রাখেন, তখন তাঁকে গুরুত্বেব সঙ্গে গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। জে সি ঘোষ বলেছেন— পরিষ্কার বঙ্গনট তিনি, এঁচড়েপাকা খোকাটি, বয়স্ক বজ্জাতের হাব-ভাব নকল করছেন। "আমরা কখনই ভুলি না, আসলে তিনি খেলোয়াড়-ছেলে, জীবন নিয়ে খেলতেই এসেছেন, কিন্তু এমন নিশ্চিত নিপুণ তাঁর টান-টোন, এমন নিখুঁত তাঁর চলাফেরাব ছাদ যে, দেখে-দেখেই অফুরান সুখ। সমাজশত্রু বললে তাঁকে যে গুরুত্ব ও দায়িত্বে ভূষিত করা হয়, তাব অধিকারী তিনি কখনো নন, তা করলে তাঁর রঙ্গিণী পরী 'পাক'-এর মতো স্বভাব-ধর্মেব কথা ভুলে যাওয়া হয়।"

এসব কথা যিনি বললেন, তিনি কিন্তু ভারতচন্দ্রের 'উচ্চবিকশিত মনস্বিতা ও বিচারবুদ্ধির' কথা মেনে নিয়েছেন। এবং বলেছেন: ঐ বস্তু থাকাটা ভারতচন্দ্রেব পক্ষে অবিমিশ্র আশীবাদ হয়নি, কারণ ঐ বিচার-দৃষ্টির সামনে সমাজেব কদর্যতাব দিক খুলে গিয়ে তাঁর বিশুদ্ধ কৌতুকের প্রবণতাকে নষ্ট করে দিয়েছিল। যেহেতু খাঁটি স্যাটায়ারিস্ট হবার মতো প্রবল নৈতিকতা ভারতচন্দ্রেব ছিল না, তাই তিনি এইকালে কেবল উপহাসকারী, একেবারে বিচ্ছু-বকাটে, স্বেচ্ছা-নষ্টামিতে স'ইকে চমকে শিউরে দিতে ব্যস্ত। ঘোষ আরও বলেন: এই অবস্থায় প্রেম তাঁর হাতে জ্যান্ত রক্তমাংসের দেহধর্ম হারিয়ে ফেলে হয়ে দাঁড়ায় বিকৃত কামের সস্তা উত্তেজনা; তখন তাঁর বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে আসে ইতরতা, হাসিতে আসে বিদ্বেষেব তিক্ততা, এবং তাঁর অনৈতিকতা হয়ে দাঁড়ায় দুর্নৈতিকতা। এই ভারতচন্দ্রই, এই চতুর, উচ্ছৃঙ্খল, বিকৃত, ভোগক্লান্ত ভারতচন্দ্রই, উনিশ শতকের বিষণ্ণ-গম্ভীর পিতা ও পতিদেব বিব্রত করে তুলেছিলেন, এখনো ঘিন্‌ঘিনে অস্বস্তিতে ফেলে অনেক আধুনিক পাঠককে।

আমাদের প্রশ্ন: এখানেও কি ভারতচন্দ্রকে একেবারে কেবল-খুশির খেলোয়াড়রূপে পাচ্ছি?—যে কেবল নেচে ও গেয়ে যাবে, অর্থাৎ

তার আত্মাটাকে রাখবে পায়ে আর গলায়! এ-ব্যক্তির মধ্যে তাহলে 'উচ্চবিকশিত মনস্বিতা' নামক উৎপাতটা থাকে কিভাবে? যদি থাকে (থাকলে কে ঠেকায়!) এবং তার খোঁচায় যদি লোকটা পূর্ব-ভূমিকা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে একথা বলা কি খুব দোষের হয়ে যাবে—আদর্শ জীবনাকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতার গ্লানি থেকে তা ঘটেছে, কিংবা ঘটেছে, আগে যার কথা বলেছি, অনুচিত কর্মবাধ্যতার জ্বালা থেকে? জে সি ঘোষ কি নিজেই বলেন নি, ভারতের উচ্চাঙ্গের বুদ্ধিশীলতা জীবনের কদর্যতার দিক খুলে ধরে তাঁর নিরাসক্ত কৌতুকের মেজাজকে নষ্ট করে দিয়েছিল, যাব ফলে কবির হাসি হয়ে উঠেছিল সিনিক্যাল? যেখানে জে সি ঘোষ-কথিত কবিটি সামাজিক গ্লানির বিরুদ্ধে ক্ষোভে সিনিক্যাল হয়ে পড়েন, তিনি আবার কিভাবে উক্ত জে সি ঘোষের বিচারে লস্টো শিশু (lost child) বা নষ্ট খেলোয়াড় হন বুঝতে পারি না। এখানে প্রমথনাথ বিশীর কথাই গ্রাহ্য—বিদ্রূপের হাসিতে সমাজ ও রাজসভাকে বিদ্ধ করা ছিল কবির অভিপ্রায়।

ভারতচন্দ্রের বিচাবে, চিন্তাগত অসংলগ্নতা সত্ত্বেও, জে সি ঘোষ যথেষ্ট শক্তি দেখিয়েছেন, বিশেষতঃ তিনি যখন ভারতচন্দ্রের দেহরক্ষা করতে চেয়েছেন। মুক্ত সম্ভোগ বর্ণনাব জন্য নিন্দিত ভারতচন্দ্রের সমর্থনে তিনি বলেছেন: প্রেম তার স্বভাবধমে পৃথিবীর স্থূলতম ইয়াকি থেকে সুন্দরতম কাব্যের বিষয়। ভারতচন্দ্রের রচনা প্রধানতঃ শেষোক্ত পর্যায়ে পড়ে। তাছাড়া ভারতচন্দ্র তো পুরাতন সংস্কৃতসাহিত্যের ধারা-পথে এসেছেন। সংস্কৃত-আলঙ্কারিকদের কাছে শৃঙ্গাররস বিশুদ্ধ শারীরিক আনন্দ (?), ভারতচন্দ্রেও তাই। দেহানন্দের সঙ্গে শিল্পানন্দ জুড়ে দিতে যেমন সচেষ্ট সংস্কৃত কবিরা, তেমনি ভাবতচন্দ্র। বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেমে আধ্যাত্মিক যদি কিছু না থাকে, এমন কি গভীর আবেগের অভাবও যদি হয়, তবু একইসঙ্গে সত্য, তার মধ্যে লোভীর অসুস্থ লোলুপতা নেই, আছে রক্তমাংসের পুরো ক্ষুধা, খোলাখুলি কাণ্ড, যেন দুটি সুস্বাস্থ্য জন্তুর প্রচণ্ড তাগিদ।

এইসব কথা বলার পরে জে সি ঘোষ বৈষ্ণবপদের সঙ্গে বিদ্যা-

সুন্দরের প্রেমের তুলনা করেছেন (যার কিছু প্রতিধ্বনি করেছেন পরে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার) ঃ

"এই সূত্রে বৈষ্ণব-পদকারদের কথা এসে যায়, বিশেষতঃ যখন তাঁদের সঙ্গে তুলনা করে ভারতচন্দ্রের নিন্দা করাই রীতি। কিন্তু বৈষ্ণবপদের কাদা-কাদা কাকুতি এবং আধ্যাত্মিক ভাবোন্মাদের পরিবর্তে প্রেমের এই ভারতচন্দ্রীয় নির্বিকার যুক্তিগ্রাহ্য বস্তুগত প্রকৃতি অতীব স্বাগত! পদকর্তারা যে রকম দেখাতে চান, প্রেম কিন্তু সর্বদা তেমন সর্বগ্রাসী সুমহান বাসনা নয়, অলৌকিক পরম কাণ্ড নয়। তাঁদের কাছে প্রেম ধর্মের প্রতিরূপ, বা সাক্ষাৎ ধর্ম ;— তার উপরে অতি গভীরতা, অতি গাঢ়তা চাপিয়ে দেবার জন্য সে বস্তু প্রায়শঃ উদ্ভট ও অবাস্তব। সেজন্য প্রায় দুশো বছরের বৈষ্ণব-পদের পরে প্রয়োজন ছিল সেই কবির, নমস্কৃত তাঁর আবির্ভাব, যিনি প্রেমকে পৃথিবীতে টেনে নামালেন, খেললেন তাকে নিয়ে, হাসি-ঠাট্টাও করলেন। আরও অগ্রসর হয়ে বলতে পারি, ভারত-চন্দ্রের হাতে প্রেম যৌবনদর্শন করেছে, প্রাপ্তবয়স্ক সুসভ্য সচেতন-তার অধিকারী হয়েছে। বৈষ্ণবপদের রাধা—কিশোরী, অনুভূতি-রসে ঘাড়-মাথা ভেঙে বুড়িয়ে যাবার গুণ ছাড়া অন্য গুণ নেই তার ; রাখাল তার প্রেমিক, বৃক্ষতলে বা পুষ্পিত লতাকুঞ্জের মধ্যে মিলন হয় তাদের ; সেখানে গোধন ঘেঁষে আসে, ময়ূর পেখম ধরে, আকাশ ঘন হয়ে নামে, যমুনা বয়ে যায় পাশ দিয়ে। অপরপক্ষে ভারতচন্দ্রের নায়িকা রাজকুমারী, রাজপুত্র তার প্রেমিক ; রাজ-প্রাসাদে বিদ্যার কক্ষে যেখানে তাদের মিলন, সেখানে দুটি উচ্চ-সংস্কৃতিসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক মন সকল প্রকার ঔজ্জ্বল্য ও মার্জিত রুচির সমাবেশ করেছে। সুন্দর পণ্ডিত ও কবি, বিদ্যা পাণ্ডিত্যে ও প্রেমকলায় তার যোগ্য। পুরাতন কবিতার পটভূমি ছিল গ্রাম্য, পরবর্তী এই কাব্যের পটভূমিকা নাগরিক। পুরাতন কবিদের ছিল অধিক অনুভূতি, তরুণতর কবির শ্রেষ্ঠত্ব শিল্পগুণ।"

ক্ষেত্রবিশেষে ঈষৎ আপত্তি সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতে হবে, ভারতচন্দ্রের সাহিত্যালোচনায় এই অংশ মর্যাদাযোগ্য।

নব মূল্যায়নের প্রমাণ-সন্ধান

॥ ১ ॥

দীর্ঘ স্থান নিয়ে আমরা ভারতচন্দ্রের সমালোচকদের বক্তব্য উপস্থিত করেছি। ঐ সকল লেখায় প্রধানতঃ দুটি জিনিস দেখতে পাওয়া যায়—ভারতচন্দ্রের রূপরীতির প্রশংসা এবং তাঁর রচনার দুর্নীতির নিন্দা বা ঐ নিন্দাদায় থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা। প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রের জীবনকথাকে বিশেষ উদ্দেশ্যে উপস্থিত করেছেন—সে উদ্দেশ্য কিন্তু উক্ত জীবনের সঙ্গে সাহিত্যকে যুক্ত করে তার মধ্য থেকে নূতন তত্ত্ব-তাৎপর্য অবিষ্কারের চেষ্টা নয়। জে সি ঘোষের মত বিদগ্ধ লেখক ও এক্ষেত্রে নূতন কথা যোগ করতে পারেন নি—কবি অবক্ষয়ী অভিজাতসমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, এই পুরাতন কথাটারই সমর্থন করেছেন। 'প্রমথনাথ বিশী ঈষৎ অগ্রসর হয়েছেন, ভারতচন্দ্রের ব্যঙ্গের উদ্দেশ্যমূলকতার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন—কিন্তু আর কিছু নয়।

আমরা কিন্তু একদিকে অনেকখানি অগ্রসর হতে চেয়েছি। আধুনিক সমালোচনা-রীতির অনুসরণ করে কাব্যের সঙ্গে কবিমনকেও বিশেষ পর্যবেক্ষণের লক্ষ্য করেছি। কবিমনের কথা অন্য লেখকেরা বলেন নি তা নয়, ভারতচন্দ্রের নষ্ট-দুষ্ট মনোভাবের কথা যথেষ্টই বলেছেন, কিন্তু আমাদের কাছে তা যথেষ্ট মনে হয় নি, আমরা গভীরতর একটি মানুষকে দেখতে চেয়েছি, যিনি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে আন্দোলিত, মূলে আদর্শবাদী হয়েও সেই আদর্শেরই বহ্ন্যুৎসব যাঁকে করতে হয়েছে নিজ কাব্যে। এই মানুষটি যে আমাদের কল্পনার সৃষ্টি নয়, তাঁর কাব্যের মধ্যেই যে তাঁর দর্শন মেলে, তা দেখিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের আছে। এই অধ্যায়ে সেই দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা করব।

ভারতচন্দ্রকে আদর্শবাদী বলেছি—কোন অর্থে? জীবনবাদী অর্থে ভারতচন্দ্র আদর্শবাদী। পরিপূর্ণ জীবনকে তিনি পেতে চান, যে-জীবনের মধ্যে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সবই আছে।

কাম অর্থাৎ ভোগ-প্রসঙ্গটি গোড়ায় আনা যাক, কারণ প্রায় সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন, ভারতচন্দ্র অনাদিরসের নন, আদিরসেরই কবি।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে সম্ভোগচিত্র আছে আমরা জানি, তার দ্বারা তাঁর ভোগপ্রীতি বোঝা যায়, কিন্তু ঐ ভোগ যে কর্দমবিলাস নয়, সুস্থ জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্য, তার পক্ষে যে-সব যুক্তি হাজির করেছেন, আমরা এখানে তাদের দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দেব। পুরুষের পক্ষে ভোগের উপাদান নারী, কামিনী তার প্রতিশব্দ, সে নারীর মন বলে একটা বস্তু আছে, তা প্রায়শঃ পুরুষ-কবিরা ভুলে যান। বিস্ময়ের কথা, আমাদের এই তথাকথিত বিলাসী কবি তা ভোলেন নি।

নারী সম্বন্ধে কবির ধারণা রসমঞ্জরী থেকে উদ্ধৃত করা যাক :

রমণী-রত্ন সহে না আঁচ,
টুটয়ে অগ্নি-পরশে কাঁচ,
করিতে মান দিবে না স্থান—
দিবে না স্থান।
কি ক'রে ক্রোধ সহে বামার?
অবলা জাতি মৃদু আকার,
জ্বলয়ে অগ্নি সে নহে মান—
সে নহে মান॥
রসতাপে হিয়ে বিনাশ পায়,
তপনে আপ শুকায়ে যায়
বসিয়ে মান রবে কোথায়—
রবে কোথায়।
প্রমদা প্রাণ সংসারিণি,
প্রমদা আকার আহ্লাদিনি,
সতত রাখহ সযত্নে তায় —
সুরত্ন প্রায়॥

রসমঞ্জরীতে কথাগুলি নায়ক-সখার। সে সখা আর কেউ নন, স্বয়ং কবি। তিনি পূর্ণ দৃষ্টিতে সমাজ, সংসার ও ব্যক্তিজীবনে নারীর স্থান লক্ষ্য করেছেন। প্রথমে দেখেছেন নারীর ব্যক্তিমূর্তি—তার মৃদুতা, সুকুমারতা, স্পর্শকাতরতা, তার সহজ মান অথচ গুরু-মান সহনে

অক্ষমতা ; কোমল আনন্দে তার আসক্তি ; এবং তার বহুমূল্য, ভঙ্গুর, কাচস্বচ্ছ দেহে-ঢাকা প্রাণলাবণ্যের আলোকচ্ছটা। তারপব দেখেছেন নাবীর সংসারমূল্য—সে এই সংসারের বন্ধনসূত্র, আনন্দের উৎস, ভাণ্ডারেব ঐশ্বর্যরত্ন। সেজন্য সে সযত্নে পালনীয় ও রমণীয়।

নারী সম্বন্ধে এই সম্ভ্রমপূর্ণ মনোভাব কিন্তু নারীর অবলাত্ব অসহায়ত্ব আগেই মেনে রেখেছে। একালীন 'যাব না. বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী' আদর্শের থেকে বহুদূরে অবস্থিত ঐ ধারণা, অবশ্যই, কিন্তু একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, মধ্যযুগীয় ভারতচন্দ্র আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সামনে নারীমহিমার সীমাবদ্ধ হলেও বরণীয় একটি আদর্শ স্থাপন করতে পেরেছিলেন।[১]

এই রসমঞ্জরীতেই কবি একবার মুক্ত কণ্ঠে যৌবনের জয়গান করেছেন। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জবী যদিও পূর্বতন সংস্কৃত কামালঙ্কার 'রসমঞ্জরীর'ই বাংলা রূপান্তর, তবু এই যৌবনবন্দনায় কবি যে নিজের কণ্ঠস্বর মিশিয়ে দিয়েছিলেন, তা ভণিতায় দেখা যায়। এবং কবিতাটির ভাষা ও বাচনভঙ্গিতে এমন সহজ আন্তরিকতা আছে, যার মধ্য থেকে কবির সহমর্মিতাকে অনুভব কবতে অসুবিধা হয় না। বক্তব্যপ্রকাশে কবি এখানে চাতুরী ছেড়েছেন (যা অপরপক্ষে প্রচুর পরিমাণে আছে রসমঞ্জরীর অন্যত্র), সেজন্য প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সুনিশ্চিত সুদৃঢ় বিশ্বাসের রূপ। কবিতাটি এই :

যৌবন পবম ধন, স্ববশ ইন্দ্রিয়গণ,
শিশু বৃদ্ধ দেখি লোকে রসকথা কহে না।
বালকের নাহি শুদ্ধি বৃদ্ধ হলে হতবুদ্ধি
যুবা বিনা রস আর কোনোখানে রহে না॥

১। নারী ও পুরুষের সমানাধিকারে বিশ্বাসী অনেক প্রগতিশীল দেশে কিন্তু এখনো নারী সম্বন্ধে পুরুষের অতিরিক্ত সৌজন্যপ্রকাশের চেষ্টা দেখা যায়। বলা-বাহুল্য তার দ্বারা পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান সূক্ষ্ম শিষ্টভাবে আত্মসম্ভোগ করে থাকে।

যুবা সূর্য বলবান যুবা চন্দ্র দ্যুতিমান
যুবা ভিন্ন সংসারের ভার অন্যে বহে না।
কিবা নর কিবা অন্য যৌবনে সকল ধন্য
যৌবন হইলে নষ্ট দেখি দেহ বহে না॥···

যৌবন-মরম না জানে যেবা।
পণ্ডিত তাহারে বলয়ে কেবা॥

তপ জপ জ্ঞান ধ্যান যে কিছু।
সকলি যৌবন-ধনের পিছু॥···

ভারতচন্দ্রের ভারতী যোগ।
যৌবনেতে কর যৌবন ভোগ॥

অন্নপূর্ণামঙ্গলে দেখি, স্বাভাবিক ভোগজীবনের পক্ষে অখণ্ডনীয় দাবি উপস্থিত করেছিল বসুন্ধরপত্নী—দেবীর কাছে। বসুন্ধর কুবেরের অনুচর, দেবীর অভিশাপে সে মর্ত্যে জন্মেছিল, এবং এখানে যথারীতি তিনটি বিয়ে করে সুখে দিন কাটাচ্ছিল। ওধারে বসুন্ধরপত্নী পূর্বস্থানে বিরহিণীর জীবন কাটাচ্ছে (যেহেতু যক্ষিণীদের মধ্যেও বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না), অসহ্য কষ্ট, সুতরাং কেঁদে পড়ল অন্নদার কাছে। তারপর কথা যখন বলতে শুরু করল, তখন কিন্তু কাঁদুনির লেশমাত্র ছিল না। অকাট্য তার যুক্তি। প্রথমে সে তার মর্ত্যবাসী স্বামীর নবপত্নীসুখের দিকে দেবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, আমার কতখানি কষ্ট আপনি নিশ্চয় বুঝবেন ; সতীনকে মেয়েরা কখনো সহ্য করতে পারে না ; শিব যদি কুচনীর বাড়ি যান, আপনার মনের অবস্থার কথা ভাবুন দেখি।

বসুন্ধরপত্নী এখানেই থামল না। একেবারে মূলে টান দিয়ে যে কথা বলল, সে রকম উন্মুক্ত সত্যভাষিতার সম্মুখীন দেবী আর কখনো হয়েছেন কি না সন্দেহ (কথাগুলি আসলে কবির)। বসুন্ধরপত্নীর যুক্তির অন্তর্নিহিত দৃঢ়তায় বিপর্যস্ত হয়ে ('বিবেচনাশূন্য', 'পাপপুণ্য-জ্ঞানহীন' ইত্যাদি গালাগালি খেয়েও), দেবী অগত্যা তার প্রার্থনাপূরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সে বলেছিল :

ঠাকুরাণী দাসীরে না দিবে যদি দৃষ্টি।
তবে কেন স্ত্রী-পুরুষে কৈলা রতি সৃষ্টি॥

কবি এগিয়ে এসে নিজেও একই মনোভাব প্রকাশ করেছেন 'রতি বিলাপের' ভণিতায়। সতীর মৃত্যুর পরে বিরহী শিব যখন দুঃখ ভুলতে তপোমগ্ন—সেইকালে তাঁর নিরুদ্ধ কামনাকে জাগিয়ে তোলার মতো নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছিল মদন—তার প্রতিশোধ তুলতে শিব তাকে ভস্ম করেছেন। মদনের মৃত্যুতে রতি যখন আছড়ে কাঁদছে, কবি কিছুমাত্র সহানুভূতি না জানিয়ে শীতল কণ্ঠে ভণিতায় বলেছেন: 'কাঁদিলে কি আর হয়—এই ফল বিরহীর শাপে।'

গোটা বিদ্যাসুন্দর কাব্য ভোগ-জীবনেব উজ্জ্বল রসকাব্য। তার বিশেষ উল্লেখ এখানে করার প্রয়োজন নেই। কেবল স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, বিদ্যার গর্ভসংবাদ-শ্রবণে বিচলিত ক্রুদ্ধ রাণী রাজার কাছে গিয়ে অন্য গঞ্জনার মধ্যে এই কথাটাও না বলে পারেন নি—'যৌবনে কামের জ্বালা, কত বা বহিবে বালা, কথায় রাখিব কত ঠেলে।'

ভারতচন্দ্রের অতিনিন্দিত একটি অধ্যায় এখন আমরা লক্ষ্য কবব —বিদ্যাসুন্দর কাব্যে 'নারীগণের পতিনিন্দা।' বাঙালি পুরুষজাতিব পক্ষে এবকম মাবাত্মক অধ্যায় ভাবতচন্দ্র অল্পই লিখেছেন। অশ্লীলতাব জন্য মারাত্মক নয়, মাবাত্মক—সত্যদর্শনের জন্য। আয়নার মতো এই অধ্যায়টি—এর মধ্যে পুরুষগণ নিজেদেব প্রতিবিম্ব দেখে লজ্জায় কুকড়ে গেছেন, তাবপর লজ্জা ঢাকতে কবির উপর রৌদ্র ও বীররস যথেচ্ছ ঢেলেছেন। অথচ এই অধ্যায়ে কৌতুকপবায়ণ কবি যতখানি সমাজ-সচেতন এবং গভীব, তেমন অল্প ক্ষেত্রেই।

'পতিনিন্দা' অধ্যায়ের বিষয়বস্তু—চোর সুন্দর ধরা পড়েছে, তাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাই দেখে কুলবতীগণ বিচলিত হয়ে উক্ত সুন্দরের মাপে যাচাই করে নিচ্ছেন গৃহস্থ পতিদেবতাদের। এই বিচারের কালে তাঁরা নিজ পতিপক্ষে রায় দিতে পারেন নি। এখানেই সমাজহিতৈষীগণের ক্ষোভ—ভারতচন্দ্র নিষ্ঠাকে এমন সুলভ পণ্য

করলেন।[২] যারা একথা বলেন, তাঁরা খেয়াল করে দেখেননি—এদেশে যেমন হাসিমুখে স্বামীর চিতায় উঠবার মতো মেয়ের অভাব হয় নি, তেমনি জ্বলন্ত চিতায় বাঁশের বাড়ি খেয়ে বাধ্যতামূলক সতীপুণ্যও অনেকের ভাগ্যে জুটত। এই সত্য কথাটা কদাপি ভোলা উচিত নয়—কেউ সতী হয়ে জন্মায়, কেউ জন্মে সতী হয়, আর কারো উপরে সতীত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়।

নারীগণের পতিনিন্দার মধ্য দিয়ে ভারতচন্দ্র অসম মিলনের অতৃপ্তি ও নৈরাশ্যের প্রশ্নটি তুলে ধরেছেন। 'পতিনিন্দা' ভারতচন্দ্রের আবিষ্কার নয়, পূর্বের অনেক মঙ্গলকাব্যে তা আছে, কিন্তু সেসব জায়গায় আমরা কেবল অবৈধ কামপীড়িত কতকগুলি নারীকে পাই, আর ভারতচন্দ্রের কাব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিবাহিত-জীবনে দাম্পত্য সুখহীন কতকগুলি নারীর মনের জ্বালার রূপ। পুরুষতান্ত্রিক এদেশের সমাজ, পুরুষের ক্ষেত্রে বহুবিবাহ ও নারীর ক্ষেত্রে একবিবাহ (বৈধব্য ঘটলেও), এবং প্রায়শঃ বাল্যবিবাহ—এসব ক্ষেত্রে নিপীড়িত কামনার যে-রুদ্ধ ক্রন্দনকে প্রতিক্ষণে নারীরা বহন করে, তাকেই কিছুটা মুক্তির

২। নমুনা-হিসাবে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু মন্তব্য হাজির করছি:

"স্ত্রীজাতিকে তিনি একেবারে রূপের ক্রীতদাসী করিয়া আঁকিয়াছেন—রূপের নিকটে পাতিব্রত্য নাই, শান্তভাব নাই, রূপ দেখিলেই তাহারা অধীর। সুন্দরকে দেখিয়া বর্ধমানের স্ত্রীবর্গ অকাতরে স্বামী আত্মীয়-পরিজনদিগের নিন্দা করিয়া চলিয়াছে।"

'নারীগণের পতিনিন্দা' বিষয়ে বলেন্দ্রনাথ ব্যঙ্গভরে বলেছেন—"আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কল্যাণে ইহাকেও পাতিব্রত্যের আত্যন্তিকতা না বলিলে নয়। কারণ, বঙ্গদেশের ধমনীতে-ধমনীতে তীব্রবেগে আধ্যাত্মিক তড়িৎস্রোত প্রবাহিত।"

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় আলোচ্য বিষয়ে খুবই ক্রোধান্বিত:

"পুরনারীগণের পতিনিন্দা আগাগোড়া কৌতুকরসেরই রচনা। সেকালে হাস্যরসপুষ্টির সবচেয়ে বড় উপাদান ছিল অশ্লীল ইঙ্গিত। ইহাতে তাহার অভাব নাই। দোয়াত-কলম সারস্বত সাধনার অঙ্গ। ইহা আমাদের কাছে পবিত্র দ্রব্য। এই দোয়াত-কলম লইয়া নোংরা রসিকতা এ যুগের কোনো পাঠক সহ্য করিবে কি?"

সুযোগ দিয়েছেন ভারতচন্দ্র। এখানে তিনি বিভিন্ন নারীর মারফত ভোগবিঘ্নের যে-তালিকা পেশ করেছেন, তার মধ্যে তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বাস্তববোধ ও মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় মেলে। নারীদের এই শ্রেণীর অভিযোগের ব্যাপারটা ঠিক কাব্যশাস্ত্রের আওতায় পড়ে না, মূলে তা কামশাস্ত্রের এক্তিয়ারভুক্ত। সুতরাং এদের কাব্যগত করতে হলে এমন কিছু অতিরিক্ত বস্তু যুক্ত করা প্রয়োজন, যা উপরিতন রসসুখে পাঠককে ব্যাপৃত রেখে ভিতরের বস্তু ঘাঁটতে উৎসাহ দেবে না। ভারতচন্দ্রের কৌতুকময় দুষ্টামী সেই বস্তু। তার দ্বারা কবি যখন রসিক পাঠককে উৎফুল্ল রেখেছেন, ঠিক তখনি, ভোগেচ্ছা ও ভোগাশ্রয়ের শোচনীয় অসামঞ্জস্যের যাতনা তলে-তলে অশ্রুরেখাকে টেনে গেছে।

নিন্দার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলছি :

বধির পতি : সাধ করি শিখিলাম কাব্যরস যত।
কালার কপালে পড়ে সব হৈল হত ॥
বুঝাই চোরের মত চুপ করি ঠারে।
আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল প্রমাদ আঁধারে ॥
নৈলে নয় তেঁই করি কষ্টেতে শয়ন।
রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন ॥

অন্ধ পতি : মন্দভাগা অন্ধপতি দ্বন্দ্বে মাত্র ভাল।
গোরা ছিনু ভাবিতে ভাবিতে হৈনু কাল ॥
ভরা পূরা যৌবন উদাসে বাসি শূন্য।
আঁধলারে দেখাইলে নাহি পাপ পুণ্য ॥

বৃদ্ধ পতি : বদনে রদন লড়ে ওদনে বঞ্চিত।
সে মুখ চুম্বনে সুখ না হয় কিঞ্চিত ॥···
আমার আবেগ দৈবে কোনোকালে নয়।
ধর্ম ভাবি তাহার আবেশ যদি হয় ॥
ঝাঁপনি কাঁপনি সার কেবল উৎপাত।
অধর দংশিতে চায় ভেঙে যায় দাঁত।

পণ্ডিত পতি : রাজসভাসদ পতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
না ছোঁয় তরুণী তৈল, আমিষে বঞ্চিত॥
পান বিনা মুখে গন্ধ নাহি দ্বিভোজন।
কি কব আমার মাথা গোগ্রাসে ভোজন॥
ঋতু হইলে একবার সম্ভবে সম্ভাষ।
তাহে যদি পর্ব হয় তবে সর্বনাশ॥
বখ্‌শী পতি : পরের হাজির গরহাজির লিখিতে।
ঘরে গরহাজিরা সে না পায় দেখিতে॥
ফেরেব ফিকিরে ফেরে ফাঁকি-ফুঁকি লেখে।
কেবল আমার গুণে পুত্রমুখ দেখে॥
ঘড়েল পতি : রাত্রি দিন আট পর ঘড়ি পিটে মরে।
তার ঘড়ি কে পিটায় তল্লাস না করে॥
রাত্রি নাহি পোহাইতে দুঘড়ি বাজায়।
আপনি না পারে আর বন্ধুরে খেদায়॥
বৈদ্য পতি : রাজসভাসদ পতি বৈদ্যবৃত্তি করে।
ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে॥
নাড়ি ধরি স্থানে-স্থানে করয়ে ভ্রমণ।
আমি মরি কামজ্বরে, সে বলে উল্বণ॥

ভারতচন্দ্রের সরসোজ্জ্বল মুখ কান্নায় করুণ হয়েছে যখন তিনি কৌলীন্যের অভিশপ্ত রূপ ফুটিয়েছেন :

আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥
যদি বা হৈল বিয়া কতদিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড়দিদি হই॥···
দুচারি বৎসরে যদি আসে একবার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যভার॥
সুতাবেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়।
তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায়॥

এই কবির 'পতিনিন্দা'র সঙ্গে পূর্ববর্তী কবিদের পতিনিন্দাগুলির তুলনা করা কাব্যের অপমান। ভারতচন্দ্র অত্যন্ত পিচ্ছিল পথে অবলীলায় বিচরণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন—প্রতিভাবান ও প্রতিভাহীনের পার্থক্যকে। এবং প্রমাণ করেছেন, জীবনের সত্য কখনো অশ্লীল নয়, যে জীবন তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিয়ে অপেক্ষা করছে কবির মধ্যস্থতায় আত্মপ্রকাশ করার জন্য। এমন কথা শোনা যায়, ভারতচন্দ্র এই পতিনিন্দার মধ্যে নাকি অনেক কৃষ্ণচন্দ্র-সভাসদের শয়নঘরকে বেআব্রু করেছিলেন। এই রটনা সত্য কিনা বলা শক্ত, তবে সত্য হতে পারে তার একটা পরোক্ষ প্রমাণ আছে। পতিনিন্দার শেষে তিনি নিজ পত্নীকে এনেছিলেন—তাঁর মুখে পতিনিন্দা বসিয়ে নিরপেক্ষতা দেখাতে।

এই আনুমানিক কারণটির কোনো গুরুত্ব নেই। শেষাংশে নিজ পত্নীকে আনার গভীরতর কারণ আছে। কামনার, অভাবের, ক্ষুধার জীবনকেই কি ভারতচন্দ্র একমাত্র সত্য মনে করেছেন? অভাবের মধ্যেও কি সুখসন্তোষের গরিমাময় জীবন সম্ভব নয়? সম্ভব। সেই মূর্তি দেখেছি শেষাংশে—স্নিগ্ধ করুণ মধুর ও শুচি, সহানুভূতিতে সিক্ত, সংযত আত্মপরিহাসে আরক্ত একটি আত্মপ্রকাশ সহসা আমাদের হৃদয় ছুলিয়ে দিয়ে সরে গেছে—কবির আসল মূর্তিকে দেখে ফেলেছি।

কবিপত্নী পতিনিন্দা করছেন :

তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী।
অপূর্ব আমার দুঃখ কর অবগতি ॥
মহাকবি পতি মোর কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে ॥
পেটে অন্ন হেঁটে বস্ত্র জোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে ॥…
শাঁখা সোনা রাঙা শাড়ি না পরিনু কভু।
কেবল বাক্যের গুণে বিবাহের প্রভু ॥

দাম্পত্যজীবনের দুঃখজয়ী মাধুর্য অসাধারণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে ঐ কয়েকটি ছত্রে উদ্‌ঘাটিত। ভারতচন্দ্রের সমস্ত জীবনটি যেন এক ঝলকে

চোখের সামনে ভেসে ওঠে। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বিয়ে-করা কবির শিশু-পত্নী ছাব্বিশ বৎসর পরেও হৃদয়েশ্বরী। ভারতচন্দ্রের সন্ন্যাসত্যাগ, গৃহী-জীবনে প্রত্যাবর্তন, ব্যক্তিজীবনের শুচিতা, আজীবন সংগ্রাম—সব-কিছুর মূলে যেন এই প্রেমময়ী গৃহলক্ষ্মী। উভয়ের প্রেমের এমন নিত্য-স্বাদের অবস্থা যে, প্রৌঢ় বয়সেও গৃহিণীকে চটিয়ে রোষ-রাগ উপ-ভোগের লোভ কবির যায় নি। তাই পতিনিন্দার মনে-অসতী নারী-দের সঙ্গে নিজের সতী নারীটিকে জুড়ে দিলেন। ধরে নিতে পারি, মধুর গঞ্জনা তিনি আশাতিরিক্ত পেয়েছিলেন। এই সাধ্বীর কোপ-কটাক্ষ লাভের প্রলোভনেই বোধহয় তিনি ভবানন্দের দুই পত্নীর কথা বলতে গিয়ে মারাত্মক রসিকতা করে ফেলেছিলেন—'দুই নারী বিনা নাই পতির আদর।' স্বামীটি এঁর এত অসহ্য, তবু তাঁর প্রতি ভাল-বাসার গরিমা ভো৷ যায় না। শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও 'এমনটি কাহারও নাই' ভাবনায় রসাবিষ্ট থাকে অন্তর। শেষ দুটি ছত্রে পতি-গরবিণী এই নারীর প্রেমমাণিক্য জ্বলজ্বল করে উঠেছে। সুন্দরকে ইঙ্গিত করে ইনি বলেছেন :

ভাবে বুঝি এই চোর কবি হৈতে পারে।
তেঁই চুরি করি বিদ্যা ভজিল ইহারে॥

বিদ্যার সুন্দর-কবির মতো এই সতী নারীরও নিজস্ব একটি কবি আছে (কবি নয়, একেবারে—'মহাকবি মোর পতি'), যার কাছে ইনি বিনামূল্যে বিকিয়েছেন। একমাত্র এঁর পক্ষেই, নিজের কবি-পতির আকর্ষণ জানেন বলেই, বিদ্যার আত্মসমর্পণকে সত্যকার সহানুভূতির সঙ্গে দেখা সম্ভবপর। 'রতিনায়ক' সুন্দরকে দেখে যাঁর পতিনিন্দার প্রবৃত্তির পরিবর্তে পতিপ্রেম বেড়েছে, তাঁকে পতিনিন্দায় নিয়োগ করা ভারতচন্দ্রের চূড়ান্ত রসিকতা। বঞ্চিতা পত্নীদের পতিনিন্দার স্বাভাবি-কতা একটি সতী নারীর বিপরীত দৃষ্টান্তে অলজ্জ কামুকতার রূপ ধরেছে —পতিনিন্দার পরিশিষ্ট পতিনিন্দার এমনই প্রতিবাদ। আমরা দেখব, ভারতচন্দ্রের এই চিত্রই প্রৌঢ়তা ঘুচিয়ে আরও রসোচ্ছল, লাবণ্যতরল হয়ে রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতার প্রথমাংশে নবরূপ নিয়েছে।

গৃহজীবনের এই আনন্দচ্ছবি। এ সংসারে আছে অন্নবস্ত্রসংস্থানের কঠিন দায়িত্ব, আবার তারই চারিদিকে তরঙ্গিত প্রেমরসের প্রবাহ। ভারতচন্দ্র জানেন, 'আদ্যরস সকল রসের মধ্যে সার।' সেই আদিরসের দেবদেবীকে, রাধা ও কৃষ্ণকে কবি (রসমঞ্জরীর সূচনায়) নমস্কার করেন, যাঁরা 'নিত্য নব রসধাম', 'সর্বসুলক্ষণধারী', 'সর্বরসবশকারী', সকলের প্রতি 'প্রণয়কারক,' 'নিরুপম নায়িকা নায়ক।' 'বীণাবেণুযন্ত্রগানে রাগ-রাগিণীর তানে বৃন্দাবনে নাটিকা নাটক' তাঁরা অভিনয় করেন, গোপ-গোপিগণের সঙ্গে সদা রাসরঙ্গে থাকেন—তাঁরাই আবার ভারতচন্দ্রকে 'ভক্তিপ্রদায়ক'। ভারতচন্দ্র মানসিংহে একটি গানে বলছেন, শ্যাম-রায়কে সকল গোপী মিলে লুণ্ঠন করছেন, কারণ বিশ্বপতি শ্যামরায় তো কারও একার নয়, সকলেরই—ভারতচন্দ্রও সে লুণ্ঠনের ভাগ পেতে চান। কিন্তু হায়, শ্যাম-উৎস থেকে প্রবাহিত উজ্জ্বল রসস্রোত যখন মানবজীবনভূমিতে প্রবাহিত হয় তখন অচিরে তা কর্দমাবিল হয়ে ওঠে এবং বিষাদের সঙ্গে কবিকে ভাবতে হয়, বিদ্যাসুন্দরের একটি ভণিতায় যা ভেবেছেন :

ভারতের গোবিন্দের চরণের আশ।
পরিণাম হরিনাম আর কামপাশ॥

মানুষের বাসনাজীবনের সমর্থনে ভারতচন্দ্রের কিছু উক্তি, বা কাব্যাংশ উদ্ধৃত করলেই প্রমাণ হয়ে যাবে না—এই কবি 'সুস্থ' ভোগ-জীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষী। তা প্রমাণিত হতে পারে যদি অপরপক্ষে স্থূল আত্মহীন কামাসক্তি সম্বন্ধে কবির বিতৃষ্ণাকে দেখিয়ে দেওয়া যায়। সত্যই তা রয়েছে। সে বিতৃষ্ণা তাঁর বড় প্রীতির দুলালী বিদ্যার শেষ পর্বের আচরণ দেখাবার কালে কিভাবে প্রকাশ করেছেন, তা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখাবার চেষ্টা করব। এখানে অন্য প্রমাণ-সন্ধান করা যাক।

'বাসনা' বিষয়ে কবির একটি কবিতা আছে। কবিতাটি উচ্চাঙ্গের নয়, কিন্তু মধ্যযুগীয় বাংলাকাব্যের পটভূমিকায় খুবই মূল্যবান কারণ এর মধ্যে কবিচিত্তের সাক্ষাৎ প্রকাশ ঘটেছে। অনাধুনিক বাংলাসাহিত্যে

ব্যক্তিমনের সচেতন প্রকাশ প্রায় দেখা যায় না। আমরা নিঃস্বার্থতাকে এমন গুরুমূল্য দিয়েছি (এবং পূর্বসূরীদের দ্বারা প্রবর্তিত রীতির প্রতি ভক্তিকে এমনভাবে রক্ষা করেছি) যে, নিজের কথা নিজের মুখে বলবার অহঙ্কারকে দূর-দূর করে তাড়িয়েছি। তারই মধ্যে দু'একজন কিছু প্রতিবাদ করেছেন—ভারতচন্দ্র তাঁদের একজন। বহুপূর্ববর্তী মৈথিল কবি বিদ্যাপতি তেমন আর একজন, যিনি প্রার্থনার অসাধারণ কবিতাগুলি লিখেছিলেন। ভারতচন্দ্রের 'বাসনা' কবিতার মধ্যে তিনশো বছর পূর্বেকার ভোগশ্রান্ত বিদ্যাপতির দীর্ঘ ব্যাকুলতা, বা শতবর্ষ পরবর্তী আশা-মরীচিকায় পথভ্রান্ত মধুসূদনের মর্মান্তিক কাতরোক্তি নেই সত্য, হয়ত এখানে বাসনাপীড়িত ভারতচন্দ্রের মৃদু আক্ষেপমাত্র দেখতে পাব, তবু এই কবিতা পাঠান্তে ইন্দ্রিয়বহ্নির ইন্ধনদাতারূপে সমালোচিত কবি সম্বন্ধে নতুনভাবে ভাববার ইচ্ছা হবে। কবিতাটি এই :

বাসনা করয়ে মন
পাই কুবেরের ধন,
সদা করি বিতরণ
তুষি যত আশনা,
আশনাই আরো চাই,
ইন্দ্রের ঐশ্বর্য পাই
ক্ষুধামাত্র সুধা খাই
যমে করি ফাঁসনা।
ফাঁসনা কেবল রৈল
বাসনা পূরণ নৈল
লোভ হতে লোভ হৈল
লোকে মিথ্যা ভাষণা,
ভাসনাই কারে বলে
ভারত সন্তাপে জ্বলে
কলার বাসনা হৈল
আঃ আরে বাসনা॥

অনেক বাসনার মধ্যে শেষের বাসনাটি আপাততঃ সবচেয়ে নিরীহ কিন্তু বস্তুতঃ প্রাণঘাতী। এই কলা-বাসনা মানুষকে ঘরের মধ্যে ঘর-ছাড়া করে, এমন আত্মাভিমান ও স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি দেয়, যা প্রচলিত সংসারের সাজানো বাগানে অনৈসর্গিক উৎপাত।

এই কবিতাটির অনুরূপ ভাবভূমি ভারতচন্দ্রের একটি গানে পেয়েছি। অন্নদামঙ্গলে 'হরগৌরীর বিবাদ সূচনা' অধ্যায়ের উপরে যে-গানটি সন্নিবেশিত হয়েছে, তার মধ্যে দেখা যায়, কবি অধর্মের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের কথা বিশেষভাবে বলেছেন। ক্ষতমুখ থেকে রক্ত পড়ছে তবু কাঁটাগাছ সুখে চিবোচ্ছে মুগ্ধ পশু—নিজের মধ্যে সেই পশুস্বভাব দর্শন করে গ্লানিতে ভরে উঠেছে কবির মন। 'সুত-মিত-রমণী-সমাজে' আবদ্ধ বিদ্যাপতির যন্ত্রণা এই কবিরও :

ধর্মে জানি সুখ হয় তবু মন নাহি লয়
অধর্মে বিবিধ ভয়, তবু তাই সাধে।
মিছা দারা সুত লয়ে মিছা সুখে সুখী হয়ে
যে রহে আপনা কয়ে সে মজে বিষাদে॥

বাসনা পারবশ্য এবং বাসনার সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম, এই কবির মধ্যে একসঙ্গে চলেছে। পরাজয়ের রঙিন ছবি আমরা দেখেছি বলেই কবির সম্বন্ধে একপাক্ষিক ধারণা করে বসি, নচেৎ একটু লক্ষ্য করলেই বিপরীত ছবিটি দেখা যাবে। তাঁর একেবারে প্রথম যৌবনের রচনা সত্যপীরের পাঁচালী দুটিতে প্রখর যৌন-সচেতনতা দেখা যায়। চৌদ্দ বৎসর বয়সে স্বেচ্ছাবিবাহ যিনি করেন, তাঁর পক্ষে সেটা স্বাভাবিক ব্যাপার। সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্যের ভিত্তি, এই কবির কাছে—যৌবন-সুখে বাধা সৃষ্টি করার এবং বাধা দূর করার ক্ষমতায়!! সত্যনারায়ণ পূজায় অমনোযোগী বণিকের তরীনিমজ্জন, প্রাণসংশয় ইত্যাদি আছে, কিন্তু সে সকলই বণিকপুত্রীর ভোগবিঘ্নের তুলনায় নিতান্ত লঘু আপদ। পূর্বতন মঙ্গলকাব্যে যৌবনে পতি হারিয়ে কন্যাগণের বুক-চাপড়ানো ইত্যাদি নেই তা নয়, কিন্তু সেখানে প্রধান ব্যাপার সম্পদনাশ বা প্রাণ-

সংশয়। উল্টোপক্ষে বর্তমান কাব্যে প্রাণ ও কাম সমর্থক। বণিকপুত্রী এই বলে হাহাকার করেছে :

ওরে বিধি হায় হায়
এ যৌবন বৃথা যায়
যেন রতি কামের অবলা। (হীরারাম-পাঁচালী)

সত্যপীরের দ্বিতীয় পাঁচালীতে ভারতচন্দ্রের কণ্ঠস্বর আরো স্পষ্ট :

এ নব যৌবন নিশি
হয়ে তার পূর্ণশশী
কোথা আছ অহর্নিশি
প্রেমাধীনী ফেলে হে ॥
যৌবন প্রভুর কাল
মদন-দহন-জ্বাল
কোকিল কোকিলা কাল
রেখ পদতলে হে ॥
যৌবন প্রফুল্ল ফুল
কেবল দুঃখের মূল
খেদে হয় প্রাণাকুল
ঝাঁপ দিই জলে হে ॥

বসন্ত ও বর্ষা বিষয়ে কবির যে দুটি কবিতা আছে, তাদের মধ্যে কামজীবনে ঋতুর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা পাই। 'বসন্ত' কবিতাটির শেষছত্রে দেহজ্বালায় অস্থির কবির বিসর্গ-চিহ্নিত ধিক্কার ও ধমকটি উপভোগ্য :

অনঙ্গেরে অঙ্গ দিলি শুষ্ক কাষ্ঠ মুঞ্জরিলি
ভারতেরে ভুলাইলি আঃ আরে বসন্ত।

'বর্ষা' কবিতাতেও একই বিসর্গ-পূর্ণ কামের ধাক্কা :

বিদ্যুতের চক্‌মকি ডাহুকের মক্‌মকি
কামানল ধক্‌ধকি বড় হইল বর্ষা ॥

ময়ূর ময়ূরী নাচে চাতকিনী পিউ যাচে
আর কি বিরহী বাঁচে বুঝিনু নিষ্কর্ষা।
ভারতের দুখঃমূল কেবল হৃদয়ে শূল
ফুটালি কদম্বফুল আঃ আরে বর্ষা॥

কবি আরও এগিয়েছেন 'রাধাকৃষ্ণের উক্তি' কবিতা দুটিতে। চটুল, শ্রদ্ধাহীন বাদপ্রতিবাদমূলক ঐ দুটি ক্ষুদ্র রচনার শেষ ছত্রে রয়েছে গূঢ় অভব্য ইঙ্গিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ধারায় লেখা এগুলি; একেবারে গ্রাম্য, ইতরতার ফুৎকারে ভরা। নমুনা হিসাবে 'কৃষ্ণের উক্তি' অংশটি উদ্ধৃত করছি:

বয়স আমার অল্প নাহি জানি রসকল্প
তুমি দেখাইয়া তল্প জাগাইলা যামী।
ননী ছানা খাওয়াইয়া রসরঙ্গ শিখাইয়া
অঙ্গভঙ্গ দেখাইয়া তুমি কৈলা কামী॥

তুমি বৃষভানুসুতা অশেষ চাতুরীযুতা
তোমার ননদীপুতা সব জানি আমি।
আগে হানি নেত্রবাণ কাড়িয়া লইলে প্রাণ
এবে কর অভিমান আঃ আরে মামী॥

কবি আরও অগ্রসর 'কর্‌দ্রাফ্‌থ বর্ণন' কবিতায়। সেখানে শব্দে পর্যন্ত যেন দেহগন্ধ ফুটেছে।

এর উল্টোদিকে আছে 'কৌতুককারিণী' কবিতা, যার মধ্যে 'ধেড়ে ও ভেড়ের সমান রূপবর্ণন।' ধেড়ে অর্থাৎ উদবিড়াল, ভেড়ে অর্থাৎ অপদার্থ কামুক পুরুষ। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটা ধেড়ে পুষেছিলেন—পোষা জীবটি নানা লীলা দেখাত; আর রাজসভায় পোষা মনুষ্য-ভেড়ুয়ার তো সীমাসংখ্যা ছিল না। ভারতচন্দ্রের সমদৃষ্টি অবিলম্বে উভয়ের ঐক্য আবিষ্কার করেছিল। আমরা তার দ্বারা কবির আর একটি চেহারাকে চিনে নিতে পারছি—বুঝতে পারছি, স্থূলবুদ্ধি কামুকের প্রতি তিনি কিরকম অশ্রদ্ধাপরায়ণ। ভারতচন্দ্রের জগতে সেই-

সকল প্রবৃত্তিতাড়িত মনুষ্যপশুর স্থান ছিল না যারা উজ্জ্বলরসকে রিরংসা-কর্দমে পরিণত করে তাতে লুটোপুটি খেতে ভালবাসে।

উক্ত কবিতার কিছু অংশ ঃ

ধেড়ে বড় দাগাবাজ, জলে পেয়ে স্ত্রীসমাজ
ব্যস্ত করে দেয় লাজ কূলে ডুব পেড়ে।
পেড়ে রাঙা যত শাড়ি ধরে করে কাড়াকাড়ি
কেহ দিলে তাড়াতাড়ি প্রবেশয়ে গেড়ে॥
গেড়ে হতে পুন আসি ভুস করে উঠে ভাসি
সবে দেখে বলে হাসি বড় দুষ্ট ধেড়ে।
ধেড়ে ভেড়ে এক সম ঝক্ মারিবার যম
কেহ কারে নহে কম ফেরে যেন দেঁড়ে॥...
ভাল বিধি কল্লে তুলা ধেড়ে আর ভেড়ে।
ভেড়ের ভাঁড়ামি মুখে ধেড়ের বিক্রম বুকে
ভেড়ে ধেড়ে ফেরে সুখে স্থল জল নেড়ে॥

অনুরূপ ঘৃণা ফুটেছে মানসিংহে ঘেসেড়ানীর বিলাপে। মানসিংহ বাংলায় সসৈন্যে এসেছেন, প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়েছে, ফলে বন্যা, সবাই ভেসে যাচ্ছে, ঘেসেড়ানীও, তার কান্না কবি কিছু হাসির সঙ্গে, অধিক তিক্ত বিদ্রূপের সঙ্গে দেখেছেন ঃ

ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে।
ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হাবাসে॥
কান্দি করে ঘেসেড়ানী, হায় রে গোঁসাই।
এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই॥
বৎসর পনর ষোল বয়স আমার।
ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার॥
হেদে গোলামের ব্যাটা বিদেশে আনিয়া।
অনেকে অনাথ কৈল মোরে ডুবাইয়া॥

মানসিংহেই দাসু-বাসুর খেদ-বর্ণনা আছে। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে ভবানন্দের তকরার হয়ে গেছে, তার ফল ভবানন্দের কয়েদ, তাঁর অনুচর

সঙ্গী-সাথীদের লাঞ্ছনা ইত্যাদি। দলে ছিল দাম্মু ও বাম্মু, রাজায় রাজায় যুদ্ধের সময়ে যারা উলুখড়। পরাভূত রাজা হয়ত 'ধন্য পুরুরাজ' হয়ে আলেকজাণ্ডারের মহত্ত্বে রক্ষা পেয়ে যেতে পারেন কিন্তু উলুখড়ের পরিত্রাণ নেই। দাম্মু-বাম্মুর তাই খেদ।

দাম্মু-বাম্মুর খেদোক্তির প্রায় গোটা অংশ ছেড়ে-আসা নারীদেহ-দুটির জন্য। কামিনী ও কাঞ্চন—দুই ফাঁসে মানুষ বাঁধা। বেচারা দাম্মু-বাম্মু কাঞ্চনের প্রয়োজনে কামিনীকে ছেড়ে এসেছে সাময়িকভাবে; এখন বিপাকে পড়ে কাঞ্চন যায়—কামিনী তো বলাই বাহুল্য।

দাম্মু বলে বাম্মু ভাই পলাইয়া চল যাই
কি হইবে বিদেশে মরিলে।
বিস্তর চাকরি পাব বিস্তর পরিব খাব
কোনরূপে পরাণ থাকিলে॥
যুবতী রমণী আছে না রয়ে তাহার কাছে
কেন আনু বামণের সাথে।
নারী রৈল মুখ চেয়ে তবু আনু মাটি খেয়ে
তারি ফল পানু হাতে হাতে॥
দিবসে মজুরী করে রজনীতে গিয়া ঘরে
নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী।
নারী ছাড়ি ধন আশে যেই থাকে পরবাসে
তার বাড়া কেবা আছে দুখী॥
কান্দিয়া কহিছে বাম্মু উচিত কহিলা দাম্মু
এই দুখে মোর প্রাণ কাঁদে।
মরি তাতে দুখ নাই নারী রেল কোন্ ঠাঁই
বিধাতা ফেলিল একি ফাঁদে॥
কুড়ি টাকা পণ দিয়া নূতন করিনু বিয়া
এক দিনো শুতে না পাইনু।
কাদাখেঁড়ু হইয়াছে পুনর্বিয়া বাকি আছে
মাটি খেয়ে বিদেশে আইনু॥

এই সব অংশ থেকে আমরা দেখতে পাই, ভারতচন্দ্রের বঙ্কিম দৃষ্টিতে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রধানতঃ যৌনকামনাত্মক। মানুষের মধ্যে এক্ষেত্রে ভিন্নতর অভীপ্সার প্রকাশ ভারতচন্দ্র বিশেষ লক্ষ্য করেন নি। এই 'পশু'-মানুষকে ভারতচন্দ্র কোথাও দাসু-বাসু-জাতীয়ের মধ্যে দর্শন করে তুচ্ছতায় করুণা করেছেন, অন্যত্র কৃষ্ণচন্দ্রীয়গণের মধ্যে দেখে ঘৃণাপূর্ণ কবিগিরিতে তুষ্ট রাখতে তৎপর হয়েছেন।

দাসু-বাসু থেকে আমরা উঠে পড়তে পারি রতির বিলাপে। কাহিনী পুরাতন—ধ্যানস্থ শিবের ধ্যান ভাঙতে মদন বাণ মেরেছিলেন। কালিদাস তার পরিণতির বর্ণনায় সবিশেষ সাংস্কৃতিক সংযম দেখিয়েছেন—শিব চন্দ্রোদয়ারম্ভে ঈষৎ স্ফীত অম্বুরাশির মতো হয়েছেন। আর বাঙালি-কবি কালিদাসের রচনাকে কেবল কাব্য বলে উড়িয়ে দিয়েছেন—শিবকে নিতান্ত বেচাল করে ছেড়েছেন (শিব 'বিকল হইয়া নারী তলাসিয়া' সকল স্থানে ফিরেছিলেন, অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, কিন্নরী অপ্সরীরা ধর্মরক্ষা করতে দে দৌড়), তার জন্য তিনি বহুভাবে নিন্দিত, তাতে যোগ দিতে আমরা রাজি আছি, কেবল কবির মনোভাবটি আমরা যেন বিবেচনা করে দেখি। কবি হয়তো ভেবেছিলেন, মানবিকতা যদি দেবতার উপরে আরোপ করতেই হয় সংকোচ রেখে লাভ নেই, নিরাকার ব্রহ্ম যেখানে দেহফাঁদে পড়ে কাঁদেন, সেখানে শিব কুচনীর বাড়িতে ছুটতেই পারেন দেহজ্বালা জুড়োবার জন্য। দেবতার এই মারাত্মক মানবিকতা আমরা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারি না, যদিও একই সঙ্গে জানি, পবিত্র দেবভাষায় ইন্দ্র-চন্দ্রাদি দেবগণের এমন সব কেলেঙ্কারী লেখা আছে, যার জন্য ক্ষেত্রবিশেষে 'পাশবিক' শব্দটি বদলে 'দৈবী' করে দিতে পারি।

অপরাজেয় কামকে দেখে কবির সম্ভ্রম না বিতৃষ্ণা ? দুইই। কামকে ভস্মীভূত করে কি ফল ? নিরাকার ঈশ্বরের মতোই কাম 'অচক্ষু সর্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান, অপদ সর্বত্র গতাগতি।' 'পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী, বিশ্বময়ে দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!' এখানে আমরা কামপ্রভাবের চরাচরব্যাপ্ত রূপ সম্বন্ধে কবির বিতৃষ্ণার রূপকেই দেখাতে

চাইছি। কাম দগ্ধ হবার পরে রতি বিলাপ করছেন, সেই 'আহা আহা, উহু উহু, হায় হায়' কান্না সম্বন্ধে কবির স্পষ্ট মনোভাব দেখতে পাই অধ্যায়ের প্রথম ছত্রেই—'পতিশোকে রতি কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে।' এরপর রতির গোছানো কান্নাকে পাব, ধরেই নিতে পারি।[৩]

স্থূল কাম সম্বন্ধে কবির তীক্ষ্ণ ঘৃণার স্পষ্ট পরিচয় আমরা অন্যত্র পেয়েছি—খুবই তাৎপর্যপূর্ণ সে অংশ। সুস্থ ভোগকে কবি কতখানি মর্যাদা দেন, সে বিষয়ে আমরা বারে-বারে বলেছি। সে ভোগ সামগ্রিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু ভোগই যেখানে জীবনসর্বস্ব, জীবনের অন্য কোনো মূল্য মহিমা যেখানে অস্বীকৃত—সেখানে কবির উদ্যত অভিশাপ। ভারতীয় ধারণায় যক্ষ কার্যতঃ অনাত্মজীব—কেবল সঞ্চয় এবং সংরক্ষণ তার উদ্দেশ্য (ধন্য কালিদাস! এক যক্ষকে তিনি চিরযুগের প্রেমিক করে তুলেছেন!)—সেজন্য ধনমত্ততা তার স্বভাবসিদ্ধ, এবং তারই অঙ্গাঙ্গি কামমত্ততা। ভারতচন্দ্রের চিন্তায় মানবজীবনেরও দুই প্রধান সমস্যা—ঐ অর্থ ও কাম। কিন্তু মানুষ তাতেই আবদ্ধ নয়—প্রেমের দ্বারা কামকে সে মহৎ করে, ত্যাগের দ্বারা গরীয়ান করে ধনকে।

কুবেরের অনুচর বসুন্ধর অন্নদাপূজার জন্য পুষ্পচয়ন করতে গিয়ে ঋতুরঙ্গের চক্রান্তে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল, অন্নদার জন্য তোলা ফুলের বিছানাতে শুয়ে নববাসর যাপন করেছিল। এই অপরাধের জন্য ডাকিনী যোগিনীরা যথার্থ রসিকতার সঙ্গে বসুন্ধর ও বসুন্ধরাকে 'ফুল মালা সঙ্গে বুকে বুকে বাঁধি রঙ্গে' অন্নদাগোচরে হাজির করেছিল, এবং দেবী শাপ দিয়েছিলেন বসুন্ধরকে—মর্ত্যে গিয়ে মনুষ্যজন্ম নাও।

মর্ত্যবাসের অভিশাপে ভীত হয়ে বসুন্ধর মর্ত্যের যেসব ভয়াবহতার

৩। রতির বিলাপের কৃত্রিমতায় দীনেশচন্দ্র সেন খুব রাগ করে বলেছেন—"ভারতচন্দ্রের রতি সামান্য গণিকার ন্যায় কৃত্রিম স্বরে পতিবিয়োগ-বিলাপ করিতেছে।"

দীনেশচন্দ্র একটি জিনিস খেয়াল করে দেখেন নি—ভারতচন্দ্র ইচ্ছে করেই রতিকে দিয়ে গণিকার কান্না কাঁদিয়েছেন, কারণ রতিকে তিনি রতিই ভেবেছিলেন—রাধিকা ভাবেন নি।

কথা দেবীকে বলেছিল তার মধ্যে আছে—সেখানে গর্ভবাসের বড় কষ্ট, সেখানে আছে জ্ঞানহীনতা ও পরদুঃখকাতরতা। প্রথম কষ্টটির কথা স্বীকার্য, দ্বিতীয়টি কেবল মর্ত্যে আছে আর যক্ষধামে নেই, একথা সত্য কিনা বিতর্কযোগ্য, কিন্তু বিস্ময়কর তৃতীয় কষ্টের কথা। পরদুঃখ-কাতরতাকে কষ্টের বিষয় একমাত্র যক্ষবুদ্ধিই বিবেচনা করতে পারে। এক্ষেত্রে কবির মনে নিশ্চয় যক্ষস্বভাবের অবিমিশ্র সঞ্চয়শীলতা, ভোগ-সর্বস্বতা এবং সহানুভূতিহীনতার কথা উঠে থাকবে। যক্ষদৃষ্টি ও মানব-দৃষ্টির এমনই পার্থক্য যে, বসুন্ধরের কাছে (কিছু পরে নলকূবরের কাছেও) মর্ত্যবাস অপেক্ষা রৌরব কুম্ভীপাক নরকও শ্রেয়ঃ। এখানে স্মরণ করিয়ে দেব, 'শোকহীন হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি' থেকে বিদায়ের কালে পুণ্যক্ষীণ মানুষটি, রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, মর্ত্যের বরণীয় লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছিল :

"মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি—তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দুদিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দু'দণ্ডের তরে।...
অয়ি দীনা হীনা,
অশ্রু-আঁখি দুঃখাতুরা জননী মলিনা,
অয়ি মর্ত্যভূমি.. "

ভারতচন্দ্রও যক্ষের মনের সঙ্গে অনুভূতিশীল মানবমনের পার্থক্য দেখাতে অবিলম্বে মর্ত্যমহিমা কীর্তন করেছেন। পৃথিবী দুঃখময়, আবার এই পৃথিবী কর্মভূমি, যেখান থেকেই কেবল মুক্তিলাভ সম্ভবপর। তাই দেবতারাও পৃথিবীতে জন্মকামনা করেন। কবি অতঃপর স্নিগ্ধ গাঢ় সুরে দেশবন্দনা করেছেন। কবি সম্ভবতঃ সুখদুঃখময়, পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর এই মর্ত্যভুবনকে সুন্দর জৈবজীবনের আশ্রয় যক্ষভমির পাশে উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন। দেশবন্দনাত্মক নিম্নের কয়েকটি ছত্রে স্তোত্রগরিমা আছে :

সপ্তদ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ।
তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্মের প্রদীপ॥

তাহে ধন্য গৌড় যাহে ধর্মের বিধান।
সাধ করি যে দেশেতে গঙ্গার অধিষ্ঠান॥

অক্ষয় ভোগের মুগ্ধ প্রাণী যক্ষস্বভাব সম্বন্ধে নিজ মনোভাবকে আরও তীব্র আকারে কবি প্রকাশ করেছেন অল্প পরেই। বসুন্ধর ছিল যক্ষরাজ কুবেরের অনুচর, নলকূবর কুবেরের পুত্র, সুতরাং যৎপরোনাস্তি উগ্র উদ্ধত। সেও পত্নীর সঙ্গে মধুমাসে রতিরঙ্গে মেতেছিল এবং মর্ত্যবাসের অভিশাপ পেয়েছিল দেবীর কাছ থেকে। বসুন্ধরের সঙ্গে নলকুবরের আচরণের তফাত এইটুকু—কুবেরের সামান্য অনুচর হিসাবে বসুন্ধর অন্যায় ধরা পড়ার পরেই অপরাধ-সচেতন, সেখানে অপরপক্ষে যক্ষরাজপুত্র নলকূবর নিজ অন্যায়ের সমর্থনে রাজকীয় ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী অন্নদার কাছে। বৃদ্ধের সামনে কামাতুর নলকূবরের মদোন্মত্ত উক্তি—নবযৌবনে সম্ভোগের পক্ষে লজ্জাহীন বচনের কুশ্রীতা—স্বতঃই পাঠকের বিরাগ আকর্ষণ করে। কবি সচেতনভাবে পাঠকমনে এই অনুভূতি সৃষ্টি করেছেন। সুস্থ ভোগের ঔচিত্যকে তিনি স্বীকার করেন, তাই বলে তার ইতর চেহারাকে সহ্য করতে প্রস্তুত নন।

এখানে স্মরণ করিয়ে দেব, নিজের মনোভাব প্রকাশে কবির যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল না বলে তাঁকে চিনে নিতে আমাদের কিছু অসুবিধা হয়। ভোগবিকৃতির বিরুদ্ধে কবির যথেষ্ট বিরাগ থাকলেও তাকেই গাঢ়রক্তিম করতে বাধ্য ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় বসে। আবার তারই ফাঁকে যেখানে সুযোগ পেয়েছেন (কিংবা কৌশলে সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়েছেন), সেখানেই কামক্লেদের উপরে ঘৃণার থুতু ছিটিয়েছেন। বাইরে কবি কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের স্তুতি করতে বাধ্য ছিলেন, কিন্তু এই ভবানন্দ যখন পূর্বজন্মে নলকূবর, তখন তার বেশরম আচরণের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য বিদ্বেষ।

নলকূবর ধনমত্ত ও কামমত্ত—একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ, কবির চোখে। সে যখন 'ধনমত্ত অতি লইয়ে যুবতী' 'কামবিহার' করে, তখন দেবীর সখী জয়া বলেছিলেন, তার কাছে নারীবেশে দেবীর যাওয়া উচিত কাজ হবে না কারণ 'লজ্জা দেয় পাছে শেষে।' সুতরাং দেবী বৃদ্ধ

ব্রাহ্মণের সাজে তার কেলিকুঞ্জে হাজির হয়ে বললেন, ছি! এসব কি করছ, এখন অন্নদাপূজার সময়, তা না করে যুবতীবিহার নিয়ে আছ?—

এমন শুনিয়া হাসিয়া ঢলিয়া
ঘূর্ণিত রক্ত-লোচনে।
মাথা হেলাইয়া অঙ্গ দোলাইয়া
জড়িমযুক্ত বচনে॥
অতিমত্ত মদে না গণে আপদে
কহে কুবেরের বেটা।
এ নব বয়সে ছাড়িয়া এ রসে
কার পূজা করে কেটা॥
এ সুখ-যামিনী এ নব কামিনী
এ আমি নবযুবক।
এ রস ছাড়িয়া পূজায় বসিয়া
ধ্যানে বব যেন বক॥
জানি অন্নদারে সে জানে আমারে
কি হবে পূজিলে তারে।
অন্নদা যেমন কতেক তেমন
আছয়ে মোর ভাণ্ডারে॥
শঙ্কর ভিখারী সে ত তারি নারী
আমি মর্ম জানি তার।
বাপার ভাণ্ডারে অন্ন চাহিবারে
দিন আসে তিনবার॥

স্থূল আত্মহীন ভোগের বিরুদ্ধে কবির বিরাগপূর্ণ মনোভাবের চূড়ান্ত একটি প্রমাণ আছে, যদিও তা খণ্ডিত। মৃত্যুর কিছু আগে কবি সংস্কৃত-বাংলা-হিন্দী মেশানো ভাষায় 'চণ্ডীনাটক' লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। আমরা মাত্র কয়েক পৃষ্ঠাই পেয়েছি। তার মধ্য থেকে কবিত্বের পরিচয় যথেষ্ট পাই না, কিন্তু কবির পরিণত ধর্মবিশ্বাস ও দার্শনিক ভাবনার বিষয়ে অনুমান করবার মতো উপাদান

পেয়ে যাই। ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায়, আখ্যানমূলক কিছু লেখবার কালে কবি শক্তিদেবীকেই অবলম্বন করেন; পূর্বে অন্নদা, এখানে চণ্ডী। এখানে আমরা উক্ত খণ্ডিত রচনার মধ্যে কবির ভোগ-দর্শনকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করব।

যেটুকু পেয়েছি তার মধ্যে প্রজার প্রতি মহিষাসুরের সদম্ভ উক্তিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। মহিষাসুর যেরকম উচ্চ ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে কাম-কাঞ্চন ক্ষুধাকে সমর্থন করেছে, তাতে মনে হয়, কবি এই নাটকে আদর্শসংঘাতকে আরও তীক্ষ্ণ ও সচেতনভাবে হাজির করতে চেয়েছিলেন। আমরা এটাই দেখতে পাই, ইন্দ্রিয়ক্ষুধা সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের কবিমনের দ্বন্দ্ব ঘুচবার নয়। এই ক্ষুধা যখন সুন্দর আকার, তখন কবির অন্নদা তার উপরে স্নেহবর্ষণ করেন, আবার যখন ভয়াল উগ্র, তখন কবির চণ্ডী তাকে সংহার করেন। এখানে ভোগবাদী দর্শনের খণ্ডন যে কবির অভিপ্রায় তা সহজেই বোঝা যায়—চণ্ডী-মহিষাসুর কাহিনীর নির্বাচন থেকে। চণ্ডী মহিষাসুরমর্দিনী। কিন্তু সেইসঙ্গে মহিষাসুরের, অর্থাৎ ভোগলালসা-প্রতীকের, প্রচণ্ড শক্তির কথাও মনে রাখতে হবে—স্বয়ং মহাদেবীই মাত্র মহিষাসুরের নিধনে সমর্থ। চণ্ডী নাটক ভারতচন্দ্রের শেষ রচনা—সুতরাং তার অন্তর্নিহিত সমস্যা নিয়েই কবির জীবন শেষ হয়েছিল। ধরে নিতে পারি, সমাধানের শান্তির চেয়ে সংঘাতের যন্ত্রণা কবির মনকে কম অধিকার করে ছিল না।[৪]

প্রজার প্রতি মহিষাসুরের উক্তি এই প্রকার :

শোন্ রে গোঁয়ার্ লোগ্, ছোড়্ দে উপাস্ রোগ্,
মানহুঁ আনন্দ ভোগ্, ভৈঁষরাজ্ যোগ্ মে।
আগ্ মে লাগাও ঘীউ কাহে কো জ্বালাও জীউ,
এক রোজ প্যার পিউ, ভোগ্ এহি লোগ্ মে॥

৪। ডাঃ মদনমোহন গোস্বামী বলেছেন, 'অসম্পূর্ণ চণ্ডী নাটকে চার্বাক দর্শনের উপাদান দেখা যায়।' এর দ্বারা মনে হয় তিনি বলতে চেয়েছেন—মহিষাসুরের উক্তিতে চার্বাকদর্শনের উপাদান আছে। আমরা উপরে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি—চার্বাকদর্শনের মূঢ়তাকে আঘাত করাই ছিল কবির অভিপ্রায়।

আপ্‌কো লাগাও ভোগ, কাম্‌কো জাগাও যোগ,
ছোড়্‌ দেও যোগ ভোগ, মোক্ষ এহি লোগ্‌ মে।
ক্যা এগান্‌, ক্যা বেগান্‌, অর্থ নার আব জান্‌,
এহি ধ্যান, এহি জ্ঞান, আর সর্ব রোগ্‌ মে॥

গোস্বামী কৃত অনুবাদ:

শোন্‌ রে গেঁায়ার লোক, ছেড়ে দে উপাস রোগ,
মান্‌ রে আনন্দ ভোগ, মহিষরাজ-যোগেতে।
আগুনেতে ঘৃত ঢালো, [নচেৎ] কিবা লাগি প্রাণ জ্বালো ?
দুদিনের বাস ভাল [যদি] ভোগ এই লোকেতে॥
নিজের লাগাও ভোগ, কামের লাগাও যোগ,
ছেড়ে দাও যাগ-যোগ মোক্ষ এই লোকেতে।
এদিক ওদিক কেন, নারী অর্থ এই জানো
এই ধ্যান, এই জ্ঞান, আর সর্ব রোগেতে॥

॥ ২ ॥

জীবনের দ্বিতীয় অধিকার, ভারতচন্দ্রের মতে, অর্থাধিকার। সত্যই দ্বিতীয় ? কবির কাছে কোন্‌ চিন্তাটি অধিক চমৎকারা—কামচিন্তা না অন্নচিন্তা—সে নিয়ে সম্পূর্ণ মীমাংসা করা সম্ভবপর নয়। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় বসে হয়ত কামচিন্তাকেই তাঁকে প্রাধান্য দিতে হয়েছে, কিন্তু কবির যে-ব্যক্তিজীবনের কথা আমরা জানি, তাতে অর্থচিন্তার তীব্রতা কম ছিল অনুমান করতে ইচ্ছা হয় না। 'পুরস্কার' কবিতার কবির মতো অতখানি ভাববিহ্বলতার সৌভাগ্য তাঁর হয় নি যে, 'মাথার উপরে বাড়ি পড়ো পড়ো' তার খোঁজ রাখছেন না, কিংবা রাজকণ্ঠের মালাটি পেয়েই সব ভুলে নাচতে-নাচতে বাড়ি ফিরছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে গোপাল ভাঁড়ের গা ঘেঁষে বসে তাঁকে রসালো তোষামুদি করতে হয়েছে, কাব্যেও তাই। 'চন্দ্র সবে ষোলকলা হ্রাসবৃদ্ধি তায়, কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়' ইত্যাদি অংশ রচনা করবার সময়ে নিশ্চয় তিনি মনে মনে বলেছিলেন—তোফা মিথ্যা ! (যেমন, ভবানন্দ মজুমদারের

ঘরভেদী চেহারার উপরে রঙিন তুলি বুলোতে-বুলোতে, নির্ঘাত ভেবেছিলেন, এই কাজ করতে যে বিরক্তি আসছে, তা আসা উচিত নয়, এ দেশাত্মবোধের আইডিয়া তো পরবর্তীকালে ইংরেজের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আসবে, আমার মধ্যে তো থাকার কথা নয়॥)—তার গ্লানি কাঁটার মতো তাঁর মনে বিঁধে থেকেছিল, তা বোঝা যায়, রাজদ্বারীর তীব্র আক্ষেপ থেকে। ভারতচন্দ্র তাঁর অতুলনীয় ভাষা তাকে ধার দিয়েছেন। তার ফলে দ্বারীর মুখে চাকুরীজীবী সম্প্রদায়ের কর্মগ্লানির নিত্যকাব্য হয়ে উঠেছে এই কথাগুলি :

ঠক-ভরা দরবার ছলে লয় ঘর-দ্বার
ক্ষুরধার ছুঁতে কাটে মাছি।
চাকুরির মুখে ছাই ছাড়িতে না পারি ভাই
বিষকৃমিসম হয়ে আছি॥

দাসু-বাসুও চাকরিজীবনের দুঃখের কথা বলেছে, কিন্তু গ্লানির কথা তারা বলতে পারে নি, যা ফুটেছে এই রাজদ্বারীর মুখে, যার জন্য আমাদের মনে জীবনের অধিকারবোধ, মূল্যবোধ ইত্যাদির জটিল সমস্যাটির ছায়াপাত হয়।[৫]

৫। এমনকি রাজার কোটাল পর্যন্ত চাকরির গ্লানির কথা বলেছে। রাজা কোটালকে যাচ্ছেতাই করেছিলেন—নিজ কন্যার ধর্ম চুরি যাওয়ায়। কোটাল পুলিশকর্তা হিসাবে এতদিন দিব্যি চোরের প্রভু হয়ে ভোগে-সুখে ছিল, এখন ঝঞ্ঝাটে পড়ে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল :

ধরিতে নারিয়া চোরে আমি হৈনু চোর।
রাজার হুজুরে যাওয়া সাধ্য নহে মোর॥
যে মারি খেয়েছি আমি চোরের অধিক।
এ ছার চাকরি করি ধিক্ ধিক্ ধিক্॥

চাকরির ঝকমারির বিষয়ে কোটালের আক্ষেপের সাক্ষাৎ কারণ আমরা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু বোধহয়, আরও একটি আচ্ছন্ন কারণ আছে—দাস যত সুখেই থাক, দাসত্বের গ্লানি এড়াতে পারে না। প্রত্যেক জীবের মধ্যে একজন আছেনই, যিনি কখনো ঘুমোন না—বিবেকানন্দ বলতেন। তাহলে কোটালের

জীবনের অর্থের মহামূল্যের কথা রীতিমতো সিনিক ভঙ্গীতে মালিনী বলেছে :

কড়ি ফট্‌কা চিঁড়া দই বন্ধু নাই কড়ি বই
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।
কড়িতে বুড়ার বিয়া কড়ি লোভে মরে গিয়া
কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে ॥[৬]

দারিদ্র্যদুঃখের কথা অন্য মঙ্গলকাব্যে কম নেই, বরং ভারতচন্দ্রের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে আছে, প্রচুর হাউ-হাউ কান্না—ভারতচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে, তিনি কেবল পেটে কলম ছুঁইয়ে লেখেন নি, মস্তিষ্কের কিছু অংশ ঐ লেখার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। তার ফলে তাঁর দুঃখকথা পড়ে আমরা কেবল ব্যথিত হই না, চিন্তিতও হই। তাঁর একটি অসাধারণ রচনাখণ্ড আছে, অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা, সেটি সমালোচকদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে—তার কয়েকটি ছত্রের মধ্যে, কী গভীর বেদনাকাব্য তিনি রচনা করতে পেরেছিলেন! বড়গাছির পদ্মিনীর সেই চিত্র। বড়গাছিতে সখী জয়ার সঙ্গে অবতরণ করে দেবী অন্নদা হাসতে-হাসতে সর্বাপেক্ষা দুঃখীর সন্ধান করে

মধ্যেও 'তিনি' আছেন, এবং তিনি মাঝে-মাঝে অনিদ্রাজনিত অস্বস্তি প্রকাশ করেন। কোটাল হয়ত উপরের অংশ 'তাঁরই' কিছু বক্তব্য নিজের ভাষায় বলে ফেলেছে!

৬। মালিনীর কথার প্রমাণ অন্নদামঙ্গলে আছে। বাহাত্তুরে কায়েত হরিহোড় ঘুঁটে কুড়িয়ে সংসার চালাত। দেবীর কৃপায় তার গোবর-ঘুঁটে সোনার ঘুঁটে হয়ে গেল। তার ফল :

কুলীন মৌলিক যত কায়স্থ আছিল।
নানামতে ধন দিয়া সবারে তুষিল ॥
ঘটক পাইয়া ধন পাইল ঠাকুর।
বাহাত্তরে গালি ছিল তাহা গেল দূর ॥
ঘোষ বসু মিত্র মুখ্যকুলীনের কন্যা।
বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা ॥

ফিরছেন—তার দুঃখমোচনের লীলাপ্রকাশ করবেন। সন্ধান পেলেন, পদ্মিনী সেই সর্বাধিক দুঃখী মানুষ। কবি ব্যঙ্গমুখে নারীটিকে এঁকেছেন, কিন্তু তেমন ব্যুমেরাং ব্যঙ্গ অল্পই সম্ভবপর; রক্তবমনে আরক্ত কবিহাসি উক্ত পদ্মিনী এইরূপ :

হেনকালে এক রামা স্নান করি যায়।
তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে যায়॥
লতা বান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন।
ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন॥
অন্ন বিনা কলেবর অস্থিচর্মসার।
গেঁয়ো লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার॥
আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা একগাছি।
মুখগন্ধে পদ্মিনীর মুখে ওড়ে মাছি॥…

কটিতে বসন জোটে না, পদ্মপাতে লজ্জা নিবারণ করে—গ্রাম্য লোক তাই সরস বচনে পদ্মিনী নাম দিয়েছে। বুঝতে পারি, এই বীভৎস গ্রাম্য রসিকতার সামনে রসের ঝুনা ব্যবসায়ী ভারতচন্দ্র পর্যন্ত কতখানি সংকুচিত ছিলেন। তারপরে কবি স্তম্ভিত অশ্রুতে কঠিন দৃষ্টি মেলে প্রথমে দেখেছেন পদ্মিনীকে, তারপরে গ্রাম্য রসিককে, তারো পরে কটি থেকে বসন টেনে যারা সংকুচিত লজ্জার উপরে পরিহাসের লবণ প্রয়োগ করে সেই সুখী শোষক মনুষ্যসমাজকে, এবং তিনি নিবিড় ঘৃণায় অভিশাপ উচ্চারণ করেছেন :

অভিমানে সেই রামা ফিরেও না চায়।
মনুষ্য দেখিলে পথে বনে বনে যায়॥

মানুষ যে পরিহারযোগ্য প্রাণী—মানুষ সম্বন্ধে এর থেকে বড় ধিক্কার সম্ভব নয়।

অর্থের প্রাচুর্যের রূপকে আমরা বলি ঐশ্বর্য; বর্ণময় সংস্কৃতিজীবন যাপনের পক্ষে সেই ঐশ্বর্যের প্রয়োজন আছে ভারতচন্দ্র জানতেন, কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন—দেহপ্রাণ এক রাখার জন্য যেটুকু অর্থের প্রয়োজন, তাই নেই মানুষের। অন্ন—অন্নই জীবনের প্রধান

সমস্যা—এই কথার স্বীকৃতিতেই বোধহয় ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন।

অন্নদামঙ্গলে অন্নসমস্যাকে কবি দেবলোকেও চালান দিয়েছিলেন। শিবস্থান কৈলাসে 'জরা মৃত্যু নাই, অপরূপ ঠাঁই, কেবল সুখের মূল।' কবির সহানুভূতিশীল শিব কিন্তু সুখী দেবলীলা ছেড়ে 'নরলীলা'র অনুরূপ লীলা করতে ইচ্ছুক হলেন। নরলীলা মানে বাঙালি গার্হস্থ্য-লীলা। শিবের এই শুভবাসনায় কবি খুবই সুবিধা পেয়ে গেলেন। কবি বাঙালি-জীবনের দুঃখকথা বলতে চান—শিবের উপরে তাহলে সেই দুঃখ চাপিয়ে দেওয়া যাক্। দুঃখের ভূষণেই তিনি হরগৌরীকে সাজাবেন—শিবকে করবেন দিগম্বর নীলকণ্ঠ।

সুতরাং শিবের শ্মশানঘরে বাঙালির গৃহস্থালি আমরা দেখি, সেখানে বেদনা অশ্রু বঞ্চনা ও অনশনের অবাধ বিস্তার। এই ছবি আঁকবার সময়ে কবি হয়ত এই সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করেছেন—দেবতার দুঃখ তো সত্য দুঃখ নয়, তাঁদের কষ্টের কথা বলে আমার মনের ভার নামানও হল, আবার একটু প্রতিশোধও নিতে পারলাম তাঁদের উপরে, যাঁরা আমাদের দুঃখ সৃষ্টি করেছেন নিজেদের লীলাসুখের জন্য।

দেবতা—এই শব্দের ব্যবধান ছাড়া আর কোনো ব্যবধান নেই শিবদেবতার সংসারের সঙ্গে বাঙালির সংসারের। শঙ্কর ভিখারী, ভিক্ষায় কিন্তু তাঁর পেট ভরে না, পেটের জ্বালায় ছটফট করতে-করতে সমাজ-সংসারকে তিনি বিষাক্ত দেখেন। বিষের জ্বালার চেয়ে বড় পেটের জ্বালা—নীলকণ্ঠ মহাদেব ক্ষুধাভগ্ন কণ্ঠে চীৎকার করেন:

শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করী।
ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি॥
নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
সাধ করে একদিন পেট ভরে খাই॥

সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ে গৃহিণীর উপরে:

বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী॥

সর্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়।
রসকথা কহিতে বিরস হয়ে যায় ॥...
আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা।
কত মতে স্বামীর সেবন করে তারা ॥

দেবীরও আর সহ্য হয় না। রাজার মেয়ে ভিখারীর ঘরে পড়েছেন। বুড়ো নিজে ছাই মাখেন, তাঁর ইচ্ছে ঐ বালাই ছাই তাঁর ধর্মপত্নীও যেন মাখেন। ভঁ ড়ারও ঐ ছাই-ভরা। স্বামীপুত্রের মুখে দুবেলা দুমুঠো জোগাতে প্রাণান্ত—রাঙা হাসিতে নিজের উপোষ ঢাকতে কত প্রবঞ্চনা করতে হয়—তাও যদি কেউ না বোঝে—দূর ছাই! চুলোয় যাক সংসার।—

শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল ॥ ··
সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি ॥
রসনা কেবল কথা সিন্ধুকের কুঁজি ॥
কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্নবস্ত্র দিয়া।
কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া ॥...
গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে।
গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে ॥...
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে ॥
শাঁখা শাড়ি সিন্দূর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি, আয়তি কেবল আচাভুয়া ॥

কলহের পরে বৃদ্ধ স্বামী দুপুরের রোদ মাথায় করে অশক্ত ক্ষুধাতুর দেহে ভিক্ষা করতে বেরিয়ে পড়লেন, অভিমানে কাঁদতে-কাঁদতে পথে চললেন, বলতে লাগলেন, বুড়া হয়েছি, চাষবাস বাণিজ্য জানি না, রোজগারের পথ ধরি নি, সবাই বলে 'নির্গুণ', আর সেই ছুতোয় ঠকায়, তবু ভিক্ষে করে জুটিয়েও তো আনি, কিন্তু তাতে হবে কি,

'যত আনি তত নাই, না ঘুচিল খাই-খাই', এমন সংসারে থেকে কি সুখ! সবচেয়ে বড় দুঃখ—শিব প্রাণের কথাটা বলেই ফেললেন :

'নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা।'

দেবী অন্নদাও অনুরূপ অভিমানে নাবালক পুত্রদের হাত ধরে বাপের বাড়ি চললেন।

পথিমধ্যে দেবীর সখী জয়া একটি পরামর্শ তাঁকে দিলেন, তাতে দেবী সহসা এমন আলোকলাভ করলেন, কহতব্য নয়। জয়া বললেন, এত যদি অন্নের অভাব, অন্নপূর্ণা-রূপ ধরলেই তো চুকে যায়! সত্যই তো! একথা তো তাঁর মনে আসে নি (আসবে কি করে, সহজ বুদ্ধিতে মাত্র মানুষের অধিকার, দেবতারা কি সহজ ব্যাপার!)। দেবী তৎ-ক্ষণাৎ সমস্ত পৃথিবীর অন্ন টেনে নিয়ে অন্নপূর্ণা মূর্তি ধরলেন। আহা অপূর্ব সে রূপ :—

মায়া কৈলা মহামায়া কহিতে কে পারে।
হরিলা যতেক অন্ন আছিল সংসারে॥
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি নারায়ণ।
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি পদ্মাসন॥
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি মৃত্যুঞ্জয়।
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি হরি হয়॥...

অন্নের পর্বত পরমান্ন-সরোবর।
ঘৃত মধু দুগ্ধ দধি সাগর সাগর॥
কে রান্ধে কে বাড়ে কেবা দেয় কেবা খায়।
কোলাহল গণ্ডগোল কহা নাহি যায়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কলরব এক ঠাঁই।
জয় জয় অন্নপূর্ণা বিনা শব্দ নাই॥

বাঙালির জীবনের সবচেয়ে বড় রূপকথা কবি রচনা করেছেন উপরের কয়েক ছত্রে।—হায়, সেদিন শিবের কাছে তা কিন্তু রূপকথার সৌন্দর্য হারিয়ে কেবল প্রতারণার মরীচিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্ন-পূর্ণা সমস্ত অন্ন টেনে নিয়েছেন, তার ফলে কোথাও অন্ন নেই, সুতরাং

শিবের জন্য ভিক্ষাও নেই কোথাও, এমনকি লক্ষ্মীও লক্ষ্মীছাড়া! ব্যর্থ ক্ষুধার্ত শিবের মর্মান্তিক আর্তনাদ :

হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়
হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া।
লক্ষ্মী বলে অন্ন নাই আর যাব কার ঠাঁই
ভুবনে ভাবিয়া নাহি পাই॥…
ঘরে অন্ন নাহি যার মরণ মঙ্গল তার
তার কেন বিলাসের সাধ।
যার নারী সুতাসুত সদা অন্নকষ্টযুত
সর্বদা তাহার অবসাদ॥

লক্ষ্মী শিবের অবস্থা দেখে ভাগ্যের নাটকীয় পরিহাস কাকে বলে হৃদয়ঙ্গম করলেন—'অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কাঁদে অন্নের তরে!' শিবকে তিনি ঘরে ফিরবার পরামর্শ দিলেন, শিব সেটা শুনলেন, কারণ সামান্য মানের বদলে যদি পেটপুরে ভালমন্দ জুটে যায়, সেটাই বরণীয়। চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়—সব রকম মিলে গেল অন্নপূর্ণার কৃপায়। বিবিধ শব্দ করে শিব উন্মত্তের মতো খেলেন—যেভাবে সাধারণ বাঙালি বড়লোকের বাড়িতে নেমন্তন্ন খায়। শিবের ভোজন আনন্দশিহরে কাঁপছে :

অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন।
অন্ন খান শিব সুখসম্পন্ন।
কারণ-অমৃত পূরিত করি।
রত্ন-পানপাত্র দিল ঈশ্বরী॥
সঘৃত পলান্নে পূরিয়া হাতা।
পরশেন হরে হরিষে মাতা॥
পঞ্চমুখে শিব খাবেন কত।
পূরেন উদর সাধের মত॥

শিব খাচ্ছেন—একেবারে সবাক চিত্র—

পায়স-পয়োধি সপ্‌সপিয়া।
পিষ্টক-পর্বত কচমচিয়া॥

চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া।
কচর মচর চর্ব্য চিবিয়া॥
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া।
চুমুকে চক্ চক্ পেয় পিয়া॥

খেয়ে-দেয়ে শিবের এত আনন্দ হল যে, তিনি নাচতে শুরু করলেন। পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে আমাদের এই পার্থক্য—সেখানে নৃত্যের পরে ভোজন, আমাদের ভোজনের পরে নৃত্য। সেখানে খিদে বাড়াতে নাচে; আমাদের খিদে পেয়েই আছে, সুতরাং একবার যদি খেতে পাই, অমনি স্ফূর্তিতে নাচ পায়ঃ

জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢুলিয়া॥
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে।
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ-তরঙ্গে॥···
নাচেন দেখিয়া শিব ঠাকুর।
হাসেন অন্নদা মৃদু মধুর॥

ক্ষুধাশান্তি হলে মানুষ ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। শিব সুতরাং কাশী স্থাপনের ইচ্ছা করলেন। কিন্তু এই মহাতীর্থে যারা আসবে, অনেকেই আসবে, তাদের অন্ন জোগাবেন কি করে? কাশীর সেই ভাবী অন্ন-সমস্যা নিবারণের উপায়, কাশীতে অন্নপূর্ণাকে বসানো। সুতরাং অন্ন-পূর্ণার পুরী নির্মিত হয়ে গেল। হল তো—দেবী বসবেন কি? শিব তখন ধর্মজগতের রাজনৈতিক সংগ্রাম আরম্ভ করলেন—অনশনে বস-লেন, এবং অন্য দেবগণ তাঁর সঙ্গে সহানুভূতির অনশন আরম্ভ করে দিলেন। না খেয়ে-দেয়ে সে বড় ভয়ানক তপস্যা। বলাবাহুল্য অন্ন-পূর্ণার দয়া হল, বিশেষতঃ যখন ব্যাপারটির সঙ্গে তাঁর অগ্নিসাক্ষীকরা স্বামী জড়িত। দেবী এলেন, বসলেন এবং সকলকে খাওয়ালেন। ভারতচন্দ্র আবার তাঁর রসাবিষ্ট কলম তুলে নিলেনঃ

এস এস বাছা সব সুখে অন্ন খাও।
শেষে মনোনীত বর দিব যাহা চাও॥

এত বলি অন্নদা সকলে দেন অন্ন।
অন্ন খান সবে সুখে আনন্দসম্পন্ন॥
বাম করে পানপাত্র রতননির্মিত।
কারণ-অমৃত-পরিপূর্ণ অতুলিত॥
সঘৃত পলান্নে পরিপূর্ণ রত্নহাতা।
ডানি করে ধরি অন্ন পরশেন মাতা॥
কোথায় রন্ধন কেহ দেখিতে না পান।
পরশেন কখন না হয় অনুমান॥
সকলে ভোজনকালে দেখেন এমনি।
আমারে দিছেন অন্ন অন্নদা-জননী॥

অন্নদামঙ্গলের এই স্বপ্ন! জীবনের বাস্তব দুঃখের উপরে এই স্বপ্নের আস্তরণ কবি বিছিয়ে দিতে চেয়েছেন। সবকিছু কিন্তু ঢাকা পড়ে নি। অন্নদামঙ্গলে অন্নহারাদের এত ভিড়! হরিহোড়ের দারিদ্র্যের অসুন্দর ছবিটা আমাদের স্বপ্ন কেড়ে নেয়। কবি আবার দেবীর রাঙাপদের স্বপ্ন দেখেন, যার স্পর্শে কাঠের সেঁউতি সোনার সেঁউতি হয়ে যায়। সোনার ছবিটি বাঙালির চোখের জলে ভাসতে থাকে, যার ফ্রেমে লেখা আছে—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'

এই অন্নসমস্যার প্রশ্নেই কবি একবার জীবনের গভীরতম অসঙ্গতিকে উন্মোচন করেছিলেন। অন্নদার সঙ্গে কলহের পরে শিব ভিক্ষায় বেরিয়েছেন—ওধারে অন্নপূর্ণা সমস্ত পৃথিবীর অন্ন হরণ করে নিয়েছেন। অন্যদিন শিব বড় আনন্দে ভিক্ষা করেন, সহজে ভিক্ষা পান, থলিভরা চাল, মনভরা স্ফূর্তি। চ্যাঙড়া ছোঁড়াগুলো কত রাগায় তাঁকে—তিনি কত সুখে তাদের সঙ্গে রঙ্গভঙ্গ করেন। কেউ বলে, ও-বুড়ো সাপ খেলাও, কেউ বলে, ও-বুড়ো জটা থেকে জল বার করো, কেউ বলে, কপালে আগুন জ্বালো দেখি—শিব মোটে রাগ করেন না, করবেন কেন, তিনি কি সর্পভূষণ, গঙ্গাধর, অনলললাট নন? আজ কিন্তু সব শূন্য, পেটে ওদন নেই, তাই তাঁর মুখে হাসিও নেই—তাঁর সামনে পড়ে আছে কদাকার নিশ্চেতন সৃষ্টিসংসার। অন্নহীন চিদানন্দ চীৎকার করে ওঠেন—

চেত রে চেত রে চিত, ডাকে চিদানন্দ।
চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ॥
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অচিতচিত্ত সেই সদা দুখী॥

ঐ কথাগুলি বলে শিব ভিক্ষা করতে লাগলেন! এত বড় পরিহাস ভারতচন্দ্র আর কখনো করেন নি। ঈশ্বরের উপর মানুষের সর্বোত্তম প্রতিশোধ। যিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, যাঁর ললাটে জ্বলছে তৃতীয় নয়ন—ক্ষুধায় তিনিও নিজেকে ভুলেছেন!—অবলুপ্ত সংবিতকে প্রাণপণে আকর্ষণ করে আনবার জন্য চীৎকার করে অন্নপানের উপরে চৈতন্যের জয়গান করেছেন!! এতখানি অসঙ্গতি জীবনের!!!

॥ ৩ ॥

কাম ও অর্থ, জীবনের এই দুই সমস্যার বিষয়ে ভারতচন্দ্রের মনোভাবের পরিচয় দিলাম তথ্যপ্রমাণসহ—তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ধর্মবিষয়ে তাঁর মনোভাবের তথ্যপরিচয় দেবার আগে কবির সুস্থ বলিষ্ঠ আদর্শপ্রীতির অন্য একটি দিক সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলে নেওয়া যায়। কবি তাঁর কাব্যে যথেষ্ট মর্ত্যপ্রীতি দেখিয়েছেন। বসুন্ধর ও নলকুবরের কথাপ্রসঙ্গে সে-বিষয়ে মূল কথাগুলি বলে এসেছি। সেখানে গাঢ় গরিমাপূর্ণ মর্ত্যবন্দনাও উদ্ধৃত করেছি। অন্যত্র আমরা দেখি, কবির মর্ত্যপ্রীতি বহুলাংশে গঙ্গাপ্রীতির রূপ নিয়েছে। গঙ্গার এবং গঙ্গাবাহিত স্থানের মাহাত্ম্যের কথা তিনি বহুবার বলেছেন; বিদ্যা স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে যাবার আগে সেই 'গঙ্গাহীন দেশ' সম্বন্ধে যথেষ্টই আতঙ্ক প্রকাশ করেছিল।[৭] এই গঙ্গাতীরবর্তী নবদ্বীপ সম্বন্ধে অতি সুন্দর একটি কাব্যছত্র তিনি রচনা করেছেন—'ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ।'

৭। বিদ্যা বলেছিল:

গঙ্গাহীন সে কি দেশ, এদেশ গঙ্গাতীর।
সে দেশের সুধাসম এদেশের নীর॥

ভারতচন্দ্র আধুনিক অর্থে দেশপ্রেমিক ছিলেন এমন বলার কোনো ইচ্ছা নেই, এবং তা না থেকে তিনি মহাপাতকগ্রস্ত এমনও মনে করি না। তাই বলে তাঁর কালে ভারতবর্ষ নামে কোনো দেশ ছিল না, এমনও সত্য নয়। এই বহু ভ্রাম্যমাণ কবি ভারতের নানাস্থানে ঘুরেছেন, এবং নিজের বহুপ্রকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে পরিচিত মঙ্গলকাব্যিক তীর্থ-বর্ণনার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন—তার দ্বারা দেখা গেছে, রাজনৈতিক-ভাবে না হলেও ধর্মীয় অর্থে একটি অখণ্ড চেতনাসম্পন্ন দেশ ছিল, তার নাম ঐ—ভা-র-ত-ব-র্ষ।

এইখানে আরও লক্ষ্য করতে পারি—ভারতচন্দ্রের হাতে একটি বৃহৎ বীরত্বের কি শোচনীয় অপমৃত্যু ঘটেছে! প্রতাপাদিত্য-কাহিনীর ঐতিহাসিকতা নিয়ে অনেক কোলাহলপূর্ণ আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে প্রবেশের প্রয়োজন নেই। ভারতচন্দ্র কিভাবে প্রতাপাদিত্যকে দেখিয়েছেন, সেটাই বিবেচনার জিনিস। প্রতাপাদিত্যের প্রারম্ভিক যে-বর্ণনা তিনি করেছেন, তাতে একটি মহাকায় পৌরুষের মূর্তি আমরা দেখতে পেয়েছি, যিনি অবশ্য সর্বথা ন্যায়বদ্ধ নন:

যশোর-নগর ধাম প্রতাপ-আদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাথী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥
তাঁর খুড়া মহাকায় আছিল বসন্তরায়
রাজা তারে সবংশে কাটিল।
তার বেটা কচুরায় রাণী বাঁচাইল তায়
জাহাঙ্গীরে সেই বাঁচাইল।

জাহাঙ্গীর প্রতাপাদিত্যকে ঠাণ্ডা করবার জন্য মানসিংহকে পাঠা-

লেন, বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি বাংলায় এলেন, ভবানন্দ মজুমদার বহিরাগত সেনাপতিকে বাংলার সমস্ত সমাচার জানালেন (তার দ্বারা পারিবারিক ঐতিহ্য তৈরী করলেন), তারপর মানসিংহ যশোরে উপস্থিত হয়ে প্রতাপাদিত্যের কাছে হয়-যুদ্ধ-নয়-বশ্যতা—এই হুমকি দিয়ে বেড়ী ও তলোয়ার পাঠালেন—যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করো। তখন প্রতাপাদিত্য, ভারতচন্দ্রের বর্ণনায়, যে-কাজ করেছিলেন, তা শ্রেষ্ঠ বীর-ঐতিহ্যের অনুযায়ী ব্যাপার।

[মানসিংহ] শিষ্টাচার-মত আগে দিলা সমাচার।
পাঠাইয়া ফরমান বেড়ী তলবার॥
প্রতাপ-আদিত্য রাজা তলবার লয়ে।
বেড়ী ফিরা পাঠাইয়া পাঠাইল কয়ে॥
কহ গিয়া অরে চর মানসিংহ রায়ে।
বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে॥
লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে।
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে॥

এত প্রচণ্ড বীরত্বের ভাষা ইতিমধ্যে বাংলাসাহিত্যে শোনা গেছে কিনা সন্দেহ! এবং ভারতচন্দ্র যথার্থ শক্তির সঙ্গে অতঃপর প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মানসিংহের যুদ্ধবর্ণনা করেছেন। শব্দধ্বনিতে তিনি কেবল রণধ্বনি এনেছেন তাই নয়—যোদ্ধার জীবনদর্শনও ফুটিয়েছেন আশ্চর্য গভীর দৃষ্টিতে। যথার্থ যে সংগ্রামী সে একই সঙ্গে জীবনপ্রেমিক এবং জীবনবৈরাগী। জীবনকে ভালবেসে সে সংগ্রামে নামে, মৃত্যুকে ভালবেসে সে সংগ্রাম করে যায়।—

যুদ্ধে প্রতাপ-আদিত্য।
ভাবিয়া অসার ডাকে মার মার
সংসার সব অনিত্য॥[৮]

৮। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় এখানে কিছু অকারণ নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে, "যুদ্ধের বর্ণনা কয়েকটি মামুলি ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বারাই নিষ্পন্ন, অর্থাৎ সশব্দ

এই প্রতাপ-আদিত্যের পরিণতি কি ? পরাজয়। তারপর শৃঙ্খল-বন্ধন ; তারপর মৃত্যু, তারপর তাঁর ঘৃত ভর্জিত দেহ জাহাঙ্গীরকে উপহারদান, তারপর যমুনায় বিসর্জন। হোক—কিন্তু ঐ সব বর্ণনায় কবির কি কার্পণ্য ! সামান্য কয়েকটি ছত্র মাত্র—তারি মধ্যে উদাসীন অবজ্ঞায় প্রতাপাদিত্যের চিরসমাধি।

এমন ঘটল কেন ? দেশীয় বীরকে অবলম্বন করে যে দেশাত্মবোধের জাগরণ হয়, তার উদ্ভব তখন হয় নি বলে ? সম্পূর্ণ সত্য নয়। ভারতচন্দ্র যেভাবে প্রতাপাদিত্যের প্রারম্ভিক বর্ণনা করেছেন, যুদ্ধ বিবরণ, দিয়েছেন, তাতে মনে হয় তিনি সচেতনভাবেই তাঁকে এঁকেছেন। তাহলে পরিণতি চিত্রণে তাঁর অত অবহেলা কেন ? প্রথম উত্তর কবি নিশ্চয় ক্রমে বুঝেছিলেন, যে-জগতে তিনি বাস করছেন সেখানে মানসিংহের সাহায্যকারী ভবানন্দ এবং ইংরেজের সাহায্যকারী কৃষ্ণচন্দ্রেরই জয়, প্রতাপ-আদিত্যের বন্দনায় আর অগ্রসর হওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ তাঁর কাব্যের ধর্মীয় বিষয়বস্তুর প্রয়োজনেও প্রতাপাদিত্যের নিঃশেষ পরাজয় ঘটাতে হবে। এবং যদি আমরা কবির মধ্যে দেশাত্মবোধের অস্ফুট চেতনা কল্পনা করিও তবু নিশ্চয় তা ধর্মীয় ধারণাকে অভিভূত করবার মতো শক্তিশালী ছিল না। অন্নদা যখন প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধে বিমুখী, তখন তাঁকে হারতেই হবে, এবং ভক্ত-কবি দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়েও ভক্তিভরে তাকে সামলে নেবেন।

পদধ্বনির দ্বারা কবি রণতাণ্ডব প্রকাশ করিয়াছেন। যুদ্ধবর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, যুদ্ধটা মানুষে-মানুষে হইতেছে না, হইতেছে শব্দে-শব্দে। সকল মঙ্গলকাব্যেই তাই।"

ভারতচন্দ্রের যুদ্ধবর্ণনা প্রথম শ্রেণীর অবশ্যই নয়। এবং বাঙালিরা, বিশেষতঃ বাঙালি কবিরা, যুদ্ধব্যাপারকে যথাযথভাবে ফোটানোর প্রয়োজনও বোধ করেন নি, কারণ তাঁরা জানতেন, ভক্তি এবং ভালবাসা—এই দুই হল কাব্যের উপজীব্য—সেইসঙ্গে কিছু পেটের কষ্টকথা। এসব সত্ত্বেও, ভারতচন্দ্র যুদ্ধের প্রাণচ্ছন্দ ধরবার চেষ্টা করেছিলেন, সেটা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

॥ ৪ ॥

ভারতচন্দ্রকে সুস্থ আদর্শবাদী মনে করবার পক্ষে প্রধান বাধা ধর্ম-সম্পর্কে তাঁর বিকৃত মনোভাব—সমালোচকগণের রচনা পড়ে তাই মনে হয়। তাঁদের সিদ্ধান্ত কার্যতঃ এইখানে গিয়ে পৌঁছেছে—ভারতবর্ষে ধর্ম থাকতে পারে, কিন্তু ভারতচন্দ্রে ধর্ম নেই।[৯] কথাটা সত্য কি-না যাচাই করা দরকার, বিশেষতঃ যখন একথা প্রায় শোনা যায়, ভারতচন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ অমঙ্গলকাব্যের কবি।

ভারতচন্দ্রের ধর্মবোধের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সংশয়ের মূলে কি আছে তা আমরা জানি। সমালোচকেরা এ কাব্য পড়ে যথেষ্ট ধর্মপ্রেরণা লাভ করেন না, যা তাঁরা নাকি সত্যই পেয়ে যান অন্য মঙ্গলকাব্যগুলি থেকে! সত্যই পান তো! যদি পান, তাহলে আমাদের বলতে হবে, এইসব ব্যক্তিদের কাছে ধর্মের অর্থ কতকগুলি প্রচলিত আচারের উপর আবেগ-গদ্‌গদ অচল বিশ্বাস। এবং এঁরা ভুলে যান—সময় বদলালে সমাজের আর-পাঁচটা জিনিস সম্বন্ধে ধারণাবদলের সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধেও ধারণা বদলাতে পারে। ধর্ম যদি সত্যই জীবনের পক্ষে বাস্তব সত্যবস্তু হয়, তাহলে পরিবর্তিত মানুষ পরিবর্তিত আকারেই তাকে আপেক্ষিক জগতে গ্রহণ করতে চাইবে। বিদ্যাসুন্দর কাব্য, অন্নদামঙ্গল ত্রয়ী-কাব্যের অন্যতম হওয়াও কবির ধর্ম সম্বন্ধে সমালোকদের সংশয়ের হেতু। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধায়োজনের মধ্যে গীতা প্রবেশ করিয়ে দেওয়াকে অনেকে যেমন ধর্মের অনুচিত সাম্রাজ্যবাদ মনে করেন, তেমনি অন্নদা-মঙ্গলেও বিদ্যাসুন্দর নামক কামগীতার অহেতুক অনুপ্রবেশ অত্যন্ত

৯। যথা, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর' প্রবন্ধে (১২৯৬)—
"রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত বিদ্যাসুন্দরের মতো আদি-রসের কাব্য। তাহাতে চঞ্চলচিত্ততা আছে, রূপতৃষ্ণা আছে, হীরা মালিনী আছে, গুপ্ত প্রণয় আছে,···সুড়ঙ্গ, সখী, চোর, কোটাল, কিছুই বাদ যায় নাই; যদি কিছু বাদ গিয়া থাকে তো তাহা ভারতচন্দ্রেও বাদ গিয়াছে—তাহা ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা।"

অসঙ্গত।[১০] ভারতচন্দ্র উপেক্ষার হাসি হেসে বলতে পারেন, মঙ্গল-কাব্যে যদি গর্ভিণী নারীর ভোজনাদি ও আচার-সংস্কারাদির উপরে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যয় করা যেতে পারে, তাহলে পূর্ববর্তী অবস্থাটার বিষয়ে কিছু রসোজ্জ্বল পৃষ্ঠাব্যয়ে এত আপত্তি!

শিবের এবং ব্যাসের চরিত্রের বিকৃতিও কবির বিরুদ্ধে আপত্তির অন্যতম কারণ।

শেষোক্ত বিষয়টির মীমাংসা করব, তার আগে খুবই স্পষ্ট ও দৃঢ়-ভাবে বলতে চাই, ভারতচন্দ্র ধর্ম-বিষয়ে উদাসীন—এর থেকে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে না। উল্টোদিকে একথা বলা চলে, ধর্মসম্বন্ধে তাঁর তুল্য সচেতনতা অন্য কোনো মঙ্গলকবি ব্যক্তিজীবনে দেখান নি। বলা বাহুল্য প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতেই আমাদের এই সিদ্ধান্ত।

ভারতচন্দ্রের ধর্ম—জিজ্ঞাসার, সন্ধানের, পরীক্ষার—কেবল উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত বিশ্বাসের নয়। পারিবারিক ও সামাজিক ধর্মবোধ তাঁর ছিলই, কিন্তু যতদূর মনে হয়, প্রথম যৌবনে ফার্সী শিক্ষা করে তিনি ধর্মসম্বন্ধে নূতনভাবে ভাবতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর নবভাবনার অস্পষ্ট ছায়াপাত ঘটেছে সত্যপীরের পাঁচালীর মধ্যে। তারপরে জীব-নের দুর্বিপাকে কবির সন্ন্যাসজীবন। এই সন্ন্যাসজীবনের ব্যাপ্তি বেশ কয়েক বৎসর। এইকালে তিনি অব্যাহতভাবে ধর্মচর্চা করেছেন ধরে নিতে পারি। আগে প্রায় কুড়ি বছর পড়াশোনা করেছেন—এখনো করেছেন, তবে নিশ্চয় প্রধানতঃ ধর্মবিষয়ে এবং তাঁর প্রভূত অভিজ্ঞতা ঘটেছে। নানা সম্প্রদায়ের মানুষকে তিনি দেখেছেন—যাঁরা কেবল বাঙালি নন। সর্ব প্রদেশের অধিবাসীই পুরীতে ছিলেন। নানা দেশে তিনি বেড়িয়েছেনও। সন্ন্যাস ত্যাগ করার পরে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয়ে যখন আছেন, তখন বিদেশীদেরও কিছু পরিমাণে দেখতে বা চিনতে পারেন। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাতেও বহু-কিছু দেখেছেন।

১০। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় খুবই সরস ভাষায় লিখেছেন:

"আমি বিদ্যাসুন্দরকে অন্নদামঙ্গলের গর্ভকাব্য বলিয়াছি। বিদ্যার গর্ভসঞ্চার ছাড়া এই কাব্যে বাস্তবনিষ্ঠ কোনো কথা নাই।" ['প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য]

এইসব তথ্য মনে রাখলে আমরা স্বতঃই বুঝতে পারব—ভারত-চন্দ্রের মতো মানুষ কখনো পুরাতন মঙ্গলকাব্যের গ্রাম্যকবিদের মতো খুঁটিবাঁধা অবস্থায় অতীতের রোমন্থন করে যেতে পারেন না।

ধর্ম বা ধর্মজীবন সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের ধারণা যে গতিশীল ছিল তার অখণ্ড প্রমাণ—তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণ ও সন্ন্যাসত্যাগ। খুব তিক্ত সমালোচনা করতে হলে বলতে হবে—ভারতচন্দ্র ভঙ্গব্রত মানুষ। এ ধরনের মানুষ কখনো শ্রদ্ধা পান না যদি-না তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন—তাঁর ব্রতভঙ্গ আসলে নূতন বোধের তাগিদে।

ভারতচন্দ্রের কাব্য থেকে আমরা যে-সাক্ষ্য পাই তাতে দেখা যায়, ভারতচন্দ্র অসংসার বৈরাগ্যে আস্থা হারিয়েছিলেন। অন্ততঃ তাঁর কাছে সন্ন্যাসজীবন বরণীয় আদর্শ নয়। ভারতচন্দ্রের মানসিক বিরূপতা ফুটেছে, আমরা অনুমান করি, সুন্দর ও বিদ্যার সন্ন্যাস-খেলা থেকে। রাজসভায় সন্ন্যাসীবেশে গিয়ে সুন্দর নানা ছলাকলায় কথা বলেছিল। বিদ্যার সঙ্গে বিচারে সে প্রবৃত্ত হতে চায়ঃ

বিচারে তাহার ঠাঁই আমি যদি হারি।
ছাড়িয়া সন্ন্যাসধর্ম দাস হব তারি॥

আর যদি বিদ্যা হারে—নবীন সন্ন্যাসীর রক্তিম সুখকল্পনাঃ

ধরাইব জটা ভস্ম, পরাইব ছালা।
গলায় রুদ্রাক্ষ, হাতে স্ফটিকের মাল॥
তীর্থব্রতে লয়ে যাব দেশ দেশান্তরে।
এমন প্রতিজ্ঞা যেন নারী নাহি করে॥

ভারতচন্দ্র সন্ন্যাস-সম্বন্ধে প্রচলিত সংস্কার ও শ্রদ্ধার মনোভাব সম্পূর্ণ ছেড়েছিলেন, তা বোঝা যায়, তাঁর এই কালের উক্তি থেকেঃ 'সন্ন্যাসীর রজনীতে বিদ্যা লয়ে রঙ্গ, দিবসে রাজার কাছে বিদ্যার প্রসঙ্গ।'

সুন্দরই যে সন্ন্যাসী সেজে রাজসভায় যাতায়াত করত একথা বিদ্যা জানত না। কাব্যের একেবারে শেষে যখন বিদ্যাসঙ্গে সুন্দর স্বদেশ গমনের উদ্যোগ করছে, তখন সে বিদ্যার কাছে রহস্য ভেঙেছিল এবং বিদ্যা ধরে পড়েছিল—তাকে সন্ন্যাসী-বেশ দেখাতে হবে। সুন্দর যখন

সন্ন্যাসীবেশ ধরল তখন বিদ্যারও সে রূপ ধরতে ইচ্ছা হল। সে রূপ অবশ্যই দারুণ মনোহারিণী হল, যার পরিণতি অবশ্যই বৈরাগ্যে নয় :

হাসিয়া ধরিল বিদ্যা সন্ন্যাসিনীবেশ।
জটাজুট বনাইলা বিনাইয়া কেশ॥···
ছি বলিয়া ছাই হেন চন্দন ফেলিয়া।
সোনা অঙ্গে ছাই মাখে হাসিয়া হাসিয়া॥ ··
বসিলেন সন্ন্যাসিনী সন্ন্যাসীর বামে।
দেখিয়া সে সাজ লাজ হয় রতি-কামে॥
হর-গৌরী বলি ভ্রম হয় পঞ্চবাণে।
ফুলধনু টান দিয়া ফুলবাণ হানে॥
মাতিল মদনে মহাযোগী মহাভাগ।
কব কত যত মত হৈল কামযাগ॥

নিতান্ত রোমান্টিক ব্যাপার নিঃসন্দেহে। কবিরা সব সময়েই বৈরাগ্যের খোলস ধরে টান দেন—ভারতচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ সবাই। 'তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী'—রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—এই কাজে তিনি ভারতচন্দ্রকে অগ্রে রেখেছেন। এই একটি ক্ষেত্রে সমাজসৌধের নিচে সুড়ঙ্গ-খননকারী দুষ্ট লোকটির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মানসিক বিরূপতা কিছু কম ছিল বোঝা যায়, যখন দেখি, তিনিও ভারতচন্দ্রের সুরেই গান ধরেছেন—'আমি হব না তাপস হব না হব না না পেলে তপস্বিনী!'

সন্ন্যাস-খেলা দেখাবার সময়ে ভারতচন্দ্র কিন্তু এদেশীয় দৃঢ়মূল সংস্কারের বিষয়ে যথেষ্ট উদাসীনতা দেখিয়েছিলেন। সন্ন্যাস এদেশে বন্দনীয় মার্গ, সন্ন্যাসীর বহির্বাস বিশুদ্ধ আদর্শের প্রতীকরূপে অগ্নিবর্ণ, সন্ন্যাসের প্রতি এদেশের মানুষের এমনই সম্ভ্রম যে, ব্যক্তিচরিত্র বিচার না করেই গৈরিকধারীকে সে নমস্কার করে—তেমন গৈরিক যখন ভারতচন্দ্রের বিদ্যা ও সুন্দরের কাছে প্রেমের খেলায় বেশান্তর মাত্র, তখন আমরা বুঝতে পারি, এক্ষেত্রে তিনি এদেশীয় ঐতিহ্যকে নির্বিচারে সম্মান জানাতে প্রস্তুত নন। এর পিছনে ভারতচন্দ্রের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় সম্বন্ধে

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তিক্ততা থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, কবি এখানে বিদ্রূপে ও কৌতুকে স্বকার্যের সাফাই গেয়েছেন। গৈরিকত্যাগী ভারতচন্দ্র গৈরিককে কেবল কোনো-একটি রঙের কাপড় ছাড়া আর কি ভাবতে পারবেন, যাকে ছেড়ে তিনি প্রেমরঙ্গে মেতেছিলেন?[১১] ঐ কাজের যে আত্মগ্লানি, তাকেই হয়ত চাপা দিতে চেয়েছিলেন বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসখেলার রসহাস্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করে।[১২]

সুতরাং ভারতচন্দ্র সচল মানুষ, সে যুগের পক্ষে বিস্ময়কর চরিত্র, ধর্মক্ষেত্রে উদ্যত জিজ্ঞাসু। হয়ত তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সুগভীর নাটকীয়তার সঙ্গে বলেন নি 'অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে, এই প্রশ্ন উদিত হইত, এ জীবন লইয়া কি করিব, লইয়া কি করিতে হয়, সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি'—কিন্তু ভারতচন্দ্রের জীবনও একই সন্ধানের। এই সন্ধান থেকে যে-উত্তর তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন, তাকে পুরো খুলে ধরতে পারেন নি—তাঁর বিক্ষিপ্ত উত্তরগুলিকে আমরা সংকলন করে গ্রথিত করবার চেষ্টা করছি। তার থেকে দেখি, ধর্ম সম্বন্ধে কবির সিদ্ধান্ত এই প্রকার :

এক, জীবনে ধর্ম আছে, কিন্তু ভোগজীবন বা সংসারজীবনকে ত্যাগ করে ধর্ম নয়।

১১। ঘরে ফিরে ভারতচন্দ্রের নির্ঘাত দারুণ স্ফূর্তি হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের জীবনীকার ঈশ্বর গুপ্তের অন্তত: তাই বিশ্বাস। কবির নবফুলশয্যা-ঘরে কল্পনার কানে আড়ি পেতে এবং কল্পনার চোখে উঁকি মেরে তিনি লিখেছেন :

"ভারত বিবাহবাসর ব্যতীত অপর কোনো দিবস আপনার প্রণয়িনী সহধর্মিণীর সহিত আর সাক্ষাৎ করেন নাই। ইহাতে সেই রজনীর সাক্ষাতে পরস্পর উভয়ের মনে যে-প্রকার সন্তোষ, প্রেম, ভাব ও আর আর ব্যাপারের উদয় হইল, তাহা কী বাক্যে প্রকাশ করিব স্থির করিতে পারিলাম না।"

১২। মনস্তত্ত্বের পণ্ডিতেরা কামকাব্য রচনায় ভারতচন্দ্রের উৎসাহ দেখে হয়ত তাঁর সন্ন্যাসজীবনের দীর্ঘ আত্মনিগ্রহকে (যদি সত্যই ঐকালে তিনি সামলে থাকেন) পরবর্তী উগ্র তাড়নার কারণরূপে অনুমান করবার চেষ্টা করবেন। আমরা এখানে কেবল এইটুকু স্মরণ করিয়ে দেব, পূর্বকালে এদেশেরই এক ব্যক্তি একই সঙ্গে বৈরাগ্যশতক ও শৃঙ্গারশতকের রচয়িতা।

দুই, ধর্ম নিয়ে সাম্প্রদায়িক কলহ জাতীয় জীবনের পক্ষে শক্তি-হানিকর। কেবল তাই নয়—ঐ কলহ করলে ধর্মের মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়। খাঁটি ধর্ম সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যতাকে স্বীকার করে।

তিন, সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ করা মানে সম্প্রদায় বা সমাজ-আশ্রিত ধর্মবোধকে ত্যাগ করা নয়। সামাজিক ধর্ম আছে এবং থাকবে।

চার, ধর্মের একটা রহস্যময় দিক আছে। তাকে অনুভূতিশীল মানুষ ব্যক্তিস্বভাবের রসায়নে আস্বাদন করে থাকে—একান্ত, বিচিত্র সুখে আচ্ছন্ন হয়ে।

উক্ত চার সিদ্ধান্তের সমর্থনে একে একে প্রমাণপ্রয়োগ করা যাক।

প্রথম বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা ইতিমধ্যে করেছি। সেইসূত্রে তাঁর সন্ন্যাসজীবন ও সন্ন্যাসত্যাগ-প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের আলোচনা পরে করব—তৃতীয় প্রসঙ্গটিকে এগিয়ে আনছি। সামাজিক ধর্ম সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের মনোভাব কি রকম ছিল? বা আরো স্পষ্ট করে—ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্য লিখেও কি মঙ্গলকাব্যের কবি ছিলেন?

সাহিত্যের দিক দিয়ে তিনি যে, মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী একথা প্রায় সকলেই মেনে নেন। কিন্তু অনুভূতির দিক দিয়ে? বিপরীত দিকেই অধিকাংশের রায়।

একথা সত্য, আমরা আগেই বলে এসেছি, ধর্মধারণার ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র একেবারে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন না, এবং তিনি অবশ্যই পুরনো মঙ্গলকাব্যের ভাবধর্মের সম্পূর্ণ আনুগত্য করেন নি। মঙ্গলকাব্যকে তিনি নবচেতনায় ভূষিত করেছিলেন। তার জন্য তাঁর কাব্য থেকে 'মঙ্গলকাব্য' নামটাকে পর্যন্ত খসিয়ে নেওয়া উচিত কি না, সেটা বিতর্কের বিষয়। আমরা বলতে চাই—বাংলাদেশের দেবদেবী সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের মন অন্যান্য বাঙালির মতো একই অনুভূতিতে স্পন্দিত ছিল। অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথমাংশের কিছু বিশ্লেষণ করে বিষয়টি পরিষ্কার করে নিতে চাই।

দেবদেবী সম্বন্ধে বাঙালির মনোভাবের একটি বিশেষ দিক আছে

(কিছুদিন আগেও অন্তুতঃ ছিল), যার সম্বন্ধে অবহিত না হলে মঙ্গল-কাহিনীর পৌরাণিক অংশকে অসঙ্গতি ও আতিশয্যপূর্ণ বলে মনে হবে, তা হল, দেবদেবীদের বিষয়ে তার মনের স্থিতিস্থাপকতা। বাঙালি বিশ্বমাতা ও ঘরের দুহিতাকে একই মূর্তিতে ভাবতে পারে। নইলে যাঁকে এই মুহূর্তে আদ্যাশক্তি বলছে, তাঁকে পরমুহূর্তে কোঁদলে নামাতে তার বাধত। এর দ্বারা যেমন মনে হয় যে, বাঙালি যথার্থ মহিমার সম্মানরক্ষা করতে পারে না, তেমনি আবার মনে হয়, অলৌকিক দেবতাকে ঘরে এনে, স্নেহ-সম্পর্কে স্থাপন করে, অনির্বচনীয় সুখবোধের গৌরবও তারই। দেবতার ঐশ্বর্যের কথা সে জানে, কিন্তু তা দেবতাকে দূরে সরাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, বরং সে ঐশ্বর্য নিতান্ত আপনার জনের, এই গৌরববুদ্ধি দেবতার সঙ্গে তার নৈকট্যকে বর্ণরঞ্জিত করে। তার ঐশ্বর্যশালিনী কন্যা পিতৃগৃহে ফিরে পুরাতন আদরে-আবদারে, কলহে-কোলাহলে যখন মেতে ওঠে, যখন আহ্লাদে-অভিমানে ডগমগ হয়ে গয়নাভরা সোনার হাত ঘুরিয়ে ঘরের তুচ্ছ কাজ সারবার জন্য আরক্ত-মুখে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন দরিদ্র পিতামাতার হৃদয়ের যে-গাঢ় সুখানুভূতি, তাকেই বাঙালি অনুভব করে বিশ্বজননীকে ঘরের দুলালী সাজিয়ে। দেবতাকে নিয়ে কৌতুক করতেও তার বাধা নেই, সমালোচকের কাছে তা বাঙালির অক্ষমণীয় লঘুত্ব, কিন্তু ধরা-ছোঁয়ার বাইরের বৃহৎকে রঙ্গব্যঙ্গ, সেইসঙ্গে সখ্যে বাঁধবার হৃদয়াশয় থেকে বঞ্চিত হওয়ার চেয়ে সমালোচকের নিন্দাকে বাঙালি আনন্দে বরণ করে নেবে।

দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সতীর দেহত্যাগের পরে শিব বড়ই উদাসীন। তাঁকে সংসারী করতে হবে, কেননা শিব শক্তিহীন থাকলে জগৎ চলে না। স্বয়ং নারায়ণ উদ্যোগী হয়ে নারদকে ঘটকালীতে লাগালেন। 'একে তো নারদ, আরো বিষ্ণুর আদেশ, শিবের বিবাহ তাতে বাড়িল আবেশ।'

তারপর যা ঘটল! খাঁটি দেশীয় সংস্কার ও রসিকতার সারটুকু পাওয়া গেল। বৃদ্ধ আমুদে ঘটক ('এইরূপে নারদমুনি বীণা বাজাইয়া, উত্তরিলা হিমালয়ে নাচিয়া গাহিয়া'); খেলায় মাতোয়ারা অল্পবয়সের মুগ্ধা কন্যার কাছে গিয়ে সেই ঘটকের রহস্য; বিয়ের কথায় লাজে

রোষে কন্যার আরক্ত মুখখানি ; খেলা ছেড়ে ছুটে গিয়ে মায়ের কোলে চড়ে বসা ; তারপর গলা জড়িয়ে রাঙা মুখে ভাঙা অভিযোগ—সবই আছে। নারদ যখন বালিকাকে প্রণাম করলেন তখন—

নারদে কহিলা দেবী গর্বিত বচনে॥
শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়।
আমারে প্রণাম করা উপযুক্ত নয়॥

সেকথা শুনে ঝানু ভক্তবীর নারদ সেকেলে রসিকতার সুযোগ ছাড়তে পারেন কখনো ?—

নাতি জ্ঞানে বুড়া বলি হাসিছ আমারে।
পাকা দাড়ি বুড়া বর ঘটাব তোমারে॥
আনিব এমন বর বাঁয়ে লড়ে দাঁত।
ঘটক তাহার আমি জানিবা পশ্চাত।

পরবর্তী ঘটনা ভাবপ্রবণ বাঙালিকে উচ্ছ্বসিত করে তুলবার পক্ষে যথেষ্ট। প্রাচীন পটুয়ার আঁকা লোকশিল্পের অপূর্ব এক ছবি :

বিবাহের নামে দেবী চলে লজ্জা পেয়ে।
কহি গিয়া মায়ে, বলি ঘরে গেলা ধেয়ে॥
আল্যা করি কোলে বসি ছেঁদে ধরি গলে।
ওমা ওমা বলি উমা কথা কন ছলে॥
সখী মেলি খেলিনু বাহিরবাড়ি গিয়া।
ধূলা-ঘরে দিতেছিনু পুতুলের বিয়া॥
কোথা হইতে বুড়া এক ডেকরা বামণ।
প্রণাম করিল মোরে একি অলক্ষণ॥
নিষেধ করিনু তারে প্রণাম করিতে।
কত কথা কহে বুড়া না পারি কহিতে॥
ছুটা লাউ বান্ধা কান্ধে কাঠ একখান।
বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া করে গান॥
ভাবে বুঝি সে বামণ বড় কন্দলিয়া।
দেখিবে যদ্যপি চল বাপারে লইয়া॥

এখনি হয়ত পূর্বরাগের লাজারুণ ব্যঞ্জনার ধোয়া উমার ছবিটি আমাদের মনে পড়বে, যাঁকে কালিদাস এঁকেছেন। অধোমুখে লীলা-কমল গণনার স্ফুটযৌবনা সেই উমার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের মুগ্ধা ও ক্রুদ্ধা বালিকার কত প্রভেদ! মানুষের যৌবনের রক্তে আগুন ধরাতে পারেন যে-ভারতচন্দ্র তিনি কুমারসম্ভবের ভাবী জননীকে বালিকা সাজিয়ে খুশি হয়েছেন—বাঙালির মনে বাৎসল্যের এমনই প্রভাব!

আমরা জানি, দেবতার উপর ঐশ্বর্য চাপানো কিছু কঠিন কাজ নয়। কিন্তু বিশেষণ ও বর্ণনাবাহুল্যে চরম আতিশয্য প্রকাশ করেও কি দেবতার সত্যমহিমা প্রকাশ করা সম্ভবপর? বড়জোর সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয়-বিস্ময়পূর্ণ কিছু অধিক সম্ভ্রমবোধ জেগে ওঠে। অপরপক্ষে দেবতা যখন তাঁর করাল বিশ্বরূপ ঢেকে মোহন শ্যামকান্তিকে প্রকাশ করেন, তখন কত আশ্বস্ত হয় তারা। বাঙালি-কবি দেবতার এই স্নিগ্ধ সহজ প্রিয়রূপই দেখতে চেয়েছেন বারে-বারে। অমরাবতী থেকে চুরি করে আনা স্ফূর্তিভরা দেবশিশুগুলি আমাদের অঙ্গনের ধূলায় ধূসর আনন্দে লুটোপুটি করেছে, আমাদের ভাঙা কুটীরে রাঙা হাসির হাট বসেছে, তারই আলোর জ্যোৎস্না দেবমহিমাচুরির অপরাধকে ঢেকে লুটিয়ে পড়েছে বাঙালির কাব্যাঙ্গনে। কবির অন্যায়কে দেবতাই শতগুণ ভালবেসে পুরস্কৃত করেছেন।

আরও অগ্রসর হওয়া যাক। ধ্যানস্থ শিব মদনশরাহত হলেন, ফলে তাঁর অবস্থা বাড়াবাড়ি-রকম মানবিক হয়ে উঠল। আগেই বলেছি যে, ভারতচন্দ্র নিরাকার ব্রহ্মকে দেহফাঁদে পড়ে কাঁদতে দেখেছেন, তিনি সাকার শিবকে দিয়ে কামক্রন্দন করাবেন তাতে বিচিত্র কি।

যাই হোক, শিবের বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেল, শিব বিবাহযাত্রা করলেন, তার বর্ণনায় স্বর্গীয় ঐশ্বর্যগৌরব নেই। কবি খুশি—নারদের হাতে বুড়ো-বর সাজানোর ভার দিয়ে এবং শ্মশানেশ্বরের সহযাত্রী ভূত-প্রেতগুলোর বিকট উল্লাসের বর্ণনা করে। আশুতোষের সজ্জার জন্য মুকুট মুক্তা কস্তূরীচন্দন বাদ দিয়ে নারদ-ঠাকুর হাড়ের মালা, মুণ্ড-মালা, বাঘছাল, সাপ, ছাই ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন, ভূতের দল

বেশরম উৎপাত করে, তাতে ভয় পেয়ে ইন্দ্রাদি বায়ু-দেবতারা ভয় পেয়ে পালান—এই সব দেখেই তো কবির সুখ। এর মধ্যে তোফা হল ভূতের নেত্য :

এরূপ করিয়া বর সাজাইয়া
হর লয়ে মুনি যায়।
প্রেত ভূতগণ ধায় অগণন
আন্ধার কৈল ধূলায়॥
ঝুপ ঝুপ ঝাপ দুপ্ দুপ্ দাপ্
লম্ফ ঝম্ফ দিয়া চলে।
মহা ধুম ধাম হাঁকে হুম্ হাম্
জয় মহাদেব বলে॥
সহজে সবার বিকট আকার
সহিতে না পারে আলো।
থাবায় থাবায় মশাল নিবায়
আন্ধারে শোভিল ভাল॥
করতালি দিয়া বেড়ায় নাচিয়া
হাসে হিহি হিহি হিহি।
দন্ত কড়মড়ি করে জড়াজড়ি
লক্ লক্ লক্ জিহি॥
করে চড়াচড়ি ধায় রড়ারড়ি
কিলাকিলি গণ্ডগোল।
কে কারে আছাড়ে কে কারে পাছাড়ে
কে মানে কাহার বোল॥

দলবল নিয়ে শিব বিবাহস্থলে পৌঁছলেন ; 'বর দেখি হিমালয় হৈল হতবুদ্ধি' ; আর বর ?

ভবানীর ভাবে বর ঢুলিয়া ঢুলিয়া।
গিরির আসনে গিয়া বসিলা ভুলিয়া॥

এই বেসামাল বুর আবার যেহেতু স্বয়ং পরম কারণ, সেহেতু বংশ-পরিচয়হীন। কেলেঙ্কারী।—

কে পিতা কে পিতামহ কে প্রপিতামহ।
কিবা গোত্র কয় বা প্রবর বর কহ॥
হেঁটমুখে পঞ্চানন ভাবিতে লাগিলা।

গ্রামীণ বাঙালির জাতীয় কাব্যের স্বরূপ এই। শিবকে স্মরহর বলবে আবার কুচনীর বাড়িতে পাঠাবে। দিগম্বর বলে আকাশবিস্তৃতি দেবে, আবার ল্যাংটা বলে ঠাট্টা করতেও ছাড়বে না। শাশুড়ির সামনে, এয়োদের সামনে সহসা উলঙ্গ, প্রদীপ নিবিয়েও পরিত্রাণ নেই, চূড়া-চন্দ্রের কৌতুক-জ্যোৎস্নায় বাধ্যতামূলক প্রদর্শনী—ছি ছি!—এয়োরা লজ্জায় রাঙা, কলহে মুখর; ভূতের নৃত্য, নারদের হাসি, হিমালয়ের ক্ষোভ, দেবগণের সম্ভ্রম, ঋষিগণের প্রণাম, কন্যার দুর্দশা-কল্পনায় মাতার অশ্রু-প্রবাহ—এই সকল দুঃখ-বেদনা-সুখ-চেতনাকে বেষ্টন করে শিবের মোহন মূর্তি বিশাল মহিমায় জেগে ওঠে। 'তুমি তো সুন্দর নও তুমি অনুপম।'

ঐ অনুপমের রূপ কি সহজে চোখে ধরা পড়ে! কত বিচিত্র বিপরীত অনুভূতি একত্রে মিশে যায়। কবির অসাধারণ ক্ষমতা—সেই অশ্রু-হাস্য মিশ্রিত, ঘৃণায় ক্ষুব্ধ, আক্ষেপে তিক্ত, কৌতূহল কৌতুকে সজীব গ্রামীণ বিবাহের উৎসবচ্ছন্দের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তিনি ঘটাতে পেরেছেন—অতুলনীয় সে কাব্য—

আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো॥
উমার কেশ চামর ছটা, তামার শলা বুড়ার জটা।
তায় বেড়িয়া ফোঁপায় ফণী দেখে আসে জ্বর লো॥
উমার মুখ চাঁদের চূড়া, বুড়ার দাড়ি সনের নুড়া।
ছারকপালে ছাইকপালে দেখে পায় ডর লো॥
উমার গলে মণির হার, বুড়ার গলে হাড়ের ভার।
কেমন করে ওমা উমা করবে বুড়ার ঘর লো॥

আমার উমা মেয়ের চূড়া, ভাঙড় পাগলা ওই লো বুড়া।
ভারত কহে পাগল নহে—ওই ভুবনেশ্বর লো॥

যা হোক, পাছে সবাই অতিরিক্ত শিবনিন্দা করে দ্বিতীয় দক্ষযজ্ঞ বাধাবার ব্যবস্থা করে ফেলে, সেই আশঙ্কায় উমা শিবের মোহন রূপ দেখবার সুযোগ করে দিলেন। তখন সকলের, বিশেষতঃ মেনকার আঁখি জুড়োল। মেয়ে-জামাইকে পাশাপাশি রূপের পটে দর্শন করে মায়ের প্রাণ যখন তৃপ্ত, তখনো কিন্তু শিবের ওসব বড় ব্যাপারে খেয়াল নেই—বহুক্ষণ সিদ্ধি জোটে নি, মুখে ফেকো উড়ছে, ওটা চাই—শিব হাঁকডাক শুরু করলেন। তখন ঘটা করে সিদ্ধি ঘোঁটা হল, আকণ্ঠ তা পান করে আবিষ্ট হলেন তিনি। 'সিদ্ধি' শব্দের গূঢ়ার্থ নিয়ে যখন কবি ও পাঠক ব্যস্ত, তখন স্বয়ং সিদ্ধিনাথ ওসব ভেজাল সিদ্ধি বাদ দিয়ে খাঁটি সিদ্ধি ঘটিঘটি শেষ করছেন। সিদ্ধি-উৎসবে কবির আনন্দগান :

শঙ্খ-ঘণ্টা-রব, মহা মহোৎসব, ত্রিভুবনে জয় জয়।
নাচিছে নাটক, গাহিছে গায়ক, রাগ তান মান লয়॥
যত চরাচর হরিষ অন্তর, পরম আনন্দময়।

অতঃপর হরগৌরীর বিহার।

কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গে হরগৌরীর বিহার কালিদাস বর্ণনা করেছেন কিনা, তা নিয়ে গত দেড়হাজার বৎসরে কলহের একটা গৌরবময় ঐতিহ্য তৈরী হয়েছে। কালিদাস যদি-বা হরগৌরীর মুক্তবিহারের কবি না হন, আমাদের আশঙ্কা ছিল, ইন্দ্রিয়সুখের কবি ভারতচন্দ্র সুযোগ ছাড়বেন না। ভারতচন্দ্র আমাদের সতর্ক উৎসাহকে ফাঁকি দিয়ে কৌশলে কার্যসিদ্ধি করেছেন। সে ভাবগূঢ়তার প্রশংসা কবির প্রাপ্য। বিয়ের পরে শিব দেবীর কাছে অর্ধনারীশ্বর মূর্তিধারণের প্রস্তাব করলেন। 'অর্ধ অঙ্গ তোমার আমার অর্ধ অঙ্গে, হরগৌরী এক তনু হয়ে থাকি রঙ্গে।' পুরুষজাতির সাধারণ নিষ্ঠাহীনতা, বিশেষতঃ শিবের কুচনীগমন ইত্যাদি আচরণের সমালোচনা দেবী করলেন। তাহলেও—

হাসিয়া কহেন দেবী হৈলা সমান।
হরগৌরী এক হই ইথে নাহি আন॥
দুইজনে সহাস্য বদনে রসরঙ্গে।
হরগৌরী এক হৈলা দুই অর্ধ অঙ্গে॥

অতঃপর উভয়ের মিলিত রূপের একটি বিস্মিত মুগ্ধ ভাবময় সাহিত্য-গুণান্বিত বর্ণনা আছে।

সুযোগ সত্ত্বেও ভারতচন্দ্র হরগৌরীর অনাবৃত মিলন কেন চিত্রিত করলেন না, তা চিন্তার বিষয়। কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গের আদর্শ তো সামনেই ছিল। আমাদের মনে হয়, শিব-উমার লৌকিক রূপ যেমন তিনি দেখেছেন, তেমনি তাঁর মনে সর্বদা জাগরূক ছিল তাঁদের তত্ত্বাশ্রয়ী প্রকৃতি। কালিদাস উমা-মহেশ্বরের লঘু লৌকিক রূপকে দেখেন নি। তাঁর কাছে ওঁরা সংসারভবনের মঙ্গলদেবতা। সেই কারণে, প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন থেকেও কালিদাস তাকে আবৃত করে (আবরণের মধ্যে উদ্ভাসিত করেও) শিবপার্বতীর জীবনে গার্হস্থ্য আদর্শের প্রকাশ দেখতে চেয়েছেন। ভারতচন্দ্রের বুদ্ধিবাদী দার্শনিক মনে অপরপক্ষে প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব প্রাধান্য পাওয়ায় তিনি অন্য সকল ক্ষেত্রে শিব-উমাকে মর্ত্যধূলিতে নামিয়েও (কবি জানতেন তত্ত্বের গায়ে ধূলো লাগে না) একটি ব্যাপারে কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন—শিব-উমার মিলনবর্ণনার সময়ে প্রকৃতি-পুরুষের নিত্যমিলনের রহস্যমূর্তির দিকে অঙ্গুলিসংকেত-মাত্র করে থেমে গিয়েছিলেন। সুতরাং আমাদের সামনে জেগে রইল অর্ধনারীশ্বরের অপরূপ মূর্তি—সৃষ্টি-প্রবাহের অনন্ত উৎস। পার্থিব যৌবনের এই কবি যুবকযুবতীর মিলন-ছন্দকে পঞ্চম রাগিণীতে উন্মত্ত করতে পারেন, কিন্তু বুঝেছিলেন, হরগৌরীকে রতিরঙ্গে উন্মত্ত করার দায়িত্ব গভীর। তাতে একদিকে তরুণ প্রাণের সুখস্পন্দনের মনোরম স্পর্শ হারিয়ে যায়, অন্যদিকে সমগ্র সমাজশাসনের এমন এক গভীর ও আত্মিক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়, অযথা যার মুখোমুখি হবার ইচ্ছা কবির ছিল না।

অন্নদামঙ্গলের মধ্যে আরও বহুতর উপাদান আছে যেগুলিকে পূর্বোক্ত

দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কবির দেব-দেবীবন্দনাকে কোন্ যুক্তিতে গতানুগতিক বলে উড়িয়ে দেওয়া হয় বুঝতে পারি না। অথচ গতানুগতিক নন বলেই তো ভারতচন্দ্র নিন্দিত। আমরা অন্ততঃ কবির গঙ্গাপ্রীতিকে কেবল মুখের কথা বলতে পারি না—এত বেশিবার তিনি ভক্তিনিবেদন করেছেন (সংস্কৃতে গঙ্গাষ্টকও লিখেছেন)। পৃষ্ঠপোষক রাজার কাছে তিনি বসবাসের জন্য গঙ্গাতীরের একটি গ্রাম চেয়েছিলেন। আর, গঙ্গার জলকল্লোলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গান ধরেছিলেন—

জয় জয় গঙ্গে জয় গঙ্গে।
হরিপদকমল কমলকলদঙ্গে॥
টল টল ঢল ঢল চল চল ছল ছল
কলকল তরলতরঙ্গে॥

কবির তীর্থমঙ্গলগুলিতে আন্তরিক সুরের অভাব আমরা লক্ষ্য করি না—এবং কোনো বুদ্ধিতেই কবির নীলাচল-বন্দনাগানের মধ্যে 'প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ' আবিষ্কার করতে পারি নি। বেশ কিছুদিন তিনি নীলাচলে কাটিয়েছিলেন—সেখানকার মহাপ্রভু জগন্নাথ, তাঁর মহাপ্রসাদ, অক্ষয় বট, সমুদ্র, তাঁর স্মৃতিসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। 'জগন্নাথ পুরীর বিবরণ' তিনি দিয়েছেন, বিশেষতঃ জগন্নাথক্ষেত্রের উদার আশ্রয় তাঁকে তৃপ্ত ও কৃতজ্ঞ করেছিল। অন্ন যে ব্রহ্ম—জগন্নাথের প্রসাদঅন্ন তার প্রমাণ। একই ব্রহ্ম সর্বভূতে—তার লৌকিক রূপ এই মহাক্ষেত্রে, যেখানে সবাই প্রসাদ পায়, 'আচার বিচার নাহি তায়।' কবির তন্ময় সঙ্গীত—

চল চল যাই নীলাচলে রে! আরে ভাই!
ঘটাইল বিধি ভাগ্যবলে।
মহাপ্রভু জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
দেখিব অক্ষয়-বট-তলে॥
খাইয়া প্রসাদ-ভাত মাথায় মুছিব হাত
নাচিব গাইব কুতূহলে।

ভবসিন্ধু বিন্দু জানি পার হৈনু হেন জানি
সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে॥

এমন কবিকে প্রচলিত হিন্দুধর্ম-বিশ্বাসহীন ভাবার মধ্যে সমালোচকগণের কল্পনাশক্তির যথেষ্ট পরিচয় মেলে, স্বীকার করি।

ধর্মকলহের অনৌচিত্য সম্বন্ধে কবির মনোভাবের যে-আলোচনাকে স্থগিত রেখেছি, এখন তাতে প্রবেশ করা যায়। সূচনার অধ্যায়ে এ সম্পর্কে মূল কথাগুলি বলেছি, এখানে কাব্যাংশ উদ্ধৃত করে সেই বক্তব্যের সমর্থন করব।

ধর্মবিবাদ নূতন বস্তু নয়। শ্রীচৈতন্যের কালে ঐ কলহের অনেকটা পরিচয় পেয়েছি বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে। পতন-অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে ঐ কলহধারা ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এসেছিল। আবার ভারতচন্দ্রের কালেই ঐ কলহের ক্ষতিকরতা সম্বন্ধে বুদ্ধি ও অনুভূতিশীল মানুষেরা সচেতন হয়ে উঠতে আরম্ভ করেন—ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের মধ্যে তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই। হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কলহের কোন্ উত্তরাধিকার ভারতচন্দ্র সমকালে দেখেছিলেন, তার কিছু নমুনা দেখাতে পারি দীনেশচন্দ্র সেনের রচনাংশ উদ্ধৃত করে। চৈতন্যের কালে শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের কথা তিনি বলেছেন :

"এই যুগে মৃদঙ্গের ধ্বনি ও হরিবোলের আনন্দ একদিকে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া উত্থিত হইতেছে, অপরদিকে এই আনন্দবিদ্বেষী দল বিদ্রূপ করিয়া বেড়াইতেছে :

"'শুনিলেই কীর্তন করয়ে পরিহাস, কেহ বলে যত পেট ভরিবার আশ। কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার, পরম উদ্ধতপনা কোন ব্যবহার। কেহ বলে কতরূপ পড়িল ভাগবত, নাচিব কাঁদিব হেন না দেখিল পথ। ধীরে ধীরে বলিলে কি পুণ্য নহে, নাচিলে গাহিলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে।' (চৈ, ভা, আদি।)

"এই দলের কোনো কোনো অগ্রসর ব্যক্তি কালীমন্দিরে

যাইয়া স্বীয় দুষ্ট অভিপ্রায়ের মঞ্জুরী চাহিতেছে—'এত কহি হাসি-হাসি পাষণ্ডীর গণ, চণ্ডীর মন্দিরে গিয়া করে আস্ফালন। প্রণমিয়ে চণ্ডীরে কহয়ে বার বার, অদ্য রাত্র এ গুলিয়ে করিবে সংহার।' (ভক্তিরত্নাকর)। বৈষ্ণবগণও ইহাদিগের ঋণ সুদ-সহিত পরিশোধ করিতে ক্রুটি করেন নাই—'লোচন বলে আমার নিতাই যেবা নাহি মানে, অনল জ্বালিয়া দিব তার মাঝ-মুখ-পানে।' অন্যত্র—'এত পরিহারে যে পাপী নিন্দা করে, তবে লাথি মারি তার মাথার উপরে।' (চৈ, ভা)। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ গোঁড়া, তাঁহারা দোয়াতের কালিকে 'সেহাই', হাঁড়ির কালিকে 'ভুষা' ও জবাফুলকে 'ওড় ফুল' বলিতেন। কালীপূজার মধ্যে কোনোরূপে সংশ্লিষ্ট থাকা ইহারা নিতান্ত পাপকার্য মনে করিতেন। শ্রীবাসের বাড়িতে গোপাল নামক এক ব্রাহ্মণ বিদ্রূপ করিয়া রাত্রিকালে—'কলার পাত উপরে থুইল ওড় ফুল, হরিদ্রা সিন্দূর রক্তচন্দন তণ্ডুল।' (হৈ, চ, ম)। কালীপূজার এই আয়োজন দেখিয়া শ্রীবাস মান্যগণ্য লোকদিগকে প্রাতে ডাকিয়া দেখাইলেন—'সবারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া, নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানীপূজন। আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ-সুজন॥ তবে সব শিষ্টলোক করে হাহাকার। ঐছে কর্ম হেথা কৈল কোন্ দুরাচার॥' (চৈ, চ)। এই অপরাধে সেই রসিক ব্রাহ্মণটির কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল বলিয়া চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে।"

দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে আরও সংবাদ আছে। এমনকি বৈষ্ণবদের মধ্যেও রামোপাসক শ্যামোপাসকে বিবাদ ছিল। শাক্তদের মধ্যে সহিংস উগ্রতা থাকলেও সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিতে বৈষ্ণবেরা সবিনয়ে বহুদূর অগ্রসর। শাক্তরা যেখানে রোষাস্ত্র ধরেছেন, বৈষ্ণবেরা সেখানে ঘৃণামন্ত্র জপ করেছেন। দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবেরা অন্যমতের সভ্যতাকে মানতে কুণ্ঠিত ছিলেন। অপরপক্ষে অদ্বৈত-প্রভাবিত শাক্তমত বহুলাংশে তার শুদ্ধ রূপে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থেকে বহুলাংশে মুক্ত। বৈষ্ণব উদারতার প্রধান ক্ষেত্র জগন্নাথ-মন্দির, মনে রাখতে হবে, প্রাক্তন বৌদ্ধপীঠ।

ভারতচন্দ্র কুলধর্মে সম্ভবতঃ শাক্ত। দীর্ঘদিন সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চা করে হিন্দুধর্মের সকল দার্শনিক মতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। ফার্সী পড়ে তিনি নিশ্চয়ই কেবল কেচ্ছা শেখেন নি, ইসলামের আপস-হীন একেশ্বরবাদের কথাও জেনেছিলেন। অবশ্যই তা জেনেছিলেন; সত্যপীরের পাঁচালীতে প্রথমে, পরে মানসিংহ কাব্যে তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। নীলাচলে গিয়ে তিনি বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর মতো দিন কাটিয়েছেন, কিন্তু বিস্ময়ের কথা, ছিলেন শঙ্করাচার্য-মঠে। কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে এসে তিনি শক্তিদেবীর উপরে মঙ্গলকাব্য লিখেছেন, তারপরে গঙ্গাতীরে মূলাযোড় গ্রামে যখন বাস করতে গেছেন, তখন গৃহদেবতা-রূপে ধাতুগঠিতা দশভুজা, শালগ্রাম শিলা এবং হরি ও হরিবধূর মূর্তি রেখেছেন।[১৩]

শেষোক্ত সংবাদটি সর্বাধিক মূল্যবান। জীবনের একেবারে শেষ-প্রান্তে, বহু স্বপ্নের সৃষ্টি নিজ গৃহ-মন্দিরে একই সঙ্গে দশভুজা ও লক্ষ্মী-নারায়ণ—নিত্যপূজিত দেবতারূপে বর্তমান তাঁরা।

সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, প্রচণ্ড শাক্ত কৃষ্ণচন্দ্রের অন্নদাস হয়েও ভারতচন্দ্র ধর্মের ক্ষেত্রে প্রভুর দাসত্ব করেন নি। যাঁরা বলতে চান কৃষ্ণ-চন্দ্রের আশ্রয়ে থাকার জন্য ভারতচন্দ্র বৈষ্ণব-বিদ্বেষের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, তাঁরা একটি কথা ভুলে যান—কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার বহু আগেই ভারতচন্দ্র বৈষ্ণব-সন্ন্যাস ত্যাগ করেছিলেন, এবং তার পিছনে অন্য অনেক কারণের সঙ্গে বৈষ্ণব গোষ্ঠীধর্মের সংকীর্ণতা সম্বন্ধে তাঁর মানসিক বিরূপতাও থাকতে পারে!! তা যে ছিল তার পক্ষে

১৩। কবি-রচিত 'নাগাষ্টকম্'-এর মধ্যে আছে :

সমানীতা দেশাদিহ দশভুজা ধাতুরচিতা
শিবাঃ শালগ্রামা হরি হরিবধূমূর্তিরতুলা।

[কিবা শোভা দেবী শুভ দশভুজা ধাতুগঠিতা
শিলা শালগ্রামো হরি হরিবধূমূর্তি অতুলা।
—বসুমতী সং]

আনুমানিক প্রমাণ—অত্যন্ত অসহিষ্ণু গোঁড়া এক বৈষ্ণবরূপে ব্যাসের অঙ্কন। মহাভারতকার ব্যাসকে ঐ রকম ধর্মান্ধ এক বৈষ্ণবের চেহারা দেওয়া উচিত হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু ব্যাসের যে-চেহারা তিনি এঁকেছেন তা যে তাঁর স্বচক্ষে দেখা জিনিস, তাতে কোনো সন্দেহই সম্ভব নয়। ছবিটা খানিক এই রকম :

দাঁড়াইলে জটাভার চরণে লুটায় তাঁর
কক্ষলোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু।
পাকা গোঁফ পাকা দাড়ি পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি
চলনে কতেক আঁটুবাঁটু।
কপালে চড়ক ফোঁটা গলে উপবীত মোটা
বাহুমূলে শঙ্খচক্ররেখা।
সর্বাঙ্গে শোভিত ছাবা কলিমৃগ বাঘথাবা
সারি সারি হরিনাম লেখা॥
তুলসীর কণ্ঠী গলে লম্বি মালা করতলে
হাতে কানে থরে থরে মালা।
কোশাকুশী কুশাসন কক্ষতলে সুশোভন
তাহে কৃষ্ণসার মৃগছালা॥
কটিতটে ডোর ধরি তাহাতে কপীন পরি
বহির্বাসে করি আচ্ছাদন।
কমণ্ডলু তুম্বীফল করঙ্গ পিবারে জল
হাতে আশা হিঙ্গুলবরণ॥
এই বেশে শিষ্যগণ সঙ্গে ফিরে অনুক্ষণ
পাঁজি পুঁথি বোঝা বোঝা লয়ে।
নিগম আগম যত পুরাণ সংহিতা কত
তর্কাতর্কি নানামত কয়ে॥

সূচনার অধ্যায়ে বলে এসেছি—মুনির মতিভ্রম দেখাতেই জ্ঞান-গুরু ব্যাসের ওহেন দুর্গতি তিনি করেছেন। ঐ মতিভ্রম—অন্ধ সাম্প্রদায়িকতার জন্য। ব্যাস-নামক বৈষ্ণব ঐ সাম্প্রদায়িকতার প্রতীক।

কবি সেই ব্যাস সম্বন্ধে যৎপরোনাস্তি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অবজ্ঞা ও ধিক্কার দিয়েছেন—বিস্ময়ের কথা, সুগভীর বৈষ্ণবতা হৃদয়ে জাগিয়ে রেখেই তিনি তা করেছেন। এমনকি একথা অনুমান করবার মতো ইঙ্গিত তাঁর কাব্য থেকে আবিষ্কার করা যায়—বৈষ্ণব-দেবতাই বোধহয় কবির ইষ্টদেবতা। তবে তিনি সম্ভবতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, থাকলে ও-ধরনের ভেদবুদ্ধির অভাব দেখাতে পারতেন না। বন্দনা-অংশে চৈতন্যবন্দনা না থাকা লক্ষ্য করার বিষয়।[১৪]

ভারতচন্দ্রের গুরু যে বৈষ্ণব, কিংবা তাঁর গুরু যে তাঁকে হরিভক্তি দান করেছিলেন, তা কবি একবার ভণিতায় পরিষ্কার বলেছেন—

গুরুবাক্য শিরে ধরি রহিয়াছে সার করি
ভারতের ভূষা হরিপদরজ রে।

এই গুরু সংকীর্ণ মতের মানুষ ছিলেন না তাও দেখা যায় আর একটি ভণিতায়—

সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের আর সব মিছা ফের
ভারত পেয়েছে টের গুরুর প্রসাদে।

এই ক্ষুদ্র দুটি ভণিতা ভারতচন্দ্রের মনোলোকের উপরে বিপুল আলোকসম্পাত করেছে। ভারতচন্দ্রের মত বুদ্ধিজীবী মানুষও মানুষেরই হাত ধরতে চেয়েছিলেন ধর্মগহন পথে চলবার সময়ে, শেষ পর্যন্ত

১৪। চৈতন্যবন্দনা না থাকার দায়িত্ব শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবির শাক্ত পৃষ্ঠপোষকদের উপরে চাপাতে চান :

"শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্তী মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতে শ্রীচৈতন্যও দেবতাদের সঙ্গে বন্দিত হইয়াছেন। ভারতচন্দ্র নদীয়ারাজার সভাকবি হইয়াও নদীয়া-নাগরের বন্দনা গা'ন নাই। শাক্ত নদীয়ারাজের সভায় ছিলেন বলিয়াই বোধহয় চৈতন্যবন্দনা করিতেও পারেন নাই।"

শ্রীযুক্ত রায়ের কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, যদিও একদা-বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, বৃন্দাবন-তীর্থযাত্রী ভারতচন্দ্রকে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধাহীন ভাবা কঠিন। সন্ন্যাস ত্যাগ করলেও বৈষ্ণবতাকে যে ত্যাগ করতে পারেন নি, তার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছি। তাঁর গুরু বৈষ্ণব। এমনকি তাঁর ইষ্টদেবতা কৃষ্ণ—এমন অনু-

একান্ত বিশ্বাস রেখেছিলেন সেই মানুষটির উপরে—এ সংবাদের গুরু-মূল্য আমরা সহজেই বুঝতে পারি। অনুমান করি, এই গুরুর স্বাধীন চিত্তশক্তি আনুষ্ঠানিকতার উপরে ঈশ্বরকে স্থাপন করে, গোষ্ঠীবন্ধন ত্যাগ করতে তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল।

এখানে আমরা ভারতচন্দ্রের বৈষ্ণবতার প্রশ্নটিকে একটু বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করতে চাই। বিশেষ পরীক্ষার কারণ, অনেকের মতে, ভারতচন্দ্রের কাব্যে বৈষ্ণবদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে। আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি—এ ধারণা একেবারে ভিত্তিহীন। তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের সঙ্গে বৈষ্ণবতার সম্পর্কের কথা একটু আগে বলেছি। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর ভারতচন্দ্র-জীবনীতে কীর্তনের সময়ে কবির প্রেমাশ্রুপতনের কথাও বলেছেন। এখানে কাব্য থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করব, ত্রয়ী-কাব্য থেকেই। অন্নপূর্ণামঙ্গল রচনার আগে, ধর্মপ্রেরণায় যিনি বৈষ্ণবসন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তিনি যে তাঁর প্রথম দিককার রচনায় অর্থাৎ সত্যপীরের পাঁচালীতে, হরিস্মরণ করবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, বিশেষতঃ সত্যপীর যখন কবির মতে বিষ্ণুর রূপান্তর।

মানের কারণ আছে, তাও বলেছি। শাক্ত কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত কাব্যে তিনি কী পরিমাণে কৃষ্ণভক্তি প্রকাশ করেছেন, তাও দেখিয়ে দিয়েছি।

তাহলে চৈতন্যবন্দনা না করার কারণ কি? মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও কারণ হতে পারেন, যিনি ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রকে ভক্তি করতেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে হয়ত অনুরূপ ভক্তি করতেন না। নবদ্বীপে শাক্ত-বৈষ্ণবের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত যথেষ্ট ছিল; সেজন্য হয়ত শাক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বৈষ্ণবের অবতারকে সহ্য করতে রাজি ছিলেন না। এবং সেইজন্যই বোধহয় ভারতচন্দ্র কয়েকবার জগন্নাথদেবকে লক্ষ্য করে, 'মহাপ্রভু' শব্দ ব্যবহার করলেও উক্ত শব্দের বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যবহারটিকে গ্রহণ করেন নি।

এই অনুমানমূলক কারণগুলির দ্বারা আমরা সম্ভবতঃ কৃষ্ণচন্দ্র ও ভারতচন্দ্র, উভয়ের প্রতি যথেষ্ট অবিচার করছি। শেষ পর্যন্ত মনে হয়, মঙ্গলকাব্যে ক্রমবর্ধমান সংস্কৃত পুরাণপ্রীতিই চৈতন্যবর্জনের কারণ। শ্রীচৈতন্য, তাঁর অলৌকিক মহিমা সত্ত্বেও, ঐতিহাসিক মানব, আর বন্দনার সকলেই পৌরাণিক দেবতা।

কবির পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কাব্য রসমঞ্জরী শাক্ত কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে লিখিত হলেও তার সূচনায় প্রেমের দেবদেবী রাধাকৃষ্ণের বন্দনা আছে। বলা যেতে পারে, প্রেমতত্ত্ব বোঝাবার কালে অন্ততঃ রাধাকৃষ্ণের নাম-স্মরণে আপত্তি করবার মতো মূঢ় ছিলেন না কৃষ্ণচন্দ্র (হায়, তাঁর নিজের নামই যে 'কৃষ্ণচন্দ্র'—নামের আত্মহত্যা তিনি করে উঠতে পারেনি!) —সুতরাং ত্রয়ী কাব্যকেই এবার নেড়ে-চেড়ে দেখা যাক।

অন্নদামঙ্গল কাব্য বিভিন্ন পালায় বিভক্ত—এক-এক পালাকে এক-একদিন গাওয়া হয়—প্রতি পালা কবি শেষ করেছেন হরিধ্বনি দিয়ে। হয়ত ওটা প্রচলিত রীতি, রীতির উপরে রাজা হাত দেন কি করে, নিশ্চয় সেই জন্যই কাব্যসূচনায় বৈষ্ণবদেবতার বন্দনায় তিনি আপত্তি করেন নি। [এবং কৃষ্ণচন্দ্র কিভাবেই বা তাঁর পূর্বপুরুষ, অন্নদাপূজক ভবানন্দ মজুমদারের দিল্লীযাত্রাকালে গোবিন্দ-প্রণাম নিবারণ করবেন? পূর্বপুরুষের প্রতি ওটুকু ভক্তি নিশ্চয় কৃষ্ণচন্দ্রের ছিল। তবে তিনি কি কবিকে একটু চোখ টিপে দিয়ে ভবানন্দের ঐ দুষ্কৃতিটাকে গোপন করাতে পারতেন না, ইচ্ছা থাকলে?] এরই মধ্যে না-হয় কবির জগন্নাথ-বন্দনাদিকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু তাই বলে কাব্যের একেবারে আরম্ভের গণেশবন্দনার শেষে ভণিতায় কবি বলবেন?—

> কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি-আশে ভারত সরস ভাষে
> রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।

কি মারাত্মক—সমালোচকগণের কৃষ্ণচন্দ্র-বিরোধী সিদ্ধান্তের পক্ষে! কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে যে শাক্ত-কাব্য ভারতচন্দ্র লিখেছেন, তার উদ্দেশ্য কৃষ্ণভক্তিলাভ !!

কবি কি ভুল করে ওকথাটা লিখেছিলেন, কিংবা মাত্র একবার লেখার অন্যায়ের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন?—না। পরের শিব-বন্দনার ভণিতাতেও একেবারে এক কথা !! এই ভণিতা আরও তাৎপর্য-পূর্ণ এইজন্য যে, অন্নদাস্বামী শিবের বন্দনার অন্তে কবি নিজের জন্য কৃষ্ণভক্তি চেয়েছেন।

এক্ষেত্রে আমি যে কিছু আরোপ করছি না, কবির একটি শিব-সঙ্গীতের শেষাংশ লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে—

শিব শিব শিব কয়ে জ্ঞানবাপীকূলে রয়ে
সুখে রব শিব হয়ে কোথায় না ধাব।
শিবের করুণা হবে দেখিব ভবানীভবে
ভারত কহিছে তবে হরিভক্তি চাব॥

আরও প্রমাণ—একটি অন্নদাসঙ্গীতে কবি বললেন—অন্নদা সমস্ত কামনা পূরণ করেন। সেই কৃপাময়ীর কাছে কবি কী চাইলেন ?—

ভারত বিনয় করে অন্নে পূর্ণ করো ঘরে
হরিভক্তি দেহ মোরে তবে দয়া জানি॥

আর একটি সঙ্গীতে কবি বলছেন—'ভারত ভূতলে কভু নাহি টলে, রাধাকৃষ্ণ-পদে বাঁধা।' অন্যত্র মাতোয়ারা হয়ে কবি গান ধরেছেন :

কি কর নর, হরি ভজ রে!
ছাড়িয়া হরির নাম কেন মজ রে!
তরিবারে পরিণাম হর জপে হরিনাম
হরি-ভজি পূর্ণকাম কমলজ রে॥

এই গানটি অন্নদামঙ্গলে 'শিবপূজা নিষেধ' অধ্যায়ের শীর্ষে আছে। অধ্যায়মধ্যে ব্যাস প্রচণ্ড শিবনিন্দা করার পরে প্রবল হরিমাহাত্ম্য শুনিয়েছিলেন। ব্যাসের মনোবিকার তাঁর ভক্তির কথাকেও কটু করে তুলেছিল। সেই অধ্যায়েরই শীর্ষে গানের মধ্যে একই ধরনের কথা বললেন কবি, কিন্তু তাঁর নির্মল স্নিগ্ধ সুগভীর ভক্তি গানটিকে যথার্থ অধ্যাত্মসঙ্গীত করে তুলল।

বিদ্যাসুন্দরে যে-সব রাধাকৃষ্ণ-সঙ্গীত আছে, অনেকগুলিই আছে, তাদের ভক্তিপ্রবণতা সম্বন্ধে আলোচনা কিছু পরে করব।

ভারতচন্দ্রের ধর্মভাবনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশে এসে পড়েছি। ধর্মদ্বন্দ্ব থেকে ধর্মসমন্বয়। সকল বৈষ্ণব-ভাবপ্রেরণা সত্ত্বেও ভারতচন্দ্র

দার্শনিকভাবে অদ্বৈতমুখী। এবং অদ্বৈতভাবনাকে আত্মসাৎ না করলে কারো পক্ষে ধর্মসমন্বয়ী হওয়াও সম্ভব নয়।

এই অদ্বৈতভাবনার এক অংশে আছে জীবব্রহ্মবাদ। যত্র জীব তত্র শিব। কবির শিবসঙ্গীতের মধ্যে এই তাত্ত্বিকতা দেখা যায়। এরই অন্য-তর প্রকাশ দেখা গেছে জগন্নাথের মহাপ্রসাদের মহিমাবর্ণনার মধ্যে।

'প্রসূতিস্তবে দক্ষ জীবন' অধ্যায়ের শীর্ষসঙ্গীতে উক্ত তত্ত্বের দ্ব্যর্থহীন প্রকাশ :

শিবগুণ কি কহিব কোথায় তুলনা দিব
জীব শিব হয় শিব সেবনে॥
শিব শিব বলে যেই এই দেহে শিব সেই
শিব নিজপদ দেই সে জনে।

শিব তাঁর সংসারলীলা সত্ত্বেও জ্ঞানের দেবতা। জ্ঞানযোগে শিবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবার কথা একটি গানে ভারতচন্দ্র বলেছেন ('সুখে রব শিব হয়ে'), তা আগেই উদ্ধৃত করেছি।

শিব যদি জীবের সঙ্গে অভেদ হন, তাহলে তিনি যে হরির সঙ্গে অভেদ হবেন, এ আর অভিনব কথা কি! অভিনব কথাই কিন্তু সাম্প্র-দায়িকগণের কাছে। সেই সংকীর্ণচিত্তদের বিরুদ্ধে ভারতচন্দ্র অন্নদা-মঙ্গল ও মানসিংহে যুদ্ধঘোষণা করেছিলেন। তাঁর সমন্বয়ী ধর্মভাবনার একাংশকে প্রকাশ করেছে অন্নদামঙ্গল, অপর অংশকে মানসিংহ।

অন্নদামঙ্গলের মধ্যে কবি হিন্দুধর্মের প্রধান দুটি সম্প্রদায়ের কল-হের চেহারা খুলে ধরে তার নিরর্থকতা দেখিয়েছেন অদ্বৈতভাবনার আলোকে। ব্যাসকাহিনীর অবতারণা এই জন্যই, সেকথা আগে বলেছি। এবার ব্যাসের কথা কিছু বেশি উপস্থিত করা যাক।

বৈষ্ণব ব্যাস ধর্মনিষ্ঠা দেখিয়ে বললেন, নারায়ণ ভজনা করলেই কেবল মোক্ষপদ পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে নিজ সাম্প্রদায়িকতাও খুলে দেখালেন প্রধান দেবপ্রতিপক্ষ শিবের নিন্দা করে। তারপর ধর্মসংঘা-তের মধ্যে ব্যাস কিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, কিভাবে ক্রমান্বয়ে মত পরিবর্তন করেছিলেন, সেসব কথা পরে বলব ব্যাসের চরিত্রায়ন-প্রসঙ্গে,

এখানে তাত্ত্বিক দিকটির উল্লেখই বিশেষভাবে করা যাক। ব্যাস, বিষ্ণু ও শিবের পার্থক্য যখন দেখাচ্ছেন, তখন কবি ভাবছেন—'অভেদ হইল ভেদ এ বড় বিরোধ।' গানে বলেছেন :

হরি হরে করে ভেদ নর বুঝে না রে।
অভেদ কহে চারি বেদ॥
অভেদ ভাবে যেই পরম জ্ঞানী সেই
তারে না লাগে পাপ-ক্লেদ॥
যে দেহে হরি হরে অভেদরূপে চরে
সে দেহে নাহি তাপ স্বেদ॥
একই কলেবর হইলা হরি হর
বুঝিতে প্রেম-পরিচ্ছেদ।
যে জানে দুই রূপে সে মজে মোহকূপে
ভারতে নাহি এই খেদ॥

এইসব কথা বলার সময়ে কবি যেন 'দৈববাণী' করছিলেন! কারণ বিষ্ণু-দেবতা ব্যাসের ভ্রান্তবুদ্ধি দেখে যা বলেছিলেন, তা কবির কথারই প্রতিধ্বনি!—

যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব।
শিবের করিলা নিন্দা কি আর বলিব॥
শিবের প্রভাববলে আমি চক্রধারী।
শিবের প্রভাব হইতে লক্ষ্মী মোর নারী॥
শিবেরে যে নিন্দা করে আমি তারে রুষ্ট।
শিবেরে যে পূজা করে আমি তারে তুষ্ট॥
মোর পূজা বিনা শিব-পূজা নাহি হয়।
শিবপূজা না করিলে মোর পূজা নয়॥

বলাবাহুল্য শিবও অনুরূপ কথা বলবেন :

মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি।
আমি তো তাহার পূজা গ্রহণ না করি॥

হরিভক্ত হয়ে যেবা না মানে আমারে।
কদাচ কমলাকান্ত না চাহেন তারে॥
হরি হর দুই মোরা অভেদশরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥
রুদ্রাক্ষ তুলসীমালা যেই ধরে গলে।
তার গলে হরি হরে থাকি গলে গলে॥

কিছু পরেই শিব একই কথা আবার বলেছেন। প্রসঙ্গের শেষেও সেই কথাই, যেখানে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ব্যাসের উপরে দেবী অন্নদা দৈববাণী নিক্ষেপ করেছিলেন। তার মধ্যে তিনি কেবল হরির সঙ্গে হরের অভেদের কথাই বলেন নি, তৃতীয় ঈশ্বর বিধির সঙ্গে অভেদের কথাও জানিয়েছেন :

হরি হর বিধি তিন আমার শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥

এইখানে কবির শক্তিতত্ত্বের কথা আসছে। কবির অদ্বৈতভাবনা লোকজগতের ক্ষেত্রে প্রকাশমুখে শক্তিবাদকে গ্রহণ না করে অগ্রসর হতে পারে নি। শক্তি বিনা সৃষ্টি নেই। গুণময় ঈশ্বর গুণময়ী শক্তির অধীন। অন্নদামঙ্গলকার ভারতচন্দ্রের অন্ততঃ তাই বিশ্বাস ছিল। সুতরাং তিনি উপরের উদ্ধৃত অংশে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে শক্তিরই ত্রি- বিকাশরূপ বলতে চেয়েছেন। অন্য অনেক জায়গায় এই ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। মানসিংহের অন্তর্গত একটি গানে কবি বলছেন :

ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম সাধন তোমার নাম
বিধি হরি হর ভাবে ও-পদ দুখানি।

শক্তিই যে, সব সৃষ্টির মূল, সেকথা অব্যর্থ শক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে অন্নদামঙ্গলের একটি গানে :

ভব সংসার-ভিতরে।
ভব ভবানী বিহরে॥
ভূতময় দেহ নবদ্বার গেহ
নর-নারী কলেবরে।

গুণাতীত হয়ে নানা গুণ লয়ে
দোঁহে নানা খেলা করে ॥
উত্তম অধম স্থাবর জঙ্গম
সব জীবের অন্তরে ।
চেতনাচেতনে মিলি দুই জনে
দেহী-দেহরূপে চরে ॥
অভেদ হইয়া ভেদ প্রকাশিয়া
একি করে চরাচরে ।
পাইয়াছে টের কি করে এ ফের
কবি রায় গুণাকরে ॥

জীব কি করে শিব হয়, এই গানে তা অধিকন্তু ব্যাখ্যাত ।

ব্যাসের মনের কদাকার চেহারা খুলে ধরে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়গুলির কলহ-কটুতার উপরে ধিক্কার দিয়েই কবি থেমে যান নি—আরও অগ্রসর হয়ে হিন্দু-মুসলমান ধর্মদ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ এনেছেন। মানসিংহে সে ব্যাপারটি বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত ।

ইসলাম সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র তীক্ষ্ণভাবে সচেতন ছিলেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রবৃত্তিপ্রবলতার পিছনে সমকালীন ফারসী-সংস্কৃতির প্রভাব ছিল, একথা অনেকেই বলেছেন। সত্যপীরের পাঁচালীর মধ্যে ইসলামের শক্তিরূপকে তিনি স্বীকার করেছেন ঃ

দ্বিজ ক্ষত্রী বৈশ্য শূদ্র কলিযুগে ক্রমে ক্ষুদ্র
যবনে করিতে বলবান ।
ফকির শরীর ধরি হরি হৈলা অবতরি
এক বৃক্ষতলে কৈলা স্থান ॥

মিশ্রদেবতা সত্যপীর ভারতচন্দ্রের উদ্‌ভাবন নন, কিন্তু যেভাবে কবি তাঁর কথা বলেছেন তাতে বোঝা যায়, এই মিশ্রদেবতা-সৃষ্টিতে হিন্দুদেরই আগ্রহ ছিল বেশী, পরাজয়ের আত্মগ্লানিকে ধর্মীয় রহস্যের মধ্যে আবৃত করে রাখার সেই একান্ত প্রয়াস ।

এই পাঁচালী রচনার পনর বৎসর পরে ভারতচন্দ্র অন্নপূর্ণামঙ্গল

লেখেন—সেই সময়ের মধ্যে জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা তিনি সংগ্রহ করে ফেলেছেন, শাস্ত্রবোধ, আত্মবিশ্বাস বহুল পরিমাণে বেড়ে গেছে, সম্ভবতঃ মুসলমান রাজশক্তির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বদলেছে এবং হিন্দুরাজার আশ্রয়ে মানসিকভাবে নিরাপদ বোধ করেছেন। এমনও হতে পারে, উক্ত হিন্দুরাজা মুসলমান নবাবের দ্বারা অত্যন্ত উৎপীড়িত হয়েছিলেন, তার বিষয়ে প্রতিশোধাত্মক মনোভাব তাঁর জেগেছিল। এই সমস্ত জড়িয়ে তিনি মুসলমান রাজশক্তির ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বিষয়ে খোলাখুলি মতপ্রকাশে প্রণোদিত হয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর চিন্তা এতই পরিপক্ব হয়েছে যে, মাত্র সংকীর্ণতাকে আঘাত করাই তাঁর লক্ষ্য হয় নি—এক সার্বভৌমিক ধর্মবিজ্ঞানের প্রকাশ করাও ইচ্ছা-বিষয় হয়ে উঠেছিল। ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবিদের কেউ-কেউ হিন্দু ধর্মশাখাগুলির মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন।[১৫] ভারতচন্দ্র ব্যাপক-

১৫। সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র (যাঁকে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'শিবায়ন কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি' মনে করেন) ভারতচন্দ্রের একশো বছর আগে তাঁর কাব্য রচনা করেন—তাতে ধর্মসমন্বয় সম্বন্ধে যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, তা বিস্ময়করভাবে ভারতচন্দ্রের অনুরূপ। এই কবির বাসস্থান ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান থেকে খুব দূরে নয়, এবং এঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে যে বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছিল, তা ভারতচন্দ্রের পারিবারিক দুর্বিপাকের অনুরূপ। বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম নাকি এঁর রসপুরের বাড়িতে হামলা করে গৃহদেবতাকে কেড়ে নিয়ে যান। সেই মর্মান্তিক ঘটনাই এঁর আশু মৃত্যুর কারণ। অনুমান করতে ইচ্ছা হয়, ভারতচন্দ্র কাছাকাছি গ্রামের এই কবির কাব্য পড়েছিলেন, এবং এঁর ট্র্যাজেডির বিষয় শুনেছিলেন।

এঁর কাব্য ভারতচন্দ্র পড়ুন বা না-পড়ুন, এঁর ধর্মধারণার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের অদ্ভুত ঐক্য। হরিহরের অভেদত্বের বিষয়ে রামকৃষ্ণ গ্রন্থসূচনায় লিখেছেন:

শুন প্রভু চন্দ্রচূড় তোমা না চিনে মূঢ়
ভেদ করে শঙ্কর কেশবে।

কাব্যসমাপ্তিতে লিখেছেন: "হরিহর দুঁহে এক শরীর অভেদ।"

নিরাকার সত্য সম্বন্ধে:

এক ব্রহ্ম সনাতন নিরাকার নিরঞ্জন
নিত্য নির্গুণ নির্বিকার।

তর অভিজ্ঞতার জন্য সেই প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সমন্বয়।[১৬]

মানসিংহের সঙ্গে ভবানন্দ মজুমদার দিল্লী গিয়েছিলেন। সেখানে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কাছে মানসিংহ আরজি পেশ করলেন—ভবানন্দ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করেছেন সুতরাং তাঁকে জমিদারী দেওয়া হোক। মানসিংহ এই সঙ্গে জুড়ে দিলেন—দেবী অন্নদার কৃপাতেই ভবানন্দের পক্ষে ওরকম সাহায্য করা সম্ভব হয়েছিল। অন্নদার নাম শুনেই জাহাঙ্গীর ক্ষেপে অস্থির। অবিলম্বে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদের আচার-আচরণ সম্বন্ধে যাচ্ছেতাই গালাগালি শুরু করলেন। ভবানন্দ তার যথোপযুক্ত উত্তর দিলেন। ফল ভাল হল না। ভবানন্দের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠিত হল এবং তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। অবশ্য তাতে তাঁর ক্ষতি না হয়ে বৃদ্ধিই হল। তাঁর হয়ে অন্নদা জাহাঙ্গীরের উপরে এমন শোধ তুললেন যে, জাহাঙ্গীর ত্রাহি-ত্রাহি করতে লাগলেন। জাহাঙ্গীরের রাজ্যে দৈবিক এবং ভৌতিক এমন-সব ব্যাপার ঘটতে লাগল যার ফলে জাহাঙ্গীরের পক্ষে অন্নদার শরণ না নিয়ে উপায় রইল না, এবং, মঙ্গলকাব্যে যেহেতু শক্তিমানের অন্যায় সর্বদা পুরস্কৃত হয় (অবশ্যই পূজাপ্রচারের জন্য), তাই জাহাঙ্গীর দেবীর দর্শন ও কৃপালাভ পর্যন্ত করলেন।

১৬। ভারতচন্দ্রের কালে বাংলায় যথেষ্ট ইউরোপীয় সমাগম হয়ে গেছে। আগে একবার ইঙ্গিত করেছি, ভারতচন্দ্র তাঁদের বিষয়ে অবহিত থাকতে পারেন কিন্তু কবি খ্রীস্টধর্মের ভিতরে যথেষ্ট প্রবেশ করেছিলেন মনে হয় না, তা করলে হয়ত তাঁর ধর্মসমন্বয়-প্রসঙ্গে খ্রীস্টধর্মের উল্লেখ করতেন।

এমনও হতে পারে তিনি খ্রীস্টধর্মতত্ত্ব সবিশেষ জানতেন। সেক্ষেত্রে অনুল্লেখের কারণ হয় : ভারতীয় সমাজজীবনে তখনো খ্রীস্টধর্ম গ্রাহ্যশক্তি নয়, তাই সে ধর্মের সঙ্গে অপর ধর্মের সমন্বয়ের কথা বলবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। খ্রীস্টধর্মের বিশ্বভূমিকার কথা যদি তিনি জেনেও থাকেন (জানতেন কিনা খুবই সন্দেহের বিষয়) তাহলেও সেই ধর্ম ভারতবর্ষের ইতিহাসে পরবর্তীকালে বিরাট ভূমিকা নেবে, এ রকম অলৌকিক কল্পনা নিশ্চয় তাঁর সাধ্যে ছিল না। →

ভারতচন্দ্র অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়েছেন বলতে হবে। নিতান্ত মূর্তি-দ্বেষী মুসলমানদের পর্যন্ত দেবী-পাদমূলে টেনে এনেছেন এবং তাদের দিয়ে মূর্তিপূজা করিয়েছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে দিল্লী-জয়ই আসল জয়। ভারতচন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলকাব্য রচনায় অভিলাষী হয়েই বোধহয় অন্নদার দিল্লীজয়কথা লিখেছেন !! বাদশাহের কী অপূর্ব ভক্তিনত মূর্তি ! ভবানন্দকে জাহাঙ্গীর বলছেন :

অধম যবন আমি তপস্যা কি জানি।
অধর্মেরে ধর্ম বলি, ধর্ম নাহি মানি॥
তবে যে আমারে দেখা দিলা মহামায়া॥
তার মূল কেবল তোমার পদছায়া॥
অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে।
পুষ্পসঙ্গে কীট যেন উঠে সুরমাথে॥

জাহাঙ্গীরের ভক্তি আরও অগ্রসর হয়, অন্নদাপূজায় এখন তাঁর পরম আগ্রহ, কিন্তু 'হায়রে পূজিব কিসে কোনো চীজ্ নাই!' ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। পূজার চীজ্ যোগাড় হতে দেরী হল না। ঢেঁড়া

খ্রীস্টান ও খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে উল্লেখ তাঁর কাব্যে আছে। বিদ্যাসুন্দরে 'বর্ধমানের গড়বর্ণন-এর মধ্যে পাই :

প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস।
ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস॥
দিনামার এলেমান করে গোলন্দাজী।
সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী॥

'পাতশার প্রতি মজুন্দারের উত্তর'-এর মধ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রসঙ্গ :

যবনেরে কত ভাল ফিরিঙ্গির মত।
কর্ণভেদ নাহি করে না দেয় সুন্নত॥
শৌচ আচমন নাহি যাহা পায় খায়।
কেবল ঈশ্বর আছে এই বলা দায়॥

এই উদ্ধৃতি অন্ততঃ দেখিয়ে দেয়, খ্রীস্টধর্মের গভীরে কবি প্রবেশ করেন নি।

পেয়ে পূজাস্থলে সারা শহর ভেঙে পড়ল। তারপর ? সে এক আশ্চর্য দৃশ্য, ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুদের সবসেরা স্বপ্ন :

কাজী ছাড়ে কলমা, কোরান ছাড়ে কারী।
হুলাহুলি দেই যত যবনের নারী॥

ভারতচন্দ্রের অলৌকিক বস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা—অঘটন-ঘটন-পটীয়সী-প্রতিভা—কোন্ উপাদানে ঐ মহা সৃষ্টিকার্য করেছে? সে উপাদানের নাম—দুর্বল পরাভূত হিন্দুর স্বপ্নের আত্মতুষ্টি !! সমস্ত মধ্য-যুগের ইতিহাসে সেই পরাজয়ের কাহিনী লেখা আছে। বিদ্যাপতি থেকে আরম্ভ করে অনেকেই কাব্যে সে কথা কয়েছেন। ভারতচন্দ্রও কিছু বলেছেন। তাঁর জাহাঙ্গীরের মনোগত ইচ্ছা :

আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই।
সুন্নত দেওয়াই আর কলমা পড়াই॥
জন কত তোমরা গোঁয়ার আছ জানি।
মিছা লয়ে ফির বেইমানী হিন্দুয়ানী॥
দেহ জ্বলি যায় মোর বামণ দেখিয়া।

জাহাঙ্গীর হিন্দুদের সম্বন্ধে আরও কিছু চোস্ত খিস্তি করেছেন বিশ্বস্ত মানসিংহের কাছে :

আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম।
কহি যদি হিন্দুপতি পাইবে সরম॥
শয়তানে বাজী দিল না পেয়ে কোরান।
ঝুটমুট পড়ি মরে আগম পুরাণ॥…
আর দেখ নারীর খসম মরি যায়।
নিকা নাহি দিয়া রাঁড় করি রাখে তায়॥
ফল হেতু ফুল তার মাসে মাসে ফুটে।
বীজ বিনা নষ্ট হয় সে পাপ কি ছুটে॥
মাটি কাঠ পাথরের গড়িয়া মুরুত।
জীউ দান দিয়া পূজে নানামত ভূত॥

আদমীতে বনাইয়া জীউ দেয় যারে।
ভাব দেখি সে কি তারে তরাবারে পারে॥
বিশেষে বামণ-জাতি বড় দাগাদার।
আপনারা এক জপে আরে বলে আর॥
পরদারে পাপ বলি বাঁদী রাখে নাই।
দুঃখভোগ হেতু হিন্দু করেছে গোঁসাই॥…
যতেক বামণ মিছা পুথি বনাইয়া।
কাফর করিল লোকে কোফর পড়িয়া॥
দেবী বলি দেই গাছে ঘড়ায় সিন্দুর।
হায় হায় আখের কি হইবে হিন্দুর॥

বলাবাহুল্য নিন্দার ঐ বিশেষ ভাষা জাহাঙ্গীরের মুখনিঃসৃত নয়। তিনি অনেক বেশী বিদগ্ধ রুচিমান ছিলেন। তবে নিঃসন্দেহে ও-কথাগুলি অনেক গাজি-কাজি-মোল্লার, যারা সমস্ত মধ্যযুগ ধরে ঘৃণা ও হিংসার মশাল জ্বালিয়ে রেখেছিল।

বিস্ময়ের কথা, হিন্দুদের মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে উদ্ধৃত অংশে জাহাঙ্গীর যা বলেছেন, পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকেরা তাঁর সে ধরনের কথার সন্ধান আমাদের দিয়েছেন। তাঁদের কাছ থেকে এ সংবাদও পাই—জাহাঙ্গীর হিন্দুপণ্ডিতগণের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা যথেষ্ট করেছেন।

জাহাঙ্গীরের ধর্মমত সম্বন্ধে ডঃ বেণীপ্রসাদ তাঁর 'হিস্টরি অব জাহাঙ্গীর'-এ জানিয়েছেন (ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের সূত্রে পেয়েছি)—জাহাঙ্গীর গোঁড়া মুসলমান ছিলেন না—এবং মোল্লা-নিন্দিত অনেক কাজকর্ম করতেন। তিনি খ্রীস্টধর্মের প্রতি কিছুটা আসক্ত ছিলেন, যদিও খ্রীস্টের অলৌকিক জন্ম, ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার রহস্য, তাঁর কাছে বোধগম্য ছিল না। সব জড়িয়ে তাঁকে উদার-ধর্মবাদী বলা যায়; গভীর ধর্মানুভূতি না থাকলেও তাঁর বৈদগ্ধ্য তাঁকে অসহিষ্ণু হতে দেয় নি; তিনি বিভিন্ন ধর্মের সাধুসঙ্গ করতেন ও তাঁদের উৎসবাদিতে যোগ দিতেন। সেজন্য গোঁড়া মুসলমানেরা তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতেন।

জাহাঙ্গীরের উদারতার কতখানি অংশ হিন্দুরা পেয়েছিল বলা

শক্ত। একথা বলা হয়েছে, তিনি হিন্দুপণ্ডিতদের সঙ্গে বেদান্ত-বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং হিন্দুদের দেওয়ালী, দশেরা, রাখীবন্ধন, শিবরাত্রি প্রভৃতিতে বাধা দেন নি। কিন্তু এও দেখা যায়, বরাহ অবতারের মূর্তি তিনি ধ্বংস করেছেন এবং কাংড়ায় ১৬২২ খ্রীঃ দুর্গামন্দির দর্শনে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—এখানে সারা জগৎ যেন ভ্রান্তিতে ডুবে আছে।

জাহাঙ্গীর আত্মজীবনীতে হিন্দুপণ্ডিতদের সঙ্গে ধর্মালোচনার বিবরণ দিয়েছেন। তাতে দেখা যায়, তিনি দশাবতার-তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। অবতারতত্ত্ব তাঁর কাছে উদ্ভট—যিনি সর্বশক্তিমান অসীম, তিনি কি করে নির্দিষ্ট দেহের আকারে আবদ্ধ থাকবেন? যদি বলা যায়, পরম আলোকে ওঁরা দীপ্যমান, তার উত্তর, সে আলোক ওঁদের মধ্যেই বাঁধা নেই। আরও নানা আপত্তি জাহাঙ্গীর উপস্থিত করেছিলেন। তাঁর দাবি, তাঁর কাছে পরাভূত হয়ে হিন্দুপণ্ডিতেরা স্বীকার করেন, তাঁরা পূর্বে যা বলেছেন, তা না-জেনেই বলেছেন (জাহাঙ্গীর অবশ্য সবকিছু জেনেই বলেছিলেন); ঈশ্বর বাস্তবিক অজ্ঞেয়; তবে পরম ঈশ্বরের দিকে যেতে হলে কোনো একটা বস্তু ধরে অগ্রসর হলে সুবিধা হয়। বিজয়ী জাহাঙ্গীর সাফ জানিয়ে দেন—না, সেটি হচ্ছে না।[১৭]

১৭। From *Wakiet-i-Jahangiri* (Autobiography of Jehangir: Discussion with learned Hindus:)

"One day I observed to some learned Hindus that if the foundation of their religion rested upon their belief in the ten incarnate gods, it was entirely absurd; because in this case it became necessary to admit that the Almighty, who is Infinite, must be adorned with a definite breadth, length and depth. If they meant that in these bodies the supremely light was visible, it is equally visible in all things, it is not limited to them alone; and that if they said that these incarnate gods were the emblems of His particular attributes it is also not admissible, for amongst the people of all religions, there have flourished persons who performed miracles and were possessed of much greater power and talents than others of their

হিন্দুপণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনার সময়ে জাহাঙ্গীর যেসব কথা বলেছিলেন (আমাদের মনে হয়, ভারতচন্দ্র যেভাবেই হোক, জাহাঙ্গীরের ধর্মবিষয়ক বক্তব্য জেনেছিলেন; জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী কি তখন প্রাপ্তব্য ছিল?)—ভারতচন্দ্রের লেখায়, বিস্ময়ের কথা, তার সারবস্তু পাই, যদিও প্রচুর রং চড়ানো আছে। ভবানন্দ মজুমদার জাহাঙ্গীরের সে কথাগুলি উপযুক্তভাবে খণ্ডনও করেছেন। ভবানন্দের উক্তিগুলি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, যুক্তিতে ধারালো এবং দৃঢ়তায় শ্রদ্ধেয়। কোনো সন্দেহ না রেখে বলা যায়, মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যে হিন্দুর ধর্মাচার ও শাস্ত্রমতের প্রতি আক্রমণের এমন যোগ্য প্রত্যুত্তর আর কোথাও নেই। ভবানন্দের কথায় কিছু দোষের অংশ আছে, জাহাঙ্গীরের নিন্দার উত্তরে তিনি প্রতিনিন্দা করেছিলেন, পরের কাঁদা ঘেঁটে নিজের কাদা নির্মল প্রমাণ করার এহেন চেষ্টা বহু প্রাচীন (উত্তেজনাবশে কবি দেবীকেও কোঁদলে নামিয়াছেন এখানে), কিন্তু তাঁর বাকি বক্তব্যে এমন-কিছু আছে, যার উদারতা আমাদের স্পর্শ করে—যার মহত্ত্বে আমরা অভিভূত হই:

হিন্দু মুসলমান আদি জীব জন্তু যত।
ঈশ্বর সবার এক নহে দুই মত॥···
মাটি কাঠ পাথর প্রভৃতি চরাচর।
পুরাণে কোরানে দেখ সকলি ঈশ্বর॥
তাঁহার মূরতি গড়ি পূজা করে যেই।
নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেখে সেই॥

---

time. After a long discourse, they at last admitted that there was a God who had no corporeal form and of whom they had no definite notion. They said that as to understand that singular and invisible Being was beyond their comprehension, they could not form any idea of Him but by the means of some natural objects, and therefore they had made these ten figures the medium of raising their minds up to the Supreme God. I then told them that they could not attain that end by this means."

সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার।
সোনা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার॥…
প্রণাম করিতে মাথা দিল যে গোঁসাই।
সংসারে যে-কিছু মূর্তি তাঁহা ছাড়া নাই॥
ভেদজ্ঞানী নহে হিন্দু, অভেদ ভাবিয়া।
যারে তারে সেবা দেয় ভূমে মাথা দিয়া॥

ভবানন্দের কণ্ঠে বলাই বাহুল্য ভারতচন্দ্রেরই কণ্ঠস্বর। সাকার উপাসনার পক্ষে যে যুক্তি তিনি অতি সংক্ষেপে উদ্ধৃত অংশে উপস্থিত করেছেন, তার অধিক কথা পরবর্তীকালেও বলা কঠিন হয়েছে। এবং ভারতচন্দ্রের সাহসী চিন্তার কথাও মনে রাখতে হবে—মঙ্গলকাব্যের কবি হয়েও তিনি শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব-সমেত সমস্ত হিন্দুব সঙ্গে মুসলমানকে এক করে দেখতে পেবেছেন। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্কের রূপ যখন জাতীয় সমস্যার বিষয়, তখন ভারতচন্দ্র তাকে না এড়িয়ে গিয়ে ধর্মক্ষেত্রে সমভূমি নির্মাণ করতে চেয়েছেন। এবং ভারতচন্দ্রের শিল্পবোধ আব একটি জিনিস প্রশংসনীয় কৌশলের সঙ্গে দেখিয়েছে। ভবানন্দের অনেক কথাই ভাবতচন্দ্রেব, কিন্তু সব কথা নয়। সমন্বয়বাদী হয়েও কাহিনীব প্রয়োজনে ভবানন্দ ক্ষেত্রবিশেষে নিন্দার উত্তেজনায় মেতে উঠেছেন, সেখানে তাঁব স্রষ্টা-কবি ভারতচন্দ্র উভয় ধর্মের আচারনিরপেক্ষ মূলগত সত্যেবই কেবল গান করেছেন। গানের কথা ভাবতচন্দ্রের একান্তই নিজের কথা, যাব মধ্যে তিনি সকল ধর্মসত্যকে গ্রহণ করে, অতিক্রম করেছেন, যেখানে মুক্ত অধ্যাত্মচেতনায় তিনি আকাশপথিক। দুটি গান এক্ষেত্রে পরপর উদ্ধৃত করতে পারি। একটি গান 'পাতশাহের দেবতানিন্দা' অধ্যায়ের শীর্ষে আছে। জাহাঙ্গীর কটুভাষায় হিন্দুর সাকারপূজার নিন্দা করেছিলেন। সে নিন্দা নিন্দার্হ, অথচ তিনি যে-নিরাকারের উপাসক, তার মধ্যে গভীর সত্য রয়েছে—ভারতচন্দ্র তারই কথা গাইলেন:

এ ফের বুঝিবে কেবা।
তার সুঝে বুঝে যেবা॥

নিত্য নিরঞ্জন সত্য সনাতন
মিথ্যা যত দেবী-দেবা।
নীরূপ যে ভাবে স্বরূপ প্রভাবে
বুঝি কিছু বুঝে সে-বা॥
ঈশ্বরের নামে তরি পরিণামে
কেবা গয়া গঙ্গা রেবা।
ভারত ভূতলে যে করে যে বলে
সব ঈশ্বরের সেবা॥

তার পরেই 'পাতশার প্রতি মজুন্দারের উত্তর' অধ্যায়ের উপরে স্থাপিত একটি সঙ্গীতে সাকার ও নিরাকারে যে স্বরূপতঃ কোনো ভেদ নেই, তারই গুঞ্জরণ :

এ কথা কব কেমনে।
নর নিন্দে নারায়ণে॥
যেই নিরাকার সেই যে সাকার
তাঁরি রূপ ত্রিভুবনে।
তেজ ভাবে যোগী দেবী ভাবে ভোগী
কৃষ্ণ ভাবে ভক্তজনে॥
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের বিশ্রাম
কেবল তরে ভজনে।
ভারতের সার গোবিন্দ সাকার
নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে॥

ধর্ম সম্পর্কে কবির চতুর্থ সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে এখানে আসতে পারি। ধর্মসাধনার কিংবা ধর্মরস আস্বাদনের একটা ব্যক্তিগত দিক আছে। সমাজের অধিকাংশ মানুষ অভ্যাসে বা বাঁচার প্রয়োজনে ধর্মের প্রচলিত রূপকে মেনে থাকে। ধর্ম তাদের জীবনে কোনো জ্বলন্ত অস্তিত্ব নয়। সাধকরাই ধর্মের উক্ত আগ্নেয় রূপকে বরণ করে থাকেন। যেমন

এইকালে রামপ্রসাদ করেছিলেন। ভারতচন্দ্র কী ছিলেন? সাধক হবার চেষ্টা যে করেছিলেন আমরা তা জানি, এবং সে চেষ্টা ত্যাগ করেছিলেন, তাও জানি। সংসারপ্রত্যাবৃত্ত ভারতচন্দ্র কিন্তু ধর্মকে ত্যাগ করতে পারেন নি, সে বিষয়ে ভূরি-ভূরি প্রমাণ আমরা দিয়ে এসেছি। সামাজিক ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের প্রকৃতির কথাও বলেছি। এখন ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনে ধর্মের কথা যখন ভাবতে চাই তখন দেখি, তা অগ্নিসত্য নয়, কিন্তু অভ্যস্ত জড় (!) সত্যও নয়—তা রসসত্য। ঈশ্বর রসস্বরূপ, সুতরাং তিনি ভক্তের কাছে রসসত্য, এই অর্থে বলছি না—তাঁর স্মরণে মননে আমার ব্যক্তিচিত্তে এক বিশেষ ধরনের রসের সঞ্চার হয়, সে একান্ত আমারই, আমার রঙে তা রাঙা—এই অর্থে ধর্ম ব্যক্তিক রসসত্য। এই রসসত্যেব মধ্যে যেমন স্বীকৃত ঈশ্বরসত্য থাকে, তেমনি মিষ্টিক রহস্যময়তা এবং রোমান্টিক আতুরতাও থাকে। গানগুলির মধ্যে ভারতচন্দ্রের এই প্রাণ-মনের বা উৎকণ্ঠিত আত্মাব প্রকাশ ঘটেছে। ভারতচন্দ্রের ধর্মপ্রত্যয় দেখাতে বেশকিছু গান ইতিমধ্যে উদ্ধৃত করেছি, তাদেব মধ্যে রয়েছে তাঁব দার্শনিক বোধ—যা অবশ্যই সুবে বিগলিত। এই দর্শন বুদ্ধিক্ষেত্র থেকে চিত্তক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়ে একেবারে জীবনদর্শন হয়ে ওঠে। তখন কবি নিজের মুখোমুখি দাঁড়ান। নিজের অপর মুখে তিনি ঈশ্বরের মুখও দেখেন। এইকালে বিশ্বজননীকে নিজের জননী মনে হয় তাঁর। তখন তিনি গুন্‌গুন্ করে গান ধরেন—'চল চল রে ভাই, চল চল, অন্নপূর্ণা অন্নপূর্ণা বল বল।' মনপ্রাণ গেয়ে ওঠে—'আনন্দ বড় রে! আনন্দ বড় রে!' আনন্দ কখনো ডুবে যায় আধ্যাত্মিক বিষাদে, 'কে তোমা চিনিতে পারে গো মা, বেদে সীমা দিতে নারে গো মা!' কাতর হয়ে দাঁড়ান বড় অভিমানে আশুতোষের কাছে, প্রার্থনার বিদ্যাপতিকে বহুশত বৎসর পরে দেখতে পাই:

আমারে শঙ্কর দয়া কর হে।
শরণ লয়েছি শুনি করুণা-আকর হে॥
তুমি দীনদয়াময় আমি দীন অতিশয়
তবে কেন দয়া নয় দেখিয়া কাতর হে।

তব পদে আশুতোষ পদে পদে মোর দোষ
জানি কেন কর রোষ পামর উপর হে ॥
পিশাচে তোমার প্রীতি মোর পিশাচের রীতি
তবে কেন মোর নীতি দেখে ভাব পর হে।
ভারত কাতর হয়ে ডাকে শিব শিব কয়ে
ভবনদী-পারে লয়ে দূর কর ডর হে ॥

না, শিব বড় উদাসীন, পিতা তিনি, পিতার কাছে কে কবে প্রশ্রয় পেয়েছে ! মা, মা, তুমিই সব, 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে'—

ফিরিয়া চাও মা অন্নদা ভবানী।
জননী না শোনে কোথা বালকের বাণী ॥

একেবারে অবোধ বালকের মতো কবি মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ান :

তুমি অন্ন দেহ যারে অমৃত কি মিঠা তারে
সুধাতে কে করে সাধ এ সুধা ছাড়িয়া।
পরশিয়া অন্নসুধা ভারতের হর ক্ষুধা
মা বিনা বালকে অন্ন কে দেয় ডাকিয়া ॥

কবিমনের এই ব্যক্তি-অনুভূতির প্রসঙ্গে বৈষ্ণবকবিতার কথা এসে যায়, কারণ পদাবলীর মধ্যেই বৈষ্ণবকবিরা নিজেদের হৃদয়ের কথা বহুলাংশে প্রকাশ করেছেন, একথা প্রায়ই বলা হয়। কথাটা আংশিক সত্যও বটে। বৈষ্ণব-তাত্ত্বিকদের নিষেধ সত্ত্বেও কবিদের পক্ষে রাধা বা কৃষ্ণের সঙ্গে অনুভূতির একাত্মতাকে পরিহার করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু বৈষ্ণবকবিতা আবার গোষ্ঠীর ধর্মকবিতা। সেজন্য উক্ত গোষ্ঠীর অনুমোদিত ধর্মভাবনাকে কবিতার মধ্যে প্রকাশ করতে নৈতিকভাবে কবিরা বাধ্য ছিলেন। তার কিছু সুবিধাও তাঁরা ভোগ করেছেন। যেখানে তাঁরা যথার্থ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ নন, সেখানেও সমষ্টিপ্রেরণার কীর্তনসুরকে নিজ কাব্যের ক্ষীণ সুরের সঙ্গে যোগ করে দেবার সুযোগ তাঁরা নিয়েছেন। যেহেতু তাঁরা বৈষ্ণবকবি, এবং প্রেমের কথা

বলছেন, সুতরাং তাঁদের পদ শুনলেই (বা পড়লেই) ভাব ও ভাবালুতায় ভক্ত শ্রোতাদের মন একাকার হয়ে যায়—বৈষ্ণব-প্রেমসাধনার বিপুল ঐতিহ্যের গৌরবচ্ছটা কাব্যের ভাবগত অভাবের শূন্যতার উপরে মায়া-বরণ বিস্তার করে দেয়।

ভারতচন্দ্র অনেক বৈষ্ণবগান লিখেছেন। গোষ্ঠীভুক্ত বৈষ্ণবের মতো করে সেগুলি তিনি লিখতে পারেন নি। ঠিকভাবে বলতে গেলে, লিখতে চান নি। তাঁর কৃষ্ণ, তাঁর রাধা—সে তাঁরই। তাঁর মনোবৃন্দাবনে ঐ রাধাকৃষ্ণের রাসবিহার। ভক্ত বৈষ্ণবের মতো লীলাশুকের ব্যবধান-রক্ষিত ভূমিকা তিনি নেন নি। তিনি নেমে এসেছেন তাঁর প্রেমের প্রাণ-পুত্তলীগুলির পাশে, তাদের খেলা দেখেছেন, এবং সময়ে-সময়ে বলে-ছেন, তোমাদের পুরনো খেলা তো কত যুগ ধরে কত কবির, ভক্তের মধ্য দিয়ে দেখলুম, এবার নতুন খেলা খেলো, আমার ইচ্ছার সুখে সুর মিলিয়ে।

সুতরাং বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে নিবেশিত রাধাকৃষ্ণের গানগুলিকে নতুন চোখেই দেখতে হবে। বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রতি পর্যায়ের আগে যেমন গৌরচন্দ্রিকা, তেমনি বিদ্যাসুন্দরের প্রতি অধ্যায়ের উপরে স্থাপিত রাধা-কৃষ্ণ-গানগুলি যেন কৃষ্ণচন্দ্রিকা। রাধাকৃষ্ণলীলা ও বিদ্যাসুন্দরকেলির সুদূর পার্থক্য। অবৈধ প্রেম উচ্চতর অভীপ্সা-সৃষ্টিতে কতদূর সাফল্য লাভ করতে পারে, তার নমুনা রাধাকৃষ্ণপদাবলী। অপরপক্ষে সমাজ-সংস্থিতির পক্ষে নীতিভ্রষ্ট প্রেমের ক্ষতিকারকতার পরিমাণ বিদ্যাসুন্দর দেখিয়ে দিয়েছে। একটি ক্ষেত্রে সর্বসমর্পণের মহোচ্চ ধর্ম, অন্যক্ষেত্রে ধর্মবিরহিত পঙ্কশয়ন। অথচ রাধাকৃষ্ণপ্রেমের জ্যোতিরহস্যের দ্বারাই কবি বিদ্যাসুন্দরের ভাবাকাশে নভোদীপ্তি রচনা করতে চেয়েছেন। কবি কি সত্যই মনে করেছেন, বিদ্যাসুন্দরের অনুচিত প্রেমের আধ্যাত্মিক ঔচিত্য আছে, (বা রাধাকৃষ্ণ প্রেম রূপক, যা অনেক সমালোচক বলেছেন ; বিষয়টি পরে আলোচ্য), কিংবা রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেও বিশুদ্ধ রোমান্টিক কেচ্ছা বলে তাঁর মনে হয়েছিল? বিদ্যাসুন্দরের প্রেমের মধ্যে অযথা ধর্মচেতনা আবিষ্কার করার মতো বেরসিক কবিকে

ভাবতে ইচ্ছা নেই, অন্যদিকে এমনও বিশ্বাস করি না যে, তিনি রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে ভক্ত হিন্দুর সেন্টিমেন্ট-বর্জিত ছিলেন।

জিনিসটিকে একটু অন্যভাবে দেখলে চলে। বাংলায় বলা হয়, কানু বিনা গীত নাই। গীতে কানু যদি অপরিহার্য হন, তাহলে (গানে যেহেতু গুহাহিত আত্মা তরঙ্গিত হয়ে ওঠে) গানের কানুতে কবি আত্মদর্শন করবেনই। সেক্ষেত্রে কানু কবির কাছে কেবল বিশ্বদেবতা থাকেন না, জীবনদেবতাও হয়ে ওঠেন। আর তখন, অনেক পরবর্তী রবীন্দ্রনাথের কথা ভারতচন্দ্রেরও কথা হয়ে ওঠে—'ওহে অন্তরতম, মিটেছে কি তব সকল তিয়াস আসি অন্তরে মম!' দুঃখ-সুখের লক্ষ ধারায় হৃদয়পাত্র পূর্ণ করে কবি তাঁকে নিবেদন করেন, শুচি অশুচি, নীতি দুর্নীতি সবই তাঁকে দেন। কবি জানেন, প্রেমজীবনের সবটাই চিন্ময় সত্য নয়, অনেকখানি অংশ মৃন্ময় উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। মূলে আছে একই গূঢ় এষণা—পাত্রান্তরের কারণে রূপের ভিন্নতা। একই প্রেমশক্তি সৎ অসৎ সর্বত্র জ্বলছে। কবি আরও জানেন, প্রেমের ক্ষেত্রে ঐ গভীর উৎকণ্ঠা সকল সময়ে সামাজিকতার বিরোধী। সমাজের বেড়া তার পক্ষে বাধাস্বরূপ। এমনকি বৈধ মহৎ প্রেমও সমাজের মধ্যে সুখাসন সুশাসন পায় না। সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী বেহুলা—সকলের জীবনেই তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। সুতরাং বিদ্যা ও সুন্দর তাদের অসামাজিক আচরণের পক্ষে সমাজের মঙ্গলনীতির সমর্থন না পেলেও—তারা বাঁধন কেটেছিল—সেই মুক্তির সঙ্গীত কবির প্রাণকে দুলিয়ে দিয়েছিল। এবং বিচিত্রভাবে একই সুরে ধরা দিয়ে কবির কাছে এসে হাজির হয়েছিলেন সাধুত্বের অভিমানহারী, চিরকালের অশিষ্ট দুষ্ট কিশোর কানাই আর কলঙ্কিনী কিশোরী রাই। শঠ লম্পট কপটিয়া! চোর নাগর! প্রাণনাচানো কুলমজানো চোর নাগর! তীব্র সুখের সঙ্গে উচ্চারণ করেও যেন যথেষ্ট সুখ হয় না। বাসনার্ত প্রাণ উষ্ণ নিঃশ্বাস ছেড়ে দেখে, বাসনার পরম বি... বাঁশি বাজিয়ে চলেছেন প্রাণমূলে টান দিয়ে, তখন হৃদয়মন্থনে রক্তপদ্মের মতো ফুটে ওঠে সঙ্গীত :

প্রাণ কেমন রে করে, না দেখে তাহারে।
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে॥

কবির সকল সঙ্গীতের এই মর্মকথা। কবি রূপ দেখেন—অপরূপ রূপ। অধৈর্য হয়ে পড়েন। তারপর অভিমানের সঙ্গে বলেন, আমার মন যাতে টলল, তাতে রমণীর মন তো দূরের কথা মুনিদের মনও টলে যাবে :

এ কি অপরূপ রূপ তরুতলে।
হেন মনে সাধ করে তুলি পরি গলে ॥...
বরণ কালিমা ছাঁদে বৃষ্টিছলে মেঘ কাঁদে
তড়িত লুটায় পায় ধরার আঁচলে ॥
ভারত দেখিয়া যারে ধৈরয ধরিতে নারে
রমণী কি তায় যায় মুনিমন টলে ॥

রাধিকার নামের ক্ষীণ আড়ালটুকু নিয়ে কবির আরও ঘনিষ্ঠ কথা চুপি চুপি :

চুপে চুপে এসো যেও আর দিকে নাহি ধেয়ো
সদা একভাবে চেয়ো এই রাধিকায় ॥
তুমি হে প্রেমের বশ তেঁই কৈনু প্রেমরস
না লইয়ো অপযশ বঞ্চিয়া আমায়।
মোর সঙ্গে প্রীতি আছে না কহিও কারো কাছে
ভারত দেখিবে পাছে না ভুলায়ো তায় ॥

বেদনার রোমাঞ্চে সৃষ্টির আদি সঙ্গীত :

আলো, আমার প্রাণ কেমন লো করে।
কি হৈল আমারে।
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে ॥...
লোকে হৈল জানাজানি সখীগণে কানাকানি
আপনা বেচিয়া এত সহিতে কে পারে।
যায় যাক জাতি কুল কে চাহে তাহার মূল
ভারত সে ধন্য শ্যাম ভালবাসে যারে ॥

দুখের তারে সুখের কাঁপন :

কারে কব লো যে দুঃখ আমার।
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার।

'না না যেও না' সুরে তাই কবি শিউরে উঠেন :

তুমি বলো যাই যাই মোর প্রাণ বলে তাই
বারে বারে কয়ে কয়ে মুরুখে শিখায়ো না॥
অপরূপ মেঘ তুমি দেখি আলো হয় ভূমি
না দেখিলে অন্ধকার, আন্ধার দেখায়ো না।
ভারতীর পতি হও ভারতের ভার লও
না ঠেলিও ও ভারতী ভারতে ছাড়ায়ো না॥

কবি কেবল নিজের কথাই বলেন নি, তাঁর পরানবঁধুর কথাও শুনবার ধৈর্য দেখিয়েছেন। সবাই তাঁকে বলে চোর। যাঁকে বলে, তিনি কি বলেন? তিনি গান গেয়ে ওঠেন—'সবাই মোরে বলে মিছা চোর।…সবে চোর হয়ে, মোরে ধরি লয়ে, চোর বাদ দেই মোর।…মোর পদে দেয় ডোর। …কে মোরে জানিবে কে মোরে চিনিবে…'

ভারতচন্দ্র তাঁকে চিনেছিলেন। একটি গানে, সাহিত্যের একটি সেরা গানে, তাঁর অচেনা-চেনার রহস্যসুরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন :

ওহে বিনোদ রায়, ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে॥
নবজলধর তনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু
পীতধড়া বিজলীতে ময়ূরে নাচাও হে॥
নয়ন চকোর মোর, দেখিয়া হয়েছে ভোর
মুখ-সুধাকর হাসি সুধায় বাঁচাও হে॥
নিত্য তুমি খেল যাহা নি॰ নহে ভাল তাহা
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমত চাহে সেই মতো চাও হে॥

ধীর বিষণ্ণ মাধুরীতে সমস্ত গানটি আচ্ছন্ন। কবি তাঁর কৃষ্ণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দীর্ঘ বেদনাময় জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি জেনে-ছেন —লীলার চঞ্চল উল্লাসটিই একমাত্র সত্য নয়; বসন্তপূর্ণিমার চাঁদের বাতিটি এক সময়ে নিভে গিয়ে কালো যমুনার ঢেউয়ের তলায় বেদনায় ছলছল করে, আনন্দগৌরী রাধাকে গ্রাস করে নিবিড় কৃষ্ণ এসে দাঁড়ায়। বড় কালো সে কৃষ্ণ। দুঃখের দারুণ রাতে সে কৃষ্ণের আকাশ-জোড়া হাসির সঙ্গে কবির পরিচয় আছে। প্রভাতের আলোকে তাকেই বিনোদরূপে বাঁশী বাজিয়ে আসতে দেখে কবির মনে যাতনাময় ঈর্ষা জেগেছে। কি মধুর! কি নিঠুর! ছলনায় নিজেকে ঢাকতে এত পটু। তাই ম্লান বিষণ্ণ একটি অনুযোগ—'নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য নহে ভাল তাহা'—ঐ নিষ্ঠুরের চরণে ছিন্ন আশার সূত্রের মতো লেগে থাকে; তারও পরে আশাহীন আশা শ্রান্তকণ্ঠে বেজেই চলে—'আমি যে খেলিতে কহি, সে খেলা খেলাও হে।'

ধর্মরস—রহস্যরস হয়ে ভারতচন্দ্রের কাব্যকে এখানে নবচেতনার অপরূপ ঐশ্বর্য দিয়েছে।

॥ ১ ॥

ভারতচন্দ্রের রোমান্টিকতা সম্বন্ধে নানা মত

রামগতি ন্যায়রত্নের নাম শুনলে এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ে তাঁর বইটি পড়লে কারো মনে কদাপি এ সন্দেহ জাগবে না, মানুষটি খুব রোমান্টিক ছিলেন। তবে একথা সত্য, রামগতি ন্যায়রত্ন খুব সহজ সরল মানুষ ছিলেন, ভাল লাগলেই 'আহা উহু' করতেন, এবং শোনা যায়, রোমান্টিসিজমের সঙ্গে মুক্ত চিত্তস্ফূর্তির সম্পর্ক আছে। তাই বলে নিশ্চয় নিছক 'আহা উহু'-বাদকে কেউ রোমান্টিকতা (শব্দের এই রক্তমিশ্রণের জন্য ক্ষমা চাইছি; কোনো সময়ে 'ক্লাসিকতা' লিখে ফেললেও আশা করি বিশুদ্ধ নীল রক্তবাদী পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন) বলবেন না। এহেন রামগতির বইয়ের মধ্যে একটি আশ্চর্য অপূর্ব (ইদানীং আমরা 'আশ্চর্য'বাদী, 'অপূর্ব'বাদী) চমকপ্রদ স্বীকারোক্তি আছে, যাতে বর্তমানে আমাদের প্রয়োজন। রামগতি লিখেছেন :

"বোধ হয় অনেকেরই জানিবার ইচ্ছা হয় যে, বিদ্যাসুন্দরের কাণ্ড বর্ধমানে ঘটিয়াছিল কি না? এবং তথায় যে সুড়ঙ্গের কথা শোনা যায়, তাহা কিরূপ? ইহার প্রথম প্রশ্নের উত্তর লেখা অনাবশ্যক। কারণ বিদ্যাসুন্দরের অলৌকিক কাণ্ড কোথাও কখনো বাস্তবিক ঘটে?"

বিদ্যাসুন্দরের অলৌকিক কাণ্ড 'কেবল কবিদিগের কল্পনাবলেই সংঘটিত হয়' জেনেও রামগতি নিজেকে সামলাতে পারলেন না :

"আমরা যৎকালে বর্ধমানে ছিলাম তখন একদিন, ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী, কয়েকজন বন্ধুসহ সুড়ঙ্গ-দর্শনার্থ কৌতুকাকুলিতচিত্তে বাসা হইতে নির্গত হইলাম।"

বলাবাহুল্য এই যাত্রায় অভিপ্রেত লক্ষ্যলাভ হয়নি। কারণ আপাততঃ যদিও ব্যাপারটা প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান, আসলে তা ছিল সৌন্দর্যের অভিসার। রামগতিকে সেবার কিছু ভাঙাবাড়ি, বনজঙ্গল, মজাপুকুর,

উঁচুটিপি, গর্ত ইত্যাদি দেখেই ফিরতে হয়েছিল। কিছু গালগল্পও জোগাড় করেছিলেন। তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু কেন তিনি পরিশ্রম করেছিলেন ?—

"ভারতের বিদ্যাসুন্দরই প্রথমে পড়িয়াছিলাম এবং তাহার অনেক ভাব আমাদের হৃদয়ে পাষাণরেখার ন্যায় একেবারে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। বর্ধমান নগরের বর্ণন পাঠ করিয়া উহার একখানি মানচিত্র আমাদের চিৎপটে আবির্ভূত হইয়াছিল, এবং যতদিন আমরা বর্ধমানে না গিয়াছিলাম ততদিন উহা অবিকৃত ছিল। ঐ মানচিত্রে বর্ধমানকে কি সুখের, কি ঐশ্বর্যের, কি বিলাসের ও কি রমণীয়তার আধারই দেখিতে পাইতাম, বলিতে পারি না। রাজপুরীর সৌন্দর্য, পরিখার অলজ্ঘ্যতা, সরোবরের চতুষ্পার্শ্বে জটাভস্মধারী অবধূত সন্ন্যাসীদের আখড়া, সরোবরের রমণীয়তা, বকুলতলার বাঁধাঘাট, তথায় বিদ্যাধরী-সদৃশী বর্ধমানাঙ্গনাদিগের জলানয়নার্থ সবিলাসভাবে আগমন—এ সকল কাণ্ড বর্ধমানে যাইলেই দেখিতে পাওয়া যায়, মনোমধ্যে এক-প্রকার সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছিল।"

আসল বর্ধমান যখন কল্পনানুরূপ হল না, তখন ক্ষোভদুঃখের সঙ্গে রামগতি লিখলেন :

"কিন্তু বর্ধমান দর্শন করিবার পর তথাকার রাজপথের ধূলা লাগিয়া আমাদের সে মানচিত্রখানি মলিন হইয়া গিয়াছে।"

রামগতির হতাশের আক্ষেপ পড়বার পরে মনে হচ্ছে, ঐ ঘটনার সময়ে হায় কেন রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র পৌনে দু'বছর, যিনি পরে রামগতির ও অনেকের সুবিধার্থ লিখবেন :

'সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে,
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদী গিরি সকলের শেষে !'

কেবল ভালমানুষ রামগতিই নন, বিদ্যাসুন্দরের ফাঁদে পড়েছিলেন ধুরন্ধর বিচক্ষণ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষও। হেমেন্দ্রপ্রসাদ অতীব গল্পবদ্ধ-

মানুষ, তথাপি বিদ্যাসুন্দর-চিন্তায় তিনি এমন প্রবল কাব্যাকুতি বোধ করেছিলেন যে, তৎসম'শব্দের ঝুড়ি উপুড় করে দিয়েছিলেন (ঘন সুন্দর আবেগ প্রকাশে সেটাই আমাদের রীতি)। কোনো একজন সমালোচক বুঝি মুকুন্দরামের রচনার সঙ্গে স্রোতস্বতীর এবং ভারতচন্দ্রের রচনার সঙ্গে সরসীর তুলনা করেছিলেন,এবং তুলনাকালে ভারতচন্দ্রকে কিছু হতমান করতে চেয়েছিলেন। আর যায় কোথা? হেমেন্দ্রপ্রসাদ সগর্জনে বললেন—সরসী, হাঁ সরসীই দরকার, সৌন্দর্যসৃষ্টি করতে। অতঃপর হেমেন্দ্রপ্রসাদের সরসীকাব্য :

"ভারতচন্দ্রের রচনা অজস্র বিকচকুসুমশোভাময় ভ্রমরগুঞ্জনমুখরিত উপবনের মধ্যভাগে অবস্থিতা সরসীরই মতো। সেই সরসীর স্ফটিক-বারিবক্ষে প্রমোদতরণী বসন্তবায়ুবিকশিতাঞ্চলা হাস্যপরিহাসস্মিতাননা শুদ্ধান্তশোভিনীদিগকে অঙ্কে লইয়া রাজহংসীর মত ভাসিয়া যায়। বায়ুহিল্লোলে তরুশাখাসীন বিহগের কলগান তাঁহাদিগের শ্রবণে অমৃত-বর্ষণ করে। তীরের সুমনসসুষমাদর্শনে তাঁহাদিগের দীপ্ত কৃষ্ণতারনয়নে আনন্দালোক বিকশিত হইয়া ওঠে। যক্ষের উদ্যানমধ্যস্থ সরসীর মতো, সে সরসীর সোপানমার্গ—মরকতশিলাবদ্ধ। তাহার স্বচ্ছসলিলে সিন্ধু-বৈদূর্যনালসমন্বিত বিকশিত কনককমল শোভমান। সেই কমলদল-শোভিত সলিলে ক্রীড়াশীল হংসদল মানসসরসেও যাইতে ইচ্ছুক নহে। আবার সেই সরোবরতীরে ইন্দ্রনীলরচিতশিখর, কনককদলীশোভিত ক্রীড়াশৈল বিদ্যমান। সেই ক্রীড়াশৈলে কুরুবকপরিবৃত মাধবীমণ্ডপের সন্নিধানে চলকিশলয়, রক্তাশোক ও কেশরতরু দণ্ডায়মান। বৃক্ষদ্বয়-মধ্যে স্ফটিকপীঠসম্পন্ন মণিময়ী বেদিকায় বদ্ধমূল অনতিপ্রৌঢ়বংশপ্রায় কাঞ্চনবাসদণ্ড—তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, ক্ষীণমধ্যা, চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভি শ্রোণীভারালসগমনা পীবরযৌবনভারা-বনতা যক্ষনারীর বলয়শিঞ্জনসহকৃত করতালবাদ্যে নৃত্য করিয়া কলাপী দিবাবসানে সেই বাসযষ্টিতে আশ্রয় লয়। সে সৌন্দর্য অলকাতেই সম্ভব; সে সৌন্দর্যসৃষ্টি কবির ক্ষমতাবলে আনীত সুরলোকের এক খণ্ড সমুজ্জ্বল সারাংশ।"

বাপরে ! 'কী এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান ব্যাপার'—উপরের রচনাটি। ওর মধ্য থেকে যতদূর মনে হয় এইটুকু পাচ্ছি, কালিদাসের অলকার কনিষ্ঠা ভগিনী বর্ধমান। এই কথা টিই আমাদের প্রয়োজন। বিদ্যাসুন্দর তাহলে কেবল কতকগুলি মন্দ চিন্তাই পাঠকের মনে জাগায় না— স্বপ্নও আনে, 'কামনার মোক্ষধাম অলকার' স্বপ্নের যা সগোত্র।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী অন্নদামঙ্গল, বিশেষতঃ তার অন্তর্গত বিদ্যা-সুন্দর কাব্যের চরিত্র সম্বন্ধে খোলাখুলি লিখেছেন :

"অন্নদামঙ্গলকে রোমান্টিক কাব্য-হিসাবে পাঠ করিলেই যথার্থ-ভাবে পাঠ করা হইবে। ইহা তিনখণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডকে দেব-খণ্ড বলিতে পারি। ইহাতে ভারতচন্দ্রের রোমান্টিক কবিপ্রতিভা পূর্ণতালাভ করিতে পারে নাই। দেবদেবীর ইতিহাস ও কাহিনী পৌরাণিকতার স্তরে এমন সুদৃঢ়ভাবে ন্যস্ত যে, কবি সে ধারাকে লঙ্ঘন করিয়া নিজস্ব প্রতিভার বিকাশ দেখাইতে পারেন নাই।···

"দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দর। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর রোমান্টিক কাব্য বাংলা ভাষায় আর নাই। অশ্লীলতাই নাকি ইহার প্রধান অন্তরায়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব, বৈষ্ণব কবিদের রাধা-কৃষ্ণ সঙ্গীত ও বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী একই মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে স্থাপিত। দুয়েরই ভাব-উপজীব্য অসামাজিক গুপ্ত প্রেম। কেবল প্রভেদ এই, রাধাকৃষ্ণের প্রেম রূপক, আর বিদ্যাসুন্দরের প্রেম রূপবান। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম রূপ-কে অতিক্রম করিয়া অরূপে পৌঁছিয়াছে, বিদ্যা-সুন্দরের প্রেম রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। রাধা তো আরাধিকা ; তাহার প্রেমে বিশেষ নির্বিশেষ হইয়াছে, আর বিদ্যার প্রেম হৃদয়ের সমস্ত সূক্ষ্ম অনুভূতি ও বাসনাকে একজনের মধ্যে বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। সুন্দর কবি, আর্টিস্ট ; তাহার প্রেম রূপে আসিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। কিন্তু মূলতঃ দুই প্রেমই সমাজশৃঙ্খলাকে লঙ্ঘন করিয়াছে। এই হিসাবে ভারতচন্দ্র বৈষ্ণব কবিদের ভাবজীবনের বংশধর। কৃষ্ণ বাঁশির সুরে রাধার হৃদয়ে রন্ধ্র নির্মাণ করিয়াছে, সুন্দর করিয়াছে সিঁদকাটিতে ; দুই প্রেমেরই আনাগোনা রন্ধ্রপথের রহস্যের অন্ধকারে।

এই রহস্যই দুই প্রেমের প্রাণ। আবার রহস্যই রোমান্টিক ধর্মের প্রধান লক্ষণ। সুন্দর কবি, 'চোরও বটে। সে চিরদিনের জন্য প্রমাণ করিয়া দিয়াছে, চুরিবিদ্যা বড় বিদ্যা, অন্ততঃ চুরি করা বিদ্যা যে, সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই।

"আসলে বিদ্যাসুন্দর কাব্য একখানি রোমান্টিক স্যাটায়ার। এ শ্লেষ দ্ব্যর্থ; একদিকে সমাজশৃঙ্খলা, অপরদিকে রাজসভা। কবি এক ঢিলে ঐ দুইটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের উপরে তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন।...

"তৃতীয় খণ্ডে মানসিংহের কাহিনী। ইহাতে কবি অনেক পরিমাণে বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন।...ইহাতে কল্পনা ও বাস্তব টানাপোড়েনের মতো বুনিয়া গিয়া অপরূপ শিল্পসম্পদ গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহাকে রোমান্স ও রিয়ালিজমের বিবাহ বলা যাইতে পারে। মুকুন্দরাম যে রিয়ালিজম গড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্র প্রধানত রোমান্টিক কবি হইয়াও সে চেষ্টাকে সফল করিয়াছেন।"

অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এই রচনা—ভারতচন্দ্র সমালোচনায়। ভারতচন্দ্রের কাব্যকে রোমান্টিক বলার ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি শ্রীযুক্ত বিশী নন, পাদরি ওয়েঙ্গার বহু বৎসর পূর্বে সে কথা বলেছেন, কিন্তু কেন এই কাব্য রোমান্টিক, তা তিনি ব্যাখ্যা করেন নি। তবে ইংরেজিতে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর সারসংক্ষেপ এমনভাবে করতে চেয়েছেন, (যা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি), যাতে ঐ কাব্যের রোমান্টিক প্রকৃতি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। শ্রীযুক্ত বিশী কিন্তু আলোচ্য কাব্যকে কেবল রোমান্টিক বলেই ক্ষান্ত হন নি, তার রোমান্টিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণও করেছেন। যতদূর দেখেছি, তাঁর পূর্বে বা পরে একাজ আর কেউ করেন নি।

শ্রীযুক্ত বিশী প্রদীপ্ত ভঙ্গি ছাড়া লেখেন না। সেই উজ্জ্বল আলোকে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আমরা অনেক সময়ে অগ্রাহ্য বস্তুকেও গ্রহণ করে ফেলি। এক্ষেত্রে চোখ রগড়ে দু'একটি বিষয়ে আমাদের আপত্তি জানাতে হচ্ছে। যেমন, ত্রয়ী কাব্যের দুর্বলতম খণ্ডটির উপরে তিনি অযথা প্রশংসা বর্ষণ করেছেন। কোনো হিসাবেই পাই না—মানসিংহে 'অপরূপ শিল্পসম্পদ' আছে, বা তাতে 'রোমান্স ও রিয়ালিজমের বিবাহ' হয়েছে। মানসিংহে

কবি ভারতচন্দ্র সত্যই ক্লান্ত, যদিও সেখানে তাত্ত্বিক দার্শনিক ভারত-চন্দ্র প্রকাশিত। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমপ্রকৃতি সম্বন্ধেও তাঁর বক্তব্য স্বীকাবে বাধা আছে।[১]

কিন্তু বাকি অংশে শ্রীযুক্ত বিশীর বক্তব্য গভীরভাবে বিবেচ্য। অন্ন-পূর্ণামঙ্গল কি রোমান্টিক না ক্লাসিক কাব্য—এ বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক থাকা উচিত ছিল, দুঃখের বিষয় তা নেই, আমাদের সমালোচনা সাহিত্যের এমনই দশা। ভারতচন্দ্র রূপ দেখিয়ে কতজনের চরিত্র নষ্ট করেছেন—এই আলোচনাতেই প্রায় সকলে মগ্ন।

তবু—ভারতচন্দ্রের কাব্যের ক্লাসিসিজম বা রিয়ালিজমের কথা বলা হয়েছে—বলেছেন অন্য কেউ নন প্রথম চৌধুরী এবং তাঁর পথানু-সারী জে সি ঘোষ। মোহিতলাল মজুমদার ও ডাঃ সুশীলকুমার দে ভারতচন্দ্রের কাব্যরীতিতে ক্লাসিকলক্ষণ দেখেছেন। প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের বক্তব্য এঁদের সকলের বিপরীত।

প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে প্রমথ বিশী কিরকম বিপরীত ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছেন দেখিয়ে দেওয়া যাক। 'ফরাসী সাহিতের বর্ণপরিচয়' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন :

১। রাধাকৃষ্ণের প্রেম এবং বিদ্যাসুন্দরের প্রেমের ভাবৈক্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিশী যেকথা বলেছেন, তার মধ্যে গভীর ইঙ্গিত আছে সত্য, কিন্তু উভয় প্রেমেব পার্থক্য কোথায়, তাও আগে আমরা বলে এসেছি। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে তিনি 'রূপক' বলেছেন, তাও আমরা স্বীকার করতে পারি না। রাধাকৃষ্ণের প্রেম নিতান্ত সত্য, বৈষ্ণবের কাছে, হিন্দুর কাছে। এক রূপের দ্বারা অন্য রূপেব কথা বলা (রূপকের যা উদ্দেশ্য) এই প্রেমলীলা বর্ণনার লক্ষ্য নয়। কৃষ্ণ ও রাধা প্রেমেব দেবদেবী, ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের কাছে তাঁরা রিয়েল ; তাঁদের সাহায্য নিয়ে অন্য কারো জীবনসত্য কবিরা প্রকাশ করেন নি। বরং বৈষ্ণব কথাটা উল্টে বলতে চাইবেন—মানবমানবীর প্রেম রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের অসম্পূর্ণ রূপক। দ্বিতীয়তঃ, রাধা-কৃষ্ণের প্রেম রূপ থেকে অরূপে পৌছেছে, একথাও কাব্যিক বা তাত্ত্বিকভাবে গ্রাহ্য নয়। কাব্যিকভাবে নয় এইজন্য যে, বৈষ্ণব কবিরা রূপার্চনা কখনো ছাড়েন নি—তাঁদের কৃষ্ণ রূপশেখর, তাঁদের রাধিকা অপরূপ রূপময়ী। যেহেতু তাঁরা ঈশ্বর-

"প্রাক্‌ব্রিটিশ যুগের বাংলা-সাহিত্যে দেখতে পাই দুটি পৃথক ধারা বরাবর পাশাপাশি চলে এসেছে : একটি সম্পূর্ণ সাবজেক্‌টিভ, অপরটি সম্পূর্ণ অবজেক্‌টিভ। যে বাঙালি-জাতির মন থেকে বৈষ্ণব-পদাবলী জন্মলাভ করেছে, সেই বাঙালি-জাতির মন থেকেই কবিকঙ্কণচণ্ডী ও অন্নদামঙ্গল জন্মলাভ করেছে। সুতরাং রোমান্টিক এবং রিয়ালিস্টিক উভয় সাহিত্যই আমাদের হৃদয়-মন স্পর্শ করতে পারে।"

শ্রীযুক্ত বিশী তাঁর 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধে লিখেছেন :

"সাধারণ ও অসাধারণ ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য, সামান্য একটুখানি দৃষ্টিভেদে ঘটে। এই সামান্যতার সাধনাতেই তাঁহাদের অসামান্যতা। ইংরেজিসাহিত্যের মতো বাংলাসাহিত্য প্রধানতঃ রোমান্টিক। ইংরেজি কাব্যের মূল [illegible] বহুপ্রচলিত এই ছত্রটিতে বিরাট ব্যাকুলতায় ধ্বনিত, Over the hills and far away; বাংলাসাহিত্যের মূল কথা 'সেই দেশেরি তরে আমার মন যে কেমন করে', কিংবা 'কান্ত পাহুন, বিরহ দারুণ, ফাটি যাওত ছাতিয়া' কিংবা 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম, কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মম প্রাণ।' এই সুদূরের ভাব, আকুলতার ভাব, বাংলাকাব্যের মূল সুর, ইহাই বাঙালি কবিদের মৌলিক প্রেরণা।

"এই রহস্যটা বৈষ্ণবকবিরা ধরিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা

বিগ্রহ, তাই গুণের মত রূপও তাদের অনন্ত। তাত্ত্বিকভাবে—দ্বৈতবাদীরা আদি অন্তে রূপকে, আকারকে স্বীকার করেন ; 'অরূপ'—অদ্বৈতবাদীদের কথা। ওটা বৈষ্ণবের কাছে দুষ্ট শব্দ। রাধার প্রেম বিশেষ থেকে নির্বিশেষ হয়েছে, একথাও স্বীকার্য নয়। কারণ, রাধাকৃষ্ণের প্রেম ভগবানের জন্য ভক্তের প্রেম নয়, তা ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরীর এবং ঈশ্বরীর জন্য ঈশ্বরের প্রেম। তা একেবারে একান্ত। রাধা কখনো কৃষ্ণের উপর অপরের অধিকার স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। তেমন সম্ভাবনা দেখা দিলেই তাঁর দারুণতম অভিমান। রাধার প্রেমকে শেষ পরিণতিতে নির্বিশেষ বলে মানলে রাধাকে মান অভিমানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে, শ্রীমতী রাধারাণী তাতে রাজি হবেন মনে হয় না !!

ভারতচন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনো মঙ্গলকাব্য-রচয়িতা ধরিতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের মূলে এই স্থূল কথা।"

প্রমথ চৌধুরী ও প্রমথ বিশীর মতের ঐক্য এইখানে—উভয়েই ইংরেজি সাহিত্যকে রোমান্টিক মনে করেন এবং বাংলা বৈষ্ণবসাহিত্য-কেও তাই। পার্থক্য—প্রমথ চৌধুরী মনে করেন, ভারতচন্দ্রের কাব্য রিয়ালিস্টিক আর প্রমথ বিশী বলেন, তা রোমান্টিক। প্রমথ চৌধুরী অধিকন্তু মনে করেন— বাংলাসাহিত্যে রোমান্টিসিজম ও রিয়ালিজম দুটি ধারাই সমভাবে বহমান, যা মনে করেন না প্রমথ বিশী। কিংবা ঠিক-ভাবে বলতে গেলে, প্রমথ বিশীর মতে, রিয়ালিজমের প্রবল ধারা বাংলা-সাহিত্যে আছে কিন্তু তা উজানস্রোত, স্বাভাবিক গতির বিপরীত দিকে প্রবাহিত।

সাহিত্যের মূল প্রাণধারা কি, সে প্রশ্ন এতই মূলগত যে, আমাদের দৃষ্টিবহির্ভূত, নচেৎ দুই বিদগ্ধ পণ্ডিতব্যক্তির এক্ষেত্রে এহেন গুরুতর মত-পার্থক্য হয় কেন? তবে বাংলাসাহিত্য প্রাণে-প্রাণে রোমান্টিক, এ কথাটা বোধহয় শ্রীযুক্ত বিশীও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না, নচেৎ তাঁর প্রবন্ধের শেষাংশে তিনি কেন বললেন, বাঙালিরা স্যাটায়ারে সমর্থ, যখন আমরা জানি, স্যাটায়ারের মেজাজ আর রোমান্টিকতার মেজাজ এক নয়।

বাংলাসাহিত্যের মূল প্রাণধর্মের আলোচনা স্থগিত থাক (অনি-র্দিষ্টকালের জন্য!)। আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গে এলে আমাদের স্বীকার করতে হবে—ভারতচন্দ্রের কাব্যের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী অপেক্ষা প্রমথ বিশীর কথাই আমাদের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য—তা রোমা-ন্টিক। কিন্তু অবিমিশ্র রোমান্টিক নয়, আর তা নয় বলেই এক্ষেত্রে মত-ভেদ দেখা গেছে। কেবল প্রমথ চৌধুরী নন, শ্রীযুক্ত জে সি ঘোষও বলেছেন: 'ঐতিহাসিক অথবা রোমান্টিক কল্পনার জন্য কিন্তু আমরা ভারতচন্দ্রের দ্বারস্থ হই না, বাস্তবতার দর্শনের জন্যই উন্মুখ থাকি, যা তাঁর শিল্পের আসল জিনিস। যখন তিনি বাস্তব জীবনের সঙ্গে ঘনি-ষ্ঠতা রক্ষা করেন তখনই তাঁকে শ্রেষ্ঠরূপে পাই—সেক্ষেত্রে তিনি মুকুন্দ-রামের সমধর্মী, যাঁর প্রভাব তাঁর সাহিত্যে বহুভাবে ব্যক্ত।'

রোমান্টিসিজম রহস্যে আচ্ছন্ন, সেজন্য ও-বস্তুর সংজ্ঞাও রহস্যময়। ওটা কী, আমরা কেউ ঠিক জানি না। যেদিন জেনে ফেলব সেদিন তা আর রোমান্টিক থাকবে না। তবু তার চরিত্র সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা মানুষকে করতেই হয়, প্রমথ চৌধুরীও করেছেন। তাঁর নানা রচনায় তা ছড়িয়ে আছে। 'ফরাসি সাহিত্যের বর্ণপরিচয়ে'র মধ্যে তিনি বলেছেন, 'মানুষের সমগ্র মন তার বুদ্ধির চাইতে বড়, এবং যুক্তিতর্কের অপেক্ষা অনুভূতি ঢের বেশী নির্ভরযোগ্য, এই বিশ্বাসের উপরই যথার্থ রোমান্টিক সাহিত্য দাঁড়িয়ে থাকে। এই দৃষ্ট বিশ্বের পিছনে একটি অদৃষ্ট বিশ্ব আছে, মানবমনের এমন একটি ধর্ম আছে, যার গুণে এই নিগূঢ় বিশ্বের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়—এই হচ্ছে রোমান্টিক দর্শনের মূল কথা। আর যে-বস্তু যুক্তিতর্কের সাহায্যে জানা যায় না, তা যুক্তিতর্কের সাহায্যে অপরকে জানানো যায় না। তাই রোমান্টিক কবিরা নিজে যা অনুভব করেছেন, অপরকে তা অনুভব করাতে চান। এ-স্থলে ভাষার অর্থের চাইতে তার ইঙ্গিতের মূল্য ঢের বেশী।'

"যে বিরাট সৌন্দর্যে মানুষের মনকে স্তম্ভিত অভিভূত করে, যে-সৌন্দর্য অতিজগতের আলো ও ছায়ায় রচিত, সে সৌন্দর্য ইংরেজি সাহিত্যে আছে, ফরাসি-সাহিত্যে নেই। কিন্তু শিল্পের সৌন্দর্য ফরাসি-সাহিত্যে অতুলনীয়।"

ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের মূল বস হাস্যরস, যার স্থান হৃদয়ে নয় মস্তিষ্কে, এই যখন তাঁর মত, তখন ধরেই নেওয়া যায়, তিনি এ-কাব্যকে রোমান্টিক সাহিত্য মনে করেন না। যখন তিনি ভারতচন্দ্রের সযত্ন শিল্পচর্চার উপরে জোর দেন, তখনও বোঝা যায়, তিনি ক্লাসিক রীতির কবিরূপেই তাঁকে গণ্য করেন। যে-কবিকে তিনি বিদগ্ধ ও সিনিক্যাল বলেছেন, তাঁকে কদাপি রোমান্টিক বলতে পারেন না। যে-কবির 'মার্কা-মারা ল্যাটিন-প্রাণ', যাঁর রচনার 'অস্পষ্ট অপরিণত ছায়াচ্ছন্ন অথবা রহস্যাচ্ছন্ন কিছু নেই, তা যেমন স্বচ্ছ তেমনি অপূর্ব'—সে-কবি রোমান্টিক অবশ্যই নন, প্রমথ চৌধুরীর মতে। ভারতচন্দ্রকে কেউ বলেছেন হোরেস, কেউ বলেছেন পোপ—কিন্তু বারয়ন বলেন নি, হয়ত প্রমথ

বিশী তাই কিছুটা বলতে চান—সুন্দর নামক সচ্চরিত্র ডন জুয়ানের স্রষ্টা হিসাবে!

এক্ষেত্রে কোন্ সিদ্ধান্ত আমরা করব? রোমান্টিক, না ক্লাসিক/রিয়ালিস্টিক? উভয় পক্ষেই যুক্তি দেখানো সম্ভবপর। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা জানিয়ে এসেছি—ও-কাব্যকে প্রধানতঃ রোমান্টিকই মনে করি, বিশেষতঃ বিদ্যাসুন্দরকে, যদিও একইসঙ্গে মনে করি, রিয়ালিস্টিক সাহিত্যের গুণাবলী ক্ষেত্রবিশেষে এমন প্রবল আকারে বর্তমান যে, রোমান্টিক প্রাণধর্মকে তা ক্ষুণ্ণ করেছে, এবং কাব্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচারে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

অন্নদামঙ্গল কাব্যে কবি মঙ্গলকাব্যের ভার বয়েছেন বলে তা সম্পূর্ণ রোমান্টিক হয়ে উঠতে পারে নি, একথা শ্রীযুক্ত বিশীও স্বীকার করেছেন। আমরা মোটামুটি তা স্বীকার করি, যদিও তাঁর মতো করে পৌরাণিকতাকে রোমান্টিক-ধর্মনাশা মনে করি না। বিশেষতঃ যখন দেখি, ভারতচন্দ্রের হাতে স্বর্গীয় ব্যাপার মর্ত্যজীবনের ধূলিতে ধূসর হয়ে নবরূপ লাভ করেছে, তার মধ্যে স্পন্দিত নব প্রাণচেতনা আমাদের অনুভূতির বিস্তার ঘটিয়েছে, যা রোমান্টিকতার লক্ষণ। এ বিষয়টি দৃষ্টান্তসহ আগে আমরা আলোচনা করে এসেছি। অল্প পরে দেখব, এই অন্নদামঙ্গলেই পুরী-নির্মাণ অংশে তিনি রোমান্টিক রূপলোক নির্মাণে কতখানি সাফল্যলাভ করেছেন। ব্যাসকে নিয়ে কবি ইতুর খেলেছেন একথা বলা হয়—সেই ব্যাসচরিত্রে রোমান্টিক ট্রাজেডির লক্ষণ কি পরিমাণে আছে দেখাবার চেষ্টা করব—এবং 'অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা' অংশকে রোমান্টিক নয় কে বলবে, যার স্বপ্নচ্ছবিকে প্রতি বাঙালি তার মনের গহন কক্ষে টাঙিয়ে রাখে—সপ্ত সমুদ্রপারে গিয়ে মধুসূদন তার দিকে তাকিয়ে কিরকম বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি।

বিদ্যাসুন্দরকে প্রমথ বিশী 'সর্বাঙ্গসুন্দর' রোমান্টিক কাব্য বলেছেন। আমরা বলি 'অপূর্ব সুন্দর,' কিন্তু সর্বাঙ্গসুন্দর নয়, কারণ রোমান্টিক পরিবেশের পক্ষে গুরুভার বেশ-কিছু অংশ তাতে আছে, যা অন্যথা

রচনা হিসাবে উৎকৃষ্ট। যেমন, ধরা যাক, হীরামালিনীর বেসাতি—তার কৌতুকে কে না উচ্ছ্বসিত হবে, কিন্তু তার বাস্তবতা এমনই তীক্ষ্ণ যে, রোমান্টিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ঠিক উল্টোদিকে আছে সুন্দরের শ্বশুর-সম্ভাষণ, যার বাস্তব ইতরতায় অনেকে উৎপীড়িত,কিন্তু রোমান্সের জগতে তা মোটেই অসঙ্গত কিছু নয়, যেমন অসঙ্গত নয় রাজসভায় বা পরবর্তীকালে সুন্দরের সন্ন্যাসীবেশের নর্মকথা বা লীলা, যাকে আবার বাস্তব মনে করলে আমাদের ধর্মসংস্কার আহত হয় (যেকথা আগে বলেছি), কিন্তু রোমান্টিক কাণ্ড হিসাবে অতি চমৎকার। অতি চমৎকার সেই আয়োজন ও পরিবেশ-রচনা, যার মধ্যে বিদ্যা ও সুন্দরের মিলনশয্যা পাতা হয়েছে, কিন্তু তার পরে মুক্ত ভোগ-চিত্র ঐ প্রেমসুকুমারতাকে আহত করে, এবং একেবারে বিপর্যস্ত করে দেয় বিদ্যার গভ ও তাব মায়ের পরবর্তী আচরণ, যার বাস্তবরস ও নাটকীয়তা অপব দিকে অনবদ্য। মানসিংহে অবশ্য রোমান্টিকতা প্রায় নেই। ঐ কাব্যের যে-অংশটুকু সাহিত্যেব দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য (গানগুলি বাদ দিয়ে), তাতে বাস্তবরসেরই প্রাধান্য—ভবানন্দের দুই পত্নী-সম্ভাষণের কৌতুকরসোজ্জ্বল ও মনস্তত্ত্বসম্মত রচনাংশটুকুর কথাই বলছি।

শ্রীযুক্ত বিশী এই সব অসুবিধার কথা জানেন না তা নয়। তাঁর মতো দীপ্তবুদ্ধি সাহিত্যিক অবশ্যই ভারতচন্দ্রের কাব্যের কৌতুক ও ব্যঙ্গাত্মক প্রকৃতির সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন। হীরা ও ভাঁড়ুকে কি তিনিই মুখোমুখি দাঁড় করাতে চান নি? সুতরাং সামঞ্জস্যের জন্য তাঁকে ভারতচন্দ্রের কাব্যের রোমান্টিকতা ও স্যাটায়ারের মিশ্রণের কথা ভাবতে হয়েছে। তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন—বিদ্যাসুন্দর রোমান্টিক স্যাটায়ার। বিদ্যাসুন্দর-কাব্যের উক্ত লক্ষণকে আমরা স্বীকার করি, একটি বিষয়ে একইসঙ্গে সচেতন থেকে—রোমান্স ও স্যাটায়ারের মতো ভিন্নধর্মী বস্তুর মিলন অতি দুরূহ ব্যাপার। রোমান্টিকতার জন্ম হৃদয়ে এবং স্যাটায়ারের জন্ম বুদ্ধিতে, তা আমরা আগেই দেখে এসেছি। রোমান্সের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাঁধনহারা জগতের সঙ্গে স্যাটায়ারের

বুদ্ধিবক্র জগতের দূর পার্থক্য। অত্যন্ত সতর্ক না হলে উভয়ের উপযুক্ত সামঞ্জস্য আনা যায় না। ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভার পক্ষে বলতে পারি, উভয়ের দুরূহ মিলনে তিনি অনেকাংশে আশ্চর্যরকমে সার্থক। কিন্তু ব্যর্থতার ক্ষেত্রও আছে, যেখানে একদিকে রোমান্সের রহস্য ঘুচেছে, অন্যদিকে স্যাটায়ারের উদ্দেশ্যমূলক হাসি কদর্য মুখবিকৃতিতে পৌঁছেছে। বিদ্যাসুন্দরের অনেক অংশ যে অনেকের চক্ষুশূল, তা কেবল তাঁদের চোখের বা মনের দোষে নয়, রোমান্স ও স্যাটায়ারের মতো দুই ভিন্ন উপাদানের মিশ্রণব্যর্থতার জন্যও বটে।

তাহলে বিদ্যাসুন্দরকে রোমান্টিক কাব্য বলবার পক্ষে কোন্ কোন্ স্পষ্ট প্রমাণ আমরা দেখাতে পারি? একটি প্রমাণ একেবারে অনস্বীকার্য, কারণ পাঠকহৃদয়ে তা গাঁথা রয়েছে—এ কাব্য মনে কল্পলোকের স্বপ্ন জাগায়। সত্যই জাগায়, তা পূর্বে রামগতি বা হেমেন্দ্রপ্রসাদের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদাকে বাদ দিলে আর কোনো একটি বাংলা কাব্য সম্বন্ধে অনুরূপ দাবি করা যাবে না। বাংলাদেশের তাবৎ সমালোচক যদি কলম উঁচিয়ে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করেন তবু পাঠকমনের সমর্থনে এ কাব্য রোমান্টিকই থেকে যাবে।

এ কাব্যের রোমান্টিকতার পক্ষে সবচেয়ে জোরালো দাবিদার প্রমথ বিশী অসামাজিক প্রেমকেই রোমান্টিকতার মৌল উপাদান বলেছেন। তদুপরি এর রন্ধ্রপথের রহস্য। অসামাজিক প্রেম কেন রোমান্টিক তিনি ব্যাখ্যা করেন নি, এবং রন্ধ্রপথের গহনতা ছাড়া এই কাব্যে রহস্যের আর কোনো উৎস আছে কি না তিনি বলেন নি।

শেষোক্ত প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি, সত্যকার রহস্য বিদ্যাসুন্দর কাব্যে যতখানি না আছে, সঙ্গীতে ততোধিক। সঙ্গীতগুলির উল্লেখ তিনি কেন করেন নি জানি না। সঙ্গীতগুলির মিস্টিক রহস্যময়তার কথা আগে বিস্তারিত বলেছি। এখানে অধিকন্তু বলতে পারি—সেগুলি রোমান্টিকভাবেও কম রহস্যময় নয়। তারা এই কাব্যের আত্মার সঙ্গীত।

বিদ্যাসুন্দরের প্রেমের অসামাজিকতা কেন রোমান্টিক, তাও একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। বৈষ্ণবকাব্যের অসামাজিক প্রেমের সঙ্গে তার

নিগূঢ় ঐক্য আছে—কেবল এই জন্যই তা রোমান্টিক নয়। বৈষ্ণব প্রেম অসামাজিক হয়েও আধ্যাত্মিক, সুতরাং তা সমাজসংস্থিতিকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে না, যা করে লৌকিক অসামাজিক প্রেম। বিদ্যাসুন্দরের প্রেম লৌকিকভাবে অসামাজিক, সুতরাং বিদ্রোহী, সেখানেই তার রোমান্টিকতা। কিন্তু ভারতচন্দ্র তো বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর উদ্ভাবক নন—তাঁর পূর্বেও তো অনেকে মোটামুটি একই কাহিনীধারার অনুসরণ করেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও কি রোমান্টিক কথাটা প্রযোজ্য? না—কেবল ভারতচন্দ্রের ক্ষেত্রেই; কারণ কালী-সত্ত্বেও বিদ্যাসুন্দর কাব্যেব সেক্যুলার স্পিরিটের কথা সকলে স্বীকার করেছেন, যা অন্যদের মধ্যে নেই। এই সেক্যুলার মেজাজেব বিদ্রোহকে ব্যক্তির বিদ্রোহ বলতে পারি, এবং রোমান্টিক সাহিত্যে এই ব্যক্তিবিদ্রোহ দেখা যায়।

ভারতচন্দ্রের এই বিদ্রোহ বৈষ্ণব ভাবালুতার বিরুদ্ধেও। আত্মার সন্ধানে বৈষ্ণবকবিরা যখন কাব্যেব আত্মাকে খাঁচাছাড়া করে ফেলেছেন, তখন সুস্থ দেহধর্মেব পক্ষে জয়ধ্বনি একধরনের চিত্তস্ফূর্তির দ্যোতক, যে-স্ফূর্তিকে রোমান্টিক লক্ষণ বলা চলে। এবং ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যিক অসুন্দর গ্রাম্যতার বিরুদ্ধেও সৌন্দর্যের পক্ষে বিদ্রোহ কবেছিলেন, যা জীবনের রমণীয় স্বপ্নলোক সৃষ্টি করে পাঠককে সুদূর-চেতনা দিয়েছিল।

শেষোক্ত ক্ষেত্রেই ভারতচন্দ্রকে সত্যকার বোমান্টিক কবি-হিসাবে পাব। বলা হয় ভারতচন্দ্র বাংলাসাহিত্যে প্রথম ক্লাসিক-রীতি এনেছিলেন। এই তথাকথিত ক্লাসিক-রীতিই যে তাঁব কাব্যকে চূড়ান্ত রোমান্টিক কবেছে—এ বিষয়ে কজন সচেতন? আর ভারতচন্দ্রের রীতি ক্লাসিক কোন্ অর্থে? ইউরোপীয় অর্থে নিশ্চয় নয়, যা বলে, পুরাতন শিষ্ট কাব্যধারার প্রকৃষ্ট অনুসরণে সে রীতি সংগঠিত হয়। বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র কার আবার অনুসরণ করলেন—মুকুন্দ-রামের? কদাপি নয়, অন্ততঃ রীতির ক্ষেত্রে। অনুসরণ করবাব যোগ্য-কিছু মুকুন্দরামের রীতিতে ছিল না। বৈষ্ণব সাহিত্যের? সে রীতি এমনই তরল (বাংলাপদের ক্ষেত্রে) এবং বৈচিত্র্যহীন কৃত্রিম (ব্রজবুলি

পদের ক্ষেত্রে) যে, ভারতচন্দ্রের পক্ষে অনুসরণের কোনো কথাই ওঠে না। বরং বলতে পারি, নিষ্প্রাণ ক্লাসিকতা যদি কোথাও থাকে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদরীতিতে আছে। ভারতচন্দ্র তাঁর রীতি-চর্চার কালে কালিদাসের যুগে ফিরে গিয়েছিলেন আদর্শসন্ধানের জন্য, একথা বললেও আমরা আপত্তি করতে পারি, ভারতচন্দ্রের কাব্যের লৌকিক প্রাণচাঞ্চল্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অপরদিকে যখন দেখি, কবি স্বাধীন সুখে নানা ভাণ্ডার থেকে যথেচ্ছ শব্দসম্ভার আহ-রণ করেছেন- -তখন তার মধ্যে কি তাঁর রোমান্টিক মেজাজ দেখা যায় না—অন্ততঃ প্রমথ চৌধুরীর ব্যাখ্যা মতো, যিনি ফরাসি রোমান্টিক আন্দোলনের চরিত্রবিশ্লেষণের কালে নিম্নের কথাগুলি বলেছেন ?—

"১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সের নূতন সাহিত্য ক্লাসিসিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। এই সাহিত্যই রোমান্টিক বলে পরিচিত। শাতোব্রিয়াঁ এর প্রবর্তক, এবং ভিকটর হিউগো এর নায়ক। ক্লাসিসিজমের ভাব ও ভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহই এ সাহিত্যের লক্ষণ ও বিশেষত্ব। রিজ্‌নের পরিবর্তে কল্পনা, বাঁধাবাঁধি নিয়মের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা, ভাষাপ্রয়োগে কৃপণতার পরিবর্তে অজস্রতা—রোমান্টিক সাহিত্যে এই সবই প্রাধান্য লাভ করেছিল। বোমান্টিক লেখকেরা ইতর বলে কোনো শব্দকেই বর্জন কবেন নি ; এঁদের প্রসাদে একদিকে শত-শত উপেক্ষিত পতিত ও বিস্মৃত শব্দ, অপরদিকে শিল্পবিজ্ঞান হতে সংগৃহীত শত-শত পারিভাষিক শব্দ সাহিত্যে প্রবেশলাভ করলে।··· এর ফলে সাহিত্যের ভাষা আবার শব্দসম্পদে বিপুল ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠল। এই নূতন ভাষা আবেগপ্রকাশের যেমন উপযোগী, বাহ্যিরের দৃশ্য-অঙ্কনের জন্য তেমনি উপযোগী। এ রোমান্টিক সাহিত্য কিন্তু আসলে উচ্ছৃঙ্খল সাহিত্য নয়। ভিকটর হিউগো, মুস্‌সে প্রমুখ লেখকেরা মুখে অবাধ স্বাধীনতা প্রকাশ করলেও কাজে আর্টের অধীনতা হতে মুক্ত হননি। এমনকি কোনো-কোনো সমালোচকের মতে ভিকটর হিউগো ফরাসিসাহিত্যের একজন অপূর্ব শিল্পী। তাঁর প্রতি ছত্রে কারিগরের হস্তের পরিচয় পাওয়া যায়।"

উপরের উদ্ধৃতির বক্তব্য কি বাংলাসাহিত্যের পটভূমিকায় ভারত-চন্দ্রের কাব্য সম্বন্ধে সত্য নয়? নানা সূত্র থেকে শব্দ গ্রহণ করে ভারত-চন্দ্র স্বাধীন পরীক্ষাকাজ চালিয়েছিলেন, তার জন্য কি তাঁকে রোমান্টিক বলা চলবে না? যদিও প্রমথ চৌধুরী হয়ত যোগ করে দিতে চাইবেন, ফরাসীরা যেমন জাতে বোমান্টিক নন, ভারতচন্দ্র তেমনি ধাতে রোমান্টিক নন।

ভারতচন্দ্রের সর্বাধিক সাফল্য রূপলোক নির্মাণে। শব্দ, ছন্দ, অলঙ্কার ও বাগ্‌রীতির কোন্ সমাহারে ঐ রমণীয় জগৎ তিনি নির্মাণ করেছিলেন, তা এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু একথা দিবা সত্য, অসাধারণ প্রতিভায় তিনি যে-সুচারু শিল্পসৃষ্টি করেছেন, তা বাংলা কাব্যজগতের অষ্টম আশ্চর্যের মত বিরাজমান থেকে পাঠককে মুগ্ধ অভিভূত করেছে। ক্লাসিক সাহিত্য থেকে যদি তিনি উপাদান সংগ্রহ করে থাকেন এবং আয়াসসাধ্য রীতিতে তাদের দ্বারা স্থাপত্য-নির্মাণ করেন, তাহলেও তা প্রাণধর্মে রোমান্টিক থেকে যায়, কারণ সমকালীন পাঠক ঐ সৌন্দর্যপুরী থেকে বহুদূরে অবস্থিত, যা তার মনকে চঞ্চল করে ঐ বিচিত্রলোকে যাত্রা করার পিপাসা জাগিয়ে তোলে। ক্লাসিক কাব্যের উপাদানকে রোমান্টিক অনুভূতিসৃষ্টির কাজে কি অপূর্ব-ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব, তা রবীন্দ্রনাথের কালিদাস-কেন্দ্রিক কবিতা-গুলি পড়লেই বোঝা যায়। ভারতচন্দ্রের সযত্নে নির্মিত তথাকথিত ক্লাসিক কাব্য বস্তুতঃপক্ষে রোমান্টিক অনুভূতিই জাগায়।

॥ ২ ॥

বিদ্যাসুন্দর কি রূপক-কাব্য?

অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর কাব্যদুটির মধ্যে কিভাবে রোমান্টিকতা প্রকাশ পেয়েছে তার বস্তুপরিচয় দেব, তার আগে অঙ্গাঙ্গি আর একটি বিষয়ের আলোচনা সেরে নিতে চাই। ত্রয়ীকাব্যকে সমগ্রভাবে, বিদ্যাসুন্দরকে বিশেষভাবে, অনেকে রূপককাব্য প্রতিপন্ন করতে চেয়ে-ছেন। যাঁরা করেছেন তাঁদের কেউ-কেউ সাধু উদ্দেশ্যে এ-কাজ করেছেন

—কাব্যের দুর্নাম দূর করাই সেই উদ্দেশ্য। তাঁদের চেষ্টা—এ পাঁক সে পাঁক নয়, এ হল চন্দনপঙ্ক—দেখিয়ে দেওয়া। এক্ষেত্রে দেবেন্দ্রবিজয় বসুর ভয়ানক কাণ্ড সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গবাসী-প্রকাশিত অন্নদামঙ্গলের ভূমিকায় তিনি যে গুরুতর তত্ত্বকথা বলেছেন তা পড়লে আতঙ্কে পাঠকের নবদ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং তারপরে তাঁরা স্বচ্ছন্দে যোগাসনে বসে অন্নদামঙ্গল পাঠ করতে পারবেন। ডঃ মদনমোহন গোস্বামী এটিকে 'সমগ্র বিদ্যাসুন্দর পালাখানির একটি চমৎকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা' বিবেচনা করে উদ্ধৃত করেছেন, কৌতূহলী পাঠক তাঁর গ্রন্থের ২২৮-২৩৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়ে চিত্তশুদ্ধি করতে পারবেন, আমি নাতি-কৌতূহলী পাঠকের জন্য ভবানন্দের দেশভ্রমণ-কাহিনী সংক্রান্ত তত্ত্বব্যাখ্যার কয়েক লাইন উপস্থিত করছি, যার দ্বারা পাঠকগণ রবীন্দ্রনাথ কেন 'ব্যঙ্গকৌতুক' লিখেছিলেন বুঝতে পারবেন :

"গুহ্যদেশে চতুর্দল মূলাধার, লিঙ্গমূলে ষড়দল স্বাধিষ্ঠান, নাভিদেশে দশদল মণিপুর, হৃদয়ে দ্বাদশদল অনাহত, কণ্ঠে ষোড়শদল বিশুদ্ধ, ললাটে দ্বিদল আজ্ঞা এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদল সহস্রার চক্র বা পদ্ম হইল ষট্‌চক্র। ইহাদিগের মধ্যে যথাক্রমে অধিষ্ঠিত আছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ, সদাশিব, শিব ও পরব্রহ্ম। ষট্‌চক্রভেদ করিয়া জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন হয়। ভবানন্দের দেশভ্রমণ কাহিনীতে নীলাচল, সেতুবন্ধ, কাঞ্চী, দ্বারকা, প্রয়াগ, অযোধ্যা এবং কাশী—এই সপ্ততীর্থ সংকেতের দ্বারা সপ্তচক্র বুঝান হইয়াছে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিশ্বকোষের ত্রয়োদশ খণ্ডের একটি পাদটীকায় উপরিউক্তভাবে সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করা হয় নি, বরং কিছু ইতিহাসকথার সঙ্গে বিদ্যাসুন্দর রূপকের যোগ করে দেওয়া হয়েছিল, তবু হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, যিনি বিদ্যাসুন্দরের রূপক-চরিত্রে বিশ্বাস করেন, বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "[লেখককে] রূপকের অর্থ শেষ পর্যন্ত স্থির রাখিতে গলদ্‌ঘর্ম হইতে হইয়াছে—ব্যাখ্যাও স্থানে স্থানে অসংলগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

বিশ্বকোষের লেখক বলেছিলেন—বিদ্যা জ্ঞানরূপা প্রকৃতির একটি রূপ—এখানে ন্যায়শাস্ত্র। বাংলা ন্যায়ের পীঠস্থান—যে বিদ্যা আহরণের

জন্য নানা স্থান থেকে পড়ুয়ারা আসে। বিদ্যালাভের জন্য তাদের প্রবল আগ্রহ (বিদ্যার প্রতি প্রেম), তারা কূটতর্কের দ্বারা ন্যায়তত্ত্ব জানতে চায় (বিদ্যাসুন্দরের বিচার), সেজন্য প্রাণ পর্যন্ত পণ করে (মশানে যায়), বিদ্যালাভের জন্য আচার্যের সাহায্য নেয় (মালিনী দৌত্য), পরে ছাত্রের নবলব্ধ বিদ্যার কাছে আচার্য হতমান হন (মালিনী-নিগ্রহ), ইত্যাদি।

অনেক পরে ডাঃ সুকুমার সেন বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে তত্ত্বরূপক আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রথম দিকে স্বাভাবিক রূপক দর্শন করেছিলেন : 'পুরুষ খোঁজে বিদ্যা আর নারী চায় সৌন্দর্য—এই রূপকের উপরে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর ভিত্তি।' পরে তিনি আরও অগ্রসর হয়ে মনুসংহিতা, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, আবেস্তা ইত্যাদি অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্ত করেছেন "এক ধরনের···ভৈষজ্য গুণীর নাম হল যেমন 'বৈদ্য', আর এক ধরনের···শল্য-গুণীর নাম হল [নর] সুন্দর।" পাঠান্তে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তারিফ করে লিখেছেন : 'ডঃ সেন···গুণসিন্ধুতনয় সুন্দরকে নরসুন্দর বানাইয়া ফেলিয়াছেন।'

বিদ্যাসুন্দরের সত্যই যদি কোনো রূপক থাকে, তাকে সৌন্দর্যময় বিদ্যাযোগে প্রথম প্রকাশ করেছিলেন (যতদূর দেখেছি), গৌরদাস বৈরাগী ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে। পরবর্তীকালে অনেকেই জ্ঞাতে অজ্ঞাতে তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। বিদ্যাসুন্দরের ইংরেজি-অনুবাদের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন :

"Some are of opinion that seemingly sensual as the sentiment running through Vidya Sundara is, the poem is really informed with a meaning of high spiritual value. They say that *Sundara represents beauty physical and moral, and Vidya learning or wisdom. The union of the hero and heroine represents the union of Beauty with wisdom—a union constituting an excellent ideal of human perfection, the Greck ideal embodied in Plato'* **Charmides,** *of a beautiful mind in a beautiful body.* Such an opinion is not utterly devoid of weight Even if it be the poet meant no such thing, still if we can read this sense into his Poem, we should certainly interpret so, as such an interpre-

tation is calculated to alter infinitely for the better the reader's point of view ; while the importance of the question as to the soundness of attributing the conception to Bharatchandra is slight indeed in comparison. Interpreted in this sense, the hideously gross will certainly lose much of its offensiveness and will come to be looked upon mainly as a contrivance to give form and shape to the spirituality impalpable We ask, if we can manage to see beauty in a work of art, why in the name of taste and morality should we persist in perceiving deformity and ugliness ?" [বক্রলিপি বর্তমান লেখকের নির্দেশে]

গৌরদাসের বক্তব্য থেকে পাচ্ছি—প্রথমতঃ তিনি 'বিদ্যা' ও 'সুন্দরে'র মিলনকে বিদ্যা ও সুন্দরের মিলন বলেই দেখতে চান, যার মধ্য দিয়ে প্লেটো-কথিত সুন্দর দেহপ্রতিমায় সুন্দর মনের অধিষ্ঠানের গ্রীক আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতচন্দ্র সচেতনভাবে এই কাজ করবাব চেষ্টা কবেছেন কি না, সে বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত নন, তবে ঐ অর্থ আবিষ্কাবের চেষ্টা করা সৎপাঠকের কর্তব্য, কারণ তার দ্বারা ভারতচন্দ্রের কাব্য নূতন আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং তার উপরে চাপানো গ্লানিকর বস্তুভার থেকে মুক্তি পাবে। উত্তম একটি শিল্পসৃষ্টির মধ্যে যদি সৌন্দর্য দেখা সম্ভবপর হয়, তাহলে নৈতিকতা ও রুচিশীলতার নামে তাকে কুৎসিত আকারে দেখতে সচেষ্ট থাকব কেন? —বৈরাগী প্রশ্ন করেছেন। এই সঙ্গে তিনি যথার্থ সাধুতার সঙ্গে জানিয়েছেন—বিদ্যাসুন্দব কাব্যের উপবে এই যে নূতন অর্থ তিনি আরোপ করলেন, এটি তাঁর নিজস্ব নয়—কাব্যটির উচ্চ আধ্যাত্মিক মূল্যে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের অনেকে ঐ কথা বলে থাকেন।[২]

২। প্রমথ চৌধুরী সম্ভবতঃ গৌরদাস বৈরাগীর লেখা পড়েছিলেন (কিংবা পড়েন নি), লিখেছেন, "কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য না হলে তিনি বিদ্যাসুন্দর রচনা করতেন না, কিন্তু তাঁর হাতে বিদ্যা ও সুন্দরের অপূর্ব মিলন সংঘটিত হত ; কেননা Knowledge এবং Art উভয়ই তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল।" ('সাহিত্যে খেলা') →

কালিদাস রায় রূপক-প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"নায়ক নায়িকার 'সুন্দর' ও 'বিদ্যা' নামকরণ বেশ ব্যঞ্জনাময়। সৌন্দর্যবোধের সহিত বিদ্যাবত্তার মিলন বড়ই দুর্লভ ও দুরূহ—কচিৎ কখনো ঘটে। যেখানে ঘটে, সেখানেই প্রকৃত কবিত্বের জন্ম হয়। এই মিলনের দূতীই প্রকৃতি—এই কাব্যে সেই পুষ্পকুঞ্জবাসিনী মালিনী। অন্তরের গভীর স্তরে এই মিলন—মনের সুড়ঙ্গপথে। এই মিলনের আনন্দ কবিচিত্ত গোপনেই উপভোগ করে—চরম দৈহিক আনন্দের symbol-এর দ্বারাই বিদ্যাসুন্দরে সেই আনন্দের আভাসমাত্র দেওয়া হইয়াছে।" [প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, তৃতীয়-চতুর্থ খণ্ড ; বিদ্যাসুন্দর]

বিদ্যাসুন্দরের রূপকের উপরে কবি কালিদাস রায় বেশ কিছু কাব্যরস বর্ষণ করেছেন। অপর পক্ষে প্রমথনাথ বিশী বক্র কটাক্ষে রূপক দেখেছেন :

"কাব্যের নায়ক ও নায়িকা, সৌন্দর্য ও বিদ্যা। রাজসভার আদর্শ ইহার অপেক্ষা আর কি বেশী হইতে পারে! যে সুন্দর ও বিদ্যার সাক্ষাৎ আমরা ভারতচন্দ্রে পাই, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাতে সেই জাতীয় সৌন্দর্য ও বিদ্যার চর্চাই হইত, গভীরতার অপেক্ষা নিপুণতা যাহাতে অধিক, আন্তরিকতার অপেক্ষা বাহ্যিকতা যাহাতে অধিক। এইসব দেখিয়া এক একবার মনে হয়, কবি গল্পের উপলক্ষে রাজসভার রূপক লিখিয়া গিয়াছেন। এই রূপক একাধারে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার রূপকথা এবং স্বরূপকথা।"

রূপক প্রসঙ্গে জয় গৌরদাস বৈরাগীরই। তাঁর থেকে চমৎকার করে কথাটা আর কেউ বলতে পারেন নি, এবং সত্যই আমরা একটা নতুন বর্ণাভাসে বিদ্যাসুন্দরকে দেখবার ইচ্ছা বোধ করি। ভারতচন্দ্র যেভাবে সুন্দরের মধ্যে বিদ্যার আশ্রয় এবং বিদ্যার মধ্যে সৌন্দর্যের বিকাশ দেখিয়েছেন, তাতে কবি এক্ষেত্রে সচেতন ছিলেন না, মনে করতে ইচ্ছা হয় না।

প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রের ব্যর্থতার কথাই এখানে বলেছেন। সাফল্য ঘটলেই তবে রূপক হয়েছে বলা চলত। তবে রূপকাভাসকে তিনি স্বীকার করেছেন।

এবং যদি সচেতন থাকেন—ব্যাপারটা খুবই রোমান্টিক দাঁড়ায়। মানবদেহে সৌন্দর্য ও জ্ঞানের নিত্যমূরতির এই কল্পনা আমাদের বস্তু-জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করবেই।

॥ ৩ ॥

অন্নদামঙ্গলে রোমান্টিকতাঃ ব্যাসকাহিনীতে নবপুরাণসৃষ্টির চেষ্টা

ভারতচন্দ্রের কাব্য যে, সত্যই রোমান্টিক,'তা কাব্যের মধ্য থেকে দেখিয়ে দেবার কিছু চেষ্টা এবার করা দরকার। অন্নদামঙ্গল সম্পূর্ণ রোমান্টিক কাব্য নয়, পুরাতন মঙ্গলকাব্যের অনেক দায় কবিকে এখানে বহন করতে হয়েছে, তবু কবি পুরনো জিনিসকে মার্জনার দ্বারাই এমন রূপ-রসোজ্জ্বল করে তুলেছেন যে, নবপুরাণপাঠের আনন্দময় উত্তেজনা আমরা লাভ করি। এই নবপুরাণসৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যাসকাহিনী সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

দু'একটি রূপসুন্দর বর্ণনা আগে উদ্ধার করা যাক। অন্নদাকে কবি মোহিনীরূপে দেখিয়ে দীর্ঘ বর্ণনা করেছেন, যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও তা যথেষ্ট আশ্চর্যজনক হয় নি, কিন্তু বড় চমৎকার হরগৌরীর মিলিত রূপের বর্ণনা, তার কয়েক ছত্র :

আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে।
আধ পট্টাম্বর সুন্দর সাজে,
আধ মণিময় কিঙ্কিণী বাজে,
আধ ফণী ফণা ধরি রে ॥
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা,
আধ মণিময় হার উজালা,
আধ গলে শোভে গরল কালা,
আধই সুধা মাধুরী রে ॥

অন্নপূর্ণার পুরীনির্মাণের সূত্রে কবি একটি অপরূপ স্বপ্ননির্মাণ করেছেন, একটি কল্পনিকেতন, রবীন্দ্রনাথের উক্তি-অনুযায়ী সেখানে সশরীরে যাওয়া যায় না :

দেউলের শোভা দেখি বিশাই মোহিলা।
চৌদিকে প্রাচীর দিয়া পুরী নির্মাইলা॥
সম্মুখে করিলা সরোবর মনোহর।
মাণিকে বান্ধিলা ঘাট দেখিতে সুন্দর॥
সূর্যকান্ত চন্দ্রকান্ত আদি মণিগণ।
দিয়া কৈল চারিপাশে অতি সুশোভন॥
গড়িল স্ফটিক দিয়া রাজহংসগণ।
প্রবালে গড়িল ঠোঁট সুরঙ্গ চরণ॥
সূর্যকান্ত মণি দিয়া গড়িলা কমল।
চন্দ্রকান্ত মণি দিয়া গড়িলা উৎপল॥
নীলমণি দিয়া গড়ে মধুকর-পাঁতি।···

এমন রূপের পৃথিবীতে বসন্তই নিত্য ঋতু :

কলকোকিল অলিকুল বকুল-ফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণিদেউলে॥
কমল-পরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে।
বসন্তরাজা আনি ছয় রাগিণী-রাণী
করিলা রাজধানী অশোকমূলে॥···

তারপর যখন

ঘরে ঘরে নানা ছন্দে বসন্তের গান।
সঙ্গে ছয় রাগিণী বসন্ত মূর্তিমান॥
শুষ্ক তরু শুষ্ক লতা রসেতে মুঞ্জরে।
মঞ্জরীতে মুকুল আকুল মন করে॥

তখন—

অবতীর্ণ অন্নপূর্ণা হইলা কাশীতে।
প্রতিমায় ভর করি লাগিলা হাসিতে॥
মণিবেদীপরে চিন্তামণির প্রতিমা।
বিশ্বকর্মা-সুনির্মিত অপার মহিমা॥

ব্যাস-কাহিনীতে কবি নবপুরাণসৃষ্টি করতে চেয়েছেন, একথা বলেছি। পুরাতন কাহিনীর মধ্যে নবজীবনবোধ সঞ্চারিত করে নূতন আকারে তাকে উপস্থিত করার এই ধরনের প্রয়াস রোমান্টিক লেখকেরা করে থাকেন। ব্যাসের চরিত্রের নবরূপায়ণের মধ্যে ভারতচন্দ্র সেই চেষ্টা করেছেন—একথা বললে কি পরিমাণ বিরক্তি অর্জন করব তা আমরা জানি, কারণ ব্যাসচরিত্র কবির ব্যর্থসৃষ্টির নমুনা, এ সম্বন্ধে বক্তব্যে সমালোচকেরা দ্বিধামাত্র রাখেন নি। (যথা, কালিদাস রায় বলেছেন, 'ব্যা:সর মতো জগৎপূজ্য চরিত্র লইয়া তিনি বাঁদরনাচ নাচাইয়াছেন।') এবং আমরাও একথা স্বীকার করি, নবপুরাণসৃষ্টি বললে যে-জাতীয় প্রবল শক্তিস্পন্দিত মহনীয় সৃষ্টি বোঝায়, এক্ষেত্রে তা হয়নি। তবু, কবি যখন তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সর্বসম্মানিত একটি পৌরাণিক চরিত্রের বিপরীত চেহারাকে উপস্থিত করেন, তখন তাঁর নূতন রচনার সচেতন অভিপ্রায়কে অগ্রাহ্য করি কি করে? তদুপরি, লেখক ব্যাসের মধ্যে যে-প্রচণ্ড অহংকে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন, যা আত্মস্ফীতি এনে তাঁকে বিচিত্র আচরণে প্রবৃত্ত করিয়েছে, তাও রোমান্টিক ট্রাজেডির প্রস্তাবনার কথা স্মরণ করায়। এই সূত্রে ত্রিশঙ্কুর মতো ব্যাসের দ্বিতীয় স্বর্গ (অর্থাৎ দ্বিতীয় কাশী) নির্মাণ-চেষ্টার কথাও মনে রাখব।

ব্যাসকাহিনীকে একটু অনুসরণ করা যাক।

গোঁড়া বৈষ্ণবরূপে এ-কাব্যে ব্যাসের অবতরণ। তাঁর সে চেহারা আগে আমরা দেখিয়েছি। শৌনকাদি ঋষিকে তিনি তমোগুণী শিবকে ছেড়ে সত্ত্বগুণী বিষ্ণুকে পূজা করতে প্ররোচিত করেছিলেন। ঋষিদের কুটবুদ্ধি অল্প নয়, তাঁরা ব্যাসকে বললেন, শিবস্থান কাশীতে বিষ্ণুপূজা হলেই তবে তা সর্বগ্রাহ্য হবে। শুনেই ব্যাস নেচে উঠলেন এবং 'হরি হরি' গর্জন করতে-করতে শিবকেল্লা দখল করতে ছুটলেন। ঋষিরাও তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলেন। যাত্রা জমেছে দেখে সবাই কাশীতে উপস্থিত, দেবগণ পর্যন্ত আকাশে গুপ্ত থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলেন।

কাশীতে ব্যাস রীতিমত কীর্তন ও কথকতার আখড়া খুলে

বসলেন। সমকালীন বৈষ্ণবদের চেহারায় ব্যাসকে উপস্থিত করতে কবির অসুবিধা হয় নি, কারণ তাঁর 'চিরজীবী নরাকার লীলা।'—

কীর্তনে ঢালিয়া দেহ গড়াগড়ি দেয় কেহ
কেহ তারে ধরে তোলে কোল।
উর্ধ্বভুজ উর্ধ্বপদে কেহ নাচে প্রেমমদে
কেহ বলে হরি হরি বোল॥

নবধর্মপ্রচারক ব্যাসের উৎসাহ আরম্ভেই ঘা খেল। শিবনিন্দা করায় নন্দী ক্রোধে শাপ দিলেন, ফলে ব্যাস ভুজস্তম্ভ, রুদ্ধকণ্ঠ। অবস্থা দেখে বিষ্ণু এসে ব্যাসকে বিস্তর ভর্ৎসনা করলেন ও শিবপূজা করতে উপদেশ দিলেন। তা করা মাত্র ব্যাস এমন প্রত্যক্ষ ফল পেলেন যে, পত্রপাঠ বিষম শিবভক্ত হয়ে পড়লেন। ছিলেন বৈষ্ণব 'বাঘ', হলেন শৈব 'ভূত'।

এত শুনি ব্যাসদেব পরম উল্লাস।
তদবধি শিবভক্ত হইলেন ব্যাস॥
মুছিয়া ফেলিলা হরি-মন্দির তিলকে।
অর্ধচন্দ্র ফোঁটা কইল কপাল-ফলকে॥
ছিঁড়িয়া তুলসী কণ্ঠী লম্বিমালা যত।
পরিল রুদ্রাক্ষমালা শৈব অনুগত॥
ফেলিলা তুলসীপত্র বিল্বপত্র লয়ে।
ছাড়িলা হরির গুণ, হরগুণ কয়ে॥
ব্যাস কৈল প্রতিজ্ঞা, যে হউক পরিণাম।
অদ্যাবধি আর না লইব হরিনাম॥

এবার শিবের টনক নড়ল। ভ্রাতা বিষ্ণুর অসম্মানে শিব ভয়ানক চটলেন। ক্রোধহাস্যে নন্দীকে বললেন:

দেখ দেখ ওরে নন্দী ব্যাসের দুর্দৈব।
ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হইল গোঁড়া শৈব॥···
হের দেখ টানিয়া ফেলিল শালগ্রাম।
রাগে মত্ত হইয়া ছাড়িল হরিনাম॥

শিব অভিশাপ দিলেন—কাশীতে ব্যাসের ভিক্ষা-বারণ। তার ফলে স্নানান্তে ব্যাস যখন গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষার জন্য দাঁড়ালেন, তখন ভিক্ষা পেলেন না, কারণ গৃহস্থের উদ্যত হাত থেকে ভিক্ষাদ্রব্য অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল শিবমায়ায়। ক্ষুধার্ত ব্যাস দ্বারে-দ্বারে ঘুরলেন, সর্বত্রই একই ভাগ্য। তখন তিনি গৃহস্থকে কটুকথা বলতে লাগলেন, উল্টো-পক্ষে গৃহস্থরাও এই অন্নহীন অমঙ্গলকে দূর্ দূর্ করতে লাগল্। ব্যাস এবার প্রতি-অভিশাপ দিলেন—অন্যত্রকৃত পাপ কাশীতে খণ্ডায়, ঠিক, কিন্তু কাশীতে কেউ পাপ করলে তা হবে অক্ষয়। পরিহাস এই, শাপ দিয়ে অপরের স্বর্গের দ্বার বন্ধ করা যায় কিন্তু নিজের অন্নসংস্থান করা যায় না। ব্যাস তিনদিন উপবাসী। দেবী অন্নদা বিচলিত হয়ে স্বয়ং ব্যাসকে অন্নদান করতে চললেন। এমন মায়ের কথা বিহ্বল হয়ে কবি লিখলেন :

জগৎ-জননী মাতা সবার সমান।
শক্তিরূপে সকল শরীরে অধিষ্ঠান॥
আকাশ পবন জল অনল অবনী।
সকলে সমান যেন অন্নদা তেমনি॥
সকলে সমান যেন চন্দ্র-সূর্য-তারা।
তেমতি সকলে সদা অন্নপূর্ণা সারা।
মেঘ করে যেমন সকলে জলদান।
তেমতি অন্নদা দেবী সকলে সমান॥

কাব্য থেকে বাস্তব নাটকের দৃশ্যে এলে দেখি—শিবের বেমক্কা রাগে দেবী বড় বিরক্ত হয়েছেন্। সে বিরক্তি পতিদেবতাকে তিনি একটু দেখালেন, অমনি শিব কম্পমান। তখনি, গরবিনী পত্নীর সুখে সকৌ-তুকে দেবী বললেন, 'বুড়াটির ঠাট হেদে দেখ লো বিজয়া!' আর ভারত-চন্দ্র বাপ-মার বিবাদস্থল থেকে স্মিত ত্রাসে সরে গিয়ে বললেন :

ভারত কহিছে ইথে সাক্ষী কেন মানো।
তোমার ঘরের ঠাট তোমরা সে জানো॥

অতঃপর মোহিনীরূপে অন্নদা ব্যাসের কাছে হাজির হবেন। বলাবাহুল্য মোহিনীরূপ বর্ণনার সুযোগ পেলে ভারতচন্দ্র কলমে কার্পণ্য করেন না। কিন্তু মনোহারিণী মোহিনী দেবীকে নয়, সেই পরম জননী মঙ্গলময়ী মাতা, যিনি ছদ্মপরিচয়ে, স্বামীর দোহাই দিয়ে, নিজ ভবনে ক্ষুধার্ত অতিথিকে ডেকে আনেন, তাঁকেই আমরা প্রণাম করি। বুদ্ধিহত ব্যাস পর্যন্ত তাঁকে চিনতে ভুল করেন নি :

নিরুপমরূপা তুমি নিরুপমবয়া।
নিরুপমগুণা তুমি নিরুপমদয়া॥
তখনি পাইনু ভিক্ষা কহিলা যখনি।
পরিচয় দেহ মোরে কে বট আপনি॥···
শুনিয়াছি অন্নপূর্ণা কাশীর ঈশ্বরী।
সেই বুঝি হবে তুমি হেন মনে করি॥
প্রতি ঘরে ফিরি ভিক্ষা নাহি পায় যেই।
অন্নপূর্ণা বিনা তারে কেবা অন্ন দেই॥
এত শুনি অন্নপূর্ণা সহাস্য অন্তরে।
কহিতে লাগিলা ব্যাসে মৃদু মধু স্বরে॥
কোথা অন্নপূর্ণা কোথা তুমি কোথা আমি।
শীঘ্র আসি অন্ন খাও দুঃখ পান স্বামী॥

ব্যাসের যখন পেট ঠাণ্ডা হয়েছে, তখন বৃদ্ধ গৃহস্বামী, যিনি অবশ্যই শিব, ব্যাসকে চেপে ধরলেন, এবং হঠাৎ রাগারাগি করে (বার্ধক্যের দোষ) ব্যাসের উপর কাশী থেকে নির্বাসনের আদেশ জারি করলেন। অন্নদার মাতৃস্নেহের দোর ধরেও ('জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া, মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া') এ যাত্রা ব্যাস পরিত্রাণ পেলেন না।

নির্বাসিত ব্যাস একেবারে ক্ষেপে গেলেন। নির্বাসন! ছি ছি! ত্রিভুবন বিদ্রূপের চোখে তাকিয়ে আছে। মানীর কাছে মান প্রাণের চেয়ে বড়। কিন্তু অমর ব্যাসের প্রাণত্যাগের অধিকারও নেই। ব্যাস রুখে দাঁড়ালেন। স্থির করলেন, বিশ্বামিত্রের দ্বিতীয় স্বর্গের মতো দ্বিতীয় কাশী তিনি তৈরী করবেন, নাম হবে ব্যাসকাশী। এই কাজে বিষ্ণুর

সাহায্য মিলবে না, তাঁর সঙ্গে শিবের আপস, তাছাড়া ক্ষমতা তো ভারি! নন্দী যখন আমাকে প্রায় খুন করে ফেলেছিল তখন ভক্তকে বাঁচাবার ক্ষ্যামতা ওঁর দেখা গেছে, এখন দরকার ব্রহ্মার সাহায্যের, তিনি সৃষ্টিকর্তা, সে হিসাবে সকলের বড়, তাঁকে উঁচুতে তুলব, আর দরকার গঙ্গার সহায়তা, কারণ গঙ্গা 'মোক্ষ কপাটের কুঁজি,' গঙ্গাকে কাজে লাগিয়েই তো শিবের কাশীর এত নাম, গঙ্গার সাহায্য মনে হয় পাওয়া যাবে, সে যে মোক্ষধাম, এ কথা তো আমিই প্রচার করে সবাইকে জানিয়েছি—ব্যাস গঙ্গার সন্ধানে মহাবেগে ধাবিত হলেন।

গঙ্গার কাছে ব্যাস তাঁর মতলব খুলে বললেন। তিনি দ্বিতীয় কাশী করতে চান, তাতে গঙ্গার উপস্থিতি দরকার। তারপর তেড়ে শিবকে গালিগালাজ করলেন। একই তোড়ে গঙ্গাকে স্তুতি শোনালেন,- যার মোট কথা, অনাচারী তমোগুণী শিবের নিজস্ব কোনো মহিমাই নেই, পতিতপাবনী গঙ্গাকে পেয়েই যত ডম্‌ডমা।

ব্যাস অনেকদিন দেব ও মানবচরিত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন। তিনি জানেন, একের নিন্দা করে যদি অন্যের প্রশংসা করা যায়, তা যেমন খোলে, তেমন আর কিছুতে নয়—ঐ, কালো মেঘে দামিনী খেলে! সুতরাং পতিদেবতার যাচ্ছেতাই নিন্দা শুনেও গঙ্গা বেশী চটতে পারলেন না। তথাপি পতিব্রতা, মিষ্টবাক্যে তিনি ব্যাসকে শিবমাহাত্ম্য বোঝাতে চেষ্টা করলেন, রাগলে শিব কি প্রলয় কাণ্ড করে বসেন, তাও জানালেন, শেষকালে বললেন, না বাপু, এসব ঝঞ্ঝাটে না থাকাই ভাল:

জানেন সকল শঙ্কর স্বামী।
এ সব কথায় না থাকি আমি॥

তখন ব্যাস হাঁ করলেন। তপস্বীর পেটে এত অম্ল, কে জানত! যা বললেন, তার মোট কথা এই—বড় আস্পর্ধা তো তোমার! তুমি তো একটা নদী (অবশ্য জ্যান্ত নদী), আমার রচা পুরাণের কল্যাণে করে খাচ্ছ, আর আমাকেই মানতে চাইছ না?

আমি যারে প্রকাশিনু আমি যারে বাড়াইনু
সেই মোরে তুচ্ছ করি কহে।

মাতঙ্গ পড়িলে দরে পতঙ্গ প্রহার করে
এ দুঃখ পরাণে নাহি সহে ॥

তারপর ব্যাস গঙ্গার স্ক্যাণ্ডাল শুরু করলেন। গঙ্গার ঘোলা জলের ঘোলা কারণ খুলে জানালেন। আমরা জানলাম, পুরাণের মহিমার মতো কেচ্ছাও বিশাল।

কিন্তু কোঁদলে পুরুষ কবে মেয়েদের সঙ্গে পেরেছে! গঙ্গার উতোরে ব্যাস নাজেহাল হয়ে গেলেন। গোড়ায় নিজের পূর্বতন কীর্তির পক্ষে কিছু দার্শনিক কারণ জানিয়ে গঙ্গা ব্যাসের চরিত্র নিয়ে পড়লেন। মহাভারতের পাঠকমাত্র জানেন, ব্যাসদেব নিজ জন্মকাহিনী এবং পরবর্তী কার্যকপালের বর্ণনায় এমন মারাত্মক সত্যপ্রীতি দেখিয়ে রেখেছেন, যার সাহায্য নিলে তাঁর কালো রঙকে আরও কালো করে দেওয়া যায়। গঙ্গাদেবী তাই করলেন—নিজের কলুষনাশিনী ভূমিকাকে কিছু সময়ের জন্য স্থগিত রেখে।

ব্যাস দুর্দম। থামা চলে না। সবাই হাসছে। কাশী হবে না? না, করবই। গঙ্গা-টঙ্গা দূর হোক, আগে নগর তো বানাই। ধ্যানযোগে টেনে আনলেন আসল লোককে—বিশ্বকর্মাকে। সত্যকার সৃষ্টিকর্তা তো এই বিশ্বকর্মা—একে দিয়ে সব কিছু তৈরী করিয়ে নামী দেবতারা তার উপরে নিজের নামের ছাপ লাগিয়ে দেন। বিশ্বকর্মাকে কাশী গড়বার অনুরোধ জানিয়ে ব্যাস খাঁটি জড়বাদীর (না, বস্তুবাদীর) মতো বিশ্বকর্মার বন্দনা করলেন :

তুমি বিশ্বকর্ম জানো বিশ্ব কর্ম
তোমাতে বিশ্ব প্রকাশ ॥
তুমি বিশ্ব গড় তুমি বিশ্বে বড়
তাই বিশ্বকর্মা নাম।
তোমার মহিমা কেবা জানে সীমা
কেবা জানে গুণগ্রাম ॥
বিধাতা হইয়া বিশ্ব নিরমিয়া
পালহ হইয়া হরি।

শেষে হয়ে হর তুমি লয় কর
তুমি ব্রহ্ম অবতরি ॥

সে অনেকদিন আগেকার কথা, শ্রমজীবীর প্রভুত্বের দিন তখনো আসে নি, সুতরাং বিশ্বকর্মা মালিকদের খামকা চটাতে রাজি হলেন না; ফলে ব্যাস শাপ ছোটালেন—তোমার কারিকর-অনুচরেরা চির দরিদ্র হবে (বিচিত্র, আশ্চর্য, কবির সমাজসচেতনতা !), বিশ্বকর্মাও ব্যাসের সুবিধাবাদী ভণ্ড রূপটি খুলে ধরে বললেন, তোমাকে খুব চিনেছি—কার্যোদ্ধারের জন্য মিথ্যে খোসামোদ করা তোমার অভ্যাস, যেখানে-সেখানে যাকে-তাকে ব্রহ্ম বলে বেড়াচ্ছ—আমার মধ্যে কি এমন দেখলে যে, আমাকে ব্রহ্ম বলে ফেললে ?

এবার ব্যাস শরণ নিলেন ব্রহ্মার। ফোঁস্-ফোঁস্ করে কাঁদতে-কাঁদতে নিজের দুর্দশা এবং শিবের বজ্জাতির কথা সবিস্তারে বললেন। ব্রহ্মার কাছে যথার্থ সহানুভূতি তিনি পেলেন। ব্রহ্মা যদিও ত্রিদেবের একজন, তবু তাঁর কোনো খাতিরই নেই। স্বয়ংবরসভায় শক্তিদেবী তাঁকে পাত্তা না দিয়ে শিবের গলায় বরমাল্য দুলিয়েছেন। সে কাঁটা বিঁধে আছে। তারপর তাঁর একটি মুণ্ড শিব ছেঁটে কমিয়ে দিয়েছেন। সে অপমানের জ্বালাও আছে। অথচ শিবের সঙ্গে সংঘাতে জয়ের সম্ভাবনা কিছুমাত্র নেই। ইচ্ছামতো উনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন, সুধা-বিষ-হুতাশন-জল সমান দেখেন, অন্যের যাতে অমঙ্গল তাকেই নিজের মঙ্গল মানেন, কিসে অনুগ্রহ কিসে নিগ্রহ বোঝা দায়, আমাকে বিধাতা বলছ, উনি আমারো বিধাতা—আঁচলের খুঁটে ব্যাসের চোখ মুছিয়ে সান্ত্বনা দিতে-দিতে ব্রহ্মা এইসব দুঃখের কথা বললেন। তারপর সদুপদেশ দিলেন :

ওরে বাছা ব্যাস তুমি বড়ই ছাবাল।
শিব-সঙ্গে বাদ কর এ বড় জঞ্জাল ॥

তারপর, এত সব প্রাণের কথা ব্যাসকে বলে ফেলেছেন, সেই ভেবে খপ্ করে নিজেকে সামলে নিয়ে ব্রহ্মা বললেন :

তাঁর সঙ্গে তোর বাদ আমি ইথে নাই।
জানেন অন্তরযামী শঙ্কর গোঁসাই ॥

সমস্ত দরজাই ব্যাসের সামনে বন্ধ হয়ে গেল। তিনি কী করবেন—হার মানবেন? নহে নহে। ব্যাস স্মরণ করলেন, সকলের উপরে আছেন মহাশক্তি। তাঁর ইচ্ছায় সর্বসিদ্ধি ঘটে। ধরব তাঁকেই। ব্যাস তাঁর শেষ তপস্যা, অন্নদাতপস্যা, শুরু করলেন।

এবং ব্যাস তাঁর ক্ষণেকের আশ্রয় ও চিরকালের সমাধি আবিষ্কার করতে পারলেন।

শক্তি তার উৎসে অন্ধশক্তি। সে ভালমন্দ সবই করে নির্বিকারে। আমরা সেই শক্তির উপরে অনুগ্রহ-নিগ্রহের মনোভাব চাপিয়ে সান্ত্বনা বা আশ্বাস পেতে চাই। কিন্তু হায়, ঘরে আলো দেয় যে-আগুন, সেই ঘর পোড়ায়। মহারাত্রি মোহরাত্রির মধ্যে ভক্ত-সাধক 'মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায় ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।'

ব্যাস চূড়ান্ত মরলেন।

মহাশক্তি তখন গৃহিণীরূপে সংসারভবনে আছেন—ভবের ভবানী, কার্ত্তিক গণেশের জননী হয়ে। কল্যাণময়ী মাতৃরূপ তাঁর। তিনি পরিবেশন করছেন অন্নপূর্ণা হয়ে। অনেকদিন পরে ভিখারী শিব ছেলেপুলের সঙ্গে বসে পেটপুরে খেতে পাচ্ছেন। তাঁর পাঁচটা মুখ, কার্ত্তিকের ছ'টা মুখ, গণেশের গজমুখ এবং সংখ্যাতীত ভূতপ্রেতের মুখ-নামক গহ্বর যখন ভরিয়ে দেবার লীলাসুখে দেবী মেতেছেন—ঠিক সেই সময়ে ক্ষুধার্ত ব্যাসের আনন্দহীন লোভ তপস্যার আকারে কৈলাস স্পর্শ করল। পরিপূর্ণ আনন্দের সংসারছবির উপরে দোয়াত উল্টে গাঢ় কালি গড়িয়ে পড়ল।

এইরূপে অন্নপূর্ণা খেলে রসে পরিপূর্ণা
নারীভাবে পতি পুত্র লয়ে।
ব্যাসের তপের গাছ অন্নদার লয়ে পাছ
ফলিলেক বিষবৃক্ষ হয়ে॥

ব্যাস জপে অনশনে অন্নদা জানিল মনে
ব্যাসের তপের অনুবলে।

কপালে টনক নড়ে হাঁত হৈতে হাতা পড়ে
উছট লাগিয়া পা টলে ॥'
দুর্দৈব যখন ধরে ভাল কর্ম মন্দ করে
অন্নদার উপজিল রোষ।

এই রোষবিকৃত মূর্তিই অন্নদার জরতী মূর্তি।

অন্নদার জরতী বেশে ব্যাসছলনা ভারতচন্দ্রের কাব্যের এক শ্রেষ্ঠ অংশরূপে স্বীকৃত। ব্যাসকে ছলনা করতে যাবার আগে শিব রসিকতা করে দেবীকে বললেন, 'তুমি বুঝি তাকে বর দিতে চললে? দেখো, আমার উপরে দয়া ছেড়ো না যেন। বুড়ো হয়েছি, তোমা বিনা গতি নেই, এক মুঠো অন্নের বরাদ্দ যেন থাকে।' রসিকতা শোনার মেজাজে দেবী ছিলেন না। সক্রোধে বললেন, 'কি যে তামাশা করো বুঝি না। তার কি করি একবার দেখো। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে নতুন বারাণসী তৈরী করবে? মজা দেখাচ্ছি।'

অন্নদা জরতী বেশ ধরলেন। তাঁর সে চেহারা দেখে আমরা আবার জানলাম, ভারতচন্দ্রের কাব্যে কেবল সুন্দরেরা নয়, অসুন্দরেরাও ভিড় করে এসেছে।

জরতীর আচার-আচরণ, চলন-বলন চেহারা, অতি বাস্তবতার সঙ্গে চিত্রিত। সেই স্থবির বৃদ্ধার বার্ধক্য অস্বীকারের চেষ্টা, শুনতে না পেলেও শুনবার নিতান্ত উৎকণ্ঠা, ভুল শুনে রাগ, অনেক কষ্টে একটুমাত্র কানে ধরে 'বুঝিনু বুঝিনু' বলে মাথা নাড়ার ভঙ্গি—ছবির মতন ফুটিয়েছেন কবি।

ছলনায় ব্যাসকে উত্ত্যক্ত করে, রাগিয়ে, দেবী বলিয়ে নিলেন, ব্যাস-কাশীতে যে মরবে, সে গর্দভ হবে। বলা মাত্র, সেই জরতী, যিনি কিছুই শুনতে পাচ্ছিলেন না, তৎক্ষণাৎ শুনে ফেললেন: 'বুঝিনু বুঝিনু বলি করে ঢাকি কান, তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্ধান।' ভক্ত পাঠক বা শ্রোতার খুশির শেষ রইল না।

সত্যই? না। বুদ্ধিভ্রষ্ট অহঙ্কারী ব্যাসের চরম দুর্দশায় সম্পূর্ণ খুশি হতে গিয়ে অনুভূতিশীল পাঠক এক সময়ে যেন থমকে যায়। ব্যাসের

শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয় স্বর্গ নির্মাণের সকল প্রয়াস অভিশাপে স্থগিত থাক অর্ধপথে, চিরকাল। কিন্তু তাই বলে ব্যাসকে ঐ অপমানের ভস্মে ফুৎকারে নিক্ষেপ? ব্যাস অনেক দোষ করেছেন কিন্তু তিনি কি মহাশক্তির ঐ নিষ্ঠুর আঘাতের যোগ্য? ব্যাসের শাস্তিতে বিশ্বচ্ছন্দ হয়ত রক্ষা পেল, কিন্তু ব্যাস তো 'মা' বলে ডেকেছিল, সেই মা কেবল মুখের কথা শুনলেন, অন্তরের কথায় কাণে হাত ঢাকলেন! ব্যাসের জন্য কোনো শেষ ক্ষমা, অনাচার-উপেক্ষাকারী কোনো শেষ মাতৃস্পর্শ কি থাকতে পারত না? বড় দুঃখে অভিমানে ব্যাস তাই বলেছেন, 'শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া, কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া!' তারপর অদৃশ্য দেবীকণ্ঠের আকাশবাণীতে উচিত-অনুচিতের তত্ত্বকথা শুনে, প্রণাম করে; ব্যাস যখন নিঃশব্দে বিদায় নিলেন—তখন, সেই প্রথম, ঐ বুদ্ধিবিবেচনাহীন ঔদ্ধত্যের পিছনে পাঠকের সহানুভূতিপূর্ণ অন্তর অনুসরণ করে অগ্রসর হয়।

বিচূর্ণ ব্যাসের প্রস্থানের ছায়া, এবং পূজাপ্রচারের কল্পনায় আমোদিত দেবীর আনন্দহাস্যের আলো, কবি একই সঙ্গে দেখিয়েছেন :

শুনিয়া আকাশবাণী ব্যাস তপোধন।
উদ্দেশে প্রণাম করি করিলা গমন॥
কৈলাসেতে অন্নপূর্ণা শঙ্কর লইয়া।
বিহারে রহিলা বড় সানন্দ হইয়া॥
জয়া বিজয়ারে কন সহাস্যবদনে।
নরলোকে মোর পূজা প্রকাশে কেমনে॥
কহিছে বিজয়া জয়া ভবিষ্যংবাণী।...

ব্যাসকাহিনী শেষাংশে যে বেদনাগভীরতা লাভ করেছে, প্রশ্ন এই, তা কি কবির অভিপ্রেত ছিল? আপাততঃ ধর্মকলহের অনৌচিত্য প্রমাণের জন্যই ব্যাসের ব্যবহার। বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এই চরিত্র-টিকে বুদ্ধি বিবেচনা বা চরিত্রগরিমার সামান্যতম অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। পাঠকের কাছে ব্যাস যত ঘৃণাস্পদ, হাস্যাস্পদ হবেন, ততই লেখক কৃতার্থতা পাবেন। নীরন্ধ্র অবজ্ঞার পীঠে ব্যাস তাই

স্থাপিত। তথাপি, ব্যাসের সম্বন্ধে পাঠকহৃদয়ের মানবিক সহানুভূতি হরণ করা সম্ভব হয় নি। কিংবা ঐ সহানুভূতিসৃষ্টি কবির আকাঙ্ক্ষিতই ছিল। অত্যন্ত সচেতন এই কবি, আমরা স্মরণ রাখব। মূঢ়তায় ব্যাসের অবিরল নিষ্ঠা, তাকে আত্মক্ষয়ী করে তুলবার জন্য তাঁরা বিপুল সাধনা, পাঠকের মনে তাঁর বিষয়ে ঘৃণা ও উপহাসকে পর্বতপ্রমাণ করে তুলেছিল এবং একই সঙ্গে, সূক্ষ্মভাবে অনুভব করিয়ে দিয়েছিল-- কোনো পর্বতপ্রমাণ আকার সম্বন্ধে স্থায়ী বিদ্বেষ সম্ভব নয়। যে-ব্যাস কদর্য কোলাহলে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তুলেছিলেন, তিনি যখন নিঃশব্দ প্রণামের সঙ্গে, ভবিষ্যৎ অনুস্মরণের সম্ভাবনামাত্র না রেখে সরে গেলেন, তখন তাঁর অবিচারী অহঙ্কারী পৌরুষের প্রতি বিচিত্র সম্ভ্রমের অনুভূতি না জেগে পারে নি।

॥ ৪ ॥

অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা : বাঙালির চিরস্বপ্ন

নির্বিকার নিষ্ঠুর মহাশক্তির লীলা দিয়ে নয়, কল্যাণময়ী মাতাকে দিয়েই ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্য শেষ করেছেন। বিরল ক্ষেত্রে কাব্যের শেষাংশ কাব্যের শ্রেষ্ঠাংশ হয়। এখানে তাই হয়েছে।

মধুরতম ভারতচন্দ্র! বাঙালির প্রাণ কেড়ে নিয়েছেন। 'কে তোর তরীতে বসি ঈশ্বরী পাটনী'—এই প্রশ্ন করে তার খেয়া নৌকার আশেপাশে জুটেছে অগণিত মানুষ—তারা একবার নৌকাটি দেখতে চায়, বিশেষতঃ সেই জায়গাটি, যেখানে জননী তাঁর আলতাপরা রাঙা চরণটি থুয়েছিলেন, আর কাঠের সেঁউতি সোনার হয়ে গিয়েছিল। আহা, সে যদি ঐ সোনার সেঁউতিটি বুকে ধরে ঘরে ফিরতে পারে! তাতে ঘর সোনায় না ভরুক, বুক তো সোনার আলোয় ভরে যাবে! সে কি ভোগের জন্য সোনাদানা চায়? কখনো নয়। সন্তানে দুধে-ভাতে থাকলেই যথেষ্ট—সকলের হয়ে ঈশ্বরী পাটনী তো সে প্রার্থনা জানিয়ে রেখেছে।

ভারতচন্দ্র কি হতে পারেন, অন্নদামঙ্গলের শেষের এই কয়েক পৃষ্ঠা তার প্রমাণ। একটা জাতির ভাবাকুলতাকে এত অল্পে অনায়াসে

প্রকাশ করা যথার্থ প্রতিভার কাজ। কিংবা তা প্রতিভার নয়, সুকৃতির সাধ্য। অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা, সংশয় ও কলুষের উপর দিয়ে, আলতাপরা চরণযুগল মাথায় ধরে, ভারতচন্দ্র পুণ্যপদে হেঁটে গেছেন।

বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং অবস্থার এমন শুচিসুন্দর ছবি কোথায় পাব! সে যে দুঃখী তবু লোভী নয়, বিধি-বিষ্ণুও যাঁকে তপস্যায় পান না সেই বিশ্বমাতার পরম করুণা যে এই দুর্বল, আবেগকোমল মানুষগুলির উপরে অযাচিত বর্ষিত হয়, তার বিহ্বল প্রকৃতিতে দুঃখজয়ী, জড়ত্বজয়ী একটি সুপবিত্র স্নিগ্ধ আধ্যাত্মিকতার সুঘ্রাণ আছে—ভারতচন্দ্রের মতো বক্রমন বিলাসী শিল্পীও তা মেনেছেন। বাকচতুর ভারতচন্দ্র হারিয়ে গিয়ে পরিবর্তে কুলুকুলু পয়ারপ্রবাহের আর এক ভগীরথ-কবিকে এখানে পাচ্ছি—অন্নদামঙ্গল কাব্যশেষের পুণ্যসিদ্ধিতে ভারতচন্দ্র কৃত্তিবাস, কাশীদাসের পাশেই নতনম্র ভঙ্গিতে ঠাঁই করে নিয়েছেন।

বাঙালির সামাজিক জীবনের কতখানি সংবাদ ঐ সামান্য কয়েক ছত্রের মধ্যে না আত্মগোপন করে আছে! সন্ধ্যার অন্ধকারে একাকিনী কুলকামিনী—গৃহত্যাগিনী কি? কেন? অপকর্মের উদ্ধত বা ভীত পদক্ষেপ তো নয়! দেখলেই কেমন ভাল লাগে, যেন ভক্তি হয়, মা বলতে ইচ্ছা করে, পরের ঘরে চলে-যাওয়া নিজের লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো মেয়েটির কথা মনে পড়ে। অব্যক্ত ব্যথায় পাটনীর বুক টনটন করে ওঠে, সে আনমনা হয়ে পড়ে, আহা, না জানি শ্বশুরবাড়িতে সে কেমন আছে! এই মেয়েটি নিশ্চয় যন্ত্রণা সইতে না পেরে গৃহত্যাগ করেছে। স্বামী কেমন—বৃদ্ধ? নেশাখোর? রোজগারপাতি বোধহয় করে না। নিশ্চয় অনেকগুলি সতীন, শাশুড়ী-ননদী রাক্ষসীর মতো—পাটনীর কষ্টবোধ হতে থাকে। তার জীবনের এই এক দুঃখ—খেয়াঘাটে কত মর্মান্তিক বেদনার নীরব সাক্ষী হতে হয়। পাটনী আবার চিন্তিতও হয়—মেয়েটিকে দেখে তো বড়ঘরের বউ মনে হচ্ছে, সাঁঝের বেলায় খোঁজ না নিয়ে পার করলে পরে ফ্যাসাদে পড়তে হবে না তো! যত দোষ উলুখড়ের। পাটনী সুতরাং জিজ্ঞাসাবাদ করে। মেয়েটির উত্তর শুনে সে ভাবে, ঠিক

যা ভেবেছিলুম ! কুলীনঘরের কোঁদল। পাটনী মানুষটি সোজা। অন্যের দুঃখে বিচলিত হয়, তার রোদে-পোড়া পাকানো কালো চেহারায় কেমন কোমলতার আভা দেখা দেয়, কিন্তু তারও তো দুঃখকষ্টের সংসার, ঘরে অনেকগুলি ছেলেপুলে, দানপত্র করবার অবস্থা নয়, এ ধরনের গৃহত্যাগিনী দুর্ভাগিনী মেয়েদের কাছে পারের কড়ি মেলা কঠিন, রাগের মাথায় ঘরছাড়ার সময়ে কে আর পয়সা গুছিয়ে নিয়ে বেরোয়, কয়েকবার পাটনীকে ঠকতে হয়েছে, তার মন একটু কঠিন হয়, তাড়া দিয়ে বলে—'শীঘ্র আসি চড়ো নায়ে, দিবা কিবা বল ?'[৩]

মর্ত্যে নেমে এসে মহাশক্তি-অন্নদা বড় ভালবেসে বাঙালি ঘরের কুলবধূ সেজেছেন। ভবপারাবারের কর্ত্রী কি নিজে নদীটুকু পার হতে

৩। মোহিতলাল মজুমদার এই অংশের অতি উচ্চাঙ্গের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি অন্নদাকে প্রথম প্রশ্নকালে 'পাটনীর মুখের সন্ত্রস্ত ভাব, দেবীর চোখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত ধরা পড়িয়াছে' দেখেছেন। দেবী যখন নিজ পরিচয় দিলেন, তখন পাটনীর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে লিখেছেন : "দেবীর কথা হইতে··· তাহার সন্দেহ দূর হইয়াছে। কুলীনের সংসারে অমন ঘটিয়া থাকে, বড়লোকের মেয়ে বলিয়াই অসহ্য হইয়াছে। পাটনী দুঃখী মানুষ, খাটিয়া খায়, বড়লোকের দুঃখ দূর করিবার সময় তাহার নাই, বরং কুলবধূর এই আচরণে সে যেন খুশি হয় নাই, তাই দেবীকে তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল :

শীঘ্র আসি নায়ে চড় কিবা দিবা বল।
দেবী কন দিব, আগে পারে লয়ে চল ॥

"এমন সহজ ভাষায় এত স্বল্পাক্ষরে আর কেহ এমন কাহিনীরস সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন ? 'কিবা দিবা বল'—ভাষার এই অতি স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই চরিত্রও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

পুনশ্চ : "(পাটনী) নিরক্ষর গ্রাম্য মানুষ ; বয়স হইলেও প্রাণের সারল্য যায় নাই ; গরীব অথচ ধর্মভীরু ; অতি অল্পে সন্তুষ্ট ; পারের মাঝি হিসাবে তাহার কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তাই একটু বেশি সতর্ক ; তাহার উপর যে বিশেষ হিন্দু-কালচার সমাজের নিম্নস্তরেও সঞ্চারিত হইয়া এককালে বাঙালির জাতীয় চরিত্রকে যেন একপ্রকার ভক্তির—আত্মসমর্পণের—ভাবে শান্ত ও স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, ভারতচন্দ্রের এই ঈশ্বরী পাটনী তাহারই একটি চমৎকার নিখুঁত দৃষ্টান্ত। →

পারতেন না? কিন্তু ঘরের মেয়ে, বাড়ির বউ হয়ে নিজে নদীপার—ছি! তাই দ্রুত কম্পিত সুমিষ্ট সুরে গাঙ্গিনীর তীরে ঈশ্বরী পাটনীকে ডাক দিতে হয়, আত্মপরিচয়ও দিতে হয়—কী অপূর্ব! বাঙালি নারী-জীবনের দুঃখজ্বালার এমন নিবিড় সংক্ষিপ্ত রূপ। সবই বলতে হয়েছে ঠারে-ঠোরে, ইঙ্গিতে। স্বামীটি মোটে ভাল নয়, তবু স্বামী, দুঃখ দিলেও ভক্তি যায় না, দ্ব্যর্থের সরু তারে নিন্দা ও প্রশংসা এক সুরে কাঁপতে থাকে।

এই সুমঙ্গল উৎসবক্ষেত্রটি থেকে কবি নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেন না। এখানে আর তিনি ভণিতার সংক্ষিপ্ত পরিসরে আবদ্ধ থাকতে রাজি নন। যখন জননী নায়ের বাড়ে পা নামিয়ে বসলেন, তখন বিহ্বল আনন্দে তিনি বললেন :

বসিয়া নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥

তারপর নিজেকে একটু সামলে (অনেক চেষ্টায় অবশ্য) একটি দিব্য কাব্যনাট্য রচনা করলেন :

দেবী পাটনীর অনুরোধে সেঁউতির উপরে পা-দুখানি রাখলেন। তা দেখে 'কবির প্রাণ সহসা উদ্দীপ্ত' হয়েছে, "পাটনী কিন্তু এসব কিছুই বুঝিতেছে না—এই না-বুঝিবার ক্ষমতাই তাহার চরিত্রটিকে এমন বাস্তব অথচ রসপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। শেষে যখন সে দেবীর আসল পরিচয় পাইল, তখনও বর চাহিতে বলিলে, নির্বোধ পাটনী আর কিছু চাহিল না, কেবল—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'—সাক্ষাৎ আবির্ভূত দেবতার কাছে এমন ক্ষুদ্র প্রার্থনা কি আর কেহ করিয়াছে? পাটনীর কল্পনায় ইহা অপেক্ষা বড় সৌভাগ্য আর কিছু হইতে পারে না—চরিত্রের পূর্বাপর সঙ্গতি কি চমৎকার! কিন্তু এই পাটনীর জবানীতেই কবি যে একটি তত্ত্বের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে অতি নির্বোধ পাটনীকেও আর এক হিসাবে অতিশয় বুদ্ধিমান বলিয়া মনে হয়। পাটনীর প্রার্থনায় যে ভক্তজনোচিত নৈরাকাঙ্ক্ষ্য আছে, তাহা ভক্ত খ্রীস্টানের 'Give us this day our daily bread'—এই প্রার্থনারই মতো।" (বাংলা কবিতার ছন্দ)।

অকুণ্ঠে বলব, ভারতচন্দ্রের কাব্যের এই হল শ্রেষ্ঠ চরিত্রালোচনা।

পাটনা বলিছে মাগো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুম্ভীরে যাবে লয়ে॥
ভবানী বলেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুইব বল॥
পাটনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন।
সেঁউতি উপরে রাখো ও রাঙা চরণ॥
পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দু'খানি পদ সেঁউতি-উপরে॥

কবি আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। পবিত্র ঈর্ষা প্রকাশ করে বললেন :

বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়।
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায়॥
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতি-উপরে।...

এ ঈর্ষা তিনি পূর্বেও বোধ করেছেন :

যাঁর নামে পার করে ভব-পারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটনী তাঁহারে করে পার॥

কবি ধরা দিয়ে ফেলেছেন। মঙ্গলতম কবিরূপে তাঁকে চিনে ফেলেছি। বোধনগানে ভরা তার কাব্য—'মা এসেছে মন্দিরে! ওরে, মা এসেছে মন্দিরে।' মায়াভেদের আনন্দে আকুল কণ্ঠ—'আর ভুলালে ভুলবো না মা, দেখেছি তোর রাঙা চরণ!'

গন্ধে আমোদিত ঘর নৃত্য বাদ্য গান।
কে বাজায় নাচে গায় দেখিতে না পান॥
পুলকে পুরিল অঙ্গ ভাবিতে লাগিলা।
হইল আকাশবাণী অন্নদা আইলা॥

স্বপ্নের আরতিদীপ জ্বালিয়ে ঐ মাতারই মুখখানি কবি আমাদের দেখিয়েছেন। সিদ্ধ কবি তিনি।

॥ ৫ ॥

বিদ্যাসুন্দর : সর্বোত্তম রোমান্টিক কাব্য

এবার ভারতচন্দ্রের এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বোত্তম রোমান্টিক কাব্য বিদ্যাসুন্দরের কিছু বিস্তারিত বিষয়-পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। তার দ্বারা কেবল কাব্যের চরিত্রলক্ষণ নয়, শিল্পরীতির নমুনাও দেখানো যাবে।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যসূচনা রাজা মানসিংহের আগমনকথা দিয়ে। মানসিংহ তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাজপুরুষ, সবদিকে তাঁর নজর, সুতরাং বর্ধমান-নগরের সুড়ঙ্গটি তাঁর চোখ এড়াল না। বীররস ও রৌদ্ররসের চর্চা করলেও তিনি যে, শৃঙ্গাররসের আস্বাদনে অনিচ্ছুক ছিলেন না, তা বোঝা যায় তাঁর কাছে ভবানন্দের বিদ্যাসুন্দরকথা কহনে উৎসাহ দেখে। আমরা অধিকন্তু বুঝছি, ভারতচন্দ্র নামক কবির মূল্যবোধে প্রণয়সমরের গুরুত্ব বাস্তব সমর অপেক্ষা কম নয়; ফেনিল কামমদ্যের পাত্র পাঠকের হাতে তুলে দিয়ে তিনি ভুলিয়ে দিতে চান, বৃথা এ সংসারের বৃথা এ সংঘাত।

গোড়াতেই বিদ্যানাম্নী এক 'রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী' কন্যার কথা শোনা গেল, যার পিতার নাম বীরসিংহ, যে-পিতার একমাত্র কাজ দিবারাত্র চোখ বুজে থাকা, রোমান্টিক কাব্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় নিদ্রিত অভিভাবকত্ব, তিনি একটি সৎকাজ করেছিলেন, সুদূর কাঞ্চীদেশে ভাট পাঠিয়েছিলেন নিজ কন্যার পাত্র সন্ধানে।

কবি কার্যতঃ বিনা ভূমিকায় বিদ্যাকে কাব্যে অবতীর্ণ করিয়েছেন। বিদ্যার প্রতিজ্ঞা, সে প্রচলিত রাজকুমারী-রীতিতে বীর্যশুল্কা হবে না— হবে বিদ্যাশুল্কা। বিচারে হারলে তবে সে আত্মদান করবে। রূপযৌবনের উপঢৌকন নিয়ে সে অপেক্ষা করছে প্রতিভার প্রতীক্ষায়। সে চায় বিদগ্ধকে। একটি স্থূল বাক্য, একটু ইতর প্রকাশ—সৌকুমার্যের প্রাণহরণ করতে পারে, সে জানে। তাই সে বিবাহের পূর্বে চায় বিচার।

ওধারে কাঞ্চীতে বীরসিংহের ভাট পৌঁছলে সেখানকার রাজকুমার সুন্দর তাকে আয়ত্ত করে একান্তে নিয়ে গেল। সেখানে সে বিদ্যার রূপগুণের কথা জানতে চাইল। ভাট বুদ্ধিমান, পুরুষচরিত্র জানে, বোধ

হয় সুন্দরের ভঙ্গিতে রূপের প্রশ্নই প্রখর ছিল, সুতরাং সে গুণের কথা বলতে উৎসাহ না দেখিয়ে রূপের স্বপ্নমঙ্গলকথা শুনিয়ে দিল :

সুন্দর মগন হয়ে ভাটেরে বিরলে লয়ে
জিজ্ঞাসে বিদ্যার রূপগুণ।
ভাটে বলে মহাশয় বাণী যদি শেষ হয়
তবু নহি কহিতে নিপুণ ॥
বিধি চক্ষু দিল যারে সে যদি না দেখে তারে
তাহার লোচনে কিবা ফল।
সে বিদ্যার পতি হও বিদ্যাপতি নাম লও
শুনিয়া সুন্দর কুতূহল ॥ ···
ভাটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার।
উথলিল সুন্দরের সুখ-পারাবার ॥

উথলে উঠল সুর-পারাবারও—

প্রাণ কেমন রে করে, না দেখে তাহারে।
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে ॥

সুন্দরের চিত্তের খুবই সংকট অবস্থা, 'হায় বিদ্যা, কোথা বিদ্যা, কবে বিদ্যা পাব?' এসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত করতে দেরী হয় না। কেননা 'খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট।' সুন্দর স্থির করে ফেলল, 'খোয়াব তনুর তরী প্রবাস-সাগরে।' সুন্দরের আত্মোৎসর্গের এহেন মহতী বাসনা অবশ্যই অবিকৃত উচ্চাঙ্গের এপিগ্রামের দ্বারা সংবর্ধিত হতে পারে :

যদি কালী কুল দেন কুলে আগমন।
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পতন ॥
একা যাব বর্ধমান করিয়া যতন।
যতন বিহনে কোথা মিলয়ে রতন ॥

এমন উদ্বুদ্ধ সন্তানকে মা-কালী অবশ্যই আকাশবাণীতে আশ্বস্ত করবেন, করবেনই, যেহেতু তিনি চতুর্বর্গ ফলদাত্রী, যার অন্যতম বর্গ কাম।

মা-কালীর আশীর্বাদ নিয়ে সুন্দর বাহন ঘোড়াকে এবং নিজেকে সাজালো বর্ধমানযাত্রার জন্য। তার যে বর্ণনা পাচ্ছি, তা থেকে বুঝতে পারি, রোমান্টিক বর্ণনার জন্য যাবনী-মিশাল ভাষা অনুপযোগী নয় :

আকাশবাণীতে হাতে পাইল আকাশ।
সোয়ারীর অশ্ব আনে গমনে বাতাস॥
আপনি সাজায় ঘোড়া মনোহর সাজ।
আপনার সুসাজ করয়ে যুবরাজ॥
বিলাতী খেলাত পরে জরকশী চীরা।
মাণিক কলগী তোরা চকমকে হীরা॥
গলে দোলে ধুক্‌ধুকি করে ধক্‌ধক্।
মণিময় আভরণ করে চকমক॥

যাত্রার আগেই সুন্দর বর্ধমানে পৌঁছে গেছে, মনোরথে। বাইরে শারীরিকভাবে সেখানে পৌঁছতেও দেরী হ'ল না। ছ'মাসের পথ পেরোল ছ'দিনে। কারণ যে-অশ্বে চড়েছিল, তার গতিরূপ এইপ্রকার :

তীর তারা উল্কা বায়ু শীঘ্রগামী যেবা।
বেগ শিখিবারে বেগে সঙ্গে যাবে কেবা॥

বর্ধমানে প্রবেশের মুখে সুন্দরকে দ্বারী আটকালো। সুন্দর মনোরম আত্মপরিচয় দিল : আমি বিদ্যাব্যবসায়ী কবি, থাকি সুদূর কাঞ্চীপুরে, এখানে এসেছি বিদ্যার আশায়, যাব রাজার কাছে। দ্বারী যদিও সন্দেহ-বোধ করেছিল তবু সুন্দর-কৌশলের কাছে তার মতো সামান্য ব্যক্তির পরাভূত না হয়ে উপায় ছিল না।

সুন্দর নগরে প্রবেশ করছে, আবহসঙ্গীতও তাকে অনুসরণ করছে : 'গুণসাগর নাগর রায়, নগর দেখিয়া যায়।' 'মৃদু মৃদু হাসি, বাজাইছে বাঁশি, কোকিল বিকল তায়।' পুরে প্রবেশ করা মাত্র আবেশে আতুর হল সুর : 'ওহে বিনোদ রায়, ধীরে যাও হে! অধরে মধুর হাসি বাঁশিটি বাজাও হে!'

সুন্দর পড়ুয়াবেশ ধরেছে। বড় রসিক পড়ুয়া, বিদ্যাকে খুঁটিয়ে পড়বার জন্য অগ্রসর হচ্ছে :

বাম কক্ষে খুঙ্গী পুথি, ডান করে শুক।
ধীরে ধীরে চলে ধীর দেখিয়া কৌতুক ॥

দেখবার যোগ্য নগর বটে বর্ধমান। আগেই বলেছি, এ বর্ধমান 'কামনার মোক্ষধাম।'—

দেখিয়া নগরশোভা বাখানে সুন্দর।
সম্মুখে দেখেন সরোবর মনোহর ॥
শানে বান্ধা চারি ঘাট, শিবালয় চারি।
অবধূত জটাভস্মধারী সারি সারি ॥
চারি পাড়ে সুচারু পুষ্পের উপবন।
গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয়-পবন ॥
টল টল করে জল মন্দ মন্দ বায়।
নানা জলচর-পক্ষী খেলিয়া বেড়ায় ॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত শত শতচ্ছদ।
ফুটে পদ্ম কুমুদ কহ্লার কোকনদ ॥
ডাহুক ডাহুকী নাচে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারস সারসী রাজহংস-আদিগণ ॥
পুষ্পবনে পক্ষিগণে নিশি দিশি জাগে।
ছয় ঋতু ছত্রিশ রাগিণী ছয় রাগে ॥
ভুবন জিনিয়া বুঝি করি রাজধানী।
কামদেব দিল বর্ধমান নামখানি ॥

কামদেব বর্ধমান নাম দিলেন, আর কামদেব সুন্দরের পায়ে ফাঁস লাগিয়ে দিলেন, ফলে 'স্মরিয়া বিদ্যার নাম ছাড়য়ে নিশ্বাস।'

যাই হোক, সুন্দর সেই মনোহর সরোবরে স্নান করল, তারপরে শিব-শিবার 'চরণ পূজিল।' তারপরে—

সঙ্গেতে দাড়িম ছিল ভাঙিলা কৌতুকে।
আপনি খাইলা কিছু, কিছু দিলা শুকে ॥
করে লয়ে এক পদ্ম লইলেন ঘ্রাণ।
এই ছলে ফুলধনু হানে ফুলবাণ ॥

আকুল হইয়া বৈসে বকুলের মূলে।
দ্বিগুন আগুন জ্বলে বকুলের ফুলে॥

সুন্দর যখন জ্বলন্ত সুন্দর, ঠিক সেই সময়ে যা হবার তাই হল—

হেনকালে নগরিয়া যতেক নাগরী।
স্নান করিবারে আইল সঙ্গে সহচরী॥
সুন্দরে দেখিয়া পড়ে কলসী খসিয়া।[4]

ভারতচন্দ্র তার পরেই এমন একটি ছত্র যোগ করেছেন, রঙ্গেব্যঙ্গে যার দোসর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর—

ভারত কহিছে শাড়ি পরলো কষিয়া॥

কালিদাস, কিংবা তাঁরও পূর্ব থেকে নাগরিকা-চিত্রণের যে-ধারা চলে আসছে, সেই ধারার অনুসরণে এই কবির কাব্যেও কটিবস্ত্র এখনি শিথিল হয়ে পড়বে, অন্যথা করা সম্ভব হবে না, সুবিবেচক কবি তাই সময় থাকতে বন্ধুভাবে নারীদের সতর্ক করে দিলেন।

বৃথা চেষ্টা। বসন্তের ঝরাপাতাকে গাছে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। মনোহর পরম সুন্দর নাগর বকুলমূলে আসীন, তাকে দেখেও অবিচলিত থাকতে পারে কবরী কাঁচলী মেখলা? তারা কি কর্ণের কবচ-কুণ্ডল! কবিপৃথিবীতে অন্ততঃ নয়। সুতরাং নারীদের হৃদয় উছলে ওঠে নয়নে, মন্দ মন্থর হয় চরণ—সুন্দর-রত্নটিকে কণ্ঠে হার করে দোলাতে,

---

৪। অনুরূপ একটি অবস্থা রসমঞ্জরীতে:

ওলো ধনি প্রাণধন শুন মোর নিবেদন
সরোবরে স্নানহেতু যেয়ো না লো যেয়ো না।
যগুপি বা যাও ভুলে অঙ্গুলে ঘোমটা তুলে
কমলকানন পানে চেয়ো না লো চেয়ো না॥…

রসমঞ্জরীতেই বিপরীত ছবি: নাগর স্নানার্থে গিয়ে নাগরী দেখে মোহিত:

গিয়েছিনু সরোবরে স্নান করিবার তরে
দেখিয়াছি একজন অপরূপ কামিনী।
চক্ষু মুখ পদ্মছন্দ কিবা ছন্দ কিবা মন্দ
নীলাম্বরে ঝাঁপে তনু মেঘে যেন দামিনী॥…

কবরীতে মালা করে দোলাতে সুনিবিড় ইচ্ছা জাগে। অমন সুন্দরের জন্য কুলত্যাগ সামান্য কথা; অসামান্য কথা নয় যৌবনে যোগিনী হওয়া। তাবা যেতে চায়, ফিরে আসে। তাদের অবস্থা—

আন ছলে পুন চাহে ফিরিয়া ফিরিয়া।
পিঞ্জরের পাখী-মত বেড়ায় ঘুরিয়া॥

অতসব হৃদয়-ঘটিত ব্যাপার যখন চলেছে, তখন সুন্দর কিন্তু সে-সম্বন্ধে উদাসীন। সে অতীব নিষ্ঠাবান সাধু। সঙ্গে করে সে শুকপাখী এনেছিল—কেন, বোঝা গেল এইবার :

বসিয়া সুন্দর রায় বকুলের তলে।
শুক সঙ্গে শাস্ত্রকথা কহে কুতূহলে॥

শুকের সঙ্গে কোন্ শাস্ত্রকথা আলোচনা হচ্ছিল, না বলাই ভাল। শুধু এইটুকু জানানো যায়, এ শুক শুকদেব নন, ইনি লীলাশুক।

ঠিক সেই সময়ে সেইখানে এক মালিনীর আবির্ভাব। মালিনীর অনবদ্য বর্ণনা পেয়েছি। বর্ণনাটি কিছু বাস্তবরসাশ্রিত, রোমান্সেব জগতের পক্ষে। হোক, ক্ষতি নেই, বরং লাভ, এসবের জন্যই রোমান্স বায়ুভূতো হয়ে উবে যায় না।—

সূর্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
হেনকালে তথা এক আইল মালিনী॥
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অভিরাম॥
গালভরা গুয়াপান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী, কথা কয় ছলে॥
চূড়াবান্ধা চুল, পরিধান সাদা শাড়ি।
ফুলের চুপড়ি কাঁখে ফিরে বাড়ি বাড়ি॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥
ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র আছে কতগুলি।
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি॥

বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল ভেজায়।
পড়শী না থাকে কাছে কোন্দলের দায় ॥
মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাতনাড়া।
তুলিতে বৈকালে ফুল আইল সে পাড়া ॥

এর পরে কিছু সময়ের জন্য উৎকৃষ্ট নাট্যরস আমরা উপভোগ করতে পারি। বুদ্ধির মাণিক্যখচিত ছুটি ছুরি পরস্পরের মর্মসন্ধান করে ঝলসেছে, তারপরেই সেয়ানে-সেয়ানে মিছে এই লড়াই ভেবে থেমে পড়েছে আপস ক'রে।

সুন্দরকে দেখে মালিনী মোহিত। এ কে ? সশরীরে স্বয়ং কাম !! দেখে মনে হয় বিদেশী পড়ুয়া। ইতিমধ্যে যদি বাসা না করে থাকে তো নিজের বাসায় নিয়ে গিয়ে তুলি।

মালিনী সুন্দরের কাছে গিয়ে হাসি-হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করল—কে তুমি, কোথায় যাবে, কোন্‌খানে বাসা ?

সুন্দর—আমি বিদ্যাব্যবসায়ী, এ নগরে এসেছি, ভাল বাসার সন্ধানে আছি।

মালিনী—আমি দুখিনী মালিনী। আমার ঘেরা বাড়ি। তবে একাকিনী থাকি। রাজবাড়িতে নিয়মিত ফুল জোগাই। রাজা-রাণী ভালবাসে, তাই সেখানে সদাই আসি-যাই : আমাকে যদি কাঙালী মনে না করো, এসো আমার আলয়ে, আমি বাসা দেব।

সুন্দর (আত্মগত)—বাঃ শুভ সংবাদ। জয় কালী। তুমিই জুটিয়ে দিলে। একেবারে রাজবাড়ির মালিনী ! এর কাছেই বিদ্যার সমাচার সব পেয়ে যাব। বাসারও সুসার, আশারও সুসার। কিন্তু—মাগী একা থাকে, নষ্ট-রীত দেখছি, দুর্বুদ্ধিতে কোন্ হিতে বিপরীত ঘটায় কে জানে ! আগে থেকে মাসী ডেকে পথ বন্ধ করে রাখি। (প্রকাশ্যে)—সত্যি, তোমার মত হিতৈষী দেখি না, নিজের থেকে বাসা দিলে, তুমি আমার মায়ের কাজ করলে—তুমি আমার মাসী হও।

মালিনী—(আত্মগত) চতুর বটে। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক, তুমি মোর বাপ বাছা, বাপের ঠাকুর। এখন চলো।

মালিনীর বাড়ির পরিবেশটি ভাল—পুষ্পবন, কোকিল, অলিকুল এবং মন্দ সমীরণ, যা 'রসায় ঋষির মন।'

সুন্দরের খুবই ভাল লাগল। সেদিন সুনিদ্রাও হল। প্রভাতে প্রসন্নমনে উঠে দুর্গানাম স্মরণ করল, তারপর স্নানান্তে পূজায় বসল। ঋষি বাৎস্যায়ন নাগরিকদের ইষ্টনাম স্মরণের বিধি দিয়েছেন।

মালিনী রাজবাড়িতে ফুলমালা দিতে গিয়েছিল সকালেই। সে ফিরলে সুন্দর বলল, মাসী আমার তো দাস-দাসী নেই, হাট-বাজার করি কি করে বলো? মালিনী উদারতায় গলে গিয়ে বলল, সেজন্য ভাবনা কি বোনপো, ও-কাজ আমিই করতে পারি, যদি কিছু কড়ি বিতরণ করো।

মালিনী অতঃপর কড়ির গুণগান করেছিল, তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছি। আর একটু অংশ উদ্ধৃত করছি এখানে, যার মধ্যে সুন্দরের পছন্দসই কতকগুলি কথা ছিল :

এ তোর মাসীরে বাপা কোনো কর্ম নাহি ছাপা
আকাশ পাতাল ভূমণ্ডলে।
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধরি দিতে পারি চাঁদ
কুলের কামিনী আনি ছলে॥

সুন্দর (বিমুগ্ধ)—তু-মি মাসী—!

মালিনী (বিনীত)—আমি দাসী, মাসী বলো আপনার গুণে।

অতঃপর মালিনীর বেসাতি এবং বেসাতির অপূর্ব হিসাব। ভারতচন্দ্র এখানে যে-বস্তু দিয়েছেন, রঙ্গে ব্যঙ্গে তার দোসর নেই। মঙ্গলকাব্যের কাদামাটি পুড়িয়ে ইস্পাত তৈরী করা যায়, কে জানত! মালিনীর বেসাতি-প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করব না, তার সবটা যথেষ্ট রোমাণ্টিক নয় বলে, কিন্তু উদ্ধৃত করব হীরামালিনীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত প্রমথনাথ বিশীর কিছু স্তুতিবাক্য :

"ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরাম, দুইজনেরই বৈশিষ্ট্য দুইটি অপ্রধান চরিত্র কল্পনায়, হীরামালিনী ও ভাঁড়ু দত্তের। একটি পূর্ণ সৃষ্টি ও একটি অপূর্ণ সৃষ্টিতে কি প্রভেদ বোঝা যায় এই দুটি চরিত্রের সমালোচনায়। এমন

অসম্ভব নয় যে, ভারতচন্দ্র হীরার চরিত্রের উপাদান পূর্ববর্তী কোনো গ্রন্থ হইতে পাইয়াছেন, কিন্তু আমরা যাহা পাই তাহা অসম্পূর্ণ উপাদান নয়, সম্পূর্ণ সৃষ্টি। ভাঁড়ু দত্ত ও হীরামালিনী দুজনেই সাহিত্যিক urbanity-তে পৌঁছিয়াছে, তাহাদের বুঝিবার জন্য পাঠককে কল্পনায় তৎকালীন সমাজে প্রবেশ করিতে হয় না।

"হীরার চরিত্র কেবলমাত্র একটি অস্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত নহে, ছোটখাট ঘটনায়, কথাবার্তায়, রসালাপে, তীক্ষ্ণশ্লেষ ও ব্যঙ্গে তাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ এবং জীবন্ত। ভাঁড়ু দত্ত একটিমাত্র রেখার সৃষ্টি। যে-কল্পনাশক্তি, ভাষাকে আদর্শায়িত করিবার যে-শক্তি থাকিলে নানারূপ তথ্যের দ্বারা পাঠকের মনে রসবোধ জাগ্রত করে, তাহার অভাববশতঃ এই রেখার সৃষ্টি সম্পূর্ণ ভরিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার চরিত্রের এই অবকাশপথে পাঠকের মনোযোগের ও রসবোধের অনেকটা অংশ পড়িয়া গিয়া নষ্ট হয়।...

"হীরামালিনী ভারতচন্দ্রের সচেতন কল্পনার সৃষ্টি। মুকুন্দরামের মত ভারতচন্দ্রও পাঠক-নিরপেক্ষ ছিলেন না।...রাজসভার আদর্শ, রুচি ও ফরমাইস খানিকটা পরিমাণে তাঁহার লেখনীকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।...কিন্তু কবি একস্থানে স্বাধীন ছিলেন, অপ্রধান চরিত্রের মহলে।...এখানে কবির প্রতিভা অপ্রতিহতভাবে লীলা করিবার সুযোগ পাইয়াছে, এবং তাহার ফল প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত নারীচরিত্র। হীরা, ভাঁড়ু দত্ত দুজনেই জীবিত, বাংলাদেশের পথে-ঘাটে আজিও তাহাদের দেখা পাওয়া যায়। অনেক সময়ে ভাবিয়াছি, যদি পথের মোড়ে হীরার সহিত ভাঁড়ুর দেখা হয়, তবে কেমন হয়! যাহাই হউক, হীরার তীক্ষ্ণ মার্জিত ব্যঙ্গবাণে দুর্ধর্ষ ভাঁড়ুকে যে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

তোফা—রচনা! বিশেষতঃ শেষাংশটি, যেখানে হীরা ও ভাঁড়ুকে মুখোমুখি দাঁড় করাবার ইচ্ছাপ্রকাশ করা হয়েছে।

কাহিনী-পথে পুনশ্চ অগ্রসর হওয়া যাক।

আহারান্তে সুন্দর তার নতুন মাসীকে ডাক দিল। মাসীও আহার

সারছিল, শেষ করে ধীরে-সুস্থে এসে সুন্দর যেখানে শুয়েছে, সেখানে ঘেঁসে বসল। সুন্দর পাঁচটা কথার সঙ্গে মিশিয়ে কৌশলে রাজবাড়ির কথা জানতে চাইল। হীরা কম ধূর্ত নয়। বলল, বলব রে বাছা বলব, আগে নিজের পরিচয় দাওদিকি! তোমার ভাবগতিক দেখে তো রাজ-পুত্র বলে মনে হয়! সুন্দর দেখল, এখন পরিচয় দিলেই সুবিধে। পরিচয় শুনে .হীরা ভক্তিতে শিউরে উঠল।—প্রণাম হই। অপরাধ মার্জনা করো। কি ভাগ্য, দাসীরে বলিলে মাসী, ও মোর ঠাকুর। এই-টুকু কৃপা করো, যতদিন এ বাড়িতে থাকবে অপরাধ নেবে না।

অতঃপর হীরা স্বতঃই রাজ-অন্তঃপুরের কথা খুলে বলেছিল।—মাঝবয়সী রাজা, একটি রাণী, পাঁচটি জোয়ান ছেলে, আর একটি মেয়ে—আহা মেয়ে! লক্ষ্মী-সরস্বতী বেটে তৈরী হয়েছে।

সুন্দরের জিজ্ঞাসাবাদের মূল লক্ষ্য বুঝতে হীরার একটুকুও অসুবিধে হয়নি। সুন্দরের দিকে কটাক্ষে চেয়ে, রাজবাড়ির অন্য জঞ্জাল বর্ণনার দায় না রেখে, বিদ্যার রূপবর্ণনা শুরু করে দিল। কবি মালিনীর জিভের উপরে শিষ্ট সরস্বতীর আসন পেতে দিলেন। অতিশয়োক্তি—আনন্দে উছলে-উছলে উঠতে লাগল।

হীরা রূপের যে-বর্ণনা করেছিল. তার মধ্যে রূপকে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করাবার চেষ্টা নেই। পাঠককে আতিশয্যে বিমূঢ় করে সানন্দ অবিশ্বাসে ঠেলে দেওয়াই উদ্দেশ্য। বিস্ময়ের তীব্রতার দ্বারা রূপের অসামান্যতা বোঝাতে কবি চেয়েছেন। বিদ্যাসুন্দরে স্থানে-স্থানে বাস্তব বর্ণনার অবসর থাকলেও এটি বাস্তবরসের কাব্য নয়—আতিশয্যের উন্মাদনার সাহায্যে কবি অগম্য সুরম্যালোকে পাঠকের মনকে টেনে নিয়ে যেতে চান। সমালোচকেরা এসব ক্ষেত্রে কঠোরভাবে বলেছেন, ভারতচন্দ্রের চরিত্রগুলি পুতুলের মতো প্রাণহীন, মাত্র আলঙ্কারিক কৌশলের উপাদান ও আশ্রয়।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় কাব্যকল্পনার গতানুগতিকতা এবং প্রথাবদ্ধ অলঙ্কারপ্রয়োগের আনন্দহীন প্রয়াসের কথাও বলা হয়। এক্ষেত্রে বলতে চাই, ভারতচন্দ্রের চতুরতার রস সমালোচকেরা সম্পূর্ণ উপভোগ

করতে পারেন নি। ভারতচন্দ্র অলঙ্কারের অতিশয়তাকে এক চূড়ান্ত স্তরে টেনে নিয়ে গিয়ে আসর মাত করে ফেলেছেন। যৎপরোনাস্তির চাঞ্চল্যের দ্বারা ঐ কাজ তিনি সমাধা করেছেন।

লক্ষ্য করবার বিষয় বিদ্যার রূপবর্ণনায় দেহকে উন্মুক্ত করা হলেও তাতে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা নেই। দেহের প্রতি অঙ্গকে খুঁটিয়ে দেখে, তার ধার ও ভার নির্লিপ্ত কৌতূহলে পরীক্ষা করার চেষ্টা করে, সে চেষ্টার অসামান্য বিফলতায় উল্লাসে আত্মহারা হয়ে, রাশীকৃত অত্যুক্তি (এখন আর অত্যুক্তি নয়) বিদ্যার বরদেহে চাপাবার এই ব্যগ্র চেষ্টা পাঠকমনে স্ফূর্তি-কৌতুকের সৃষ্টি করে। বিদ্যার দেহ নিভৃত রহস্যের নৈশপ্রতিমা নয়, প্রকাশ্য প্রদর্শনীর দুর্লভ সংগ্রহ। এই রূপবর্ণনা সম্বন্ধে শেষ কথা এইটুকুই বলা চলে, মানুষের গুণের কথা বোঝাতে গিয়ে যদি গিরি-গগনকে টেনে আনা যায়, এমনকি দোষের কথা বোঝাতেও (যথা, পর্বতপ্রমাণ ভ্রান্তি, আকাশপ্রমাণ মূঢ়তা)—তাহলে রূপের ক্ষেত্রে পর্বত-মেদিনীকে স্মরণ করায় দোষ কোথায়?

রূপবর্ণনার কিছু অংশ :

বিনাইয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী-তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কত গুলা॥…
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন-হিল্লোলে।
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥…
কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরুচূড়া ধরে।
শিহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে॥…
কে বলে অনঙ্গ-অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক সে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায়॥
মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁপিয়া ওঠে থাকিয়া থাকিয়া॥

রূপের কথা যতখানি, বলাবাহুল্য, গুণের কথা ততখানি ফুটতে

পারে না মালিনীর মুখে। সে এইমাত্র জানাল, বিদ্যাকে বিচারে হারাতে কত রাজপুত্র এসেছে, সবাই হেরে পালিয়েছে।

বিদ্যাসুন্দর যে-চরিত্রের কাব্য তাতে দয়া মায়া করুণা ইত্যাদি হৃদয়দ্রাবী গুণের বিশেষ সমাদর থাকার কথা নয়। উজ্জ্বল দেহ এবং উজ্জ্বল বুদ্ধি, এই জগতের বাসনা ও সাধনার বস্তু। বিদ্যার এবং সুন্দরের দেহ এবং মন যে, আলোক-বিচ্ছুরিত, সেটা দেখাতে পারলেই কবি কৃতার্থ বোধ করবেন।

বিদ্যার রূপ-গুণের কথা বলে হীরা সুন্দরের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল, কৌশলে সুন্দর তার উত্তরও দিল :

মালিনী : রাজপুত্র বট বাছা, রূপ বড় বটে।
বিচারে জিনিতে পার তব বড় ঘটে॥
যদি কহ কহি রাজা-রাণীর সাক্ষাৎ—
সুন্দর : [রায় বলে] কেন মাসী বাড়াও উৎপাত॥
দেখি আগে বিদ্যার বিদ্যায় কত দৌড়।
কি জানি হারায় বিদ্যা হাসিবেক গৌড়॥

সুন্দর 'বেড়া নেড়ে গৃহস্থের মন বুঝতে' চাইল। মালিনীকে বলল, তুমি নিত্য মালা গেঁথে নিয়ে যাও, একদিন আমি মালা গেঁথে দেব, আর তার মধ্যে ভরে দেব পত্র। বিদ্যা যদি সে পত্রের ভাব ধরতে পারে, তবেই পরবর্তী পরিশ্রম করতে পারি। মালিনী রাজি হয়ে গেল। মুখ টিপে হেসে মনে-মনে বলল, 'গাঁথিনু বড়িশে মাছ আর কোথা যায়!'

এরপর সুন্দরের সাধনা—মাল্যরচনা। মালা গাঁথছে আর গুন্ গুন্ করে গান গাইছে। গানটি শুরু করেছিলেন কবি :

কি এ মনোহর
দেখিতে সুন্দর
গাঁথা সুন্দর মালিকা।
গাঁথে বিনা গুণে
শোভে নানা গুণে
কামমধুব্রতপালিকা॥

কবির সুরে সুর মিলিয়ে সুন্দরের মালা-গাঁথার আঙুলগুলি কাঁপতে লাগল ঃ

মালিনী আনিল ফুলের ভার,
আনন্দ নন্দন-বনের সার।
বিবিধ বন্ধন জানে কুমার,
সহায় হইয়া কালিকা।
কুসুম-আকর কিঙ্কর তায়
মলয়-পবন গুণ যোগায়,
ভ্রমর ভ্রমরী গুন্‌গুনায়
ভুলিবে ভূপতি বালিকা।

নায়কের সুরকে কবি নিজের কণ্ঠে তুলে নিয়ে মৃদু তরঙ্গে ছড়িয়ে দিলেন ঃ

ভাল মালা গাঁথে ভাল মালিয়া রে।
বনমালী মেঘমালী কালিয়া রে ॥ ···
যেদিকে যখন চায়, ফুল বরষিয়া যায়।
মোহ করে প্রেমমধু ঢালিয়া রে ॥

সুন্দর এখন সৃষ্টিসুন্দর। ফুলধনুকে ফুলতনু দেবার আনন্দব্রতে তিনি নিযুক্ত। অকালবসন্তেও পুষ্পধনু এমন রূপের ভাগ পান নি, যা তিনি পেলেন সুন্দরের রচনায় ঃ

তার মাঝে গড়িল ফুলের ফুলধনু।
তার পাশে গড়ে রতি ফুলময় তনু ॥
গড়িয়া অপরাজিতা থরে কৈল চুল।
মুখানি গড়িল দিয়া কমলের ফুল ॥
তিল ফুলে কৈল নাসা অধর বান্ধুলি।
চাঁপার পাপড়ি দিয়া গড়িল অঙ্গুলি ॥
নয়ন সুন্দর কৈল ইন্দীবর দিয়া।
মৃণালে গড়িল ভুজ কাঁটা ফেলাইয়া ॥

কনকচম্পকে তনু সকল গড়িয়া।
গড়িল চরণপদ্ম স্থলপদ্ম দিয়া ॥
গড়িল পারুলফুলে তূণ মনোহর।
বোঁটাসহ রঙ্গনে পুরিয়া দিল শর ॥
ফুলধনু ফুলগুণ ফুলময় বাণ।
দুই হাতে দিল তার পুরিয়া সন্ধান ॥
রাখিল কৌটার কল করিয়া এমনি।
ফুটিবে বিদ্যার বুকে ছুটিবে যখনি ॥

পাঠক পরিষ্কার বুঝে নিয়েছেন, এইবার, এতদিনে সত্যই কুমারী বিদ্যার ফুটবার সময় হয়েছে। তার জীবনে (কবিগুরু যেমন বলেছেন) গ্রীস রোমের ইতিহাস হালকা হয়ে যাবে।

সুন্দর অধিকন্তু কেয়াপাতে একটি শ্লোক লিখে উক্ত কৌটার মধ্যে পুরে দিয়েছিল, যাতে বিদ্যার বুকে তার বাণের সঙ্গে প্রাণও ছুটে গিয়ে বিঁধে যায়।

এতসব কায়দা-কানুন করতে কিছু দেরী হয়ে গিয়েছিল। ওধারে মালিনীর কাছ থেকে ফুলমাল্য না পেয়ে বিদ্যার পূজা হচ্ছিল না। মেয়েটি ভক্তিমতী। আবার স্বাস্থ্য ভাল বলে ক্ষুধাতৃষ্ণাও প্রবল। পূজা শেষ না করে জলগ্রহণ করে না। সুতরাং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় এবং মালিনীর উপর রাগে জ্বলছিল। মালিনীর দেখা পেয়েই সবকিছু উপুড় করে দিল তার উপরে। যে-ভাষায় গালিগালাজ করল তা বিদ্যামন্দির থেকে আমদানী করা নয়। কিছু বিদগ্ধ খিস্তি করে বিদ্যা বুঝিয়ে দিল, খিদে পেলে অতি বড় কালচার্ডেরও জ্ঞান থাকে না, এবং জীবনরহস্যের মোটা কথাগুলো সে ভালই জানে। সে মোটমাট এই কথাই বলতে চেয়েছিল, বুড়ো বয়সে নতুন নাগর জুটিয়ে লীলাখেলায় রাত্তির কাটিয়েছে বলেই সকালে আসতে দেরী হয়েছে হীরার।

এবার মালিনীর পালা। তার খেদোক্তির বয়ানটি চমৎকার। প্রথমে সে সত্যই ভীত; 'হীরা থরথর কাঁপায় ডরে।' কিন্তু এখনো তার 'কিছু গুঁড়া' আছে। সে অবিলম্বে তরুণী মেয়েটিকে বিনয়ে বশ করে ফেলল।

তারপর, সুন্দর-রচিত চিকন ফুলহার দেখে বিদ্যা চকিত হওয়া মাত্র, সুযোগ বুঝে বলতে শুরু করল :

হীরা কহে তিতি আঁখির নীরে।
জীবন যৌবন গেলে কি ফিরে॥
নহে ক্ষীণ মাজা কুচ কঠোর।
কি দেখি বঁধু আসিবে মোর॥
ছাড় আই বলা জানি সকল।
গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল॥
বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥

কৌটা খোলামাত্র ফুলশর ছুটে গিয়ে বিদ্যার বুকে বিঁধল, তাতে এবং পুষ্পগ্রন্থিত শ্লোক পাঠ করে সে যখন বিকলচিত্ত হয়ে পড়ল, তখন নিজ মূর্তি ধরল হীরা, 'যার কথায় হীরার ধার।' অতঃপর একটা ছোট নাটকের অভিনয় হয়ে গেল।

হীরা ইনিয়ে-বিনিয়ে জানাল : তার মতো বিদ্যার শুভার্থী আর কেউ নেই। কপালে করাঘাত করে সে দুঃখ করতে লাগল : এতবড় হিতৈষীকেও বিদ্যা চিনল না। সে কি জানে, তার কথা ভেবে হীরার মুখে অন্নজল রোচে না! রূপযৌবন নিয়ে পড়ে আছো, কিন্তু বর জোটে নি ; কোথায় বর পাবে, সেই ভেবে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। প্রতিজ্ঞা করে বসে আছো, যে-তোমাকে হারাবে, সে হবে বর—কতদিনে তেমন লোকের সাক্ষাৎ পাবে কে জানে! ততদিন কি যৌবন বসে থাকবে? গ্রীষ্মে গাছ জ্বলে-পুড়ে মরে গেলে পরে বর্ষায় কি ফল হবে? সেইজন্যই তো উপযুক্ত নাগরের সন্ধান পেয়ে তাকে আটকে রেখেছি : কাঞ্চীপুরের রাজা গুণসিন্ধু, তার ছেলে ভুবনবিজয়ী সুকবি সুন্দর—তার দেখা পেয়েছি পথে, ভুলিয়ে ধরে রেখেছি, তোমার পণের কথা জানিয়েছি, সে তোমাকে বাজিয়ে নিতে এই ফুলখেলা করেছে। এ সব করেছি কার জন্য? আর তুমি? 'সোহাগের শূল' হেনে গঞ্জনার ঝঙ্কার দেয় হীরা—'যাহার লাগিয়া চুরি করে গিয়া, সেই জন কহে চোর!'

অসহ্য অভিভাবকত্ব সত্ত্বেও মালিনী এখন বিদ্যার কাছে 'ফণীর মণি।' আঁচল টেনে বিদ্যা তাকে থামাল, এবং যে-কথা বলল তাতে বোঝা গেল, উক্ত পঞ্চদশী (বা ষোড়শী) কন্যাটি নিজের যৌবন আগলে অস্থির হয়ে পড়েছে—'কামানল জ্বেলে যেতে চাহ ফেলে, নাতিনী-ঘাতিনী বুড়ী?'

বিদ্যাকে যথেষ্ট কাতর ও বশীভূত দেখে, কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে গুন্‌গুনিয়ে সুন্দরের রূপের কথা শোনাতে লাগল হীরা, যার মধ্যে সে সস্পৃহ সুখে সুন্দরের দেহাঙ্গগুলিকে বর্ণনা করেছিল, যার সমাপ্তি টেনেছিল সুন্দরের অগ্নিকাণ্ড ঘটাবার ক্ষমতার কথা বলে :

দেখিয়া সে ঠাম জিয়ে মোর কাম
এত যে হৈয়াছি বুড়া।
মাসী বলে যেই রক্ষা হেতু এই—

সুন্দর সত্যই বৃথা ভয় করেনি। ভাগ্যে সে মাসী ডেকেছিল!

এর পরেই বিদ্যার অনিবার্য গান :

কি বলিলি মালিনী, ফিরে ফিবে বল!
রসে তনু ডগমগ মন টল টল॥
শিহরিল কলেবর তনু কাঁপে থরথর
হিয়া হৈল জরজব আখি ছল ছল॥

প্রথম দর্শনেব চূড়ান্ত রোমান্টিক মুহূর্তটি এবার আসবে, যার উপরে 'সাতটি অমরাবতী' ভর করে আছে।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যা বৈরাগিণী নয়। বিবাহের প্রয়োজন তার কাছে মানসিক এবং শারীরিক উভয়ই। বিচারের অন্তরালে সে আশ্রয় নিয়েছিল নিজের চরিত্ররক্ষার জন্য—রাজপুত্র নামক 'রাজবংশে চাষার' হাতে সে পড়তে চায় নি। অবিদ্যার দাস কখনো বিদ্যার প্রভু হতে পারে? কিন্তু যতই তার সূক্ষ্ম ও উচ্চ বুদ্ধির কাছে চাষা-জাতীয় রাজপুত্রেরা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে গেছে, ততই তার যৌবন ভিতরে-ভিতরে দুর্বহ হয়ে উঠেছে :

ভাবিয়া মারিয়াছিনু প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কার মনে ছিল আই মোর হবে বিয়া॥

সুন্দরের কলাকৌশল দেখে, কবিতা পড়ে, রূপের বর্ণনা শুনে, সে বুঝলে এতদিনে সত্যই নিধি এসেছে। আহা বিধাতার দান, 'বিধি নিধি নাহি দিলে আর কেবা দেই।' এখন পরাজয়ের চেয়ে বড় জয় আর নেই, 'হারাইলে হারিব, হারিলে যে জিনি।' লজ্জা না রেখেই নিজেকে খুলে ধরল :

এত দিনে শিব বুঝি হৈলা অনুকূল।
ফুটাইল ভগবতী বিবাহের ফুল॥

বিদ্যার এমন বিপর্যস্ত অবস্থা যে, মৌলিকতাকে পর্যন্ত সে উৎসর্গ করে বসল সুন্দরের প্রতিভার পায়ে (করবে না ? সুন্দর ইতিমধ্যেই বিদ্যার কাছে 'কবিতা-কমলে তুমি রবি মহাশয়, নরলোকে সম নাহি দেবলোকে কয়।')—তার রচিত প্রেমলিপিটি সুন্দরের প্রেমলিপির হুবহু অনুকরণ। এর পরে ধরেই নিতে পারি, 'বড় ভক্তিভাবে' সে পূজায় বসবে, এবং এমন বেরসিক কে আছে, পূজার দেবতা বদলে গেলে এখন রাগ করবে ?—

পূজা না হইতে মাগে আগেভাগে বর।
দেবীকে করিতে ধ্যান দেখয়ে সুন্দর॥···
সুগন্ধ সুগন্ধি মালা দেবী-গলে দিতে।
বরের গলায় দিনু এই লয় চিতে॥

দেবী অন্ততঃ তেমন অরসিকা নন। তদুপরি বুদ্ধিমতী। গণ্ডগোল দেখে টপ্ করে চোখ বুজে তিনি উদার তত্ত্বচিন্তা করতে লেগে গেলেন :

পূজা না হইল বলি না করিহ ভয়।
সকলি পাইনু আমি আমি বিশ্বময়॥

মালিনীকে বিদ্যা বলে দিয়েছিল, তাদের বালাখানার সামনে রথের কাছে সুন্দর দাঁড়ালে চার চোখের মিলন হবে। সুন্দর তাই করল। তাকে দেখে বিদ্যার অবস্থা : 'অনিমিষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ।' উভয়ের অবস্থা ঃ

দু'হার নয়ন-ফাঁদে ঠেকিয়া দুজনে।
দুজনে পড়িল বান্ধা দুজনের মনে॥
মনে মনে মনমালা বদল করিয়া।
ঘরে গেলা দুঁহে দুঁহা হৃদয় লইয়া॥

ঘরে ফিরবার ইচ্ছা দুজনের কারোরই ছিল না। কিন্তু ঐ অবস্থায় থাকাও নিরাপদ নয়। ভারতচন্দ্র অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে (কার উপর ?) লিখেছেন

আঁখি পালটিয়া ঘরে যাওয়া হইল কাল।
ভারত জানায় প্রেম এমনি জঞ্জাল॥

পরিপক্ক অবস্থা দেখে হীরা সৎপরামর্শ দিল—বাপ-মাকে জানিয়ে এবার শুভকাজ সেরে ফেলো। বিদ্যা কিন্তু ও-ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। যদি বাপ-মা রাজি না হন! আরও আশঙ্কা—যদি সুন্দর রাজপুত্র না হয়!! রাজপুত্র নয় বলেই তো সন্দেহ। বিদ্যা এখন সুন্দরকে চায়, রাজ-পুত্র শব্দকে চায় না। সে মনে স্বাধীনা, রুচিশীলা এবং সাহসিকা। সুন্দরকে রূপে ও বৈদগ্ধ্যে শ্রেষ্ঠ জেনে মনে বরণ করে ফেলেছে—তাকে তার চাই-ই। সেজন্য যে-কোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। বিদ্যা কাজ সেরে ফেলতে চাইল—সুন্দর-রেখায় চিহ্নিত হয়ে সে নিশ্চিন্ত হতে চায়ঃ 'তেঁই বলি চুপে-চুপে, বিয়া হয় কোনোরূপে, শেষে কালী যা করে তা হবে।' শুনে শিউরে উঠল হীরা : মেয়ে বলে কি! নিজের অবস্থা হীরা জানে—'ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ।' দড়িই বেশী। বাপ্ রে, গোপন বিয়ের কথা কি ছাপা থাকবে? বাঘিনীর মতো রাণী, প্রলয়ঙ্কর রাজা, অনর্থকর কোটাল, আর ঐ সঙ্গীরা—নমস্কার করি, এক-একটি ধিঙ্গি, মুখে এক মনে আর, ঠারে-ঠোরে সব কথা জানিয়ে দেবে, তার ফলে পরের বাছা মরবে, আর টানাটানি হবে নাহক আমাকে নিয়ে। আমি ওসবের মধ্যে নেই। তুমি রাজা রাণীকে জানাও, আঁধার ঘরে আলো জ্বলুক। বিদ্যা কিন্তু নাছোড়। না, সরকারী পথ এখন সম্ভব নয়। দেহে মনে জ্বলতে-জ্বলতে সে হঠাৎ পৌরাণিক সমর্থন পেয়ে গেল। রুক্মিণীকে

হরণ করেছিলেন কৃষ্ণ—আমাকেও সুন্দর হরণ করে নিন। এই অনুরোধবাক্য জেদ করে সে হীরার মারফত সুন্দরের কাছে পাঠিয়ে দিল।

এতবড় আহ্বান! সুন্দর অভিভূত। কিন্তু যাই কি করে? সুন্দর চিন্তিত। উপায় কালী, যিনি 'কালের কামিনী' হয়ে সুন্দরের চিত্তে আশা সঞ্চার করে রেখেছেন। সুন্দর স্তব শুরু করে দিল, দেবীও অবিলম্বে তুষ্ট হয়ে সুড়ঙ্গ কাটবার সিঁদকাটি ফেলে দিলেন, তাম্রপত্রে লেখা সন্ধিমন্ত্রসহ।

কবির অলৌকিক প্রতিভায় আমরা বিস্মিত। তিনি দেবীকে আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মতো যথেচ্ছ কাজে লাগিয়েছেন। মঙ্গলকাব্যে দেখি, পূজাপ্রচারে ব্যগ্র দেবগণ বশ-না-মানা মানুষের উপর উৎপীড়ন করেন, অপরপক্ষে এখানে দেখছি, বশ-মানারাই উৎপীড়ন করছেন দেবতাদের উপর, সঙ্গত অসঙ্গত সর্বপ্রকার আবদাররক্ষায় তাঁদের ব্যবহার করে।

এখানে অবশ্য সুন্দর প্রয়োজনেই উৎপীড়ন। 'রোমান্টিক সাহিত্যের সাধারণ সম্পত্তির একটি—সুড়ঙ্গ-খনন'— সে কাজে সাহায্য করতে পেরে দেবী শিল্পসৃষ্টিতে সহায়তা করার সুকৃতি অর্জন করেছিলেন, কারণ, সুড়ঙ্গটি যদিও সমাজের তলদেশে (রবীন্দ্রনাথ যা বলেন), তবু স্থাপত্য-কর্ম হিসাবে উৎকৃষ্ট। কাজটা অবশ্য হাতে-কলমে করল সুন্দর—তার পক্ষে এমন কি কাজ! বিদ্যালাভের জন্য সে পাহাড় টপকাবে, সাগর পাড়ি দেবে, গহন বনে ঢুকে পড়বে, আগ্নেয়গিরির গহ্বরে ঝাঁপ দেবে, কি করবে না? এক্ষেত্রে তো সবচেয়ে সহজ কাজটি করেছিল, সুবিধাজনক শৌর্য—গোপনে সুড়ঙ্গ খনন!!

সুড়ঙ্গটির বাইরে অন্ধকার, ভিতরে—'স্থলে স্থলে মণি জ্বলে হরে অন্ধকার।' এমন একটি সুড়ঙ্গ কেটেও, হায়, সুন্দরের নাম হল চোর! হোক, ক্ষতি নেই, কারণ সুন্দর মাত্রেই চোর। সর্বদা সে হৃদয়কক্ষে মনচোর রাজবেশে উপস্থিত। ভাগ্যে তাকে দেখার মতো চোখ বেশী লোকের নেই! দেখলেই তো হতে হবে বিদ্যার মতো কলঙ্কিনী। সুন্দরের জয় সর্বত্র—একথা অন্য কেউ নন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়ে গেছেন।

সুপরিসর মণিদীপ্ত সুড়ঙ্গ দিয়ে সুন্দরের যাত্রা শুরু হয়। দেবী

কালিকা সর্বশক্তিময়ী, সুতরাং নিজেকে উচিতবোধ থেকে বঞ্চিত রাখতে পারেন ; তারই জোরে বরবর্ষণ করে যেতে লাগলেন রূপমনোহর নবীন নাগরের উপর। বাইরে মূর্খ দ্বারী সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে ব্যস্ত রইল মক্ষিকার গতিরোধে।

সুন্দর চলেছে—'উরু গুরু গুরু', কাঁপছে 'আবেশ-রসে' ; 'ক্ষণে আগে যায়, ক্ষণে পিছে চায়,' 'ক্ষণেক চমকে, ক্ষণেক থমকে।' সাধ ও শঙ্কায়, কামনা ও কল্পনায় মথিত যৌবনমূর্তি।

ওদিকে অস্থির বিদ্যা, মিলনের আগেই বিরহার্ত, অর্থাৎ দেহজ্বরাতুর, স্মরগরলে ঝলসিত যুবতীকন্যা। বৈষ্ণব বিরহিণীর অনুকরণে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে : 'চাঁদের মণ্ডল বরিষে গরল, চন্দন আগুনকণা ; কর্পূর তাম্বুল লাগে যেন শূল ; গীত নাট ঝনঝনা' ; কিন্তু বৈষ্ণবকাব্যের মধুময় ভাবাকাশ এই কামজর্জর পরিবেশের কাছে সুদূর নীহারিকা। এই জগতের ভাষা বৈষ্ণবভাষার বাহ্য অনুকরণ করে ভিতরে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছে : 'এ নীল কাপড় হানিছে কামড়, যেন কাল-সাপিনী ; শয্যা হল শাল, লজ্জা হল কাল—'

সহসা ভূমিতল থেকে সুন্দরের আবির্ভাব। বৈচিত্র্যে আকস্মিকতায় যথার্থ সৌন্দর্যসৃষ্টি করতে পেরেছেন কবি : 'ভূমিতে চাঁদ উদয়।' চন্দ্রোদয়ে উদ্বেল চঞ্চল নারীগণ : 'হংসীর মণ্ডল যেমন চঞ্চল, রাজহংস দেখি হয়।'

একি লো একি লো ! একি-কি দেখি লো !
এ চাহে উহার পানে।

আর সুন্দর? তার মনোভাব পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে একটি গানে, যেটি, 'মালিনীর বেসাতির হিসাব' অধ্যায়ের উপরে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেটির স্বস্থান এখানে :

নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে।
তারা কথায় মনের গাঁটি কাটে॥
লাভ কে করিতে চায় মূল রাখা হৈল দায়
এমন ব্যাপারে কেবা আঁটে॥

পসারী গোপের নারী বসিয়াছে সারি সারি
রসের পসরা গীত নাটে।

এর পরে নাগরালির চরম। ত্রস্ত নারীদের কাছ থেকে যে-রকম সরস সপ্রতিভ ভাষায় সুন্দর আসন চেয়েছিল, আত্মপরিচয় দিয়ে বিদ্যার যৌবনস্ফুরিত দেহের অনায়াস প্রশংসা করেছিল—নাগরিক বৈদগ্ধ্যের পরাকাষ্ঠা তা। প্রথম পরিচয়েই বিদ্যার রূপবর্ণনায় দুঃসাহসিক মুখরতা দেখিয়ে সুন্দর প্রমাণ করেছে, যে সুযোগ নিতে জানে সেই সুযোগ পায়।—

বিচার হইবে কি প্রথমে অবিচার।
আহূত অতিথি এলে নাহি পুরস্কার॥
আসিয়াছি আশ্বাসে বিশ্বাস হইলে বসি।
শুনি সিংহাসন দিতে কহিলা রূপসী॥
বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর সার।
অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার॥
তড়িত ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে।
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণ চাঁদে॥
অঞ্চলে ঢাকিতে চাহে কমলের গন্ধ।
মাণিকের ছটা কি কাপড়ে পায় বন্ধ॥
দেখামাত্র জিনিয়াছি কহিতে ডরাই।
দেশের বিচারে পাছে হারায়ে হারাই॥

এই সব কথা সুন্দর বলছিল আর সতৃষ্ণ সুখে বিদ্যার লজ্জা উপভোগ করছিল। তারপর যেভাবে কৌতুকের লঘুস্পর্শে লজ্জাবরণ অপসৃত করতে চেয়েছে, অনবদ্য সে বাণী :

জিনিলেক এত জন যে-জন বিচারে।
দেখ লো লজ্জার হাতে সেই জন হারে॥
হারিয়া লজ্জার হাতে কথা না।ই যার।
সে কেন প্রতিজ্ঞা করে করিতে বিচার॥

সখীরা বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে থাকতে চাইল না, কারণ—উত্তমে

অধমে মিল হয় না, ভেড়ার শৃঙ্গে পড়লে হীরার ধার থাকে না, সুন্দরের কথার উত্তর বিদ্যাই দিতে পারে, সেই দিক। কিন্তু হায়, মুখরা বিদ্যাও আজ, এই মুহূর্তে, বাক্যহারা। লাজে রসে টলটল অল্প একটুকু কাব্য :

কি কব, ঠাকুরঝিরে ধরিয়াছে লাজ।
নহিলে উত্তর ভাল পেতে যুবরাজ॥

বিদ্যার এই ক্ষণিকের লজ্জাটুকু বিদ্যাসুন্দর কাব্যের উগ্র ঔজ্জ্বল্যের উপরে কোমল সজলচ্ছায়া এনেছে। লজ্জার সঙ্গে বিদ্যার জন্মের আড়ি। ভরা যৌবনে বিলাসসখা বাছবার জন্য যে-মেয়ে বিচারে বসে, লজ্জা তার স্বভাবগুণ নয়। সুন্দরের কথা শোনার পরে সে যে ভাবে ও ভাষায় গোপন মিলনের জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করেছে, তাতে তাকে বেপথুমতী বলতে পারি না। পরবর্তীকালেও তাকে লাজবতী দেখব না। কবি সম্ভবতঃ বিদ্যার চরিত্রের এই নগ্ন দীপ্তিতে ঈষৎ অস্বস্তিবোধ করে থাকবেন। তাই অতিবড় লজ্জাহীনাকেও একবার লজ্জা দিতে চেয়েছেন—এই সেই ক্ষণ, অপূর্ব যার নির্বাচন। সুন্দরকে বিদ্যার চাই-ই, এখনি—পিতা-মাতা, সমাজ, ন্যায়নীতির চিন্তা পরে—সেই সুন্দর যখন সাড়া দিয়ে, দাবি নিয়ে উপস্থিত হল, তখন আবির্ভূত সূর্যের সামনে কুন্তীর লজ্জায় অভিভূত হল সে। সে বুঝেছে, তারই ইচ্ছা সবলে আকর্ষণ করেছে মুগ্ধপতঙ্গ সুন্দরকে, নিজের সে ইচ্ছার স্বরূপও সে জানে, তথাপি এখন সহসামুক্ত উৎসের লাজরস তাকে একেবারে সিক্ত ও আচ্ছন্ন করে ফেলল। নারী-হৃদয়ের এই লজ্জাই সুন্দরের পৌরুষকে সম্মানিত করেছে, এবং সুন্দরের প্রতি বিদ্যার কামনাকে দেহরত রেখেও প্রেমনত করেছে। বস্তুতঃ এই লজ্জাভাসটুকু বিদ্যার বরণীয় মনোদেহের উপরে ধূসরাংশুকের আবরণ টেনে দিয়ে রূঢ় প্রত্যক্ষকে অনির্বচনীয় করেছে রসে-রহস্যে।

বিচার একটা অবশ্যই হবে এর পরে। তেমন রসের বিচার কদাচিৎ দেখা যায়।[৫] বিদ্যা বিচারের নিকষে স্বেচ্ছাপরাজয়কে আনন্দভরে যাচাই করে স্থায়ী করে নিয়েছিল। সুন্দর শ্লোক শোনাল :

৫। এই বিচারের অনুরূপ একটি ভাগ্যপরীক্ষা আছে শেক্সপীয়ারের মার্চেণ্ট অব ভেনিসে। সেখানেও পোর্শিয়ার মন বিকিয়ে গিয়েছিল ভাগ্যপরীক্ষার

শ্লোক শুনি সুন্দরীর রসে মন টলে।
ইহার অধিক আর হারি কাকে বলে॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা রসের তরঙ্গ।
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে ওঠে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ॥
ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার আদি সাধ্য সাধন সাধক॥
মধ্যবর্তী হইলা মদন পঞ্চানন।
যার সঙ্গে ছয় ঋতু ছয় দরশন॥

ভারতবর্ষে (এবং ভারতচন্দ্রে) কি সুবিধা—এখানে শেষ শাস্ত্র বেদান্ত, যার সার কথা—সর্বভূতে এক আত্মা। বেদান্তের বিদ্যাপক্ষে ব্যাখ্যা শুনে ঋষি বাদরায়ণ তোবা তোবা করে উঠেছেন:

সুন্দর কহেন রামা কি হৈল সিদ্ধান্ত।
বিদ্যা বলে সেই সত্য যে কহে বেদান্ত॥
অন্য শাস্ত্রে যে-সব সে-সব কাঁটাবন।
তত্ত্বস্তু বাদরায়ণে প্রমাণ লিখন॥
রায় বলে এক আত্মা তবে তুমি আমি।
বিদ্যা বলে হারিলাম, তুমি মোর স্বামী॥

যাক বাবা। কবি নিশ্চিন্ত, নিরঙ্কুশ। দুটি মন তিনি এক করেছেন, দুটি দেহ তা করতে পারলেই দায়মুক্ত হন। শুভকার্য যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল:

ত্রস্ত হয়ে কহিছে ভারতচন্দ্র রায়।
বিয়া করো ধরো কন্যা রাত্রি বয়ে যায়॥

আগে। তখন তার কী যন্ত্রণা—যদি তার পরাণবঁধু ঠিকমতো বাক্সটি বাছতে না পারে! বিদ্যার অবস্থা অনেক ভাল, তার ভাগ্য তার নিজেরই হাতে, নিয়তির হাতে নয়। সেজন্য শেক্সপীয়ারের নাটকে এক্ষেত্রে আমরা যে নাটকীয় উত্তেজনা বোধ করি, ভারতচন্দ্রে তা নেই, কিন্তু তার যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছে মনোহারীর কাছে স্বেচ্ছাপরাজয়ের কামমধুরতা।

গান্ধর্ব-বিবাহ কথাটা অনেকেরই শোনা আছে, পড়াও আছে আরো কারো-কারো, অন্ততঃ শকুন্তলা নাটকের সূত্রে, কিন্তু ব্যাপারটা (যা স্বেচ্ছামিলন ছাড়া আর কিছু নয়) যে, এমন কাব্যিক, ও আলঙ্কারিক চারুত্বপূর্ণ, তা নিম্নের কয়েক ছত্র পড়বার পূর্বে বোঝা সম্ভব ছিল না :

কন্যাকর্তা হৈল কন্যা বরকর্তা বর।
পুরোহিত ভট্টাচার্য হইল পঞ্চশর॥
কন্যাযাত্র বরযাত্র ঋতু ছয় জন।
বাদ্য করে বাদ্যকর কিঙ্কিণী কঙ্কণ॥
নৃত্য করে বেশরে নূপুরে গীত গায়।
আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈল তায়॥

ক্রমে সুগন্ধিসম্ভার, পুষ্পসজ্জা, উপযোগী খাদ্যচয়ন, প্রকৃতির প্ররোচনা, সখীদের শৃঙ্গারগীতি ; প্রথমে বিদ্যার, পরে সুন্দরের, তারপরে যুগ্মকণ্ঠের সঙ্গীত ;—এদের মধ্য দিয়ে দেহসাগরের তটে পাঠকের উত্তেজিত অনুভূতিকে কবি টেনে নিয়ে গিয়েছেন, যেখানে লজ্জাহীন আকাঙ্ক্ষায় বিস্ফারিত থেকেছে তার সর্বেন্দ্রিয় :

লাজে পলাইল লাজ ভয়ে ভাগে ভয়।
লোভেতে আইল লোভ গুণাকর কয়॥

কবি ভোগোৎসবের অপূর্ব রোমান্টিক পরিবেশ রচনা করেছিলেন :

গোলাব আতর চুয়া কেশর কস্তূরী।
চন্দনাদি গন্ধ সখী রাখে বাটি পূরি॥
মল্লিকা মালতী চাঁপা আদি পুষ্পমালা।
রাখে সহচরী পূরি কনকের থালা॥…
প্রথম বৈশাখ শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী।
সুগন্ধ মারুত মন্দ নিরমল শশী।
কোকিল কোকিলামুখে মুখ আরোপিয়া।
কুহু কুহু রব করে মদনে মাতিয়া॥
মুখে মুখে মধুকর মধুকর-বধূ।
গুন্ গুন্ গুঞ্জরে মাতিয়া পিয়া মধু॥…

বিদ্যার ইঙ্গিত পেয়ে সহচরীগণ।
আরম্ভ করিল গীত যন্ত্রের বাদন ॥
আলাপ বসন্ত-রাগ রাগিণীর সঙ্গ।
মন্দিরা বাজায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ ॥…
মোহিত সখীর গীতে হারাইয়া জ্ঞান।
বীণা বাজাইয়া রায় আরম্ভিলা গান ॥
সুন্দরের গান শুনি সুন্দরী মোহিলা।
মিশায়ে বীণার স্বরে গাহিতে লাগিলা ॥

ভারতচন্দ্র এর পরে অবশ্য থামতে পারেন নি। কেন থামতে পারেননি, স্বভাবের দায়ে, না চাকরির দায়ে, সে নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলতে পারে, কিন্তু থামতে পারেন নি। তার এই গতিশীলতা শয়নকক্ষের বাইরে না হয়ে ভিতর হবার জন্য তিনি ধিক্কৃত। আমরা পিছন থেকে মহাজনগণের বাক্যে সায় দিয়ে পাশ কাটিয়ে অগ্রসর হতে পারি। পৌঁছে যাই মিলনের নিশিভোরে, যখন বিচ্ছেদকাতর সুন্দর বলছে, 'আমি দেহ, তুমি যে জীবন।' সুন্দরের কথায় আমাদের অবিলম্ব সমর্থন। এখনো পর্যন্ত সুন্দর সত্যই দেহজীবী। এবং বিদ্যাও এই সময়ে উগ্র উল্লাসে শরীরিণী। মনের উপরে দেহকে চাপিয়ে তুষ্ট লোভের সঙ্গে সে বলেছে: 'ভবিষ্যতে ভাবি কেবা বর্তমানে মরে, প্রসবের ভয় তবু পতিসঙ্গ করে।' স্মরজর্জর লালসাচ্ছন্ন মন—নীতিহীন ভীতিহীন। প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে পরাভূত হয়ে মানুষ কখনো-কখনো প্রবৃত্তিকেই বহুমান দিয়ে আত্মসমর্থনের চেষ্টা করে—তখন তার সেই মৃত্যুময় বহ্নি-পিপাসা দেখে হাহাকার করে ওঠে আত্মজয়েচ্ছু আদর্শবাদী মন।

বিদ্যা ও সুন্দর দুজনেই গোপনমিলনের ব্যাপারটা হীরার কাছে চেপে গিয়েছিল। কবি প্রশংসা করে বলেছেন: 'বুঝহ চতুর সব কি এ চতুরালি, কুটনীরে ফাঁকি দিয়া করে নাগরালি।' রোমান্টিক প্রেমের ক্ষেত্রে এই কুটনী-চরিত্রটি অনিবার্য আবর্জনা। মিলনে সে সহায়িকা কিন্তু অপরাধবোধে কুটিল ও সাবধান। অবৈধ মিলনও পবিত্র হয় প্রেমে; তখন পূর্বতন অনুচিত আচরণকে স্মরণ করিয়ে দেয় ঐ অন্ধ-

কার মূর্তিটা। তার অভিজ্ঞতার বলিচিহ্ন মিলনের নিটোল আনন্দ-লোকে অস্থিছায়া। কুটনীকে ফাঁকি দিয়ে মিলনের চতুরালিতে কবি আলঙ্কারিক উল্লাসবোধ করেছেন, অপরপক্ষে আমরা খুশি মাণিক্য-খচিত সুড়ঙ্গপথ থেকে ইতরমূর্তিটা সরে গেছে বলে। কবি জানিয়েছেন, উভয়ের ব্যাপার কেবল সখীরা জানে। 'সেবার কারণ মাত্র জানে সহচরী।' সখীরা সকলেই সুন্দরী যুবতী, সঙ্গ দেয়, গীতবাদ্যে উদ্দীপন-পরিবেশ রচনা করে, যা দেহগত প্রাকৃতিকতার স্থূলতাকে আবৃত করে রাখে। তদুপরি নায়িকা মিলনের পূর্বে ও পরে সমপ্রাণা সখীদের কাছে দেহমন খুলে কৌতুক, কৌতূহল ও প্রীতিকূজনের পরিচর্যালাভের সুখবোধও করে।

প্রতারণার স্ফূর্তি পেতে শুরু করলে থামা মুশকিল। মালিনীর পরে রাজার সঙ্গে সুন্দরের প্রতারণার খেলা চলে। এ বড় মজার খেলা। তার ছন্দটা কবি এইভাবে ধরিয়ে দিয়েছেন :

বড় বসিয়া নাগর হে।
গভীর গুণসাগর হে ॥···
কখন ঘেটেল কখন কাঁড়ারী,
কখন খেঁটেল কখন ভাঁড়ারী,
কখন লুঠেরা কখন পসারী
কভু চোর কভু চর হে ॥···
কখন নাটক কখন চেটক,
কখন ঘটক কখন পাঠক,
কখন গায়ক কখন গণক
ভারতের মনোহর রে ॥

বিদ্যার সঙ্গে রাত্রি কাটিয়ে দিবসে সুন্দর যখন বেকার, তখন নব-রাজের লীলারঙ্গ উপভোগ করতে সন্ন্যাসীবেশে হাজির হল রাজ-সভায়। সেখানে মজা জমল মন্দ নয়। জামাই হয়েও প্রণাম পেল শ্বশুরের এবং উক্ত শ্বশুরের কাছে তাঁর কন্যার সঙ্গে বিচারের দাবি

জানাতে লাগল বারবার। রাজা আতঙ্কে ভাবলেন—সর্বনাশ! সন্ন্যাসীর সঙ্গে কন্যার বিবাহ। 'গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়।'

সুন্দর তার নবসাজের কথা বিদ্যার কাছেও চেপে গিয়েছিল। বিদ্যাকে বিব্রত করার জন্য বিচারপ্রার্থী সন্ন্যাসীর কথা তুলল। সন্ন্যাসী দারুণ পণ্ডিত, এমন পণ্ডিত যে, পূর্বে সুন্দরকে হারিয়ে দিয়েছে, এখন বিদ্যাকে হারিয়ে দেবার সমূহ সম্ভাবনা—সর্বনাশ! তবে, বিদ্যার পক্ষে আর সর্বনাশ কি! সে হারলে 'পুরাতন ফেলাইয়া নূতন পাইবে।' —সুন্দর কপট অভিমানে বলল।

সন্ন্যাসীর কথা হীরাও শুনল—শুনে হায় হায় করে উঠল। কোথায় সুন্দর, আর কোথায় সন্ন্যাসী!—

ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়॥

অভিমানবিকৃত তিক্ত পরিহাস করল :

কিবা ঢুলু ঢুলু আঁখি খাইয়া ধুতুরা।
দেখাইবে বারাণসী প্রয়াগ মথুরা॥
এতদিনে বাছিয়া মিলিল ভাল বর।
দেখিয়া জুড়াবে আঁখি সদা দিগম্বর॥
পরাইবে বাঘছাল, ছাই মাখাইবে।
লয়ে যাবে তীর্থব্রতে সিদ্ধি ঘুঁটাইবে॥
হরগৌরী বিবাহের হইল কৌতুক।
হায় বিধি কহিতে শুনিতে ফাটে বুক॥

একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যার সবচেয়ে বেশি ভয় পাওয়ার কথা, সেই বিদ্যা কিন্তু যথেষ্ট আশঙ্কাবোধ করে নি। কবি এখানে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞান দেখিয়েছেন। বিদ্যা যে, পরহস্তগত হতে পারে—এ চিন্তা পর্যন্ত তার নেই। নারীর অব্যবস্থিতচিত্ততা নিয়ে সুন্দরের ক্ষুরধার কৌতুকের উত্তরে সে যা বলেছিল, তার মধ্যে পূর্বতন তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিদ্যাকে যেন খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি মুগ্ধা বিহ্বলা নারীপ্রকৃতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। একটি বাস্তব সত্য বিদ্যা

জানে—বিচারের জয়-পরাজয় এখন তার কাছে অবান্তর। যাই ঘটুক, সে অন্য কারো হতে পারবে না। এই অবস্থাসৃষ্টির জন্যই তো সে সুন্দরর কাছে ধরা দেবার জন্য অত ব্যস্ত হয়েছিল।

বিদ্যার মনের আর একটি রূপ দেখা গেল এর পরেই। ভোগে তার আপত্তি নেই, কিন্তু তার ইতরতাকে সে সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। দিবসে সুন্দরের লোভের শিকার হয়ে সে অত্যন্ত অপমানবোধ করেছিল, তার গুরুমান শত চেষ্টাতেও সুন্দর ভাঙতে পারে নি; শেষে স্থূলভ চতুরতায়, সংস্কারের দোহাই দিয়ে, অনুকম্পামাত্র পেয়েছিল। দিবাবিহার বিদ্যার কাছে পাশবিক। রাত্রির আড়ালটুকু চাই। সেই মায়াযবনিকা লালসাকে করে লীলা, বাসনাকে করে বিলাস। বিদ্যা একটি দেহ বটে কিন্তু মনোময় দেহ, আরতি না করে তার প্রসাদ পাওয়া যায় না, বন্দনা না করে সে মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। রাজবংশে চাষা নয় বলেই তো তার কাছে সুন্দরের এত সমাদর। বিদ্যার নিকষোত্তীর্ণ সুন্দরই কেবল গ্রাহ্য, নচেৎ সে মাংসল প্রাণী মাত্র।

দিবাবিহারের প্রতিশোধ তুলতে একদিন দিবসে বিদ্যা সুড়ঙ্গপথে সুন্দরের কক্ষে এসে নিদ্রিত নায়ককে চিহ্নিত করে গেল। বিদ্যার এই স্বেচ্ছাস্বাধীনতাটুকু কি মধুর! নিদ্রিতা অসংবৃতা বিদ্যাকে পেয়ে সুন্দর যেখানে লালসামত্ত, সেখানে, অনুরূপ অবসরে, বিদ্যার স্নেহস্থির, ধীর চুম্বনটি কাব্যের উপরে স্নিগ্ধ মধুরিমা বিস্তার করেছে:

নিদ্রায় অবশ দেখি রাজার নন্দন।
ধীরে ধীরে তার মুখে করিলা চুম্বন॥
সিন্দুর চন্দন সতী পতিভালে দিয়া।
দ্রুত গেলা চিহ্ন রাখি নয়ন চুম্বিয়া॥

ঐ দ্রুত পলায়নের চরণচ্যুত মঞ্জীরধ্বনি আনন্দকলরব করে স্বাধীনা বালার আরক্ত কৌতুক ও প্রগল্ভ আচরণের অনৌচিত্যকে হরণ করে নিয়েছে।

প্রেমলীলার বিভিন্ন অবস্থানের বর্ণনায় কবি যথেষ্ট আলঙ্কারিক কৌশল দেখিয়েছেন। মান-কেন্দ্রিক পর্বে তিনি স্বতঃই জয়দেব গোস্বামীর

আনুগত্য স্বীকার করেছেন, কারণ জয়দেব, সকলেরই জানা আছে প্রণয়সমরে মানসিংহ। জয়দেবীয় কৃষ্ণের মতো যখন সুন্দর মানিনী-বিদ্যার পদপল্লব হৃদয়-সরোবরে ফুটিয়েছেন, তখন তার রসমোহিত বর্ণনা এইপ্রকার :

হৃদে ধরে রাঙাপদ, হ্রদে যেন কোকনদ,
নূপুর ভ্রমর-ধ্বনি করে।

সেই সঙ্গে শারী-শুকের বিয়ে দিয়ে কল্পজগতের রসসুখ অনুভব করতে চেয়েছে বিদ্যা ও সুন্দর, যে-সুখ কবি পেয়েছেন তাঁর কাব্য-দাঁড়ের সারী-শুক বিদ্যা ও সুন্দরের বিবাহ ও মিলনলীলা দেখে। এই লীলাকৌতুকের মধ্যে সুন্দরের কথায় সহসা সুর লেগেছে প্রেমের :

তোমারি সিন্দুর এই তোমারি চন্দন।
তোমারি পানের পিকে রেঙেছে নয়ন ॥···
এমনি তোমার পানে রেঙেছি নয়নে।
তোমা বিনা নাহি দেখি জাগ্রত স্বপনে ॥

মিলনের নানা লীলার বিস্তারিত বর্ণনার পরে কবি বেপরোয়া ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বাস্তবের মুখোমুখি হলেন। রোমান্টিক প্রেমে সন্তান-সম্ভাবনা থাকে না (সন্তান বড়ই গুরুভার), মিলন আর বিরহ, বিরহ আর মিলন। সে প্রেম দৈহিক প্রায় নয়, আত্মিক। অপরপকে গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ যেখানে অভিপ্রেত, সেখানে সন্তানের সুকুমার তনু প্রেমকে মঙ্গলসুন্দর করে তোলে। নিষিদ্ধ প্রেমের যন্ত্রণাদহন ফোটাতে হলে অবাঞ্ছিত সন্তানকে টেনে আনা হয়। নববিবাহিতের উন্মত্ত ভাল-বাসার মধ্যেও সন্তান কখনো-কখনো অবাঞ্ছিত, বিশেষতঃ পুরুষের কাছে, যখন সে রমণীস্নেহের ভাগীদার হিসাবে হাজির হয়।

বিদ্যাসুন্দরে 'বিদ্যার গর্ভ' অধ্যায়ে এ সকল সমস্যার ছায়াপাত কবির মনে অন্ততঃ নেই। সমাজকলঙ্কের মারাত্মক ভয়টা পর্যন্ত তিনি বোধ করছেন না, কারণ বিদ্যার ও-কালিমা কালীগত। কবির মনো-ভাব এখানে ভিন্নতর। ভোগ থাকলেই ভোগফল জন্মায়। প্রচণ্ড অথচ নিঃশব্দ অট্টহাস্যে বিদ্যাসুন্দরের মুক্ত বিহারের উপরেএকটি ভ্রূণ নিক্ষেপ

করতে পেরে ভারতচন্দ্রের কৌতুকবোধ চরিতার্থ হয়েছে। সুস্থ যৌবন-ধন্য নরনারীর মিলনের আনন্দ যেমন সত্য, তেমনি সত্য মিলনের ফল-রূপ সন্তান। ভারতচন্দ্র জীববিজ্ঞানীর নিরাসক্ত মনোভাবের ভঙ্গিতে এই তথ্য ঘোষণা করেছেন—প্রকৃতিকে পরাভূত করা কাব্যের পক্ষেও সর্বত্র সম্ভব নয়।

গর্ভবতী নারীর আকাঙ্ক্ষা ও আচরণের বর্ণনায় মঙ্গলকাব্য ভার-গ্রস্ত। ভারতচন্দ্র অপূর্ব বাণীতে সেই অতি-বিস্তারিত বর্ণনার জঞ্জাল পরিষ্কার করে একটি সংক্ষিপ্ত সুন্দর ছবি এঁকেছেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সঙ্গে রসিকতার আশ্চর্য সমন্বয় তাতে হয়েছে। গর্ভালসা নারীর দুই ছত্রের এই বর্ণনা :

নিদ্রা না হইত পূর্বে অপূর্ব শয্যায়।
আঁচল পাতিয়া নিদ্রা আনন্দে ধরায়॥

গোপন কর্ষণের অবাঞ্ছিত সৃষ্টি দেখে সমাজদৃষ্টি কিরূপ আক্রোশ-পরায়ণ হবে, সেই আশঙ্কায় পাঠকচিত্ত যখন ক্লিষ্ট (কবি নির্ভয় হলেও পাঠক তা হতে পারে নি), তখনি ধরণীর সদা স্পর্শকামী ভারনত একটি মাতৃরূপ ভাবী সন্তানজন্মের মঙ্গলশঙ্খধ্বনির কল্পনায় তার চিত্তকে পূর্ণবারি করে ফেলে।

এর পরে বেশ কিছু সময় কাব্য থেকে রোমান্টিকতার প্রস্থান এবং তাতে বাস্তবিকতার বিস্তার—কিন্তু কি অনবদ্য বাস্তবতা এবং নাটকীয়তা! নাটকীয় সাহিত্য হিসাবে 'গর্ভসংবাদ শ্রবণে রাণীর তিরস্কার' 'বিদ্যার অনুনয়', 'রাজার বিদ্যার গর্ভশ্রবণ', 'কোটালের শাসন', 'কোটালের চোর অনুসন্ধান,' 'কোটালগণের স্ত্রীবেশ', 'চোর ধরা', 'কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ,' 'মালিনী নিগ্রহ' প্রভৃতি অধ্যায়গুলি প্রথম শ্রেণীর। কিছু-কিছু অংশে ঘটনাসন্নিবেশে রোমান্সরস থাকলেও বাস্তবরসের প্রাধান্যই ঘটেছে।

সখীদের মুখে বিদ্যার নবসৌভাগ্য সম্বন্ধীয় সংবাদটি রাণী শুনলেন। তার পরেই গতিশীল চিত্র ক্রমান্বয়ে সরে গেছে। বিচলিত শিহরিত রাণীর সচকিত গতি, বিদ্যার সামনে তিনি উপস্থিত হলে তার প্রারম্ভিক

লজ্জা এবং প্রণামের কুণ্ঠিত অসম্পূর্ণ চেষ্টা, রাণীর ক্ষোভ ও গঞ্জনা, একমাত্র কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে আশাভঙ্গের মর্মপীড়া, বিদ্যার চতুর আত্মসমর্থনের চেষ্টা দেখে রাগে ঝাঁঝে ফেটে-পড়া, তারপরে রাজার কাছে ধেয়ে গিয়ে বুকের জ্বালা উজাড় করে দেওয়া—এই ছবিগুলি যে-কোনো প্রশংসার দাবি করতে পারে। অব্যর্থ নাটকীয় সংলাপের ভূরি-ভূরি নিদর্শন এইসব অংশে আছে। যে রাণী কন্যাকে 'ওলো নিঃশঙ্কিনী কুলকলঙ্কিনী, সাপিনী, পাপকারিণী' বলে ধিক্কার দিয়েছেন, সখীদের গাল দিয়ে বলেছেন, 'সকলে মিলিয়া কুটিনী হইয়া চুনকালি দিলি গালে', তিনিই উদাসীন কর্তব্যপরাঙ্মুখ রাজার কাছে অস্থির যৌবনের পক্ষসমর্থন করে তীব্র ব্যঙ্গে যা বলেছেন, তার পরিবেশ-ঔচিত্য অসাধারণ : 'অনায়াসে পাবে সুখ, দেখিবে নাতির মুখ, এড়াইয়া ঝির বিয়া দায়।'

মায়ের কাছে অনুনয়কালে বিদ্যা যেসব কথা বলেছিল তার মধ্যে আদিম কামনার তীব্রতা উদাসীন পিতামাতাকে চমকে দেবার মতো করে ফুটে উঠেছে। যাকে 'বাপে না জিজ্ঞাসে, মায়ে না সম্ভাষে,' রাজার নন্দিনী হয়েও যে 'চিরবিরহিণী', দুশ্চিন্তায় তার পেটে গুল্ম হতেই পারে। ভাবনাজাত জঠর-গুল্মের কথা যে বিশ্বাসযোগ্য নয়, তা বিদ্যা যথেষ্টই জানত। কিন্তু জঠর-গুল্মের বাস্তব কারণকে যদি মানতে হয়, তাহলে উক্ত কারণের কারণও চিন্তা করতে হবে। বিদ্যার কলঙ্কিত আত্মসমর্থন সমাজমনের সামনে জৈবস্বভাবের প্রশ্নচিহ্নের মতো জেগে আছে। (বিদ্যা অবশ্য নিজের ভাগ্য নিজেই নির্মাণ করেছিল, আমরা জানি)।

রাণী গিয়ে রাজাকে জাগালেন। সদানিদ্রিত রাজা অকালজাগরণে রক্ত-আঁখি যথারীতি ঘূর্ণিত করলেন। সব দোষ গিয়ে পড়ল কোটালের উপর ; 'ধরে আন চোর, নহিলে নগরপাল রক্ষা নাহি তোর।' রাজার শাসনের ভাষা রাজপথ থেকে সংগ্রহ করা। কোটাল যে চুরি করে দেশ ফাঁক করে দিচ্ছে, রাজা তা বেশ জানেন, কিন্তু নিজের ঘরের সম্ভ্রমে সিঁদ না-কাটা পর্যন্ত তাঁর ঘুমোবার হক্। ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।

ভারতচন্দ্র তাঁর এই রচনায় সত্যই 'শাশ্বত আধুনিকতা' (!!) দেখিয়েছেন :

রাজা কহে শুন রে কোটাল।
নিমকহারাম বেটা আজি বাঁচাইবে কেটা
দেখিবি করিব যেই হাল॥
রাজ্য কৈলি ছারখার তল্লাস কে করে তার
পাত্র মিত্র গোবর-গণেশ।
আপনি ডাকাতি করি প্রজার সর্বস্ব হরি
হয়েছিস দ্বিতীয় ধনেশ॥
লুটিলি সকল দেশ মোর পুরী ছিল শেষ
তাহে চুরি করিলি আরম্ভ।
জানবাচ্ছা এক খাদে গাড়িব হারামজাদে
তবে সে জানিবি মোর দম্ভ॥

প্রাণভয়ে কাতর কোটাল বিরস মনে বিদ্যা সম্বন্ধে একটি মর্মান্তিক রসিকতা করেছিল, যা উচ্চবর্গের ঘরোয়া রসচর্চা সম্বন্ধে জনসাধারণের মনোভাবের দ্যোতক : 'রসময়ী রাজকন্যা, রূপগুণময়ী ধন্যা!'

ঠেলায় তৎপর কোটাল চোর ধরার বড় রকমের আয়োজন করল। গোয়েন্দার ভঙ্গিতে বিদ্যার কক্ষের সুড়ঙ্গ সম্বন্ধে নানা জটিল চিন্তা করে সিদ্ধান্ত করল, সুড়ঙ্গের মুখে অপেক্ষা করাই শ্রেয়, কেননা 'পেয়েছে বিদ্যার লোভ আসিবে অবশ্য।' গুঁতোর চোটে কোটালের মুখ থেকে জ্ঞানবাণী ছুটতে লাগল :

লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়।
পশুপক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়॥
দেব উপদেব পড়ে তন্ত্র-মন্ত্র ফাঁদে।
নিরাকার ব্রহ্ম দেহফাঁদে পড়ি কাঁদে॥

কোটালের এহেন প্রাজ্ঞোক্তিতে হাসি এবং বিরক্তি দুইই আসে। ভারতচন্দ্রের ঝাঁঝালো ধারালো রসিকতা অবশ্যই উপভোগ্য, বহুক্ষেত্রেই তার প্রাসঙ্গিকতা আছে, কিন্তু এমন ক্ষেত্রও আছে যেখানে কাব্য-প্রয়োজনকে অতিক্রম করে কবির বচনের গুলি ছিটকে চলেছে। সেই-সব অপ্রয়োজনীয় ভূয়োদর্শনকে কবির সাত্তা নয়, সাধুতার অভাব

বলেই মনে হয়। ভারতচন্দ্র এমন বহু কবিবচন রচনা করেছেন যা তুচ্ছকুল থেকেও আহৃত হবার যোগ্য, কিন্তু ঐ সকল রত্নকে তুচ্ছকুলে নিক্ষেপ করবার দায়িত্বও কবিরই। ভারতচন্দ্র-রচিত কিছু প্রবচন আছে, যাদের স্বচ্ছন্দে নিয়মিত ব্যবহার করে যাই, কবি কোথায় তাদের প্রয়োগ করেছেন সে বিষয়ে অবহিত থাকি না বলেই !!

চোর পাকড়াবার জন্য কোটাল ও তার অনুচরেরা স্ত্রীবেশ ধরে অপেক্ষা করতে লাগল। ব্যাপারটা আপাততঃ রোমান্টিক মনে হয়, যদিও তার রোমান্টিকতা শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল কি না সন্দেহ। শেক্সপীয়র-প্রভৃতির রোমান্টিক নাটকে নারীর পুরুষবেশ ধারণের প্রচুর বিবরণ আছে। এখানে তার বিপরীত—পুরুষের স্ত্রীবেশ, সাহিত্যে যার উল্লেখ প্রায় নেই। মনে হয়, যৌবনোদ্ধত নারীদেহকে পুরুষবেশের সংকীর্ণ সীমায় শাসিত করে সাহিত্যিকরা যত আনন্দ পেয়েছেন, পুরুষকে নারী সাজিয়ে সে সুখ তাঁরা পান নি।[৬] ইউরোপীয় কেচ্ছা-সাহিত্যে অবশ্য নারীর বিশ্বস্ত আত্মপ্রকাশকে ছদ্মপরিচয়ে উপভোগ করবার সুযোগ দেওয়ার জন্য পুরুষকে নারীবেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে পুরুষের নারীবেশ-ধারণ জুগুপ্সার সৃষ্টিই করে, যার কদর্য প্রকাশ ঘটেছে স্ত্রীবেশী চন্দ্রকেতুর সঙ্গে সুন্দরের ব্যবহারে। প্রেমমুগ্ধের জ্ঞান থাকে না, জড় পদার্থেও প্রিয়-প্রতিচ্ছবি দেখে ক্ষেপে গিয়ে

৬। শেক্সপীয়ারের কালে নারীর পুরুষবেশ ধারণের কিছু কারণ দেখানো হয়েছে। নারী-ভূমিকায় অভিনেত্রী পাওয়া যেত না বলে কিশোর বালককে মেয়ে সাজানো হত ; কিন্তু যেহেতু সে শরীরতঃ ছেলে, তাই নাটকীয় কারণ দেখিয়ে যতশীঘ্র মেয়ে-সাজ ছাড়িয়ে তাকে ছেলে করে ফেলা যায়, ততই অভিনয়ের সুবিধা। ছেলে আবার ছেলেই হল অথচ সে আসলে মেয়ে এমন একটা ধারণার জন্য দর্শকদের মন রসালো হয়ে রইল। তাছাড়া, সেই মধ্যযুগে নারীর স্বাধীনতা ও চিত্তস্ফূর্তি পুরুষবেশের ছাড়পত্রের সাহায্যেই মাত্র ঘটতে পারত। শেক্সপীয়ার এ রীতির প্রবর্তন করেন নি, অনুসরণ করেছেন। বর্তমানে পাঠকদের আমরা ঐ সকল ঐতিহাসিক কারণতত্ত্ব ভুলতে অনুরোধ করব। মেয়েকে ছেলে সাজিয়ে শেক্সপীয়ার আনন্দ পেয়েছিলেন, আমরা এইটুকু বিশ্বাসেই আমোদিত।

প্রেমিক-প্রেমিকা সেদিকে ধেয়ে যায়—রোমান্টিক কাব্যে এ সকল জিনিস আমরা হরবখত্ পাই। তবে রোমান্টিক কবিরা প্রেমকে এমন দেহোত্তর ভাবলোকের বস্তু করে ফেলেন যে, জড়ের প্রতি প্রেমিকের ঐ ভ্রমপূর্ণ আসক্তি আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠার ব্যঞ্জনা আনে। কিন্তু স্ত্রীবেশী চন্দ্রকেতুকে নিয়ে কীচক-স্বভাব সুন্দর যে কাণ্ড করেছে, তা রোমান্সের ছাল ছড়িয়ে ব্যাপারটাকে দগ্‌দগে করে দিয়েছে। কামোন্মত্তের জ্ঞান-হীন আচরণের উপরে ভারতচন্দ্রের পরিহাসবাক্যের রৌদ্রপাতও ('বদন চুম্বন করি স্তনে হাত দিল, খসিল কাষ্ঠের কুচ কাঁচলি ছিঁড়িল; কামমদে মত্ত কবি, তবু নাহি জ্ঞান, সাবাসি সাবাসি রে সাবাসি ফুলবাণ!') পাঠকমনের গ্লানিহরণ করতে পারে নি। যে অল্প দু'একটি ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র ভাল্‌গার, এ তেমন একটি ক্ষেত্র।

সুন্দর ধরা পড়ল। তারপর কোটালদের নাচ-গান-উৎসব শুরু হয়ে গেল। সেই লম্ফঝম্পের মজাদার বর্ণনা কবি করেছেন, যত করেছেন তত আনন্দ আর ব্যঙ্গ বেড়ে-বেড়ে উঠেছে। মহাবীর কোটাল তারপর মহাসেনাপতির মতো নিজে প্রথমে সুড়ঙ্গে না ঢুকে অনুচরদের এগিয়ে দিল; পরে অনুকুল সংবাদ পেয়ে বীরদর্পে এগিয়ে গিয়ে মালিনীকে পাকড়ালো; তারপর মালিনীনিগ্রহ আরম্ভ হয়ে গেল এবং আমরা ভারতচন্দ্রের রচনাশক্তির আর এক সাফল্যমণ্ডিত নমুনা পেয়ে গেলাম। কোটাল ও মালিনী-সংবাদের নাটকীয়তা পরে অন্য অধ্যায়ে দেখাবার চেষ্টা করব।

'বিদ্যার গর্ভ' থেকে 'মালিনী-নিগ্রহ' পর্যন্ত অধ্যায়গুলিতে কবি যে নিতান্ত বস্তুরসে নিমগ্ন ছিলেন, সে বিষয়ে তাঁর সচেতনতাও ছিল। প্রমাণ—এইকালে তিনি স্বপ্নরসময় গানের স্রোত বইয়ে দিয়েছেন অধ্যায়গুলির উপর দিয়ে।

এ বড় চতুর চোর।
গোকুলের নন্দকিশোর॥
নারিনু রাখিতে দেখিতে দেখিতে
চিত্ত চুরি কৈল মোর॥

সে দেখে সবারে কে দেখে তাহারে
লম্পট কাল-কঠোর ॥

চল সবে চোর ধরি গিয়া।
রমণীমণ্ডল ফাঁদ দিয়া ॥
তেয়াগিয়া ভয়-লাজ সকলে করহ সাজ
সে বড় লম্পট কপটিয়া।
জানে নানামত খেলা দিবস দুপুর বেলা
চুরি করে বাঁশি বাজাইয়া।
সে বটে বসনচোরা তাহারে ধরিব মোরা
পীতধড়া লইব কাড়িয়া।
সদা ফিরে বাঁকা হয়ে আজি সোজা করি লয়ে
ভারত রহিবে পহুরিয়া ॥

আজি ধরা গেল চোর চূড়ামণি।
মোরা জেগে আছি সকল রমণী ॥
ভাঙা গেল যত ভূর চাতুরী হইল চূর
এড়াইতে নারিবে এমনি।
প্রকাশিয়া ভারি-ভূরি অনেক করেছে চুরি
আজি ধরি শিখাব তেমনি ॥
যদি কারাগার ঘেরে বান্ধিয়া মনের ডোরে
গছাইব পরাণে এখনি।
সকলেরে ফাঁকি দেহ ধরিতে না পারে কেহ
ভারত না ছাড়িবে অমনি ॥

কারে কব লো দুঃখ আমার।
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার ॥

বাঁধা আছি কুলফাঁদে পরাণ সতত কাঁদে
না দেখিয়া শ্যামচাঁদে দিবসে আঁধার ॥

সুন্দর ধরা পড়ার পরে কাব্যের কাহিনীর আকর্ষণ কার্যতঃ শেষ। সুন্দরকে রাজসভায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রাজসভার বর্ণনায় ঘটা যথেষ্ট, যদিচ ব্যাপারটা শূন্যগর্ভ। সুন্দর সভায় উপস্থিত হলে রাজা হেঁটমুখ, অবশ্যই লজ্জায়, কিন্তু কন্যার কুমারী-কলঙ্কের ব্যাপারটিকে তিনি প্রকাশ্যসভায় কেন টেনে আনলেন বোঝা শক্ত। রাজা কি এতই ন্যায়বিচারী?—না। রাজার আপত্তি সত্ত্বেও ও-কাজটা ভারতচন্দ্রই করেছেন। একের ঘরের গোপন কেচ্ছা অন্যান্যদের প্রকাশ্যে তারিয়ে চাখার সুযোগ দিতে কবি ঐ অত্যাচারটি রাজার উপরে করেছেন রাজারই আজ্ঞায় রাজসভার হাটে ঘরের হাঁড়ি ভাঙা হয়েছে।

সুন্দরকে দেখে রাজা রক্ত আঁখিতেও রসাক্ত: 'কাটিতে উচিত কিন্তু কেমনে কাটিব, কলঙ্ক করিতে দূর কলঙ্ক করিব!'

ধৃত মালিনী কপট সাধুতায় ব্যাকুল: 'না জানি কুটিনীপনা দুখিনী মালিনী, চোরে বাসা দিয়া নাম হইল কুটিনী।'

পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হলে সুন্দর বাক্‌ছলে সকলকে ফিরাল। আসল কারণ অনেক পরে শুক পাখির মুখে শুনে আমরা মোহিত—রাজার ছেলে নিজে নিজের পরিচয় দিতে পারে কখনো! ও-কাজ তো করে ভাট ও ঘটকেরা! একে বলি কালচার! এ ঠাট মরলেও যায় না। শোনা যায়, জুতো পরিয়ে দেবার লোক ছিল না বলে এদেশীয় এক পরাভূত নবাব সুযোগ সত্ত্বেও পালাতে পারেন নি।

এই কালচারের বাজিকর কবিরূপে ভারতচন্দ্রকে আমরা দেখি সুন্দরের শ্বশুর-সম্ভাষণের মধ্যে। দীনেশচন্দ্র কঠোরভাবে বলেছেন, 'এই সমস্ত উক্তির অশিষ্টতা লিপিচাতুর্যের নামে মার্জনীয় নহে। ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের নিকট কোনো জামাতা যে সত্যসত্যই এরূপ ছন্দ ও ভঙ্গিতে আত্মপরিচয় দিতে পারেন—ইহা আমাদের ধারণার অতীত।' প্রমথ চৌধুরী এই সমালোচনার উত্তোর দিয়েছেন—'এরূপ সমালোচনা কোন্ সাহিত্যসমাজের সুরীতি?' আমাদের বিবেচনায় বাদী-প্রতিবাদী

উভয়ের কথাই ন্যায্য। শ্বশুরের সঙ্গে ঐ প্রকার 'ইয়ার্কি' বাস্তবিক ইতর জাতীয়। আবার তলিয়ে দেখলে, রাজকীয়। শুক তো আগেই বুঝিয়ে বলেছে, রাজার ছেলে ভাট-ছাড়া নিজে পরিচয় দেয় না।

চরিত্রসৃষ্টিতে ভারতচন্দ্রের ব্যর্থতার দুই 'উজ্জ্বল' দৃষ্টান্তরূপে কথিত বিদ্যা ও সুন্দরের চরিত্রবিষয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা ইতিমধ্যে আমরা করেছি, এবং, রোমান্টিক চরিত্র-হিসাবে তারা যে, সবিশেষ নিন্দনীয় এমন কথা বলতে পারি নি। তাদের চরিত্রের সর্বশেষ পরিণতি সম্বন্ধে এখানে দু'একটি কথা আরও বলে নেওয়া যায়। ইতিমধ্যে যা বলে এসেছি তদনুযায়ী সুন্দর একটি উজ্জ্বল মাংসল সৌন্দর্য, চতুরতা ও পাণ্ডিত্য থাকলেও যথোচিত ব্যক্তিত্বের অভাব আছে তার মধ্যে। অপরপক্ষে বিদ্যা—বিদ্যায় বুদ্ধিতে রূপে চারিত্রে ঝলমল। পূর্বরাগ ও মিলন পর্যন্ত বিদ্যার প্রাধান্যের রূপ বজায় আছে। কিন্তু সুন্দর ধরা পড়ার পর থেকে তার ভূমিকা গৌণ হয়ে গেছে। কবি 'বিদ্যার আক্ষেপে'র বিবরণ দিয়েছেন, যাকে বেনামী রতিবিলাপ বলা চলে। অসিতকুমার তা নিয়ে সঙ্গতভাবেই বিদ্রূপ করেছেন: 'বিদ্যা গজকাটি মাপিয়া মাপিয়া বিলাপ করিয়াছে।' দীনেশচন্দ্রের মন্তব্য কম উপভোগ্য নয়, 'তাহার ক্রন্দনে চক্ষুজল ব্যতীত সকলই ছিল—শব্দের প্রতি সাবধানতা বিশেষ।' প্রথমে যেন সন্দেহ হয়েছিল, বিদ্যা বুঝি দ্বিতীয় রাধিকায় পরিণত হয়: 'সুন্দর পড়েছে ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা, সখী তোলে ধরাধরি করি।' কিন্তু কবি অবিলম্বে সে ধারণা দূর করে দিলেন। দেখা গেল, বিদ্যা বেশ গুছিয়ে কাঁদতে পারে। কান্নার ফাঁকে-ফাঁকে সে গুণসিন্ধুতনয়ের গুণ-তালিকা পেশ করেছিল এবং ঐ সকল গুণাস্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখের কথাই বিশেষভাবে জানিয়েছিল। সে যে 'বিনিয়া বিনিয়া' কাঁদছিল, কবি গোপন করেন নি। অর্থাৎ বিদ্যার বিরহানুভূতির গভীরতার অভাব যদি দেখা যায়, সে কবির জ্ঞাতসারে, তাঁরই ইচ্ছায় ঘটেছে। বিদ্যার হৃদয়াকাশের সুন্দর-ইন্দুর চেহারা এই রকম:

প্রভু মোর গুণের সাগর,
রসময় রসিক নাগর।

রসিকের শিরোমণি বিলাসধনের ধনী
নৃত্যগীতবাদ্যের আকর॥

বাগ্‌বাহুল্যে বিদ্যার বৈদগ্ধ্য পর্যন্ত হতমান :

যুবতী-জনম কালামুখ
পরের অধীন সুখ দুখ।
পর ঘরে ঘর করে পরের মরণে মরে
পরে সুখ দিলে হয় সুখ॥

কোন্ সুখবঞ্চনায় এত আক্ষেপ, ঠিক পরেই বিদ্যা তা জানিয়েছে :

রমণীর রমণ পরাণ,
তাহা বিনে কেবা আছে আন।

শব্দের উপর ভারতচন্দ্রের মারাত্মক অধিকার। শ্লেষমুখে তিনি কিছু বলতে বাকি রাখেন নি।

বিদ্যার এই যে রূপাঙ্কন কবি করলেন—কাব্যের ঔচিত্য রাখতেই একাজ তিনি করেছেন। বিদ্যার মতো প্রখর আত্মসচেতন বৈদগ্ধ্যময়ীকে অকস্মাৎ ভাবময়ী রাধিকা করলে ভারতচন্দ্র জানতেন (???) তাঁর পরবর্তী আদর্শবাদী সমালোচকেরা খুশি হবেন কিন্তু কাব্যের অন্তঃসঙ্গতি ক্ষুণ্ণ হবে একই সঙ্গে। বিদ্যা তার চোখের আলো ঝরাতে পারে, পানি নয়।

সুন্দর ধরা পড়ার পর থেকে, তাই কাব্যে বিদ্যার ভূমিকা অপ্রধান। সেই-যে সে অবরোধে প্রস্থান করল, তারপরে সুন্দর মুক্তি পাবার আগে পর্যন্ত কবি যেন তাকে ভুলে গিয়েছিলেন। এমন কোনো ইঙ্গিত তিনি দেন নি যার দ্বারা অবরোধ-প্রস্থিত বিদ্যার যন্ত্রণাচ্ছিন্ন অবস্থা কল্পনা করে পাঠক স্বস্তিবোধ করতে পারে। এইখানে বৈষ্ণবকাব্যের সঙ্গে বিদ্যাসুন্দরের পার্থক্য। বিপদ নইলে প্রেমের পরীক্ষা হয় না। গোপন সুড়ঙ্গপথে সঞ্চরমান সুন্দরের কামতাড়নাকে একদিন বিদ্যা নিয়ন্ত্রণে শাসনে শ্লীলীন সুমোহন করেছিল। তখন গোটা পরিবেশে তার আধিপত্য। কিন্তু সেই গোপন বিহার যখন প্রকাশ্য বিচারের সামনে দাঁড়াল, তখন কলঙ্কিনী ভীরু নারীর মতোই বিদ্যা পিতামাতা

ও সমাজের শাসন মেনে নিয়ে প্রাচীরের ভিতরে সরে গেল। বৈষ্ণব-কাব্যের নায়িকা হলে সে সমাজসংসার ভুলে আত্মহারা দুঃসাহসে প্রকাশ্য প্রেমঘোষণা নিয়ে অবতীর্ণ হত। তাই বিদ্যাকে রাধিকাতুল্য বলা ব্যাজস্তুতির দুমুখো আক্রমণে রাধিকা ও বিদ্যা দুজনকেই অপদস্থ করা। কবি তা করতে চান নি এবং তিনি যে এক্ষেত্রে বিদ্যা সম্বন্ধে কঠিন মনোভাব পোষণ করেছিলেন, তা শুকের মুখের কথা থেকে (যা কবিরও কথা) বোঝা যায়: 'বিয়া কৈল লুকাইয়া, শেষে দিল ধরাইয়া, ডাকাতের দুহিতা রাক্ষসী।'

কাব্যের শেষপর্যায়ে সুন্দরকে কিন্তু কিছু ভিন্নরূপে যেন দেখা যায়। ধরা পড়বার পর সে আক্ষেপ করেছিল। না জানি কোন্ অপমান অপেক্ষা করছে, কোন্ সর্বনাশ, এই প্রশ্নও করেছিল ক্ষোভের সঙ্গে। কিন্তু তবু, গহন পথের প্রান্তে সে যা পেয়েছিল, তার আনন্দজ্যোতি ঐ সমুদ্যত আঘাতের নিচেও তার মনকে ভরিয়ে রেখেছিল:

তার সমা নিরুপমা প্রিয়তমা কেবা।
দেখা নৈল মনে রৈল যত কৈল সেবা॥
সে আমার আমি তার কেবা আর আছে।
সেই সার কেবা আর যাব কার কাছে॥

রাজসভায় আনীত সুন্দর চোর পঞ্চাশতের তিনটি শ্লোক শুনিয়েছিল। পঞ্চাশটি চোর-শ্লোকের মধ্য থেকে ঐ তিনটি শ্লোক কবি বিশেষ বিবেচনা ও সাহিত্যবুদ্ধির সঙ্গে নির্বাচন করেছিলেন। শ্লোক তিনটিকে বিদ্যাসুন্দরের প্রেমজীবনের সংক্ষিপ্ত টীকা বলতে পারি। প্রথমটিতে বিদ্যার কাম-পরিচয়; তার 'কামবিহ্বললালসার' রূপ। দ্বিতীয়টিতে ঐ কাম প্রেমমুখী; সুন্দরের প্রতি গুরুতর রোষ সত্ত্বেও বিদ্যা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আয়তিচিহ্ন কনককুণ্ডল পরিধান করে দেখিয়ে দিয়েছিল, তাদের প্রেম সম্পূর্ণ দেহবদ্ধ নয়। তৃতীয়টিতে আছে সুন্দরের কামপ্রেমের অগ্নিময় আনন্দের রূপকচিত্র। সে কামপ্রেম—নীলকণ্ঠের কালকূট, কূর্মের পৃথিবীভার, সমুদ্রের বাড়বাগ্নির মতোই।

রাজসভায় দাঁড়িয়ে সমস্ত দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়ে (সুন্দর চোর,

পুরুষও বটে) যেভাবে সে আত্মঘোষণা করেছিল, তা আপাত চতুরতা-ইতরতাকে অভিভূত করে নূতন মর্যাদালাভ করেছে। বিদ্যা নয়, সুন্দরই এখন 'জপিতে জপিতে নাম' অবশচিত্ত :

বিদ্যাপতি মোর নাম, বিদ্যাপতি মোর নাম।
বিদ্যাধর জাতি, বাড়ি বিদ্যাপুর গ্রাম ॥....
মোর বিদ্যা মোরে দেহ, মোর বিদ্যা মোরে দেহ।
জাতি লয়ে থাক তুমি, আমি যাই গেহ ॥
বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ, বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ।
তপ জপ যজ্ঞ যাগ ধন ধ্যান জ্ঞান ॥...
আমি বিদ্যার লাগিয়া আমি বিদ্যার লাগিয়া।
আসিয়াছি ঘর ছাড়ি সন্ন্যাসী হইয়া ॥

সুন্দরের এই বিদ্যাস্তোত্র আড়ম্বর সত্ত্বেও (আড়ম্বর একেবারে ছাড়লে সুন্দর সুন্দরই থাকে না) তার প্রেমের গাঢ় বলিষ্ঠতার রূপ দেখিয়ে দিয়েছে। এবং এই প্রথম বিদ্যাসুন্দরের অধ্যায়শীর্ষের রাধাকৃষ্ণসঙ্গীতের সঙ্গে কাব্যবিষয়ের একাত্মতা ঘটেছে।—

মোর পরাণপুতলী রাধা।
সুতনু তনুর আধা ॥
দেখিতে রাধায় সদা মন ধায়
নাহি মানে কোনো বাধা।
রাধা সে আমার আমি সে রাধার
আর যত সব বাধা ॥
রাধা সে ধেয়ান রাধা সে গেয়ান
রাধা সে মনের সাধা।
ভারত ভূতলে কভু নাহি টলে
রাধাকৃষ্ণ-পদে বাঁধা ॥

এইখানেই বিদ্যাসুন্দর কাব্যের শেষ। একটা উপসংহার আছে যা কাব্যকে সংহার করেছে। সুন্দরকে মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে সে কালীস্তুতি করেছিল। সে এক শব্দের মহাযজ্ঞ। তার পরে

চৌতিশা। কে যেন বলছেন—চৌতিশা ভক্তি-আদালতের সমন, দেবীদের কাছে অপ্রতিরোধ্য।

মশানে যেসব কাণ্ড হয়েছিল, তাতে কবির অভিপ্রেত বা অনভিপ্রেত হাস্যরস প্রচুর সৃষ্টি হয়েছে। সুন্দরের কালীস্তুতি বিষয়ে দীনেশচন্দ্রের অনবদ্য সরস মন্তব্য :

"মশানে যখন সুন্দরের শিরোর্ধ্বে কোটালের খরশান খড়্গ উত্থিত, তখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে অভিধান খুঁজিয়া চণ্ডীশব্দের প্রতিশব্দ বাহির করিতেছিলেন, অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার এই প্রাণান্ত অনুরাগ দৃষ্টে —বিপজ্জালবেষ্টিত গণিতবিজ্ঞানে ঘোর নিবিষ্টচিত্ত, ভ্রূক্ষেপহীন আর্কমিডাসের কথা মনে হয়। হর্ষচরিতে পড়িয়াছি, আসন্নমৃত্যু রাজা জ্বরবিকারগ্রস্ত হইয়া 'হারং দেহি মে হরিণি' প্রভৃতি ভাবে কেবল যমক মিলাইতেছেন। শিক্ষাস্পর্ধিত কবিগণ বিদ্যা-বুদ্ধি দেখাইবার ব্যস্ততায় বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন। মশানে পতিত সুন্দরকে দিয়াও ভারতচন্দ্র সেইরূপ সময়ানুচিত অলঙ্কারশাস্ত্রের অভিনয় করাইয়াছেন। সুন্দরের স্তবে ভক্তির কথা দুর্লভ—লিপিশক্তির পরিচয় সুলভ।"

অতঃপর দেবী আবির্ভূত না হয়ে পারেন নি, একেবারে প্রলয়ঙ্করীরূপে !! দক্ষযজ্ঞনাশের কাণ্ড হতে-হতে সামলে গেল। দেবীর রাগ হতেই পারে, তাঁর বরপুত্র চোর হৈল, কোটাল মশানে লৈল !! চালাকি !!! 'মা ভৈষী মা ভৈষী বেটা!' বলে তিনি সুন্দরকে অভয় দিলেন ; সুন্দর যেসব কীর্তি করেছে তার জন্য বাক্যে তার পিঠ চাপড়ালেন ; প্রয়োজনে প্রলয় ঘটাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন ; এবং শেষে বললেন, 'তোরে পুনঃ বাঁচাইয়া বিদ্যা দিব রাজ্য দিয়া, ভয় কি রে বিদ্যা-বিনোদিয়া।'

না, সত্যই ভয় নেই কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদের। ইতিমধ্যে ভাটের মুখে সুন্দরের খাঁটি পরিচয় পেয়ে গলায় কুঠার বেঁধে মশানে ছুটে এসেছেন রাজা ; দেখলেন অপূর্ব দৃশ্য—চারিদিকে ডাকিনী যোগিনীর ভয়াবহ নর্তন-কুর্দন, তার মাঝখানে ধ্যানস্থ সুন্দরের উর্ধ্বমুখ ফুটে আছে পদ্মের মতো। ব্যাপারটা অবশ্যই মিলনান্ত দাঁড়াল। শ্বশুর জামাইয়ের স্তব করেন, জামাইও প্রতিযোগিতা করে শ্বশুরের কৃপাপ্রার্থী। জামা-

তার অনুগ্রহে শ্বশুরের দেবী-দর্শন পর্যন্ত হয়ে গেল। বীরসিংহের কি 'সুন্দর' নিয়তি! এরই মধ্যে দেবী নিজের কাজ গুছিয়ে নিলেন—বিদ্যা-সুন্দর কাব্যে অসামাজিকতাকে প্রশ্রয় দেবার পুরস্কাররূপে নিজের পূজাপ্রচারের ব্যবস্থা হয়ে গেল। আমরা বুঝলাম, ইলেকশনে দাঁড়ালে মহাত্মাদেরও নীতি-দুর্নীতির প্রশ্নকে উহ্য রাখতে হয়। তবে আমাদের ভাগ্য, আমাদের দেবীরা হেলেনিক নন, খোলাখুলি হয়ে তাঁদের নেমে পড়তে হয় না বিউটি-কম্‌পিটিশনে, প্যারিস-রুচির সামনে !!

॥ ১ ॥

কবি না শিল্পী

সুন্দরকে বীরবিক্রমে মশানে পাঠাবার আগে তার শ্বশুর বীরসিংহ ঈষৎ লজ্জিত সৌন্দর্যবোধে বলেছিলেন, 'কাটিতে উচিত হয় কেমনে কাটিব, কলঙ্ক করিতে দূর কলঙ্ক করিব?' অধিকাংশ নীতিবাদী বাঙালি-সমালোচক সুন্দরের রূপ দেখে একইরকম মুগ্ধ লজ্জা বোধ করেছেন, তারপর চোখে হাতচাপা দিয়ে কাব্যটিকে মশানে পাঠাবার ব্যবস্থাও করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য অবশ্য সিদ্ধ হয় নি, যেহেতু মহাকাল সেখানে হাজির ছিলেন—মহাকালী হয়ে তিনি তাঁর সুন্দর-ছেলেটিকে কেবল বাঁচান নি, দীর্ঘ আয়ুও দিয়ে দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসুন্দর কাব্য তার সৌন্দর্যের জোরে বেঁচে আছে—এই হল প্রচলিত সিদ্ধান্ত। ভারতচন্দ্র কবি নন, কেবল শিল্পী। কবির থেকে শিল্পী অনেক ছোট কথা।

'কে কবি কবে কে মোরে?'

'কবি' হওয়া খুব কঠিন, অন্ততঃ মোহিতলালের মত মানতে হলে, যিনি রবীন্দ্রনাথকেও কবি-পদবী থেকে খারিজ করে 'চূড়ান্ত শিল্পী'—এই আখ্যায় শাসন করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যদি কবি না হন, বলাবাহুল্য ভারতচন্দ্র তা হতে পারেন না।

মোহিতলাল মজুমদারের দারুণ সাহস আমাদের নেই। আমরা মনে করি, রবীন্দ্রনাথ কবি, যেমন কবি কমই হয়েছেন, কবিজগতে তিনি যুগাবতার—ঠাকুর রবীন্দ্র। রবীন্দ্রনাথকে অব্যাহতি দেওয়া যাক। তিনি হিসাবের বাইরে থাকুন। কেবল এইটুকু হিসাব নিয়ে নিই—তাঁর মাপে ভারতচন্দ্র সত্যই কবি নন।

কথাটা আমার নয়—ভারতচন্দ্রের বড় ভক্ত, কৃষ্ণনগরে নাগরিকতা-প্রাপ্ত প্রমথ চৌধুরীর। প্রমথ চৌধুরীর ভারতচন্দ্র-আলোচনা প্রচুর উদ্ধৃত করেছি ইতিপূর্বে। সেখানে, রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা-প্রসঙ্গে তিনি বলে-

ছেন (আমরা আগে দেখেছি), ভারতচন্দ্রের আঙুল মেজরাপ-মণ্ডিত বলে সরস্বতীর বীণা-গুণকে সাক্ষাৎ স্পর্শ করতে পারে নি। তাঁর একথা থেকে এটুকু সিদ্ধান্ত করবার অধিকার আমার আছে—সরস্বতীর কোলের ছেলেরা, মানে 'কবিরা' (রবীন্দ্রনাথ যাঁদের একজন), খোলা আঙল বুলিয়ে উক্ত বীণার তারে সুর তোলেন।

প্রমথ চৌধুরী যে, বিদ্যাসুন্দরকে বিষয়ে এবং রচনায় চিত্রাঙ্গদার মতো 'সম্পূর্ণ রাগিণী' বিবেচনা করতেন না, তা তাঁর রচনার অন্য অংশ থেকেও দেখানো যায়। আগেই তা দেখিয়েছি। বিদ্যাসুন্দরে 'নলেজ' ও 'আর্ট'-এর সম্পূর্ণ মিলন হয় নি—তিনি বলেছেন। বলেছেন যে, উপযুক্ত পরিবেশ পেলে বিদ্যাসুন্দর ফরাসি মাস্টারপিস-তুল্য হতে পারত। তার মানে, উপযুক্ত পরিবেশ পায় নি এবং উক্তপ্রকার মাস্টারপিস হয় নি। বলেছেন, বিদ্যাসুন্দর খেলনা। রাজার ঘরের খেলনা হলেও খেলনা। বলেছেন, পরের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে সরস্বতীর বরপুত্র নট-বিটের দলভুক্ত হয়ে পড়েছেন। বিট মানে—কালচার্ড লম্পট। আর নট মানে অভিনেতা (কে না জানে!)—সাজঘর থেকে বেরিয়ে এসে যে নাচ গান করে রঙ্গমঞ্চে, পরের জন্য। আরও কঠিন কথা আছে তাঁর 'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধে (কার্তিক, ১৩২২) : "ভারতচন্দ্র মালিনীর বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেছেন যে—'আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে, এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।'—স্বয়ং ভারতচন্দ্রের কবিতার যদি ঠাট বাদ দেওয়া যায়, তাহলে যে গুঁড়া অবশিষ্ট থাকে, তাতে ফোঁটা দেওয়া চলে না, কেননা সে গুঁড়া চন্দনের নয়।"

প্রমথ চৌধুরী এর পরেও বলেছেন, 'অথচ ভারতচন্দ্র যে কবি, সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।'

অবশ্যই কবি—তবে রবীন্দ্রনাথের বর্ণের কবি নন। এখানে আমি ছোট-বড়র জাতিভেদের কথা আনছি না, গুণভেদে বর্ণভেদের কথাই বলছি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রের কাব্য-বিষয়ের আলোচনা বিশেষ করেন নি, তাঁর প্রশংসা রীতিগুণের জন্যই। ভারতচন্দ্রের কাব্যের চিন্তাবস্তুর বিষয়ে একবার বলেছিলেন, ঐ কাব্যে

সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি আছে ; আর একবার ভারত-চন্দ্রের কাব্যাংশ উদ্ধৃত করে (আগে উদ্ধৃত করেছি) বলতে চেয়েছিলেন, কোনো কবির কল্পনায় দেহ-দেহীর ভেদাভেদজ্ঞান মূর্ত হয়ে উঠলে সে-কবির কল্পনাকে শুধু দৈহিক বলা চলে না।

এইটুকু মাত্র। বাকি অংশে প্রমথ চৌধুরী তাঁর সমস্ত সমাদরের মধ্যেও তির্যক-দৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত তাঁর মনোভাব—ও-কাব্য পুষ্প হলেও 'বিষপুষ্প। একটি সনেটে তিনি নিজের মনের কথাটি খুলে বলেছিলেন: বিদ্যাসুন্দরের আলোক 'অশুভদর্শন কুহকী আলোক;···চিতাগ্নির শিখা' ; কাব্যলোকের উপরে তা 'রক্তসন্ধ্যা'র মৃত্যুচ্ছায়া বিস্তার করেছে।

প্রমথ চৌধুরী এতেও থামেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে সুন্দর এবং সুন্দরের স্রষ্টা দুজনই চোর-কবি—বাসনার রক্তপুষ্পের অঞ্জলি দিয়ে তাঁরা মশানেতে নায়িকা-সাধন করেছিলেন—যার ফলে :

'দিয়েছিল দেখা বিশ্ব বিদ্যারূপ ধরি,
কনকচম্পকদামে সর্বাঙ্গ আবরি,
স্বপ্নোত্থিতা, শিথিলাঙ্গী, বিলোলকবরী.
প্রমাদের রাশিসম অবিদ্যা-সুন্দরী।'[১]

এ কবিতায় প্রমথ চৌধুরী যদি সুচারু কথা ও অলঙ্কারের লোভে পড়ে না থাকেন, তাহলে অবশ্যই বলতে হবে, তাঁর মতে, 'অবিদ্যা-সুন্দরী'র স্রষ্টা ভারতচন্দ্র কবি হতে পারেন না কোনো মহৎ অর্থে। হতে পারেন, হাঁ, 'চোর-কবি !'

কলাকৈবল্যবাদী প্রমথ চৌধুরীর যখন এই মনোভাব (ভারত-চন্দ্রের সমর্থনে যিনি ত্যক্ত ব্যারিস্টারী-গাউন কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন), তখন কলার মধ্যে কলা অপেক্ষা কৈবল্যলাভে যাঁরা উদ্যোগী, তাঁদের মনোভাব কি হবে বোঝাই যায়।

ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার প্রসঙ্গটিকে একটু ভিন্নদৃষ্টিতে দেখলেও একই সিদ্ধান্তে আসতে হয়। সাহিত্য যদি সমগ্র মানবকে বা তার

১। 'চোর-কবি' ; সনেট পঞ্চাশৎ।

প্রতিনিধি-রূপকে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত আংশিকতাকে সে অবশ্যই সাহিত্যধর্মবিরোধী মনে করবে। সাহিত্যে দৈহিকতায় আপত্তি নেই, কারণ 'দেহপটে স্থাপিত সকলি', কিন্তু নিছক দৈহিকতায় অবশ্যই আপত্তি আছে, যেহেতু তার মধ্যে সমগ্র মানবের আমন্ত্রণ নেই। ভারতচন্দ্রকে আমরা যত সমর্থনের চেষ্টাই করিনা কেন, এ কথা অস্বীকার করা যাবে না, তাঁর অন্নপূর্ণামঙ্গল পড়বার পরে বিদ্যাসুন্দরেই মন আটকে যায়, এবং—বিদ্যাসুন্দর-কাব্য বিহারগামী গাড়িতে (নাকি কামরূপগামী ?) চড়ে বসে আছে।

নিজেদের রুচি ও বুদ্ধি অনুযায়ী ভারতচন্দ্রকে কবি-পদবী থেকে খারিজ করবার চেষ্টা নানা জনে করেছেন। 'মহাকবি' মধুসূদন 'কবি' নামক চতুর্দশপদীতে বলেছেন—কবির সঙ্গে কল্পনার নিত্যবিবাহ :

'সেই কবি মোর মতে, কল্পনাসুন্দরী
যার মনঃকমলেতে পাতেন আসন।'

এরও আগে মধুসূদন 'মধুকরী কল্পনাদেবী'র কথা বলেছিলেন মেঘনাদবধে। তারও আগে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে তিনি 'বিশ্ববিনোদিনী পদ্মাসনা বীণাপাণি'র কাছে 'কোথা সে, কোথা সে'—বলে স্বর্গ-মর্ত্যের বহু খবরাখবর নিয়েছেন। তারও আগে 'ক্যাপটিভ লেডী'র মধ্যে কল্পনার বহুত আবাহন করেছেন।

'কল্পনা' কথাটা বাড়িয়ে তুলছি কেন ? এইজন্য যে, এই 'কল্পনা'র দ্বারাই পুরাতন কাব্য ও নূতন কাব্য পৃথক। পুরাতন কাব্যের সেরা কবি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে নূতন কাব্যের তদানীন্তন সেরা কবি মধুসূদনের ব্যবধান এই কল্পনাই রচনা করেছে। কল্পনা ও কবির কেমন অঙ্গাঙ্গি ভালবাসা তা মধুসূদনের অনুগামী হেমচন্দ্র খুলে বলেছেন :

"ভারতের কল্পনার ন্যায় ইহার [মধুসূদনের] জন্মমৃত্যুস্থল রাজভবন ও বন্ধুবান্ধব দুই ক্ষুদ্রপ্রাণী নায়ক-নায়িকা নয়। স্বর্গ, মর্ত্য, দেব, নর, রক্ষ-মধ্যে যতকিছু বীর্যশালী আছে, সমস্তই মেঘনাদে লিপ্ত করা হইয়াছে বা লিপ্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।"

পুনশ্চ : "গুণীগণ যে-সমস্ত গুণকে কবিকৌলীন্যের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ

গণনা করেন, ভারতচন্দ্রের সে সকল গুণ অতি সামান্য ছিল। বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্র-রচিত সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য কিন্তু যাহাতে অন্তর্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহ্যেন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়, তাদৃশ ভাব তাহাতে কই? কল্পনারূপ সমুদ্রের উচ্ছ্বাসিত তরঙ্গবেগ কই, বিদ্যুৎছটাকৃতি বিশ্বোজ্জ্বল বর্ণনাছটা কোথায়? তাহার কবিতাস্রোতঃ কুঞ্জবনমধ্যস্থিত অপ্রশস্ত মৃদুগতি প্রবাহের ন্যায়; বেগ নাই, গভীরতা নাই, তরঙ্গগর্জন নাই; মৃদুস্বরে ধীরে-ধীরে গমন করিতেছে অথচ নয়ন ও শ্রবণ তৃপ্তিকর।"

বাংলাসাহিত্যের একজন 'খাঁটি মহাকবি'র এই রচনা। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল লণ্ডভণ্ডকরা কল্পনার বিস্ফোরণ ঘটানোর স্বপ্ন যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁদের অন্যতম হেমচন্দ্র, বলাবাহুল্য ভারতচন্দ্রের কাহিনীগত পুচ্ছগ্রাহিতাকে (তাঁর পুচ্ছমোচড়ের স্বাধীন বজ্জাতির কথা মনে রেখেও) যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতে পারেন না।

হেমচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের নাতিভক্ত। অতিভক্তেরা আবার কল্পনা-শক্তিতে মুকুন্দরামকে ভারতচন্দ্রের তুলনায় অধিক অগ্রসর দেখেছেন। এঁরা মুকুন্দরামের খোলা ভাণ্ডার থেকে ভারতচন্দ্রকে অপহরণ করতেও দেখেছেন। মুকুন্দরাম কোন্ ভাণ্ডার থেকে নিয়েছেন, তার খবর বহুলাংশে আজানা ছিল বলে এঁরা ধরে নিয়েছেন—কাহিনীরচনার গৌরব মুকুন্দরামেরই। যেমন রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন: "কবিকঙ্কণের ন্যায় ভারতচন্দ্রের যদি উদ্ভাবনীশক্তি থাকিত তাহা হইলে…ভারতচন্দ্র হইতেন—'গজদন্ত কনকে জড়িত'।" যেমন গঙ্গাচরণ সরকার: "…এইরূপ অন্নদামঙ্গলের প্রায় সমস্ত অঙ্গই [কবিকঙ্কণ] চণ্ডীর অনুকরণ।…ভারতচন্দ্রের সৃজনীশক্তি বিশেষ বলবতী ছিল না। তিনি স্বীয় কল্পনা হইতে কোনো নূতন সৃষ্টি উদ্ভাবন করিতে বিশেষ সক্ষম ছিলেন না।" যেমন গঙ্গাচরণের অনুগামী কৈলাসচন্দ্র ঘোষ: "ভারতচন্দ্র প্রায় সকল স্থলেই মুকুন্দরামের অনুকরণ করিয়াছেন।…গুণাকরের অন্যান্য নানা গুণ থাকিলেও কোনো নূতন বিষয় অবতারণা করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। অন্নদামঙ্গলে কোনো নূতন চরিত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভারতচন্দ্রের কল্পনাশক্তি কোনো নূতন মূর্তি উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। তাঁহার কল্পনা তত প্রখরা ছিল না।"

এইসব লেখকেরা 'উদ্ভাবনীশক্তি' বলতে সম্ভবতঃ নানা ধরনের বিপুল পরিমাণ উপাদানের ব্যবহার বুঝেছেন, এবং মুকুন্দরামের মতো তা না করার জন্য ভারতচন্দ্রকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। এ বিষয়ে দৃষ্টি-ভঙ্গি এখন কিছু বদলেছে। এখন আর মুকুন্দরাম-পদ্ধতিতে সামাজিক ইতিহাসের বস্তুবহনকে সাহিত্যের 'উদ্ভাবনীশক্তি' মনে করতে পারি না। পূর্বোক্ত সমালোচকেরা বোধহয় 'উৎপাদনীশক্তি' বলতে গিয়ে 'উদ্ভাবনীশক্তি' বলে ফেলেছিলেন।

কল্পনাশক্তি থেকে ভাবের কবিত্বের কথায় চলে আসতে পারি, যেখানেও নাকি ভারতচন্দ্র অভাবী মানুষ। দুইজন ভাববাদী লেখককে এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাক—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দীনেশচন্দ্র সেন। না, তার আগে ভারতচন্দ্রের আরও পুরনো বন্ধু রঙ্গলালের কথা শুনে নেওয়া যাক। হায়, রঙ্গলালও এখানে কিছু অমিত্র-ব্যবহার করেছেন। তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল, 'ভারতচন্দ্র কোনো মহাকবির ন্যায় উচ্চতর ভাবসকল প্রকাশ করিতে পারেন নাই।' এমন ভাবদীনতার জন্য অবশ্য তিনি কবিকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী না করে দেশের পরাধীন-তাকেই দায়ী করেছেন ('যে জাতি পরাধীনতা-শৃঙ্খলে চিরদিনের জন্য বদ্ধ....তাহারদিগের চিত্তবৃত্তিসকল গিরিগহ্বরস্থ হীরকের ন্যায় অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে')—কিন্তু ব্যাপারটাকে মেনেও নিয়েছেন।

রঙ্গলালের মত যদি এই হয়, তাহলে বলেন্দ্রনাথ স্বতঃই বলতে পারেন, 'প্রকৃতির অন্তরে ডুবিয়া তাহার আনন্দ উপভোগ করিবার কবি ভারতচন্দ্র নহেন।' 'বর্তমান কালের কবিদিগের মতো ভাবের সৌন্দর্য-জ্ঞান ভারতের ছিল না। বড়-বড় আদর্শ সৃষ্টি করিতেও তিনি অক্ষম।' 'বাস্তবিক ভারতচন্দ্র যে-পরিমাণে রঙ্গরসপ্রিয়, তেমন কবি নহেন।' 'কবিকঙ্কণের মধ্যে ভারত অপেক্ষা গাম্ভীর্য আছে। মুকুন্দরাম উন্নত চরিত্রচিত্রণে ভারত অপেক্ষা সমধিক দক্ষ।' 'তাঁহার ভাবের তেমন গভীরতা নাই, সেইজন্য গাম্ভীর্যের তাঁহার বিশেষ অভাব আছে।'

ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সত্যই বীরসিংহ। ভারতচন্দ্রকে তিনি শূল-শাস্তি দিতে চান, তা আগে দেখেছি। তাঁর কাছে ভারতচন্দ্র কদাপি কবি-পদবী পেতে পারেন না। চিত্রকর—হাঁ, যথেষ্ট কথা, উক্ত কবি-নামধেয় ব্যক্তির সম্বন্ধে :

"[ভারতচন্দ্রের কাব্যে] কোথাও ভাবের গুরুত্ব নাই, কোথাও কবি হৃদয় ছুঁইতে পারিতেছেন না। একখানি সুন্দর ছবি দেখিতে চক্ষুর যে তৃপ্তি, ভারতের কবিতাপাঠে সেইরূপ তৃপ্তিলাভ সম্ভব, কিন্তু চিত্রকর হইতে কবির উচ্চতর প্রশংসা প্রাপ্য। চিত্রকরের চিত্র কবির মন্ত্রপূত তুলির স্পর্শে প্রাণ পায়, ভারতচন্দ্রের তুলি প্রাণদান করিতে পারে নাই। তাঁহার কাব্যে কোনো স্থানেই হৃদয়ের ব্যাকুলতা নাই, হৃদয়ের মর্মস্পর্শী দুঃখের স্নিগ্ধ সুধাধারা তাঁহার কাব্যের কোনো অংশ পবিত্র করে নাই।"

কার হৃদয় কিসে কাঁদে, কেউ ঠিক করে বলতে পারে না। চোখের জল শুকিয়ে দেয়, এমন দুঃখও সম্ভব। সে যাই হোক, আলোচ্য প্রসঙ্গে অন্য অনেকের সঙ্গে দীনেশচন্দ্রের মূল অভিযোগ এইপ্রকার :

"আমরা ভারতচন্দ্রের কবিতা ভাবের গুরুত্ব হিসাবে বিশেষ শ্রদ্ধেয় বলিয়া মনে করি না। বিদ্যাসুন্দর সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি ; অপরাপর কাব্যেও কবি জীবনের কোনো গূঢ় সমস্যা, কি কঠোর পরীক্ষা উদ্‌ঘাটন করিয়া উন্নত চরিত্রবল দেখান নাই।"

এইবার আমাদের খোলাখুলি আপত্তি করতে হচ্ছে—দীনেশ সেন মোটেই ঠিক কথা বলেন নি। একটু জোর দিয়েই কথাগুলি বলছি, কারণ দীনেশচন্দ্রের এই কথাগুলির ধ্বনি-প্রতিধ্বনি অনেকের লেখাতেই মেলে। ভারতচন্দ্রের কবিমানসের বিস্তারিত আলোচনাকালে আগে যথেষ্ট বলেছি, দীনেশচন্দ্রের কথা কেন গ্রাহ্য নয়। তাছাড়া দীনেশচন্দ্র নিজেই নিজের কথার আংশিক প্রতিবাদ করেছেন, যখন ভারতচন্দ্রের কাব্যের ধর্মসমন্বয়ের কথা বলেছেন :

"এস্থলে বলা উচিত, ভারতচন্দ্র শৈব ও শাক্তের যে কলহ বর্ণনা করিয়াছেন, ও দাশরথি যাহার আভাস দিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের সময়ের

সামগ্রী নহে। তাঁহারা অতীত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা অঙ্কিত করিয়াছেন মাত্র। ভারতচন্দ্র উক্ত কলহ বর্ণনা করিতে যাইয়া নানা মতের সামঞ্জস্যের চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। তদ্দ্বারাই দৃষ্ট হয়, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায় সে সময় পরস্পরের বিরোধ ভুলিয়া সকলেই যে এক পথের পথিক, এই সত্য ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা ধর্মবিদ্বেষের সীমা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিল।"[২]

২। দীনেশচন্দ্রের কথাগুলি কি সম্পূর্ণ ঠিক ? ধর্ম সংঘর্ষ ভারতচন্দ্রের কালে ছিল না—কবি পুরাতন কালের ইতিকথাই মাত্র তাঁর কাব্যে বলেছেন ? পুরাতন কালে সংঘর্ষের কথা কেউ অস্বীকার করছে না, কিন্তু তাই বলে নিশ্চয় মেনে নেওয়া যায় না—ভারতচন্দ্রের কালে ধর্মসংঘর্ষ ছিল না। এবং একথাও গ্রাহ্য নয়, ভারতচন্দ্রের কালে জনসমাজ ধর্মসমন্বয়কে মেনে নিয়েছে এবং কবি সমকালীন ধারণার প্রতিধ্বনি মাত্র করেছেন। সংঘর্ষের বেলায় কবি পুরনো ইতিহাস বলেছেন, আর সমন্বয়ের বেলায় সমকালের সিদ্ধান্ত শুনিয়েছেন—বিচিত্র বটে! কবির মনস্বিতার গৌরবহ্রাসের সুন্দর কৌশল !! আমরা কিন্তু এটাই দেখতে পাই, ধর্মসংঘর্ষ যেমন পুরনো কালে ছিল, তেমনি ছিল ভারতচন্দ্রের কালেও, এবং ভারতচন্দ্র যে-সমন্বয়ের কথা বলেছেন, তার মোট কথাগুলো ভারতচন্দ্রের নতুন আবিষ্কার নয়—তার সূত্রও পুরনো কালেই আছে। বিদ্যাপতি কি ধর্মসমন্বয়ের কথা বলে যাননি ? বাসলী-সেবক চণ্ডীদাস কি বৈষ্ণবপদ লেখেন নি ? 'শিবের চরণে রত' দামিন্যার অধিবাসী মুকুন্দরামের কি বিষ্ণুভক্ত হতে অসুবিধা হয়েছিল, কিংবা বিষ্ণুভক্ত হবার পরে চণ্ডীকাব্য লেখার সময়ে কি তাঁর কলমে কালি কম এসেছিল ? সপ্তদশ শতাব্দীর রামকৃষ্ণের শিবায়নে কি ধর্মসমন্বয়কথা নেই ? কেতকাদাস কি মনসামঙ্গলের গোড়ায় চৈতন্যবন্দনা জুড়ে দেন নি ? এবং তা করবার সময়ে কি মনসাপূজকদের সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাসের কটূক্তি বিষাক্ত স্মৃতির আকারে মনে জাগিয়ে রেখেছিলেন ?

দৃষ্টান্ত স্বচ্ছন্দে বাড়ানো যায়। তার প্রয়োজন নহে। কেবল প্রশ্ন এই—ছিল তো সবই কিন্তু ঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল কি ? ভারতচন্দ্রের চিন্তাশক্তির পক্ষে বলা যাবে—তিনি উক্ত ধর্মসংঘর্ষকে জাতীয় জীবনের পরিচিত ঘটনামাত্র ধরে না নিয়ে বিপজ্জনক সমস্যা বলে ধরেছিলেন এবং তার সমাধানের পথনির্দেশও করেছেন।

ধর্মসমন্বয়ের মতো প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত যার কাব্যে রয়েছে, তিনি জীবনের সমস্যার কথা ভাবেন নি, একথা মেনে নেওয়া শক্ত।

ঠিক উল্টোদিকে বলতে পারি—মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে জীবনের গূঢ় সমস্যার প্রকাশ যদি কোথাও থাকে—ভারতচন্দ্রের কাব্যেই আছে। 'গূঢ়' কথাটার দিকে নজর দিতে বলি। মুকুন্দরামে ও-বস্তু নেই। মুকুন্দরামের স্পষ্ট সমস্যা—পেটে খিদে এবং পিঠে মার। অন্য মঙ্গলকাব্যেরও একই সমস্যা। কিছু ব্যতিক্রম মনসামঙ্গলে। সেখানে ধর্মকে অভ্যস্ত পারিবারিক বিশ্বাসের ব্যাপার না করে মূলগত প্রত্যয়ের আধার করা হয়েছে। চাঁদ সদাগরের ধর্ম ব্যক্তিধর্ম—সেজন্য বিশ্বাসের সংগ্রাম তিনি করতে পেরেছেন। তবু ঐ সংগ্রামের মধ্যে কোনো গূঢ়তা নেই—ও-বস্তু স্পষ্ট। কেবল চাঁদের অন্তিম পরিণতিতে জীবনের জটিলতার আভাস আছে। মনসার কাছে চাঁদের পরাজয় বিশ্বাসের ভিত্তিভঙ্গ নয়, সাংসারিকতার সঙ্গে আদর্শের অনিচ্ছুক আপস। মহৎ মানুষের জীবনে ত্যাগের শেষ নেই—সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ত্যাগ সামান্য কথা তাঁদের কাছে—স্নেহ প্রেম সহানুভূতির জন্য তাঁরা প্রাণের চেয়ে প্রিয় বিশ্বাসকেও অনেক সময়ে ত্যাগ করতে বাধ্য হন—ঐকালে নিজের পরাজয়কে বহনের লজ্জায় প্রতি মুহূর্তে আত্মগ্লানিতে সংকুচিত থাকেন। চাঁদের শেষ পরিণতিতে তার আভাস আছে, কিন্তু কবিরা তার উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারেন নি। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিশ্বাসের সংকট নেই, অথচ তা প্রত্যাশিত ছিল। এই নবধর্ম কত পুরাতন বিশ্বাসকে না টলিয়েছিল! কত উৎপীড়ন অত্যাচার—এই নবধর্মের জন্য! চিত্তসংকট কি ছিল না কবিদের মধ্যে, ধরা যাক গোবিন্দদাসের মধ্যে—যখন তিনি যথেষ্ট পরিণত বয়সে পূর্ব-বিশ্বাসকে ত্যাগ করে বৈষ্ণব হয়েছিলেন? রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীতে না হোক, তাঁর প্রার্থনার পদে তার পরিচয় থাকতে পারত, কিংবা তাঁর জীবনকথা যেসব গ্রন্থে বলা হয়েছে, সেখানে। কোথায়? আমরা ওসবের বদলে জানতে পারলাম—কবির গ্রহণী রোগ সারাবার ফি-হিসাবে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র গোবিন্দদাসের ভক্তি-অর্থ পেয়ে গেছেন!! বৈষ্ণব জীবনীগ্রন্থগুলি কেবল ভক্তিবিশ্বাসের কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে

উন্মত্ত। বিদ্যাপতির মধ্যে কিছু ব্যক্তিগত দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরিচয় মেলে। কিন্তু তিনি তো বাঙালি নন। সুতরাং জীবনের 'গূঢ় সমস্যা' যদি কোথাও থাকে—একমাত্র ভারতচন্দ্রেই—যিনি জীবনকে কোনো এক-দিক দিয়ে মাত্র দেখেন নি—জীবনের বহুমুখ সমস্যার চরিত্র বুঝে, বুদ্ধি ও অনুভূতির দিক দিয়ে তার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। এইরকম ব্যাপক মননশীলতা আর কোনো পুরনো বাঙালি-কবির ছিল না। দীনেশচন্দ্র যদি অন্য অনেকের সঙ্গে বলেন, এঁর জীবনের গূঢ় সমস্যার জ্ঞান ছিল না, তাহলে বুঝতে হবে, তিনি 'গূঢ় সমস্যা' কথাটিকে প্রচলিত অর্থে ব্যবহার না করে ব্যক্তিগত অভিরুচিমতো কোনো অর্থে ব্যবহার করেছেন।

তবু প্রশ্নটি থেকে যায়। না হয় ভারতচন্দ্রের কাব্য থেকে প্রমাণ করা গেল, জীবনসমস্যার বিষয়ে তিনি যথেষ্টই অবহিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর কাব্যে কি তার নিঃসংশয় প্রকাশ ঘটেছে, যার দ্বারা ঐ বিষয়ে সন্দেহাতীত ধারণায় উপনীত হয় পাঠকের মন ? তা অবশ্যই হয় নি—যদি হত, তাহলে তিনি 'যথার্থই কবি', একথা অস্বীকার করতেন না সমালোচকেরা। আমরা তা জানি। জানি যে, যে-কোনো অর্থে কবিরূপে স্বীকৃতি পাবার উপযোগী উপাদান নিজ কাব্যে যথেষ্ট পরিমাণে রেখেও সেগুলিকে নিশ্চিত প্রকাশের গৌরব তিনি দিতে পারেন নি। আর, সেজন্য আমাদের এত বেশি করে তাঁর অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য পরিশ্রম করতে হচ্ছে। আমরা স্বীকার করি—ভারতচন্দ্র মহৎ অর্থে কবি—যতখানি সম্ভাবনায়, ততখানি প্রকাশে নন।

॥ ২ ॥

কবির বিদ্যা ও বৈদগ্ধ্য

অন্য অনেক কবির মতো ভারতচন্দ্র জানতেন, প্রতিভাগুণে যদি তাঁর কাব্য বাঁচে তাহলে তাঁর নাম বাঁচবে, কারণ তা ভণিতায় গাঁথা আছে। কিন্তু পুরনো বাংলার আরো কিছু কবির মতো ভারতচন্দ্র সম্ভবতঃ আর একটু বেশি বাঁচতে চেয়েছিলেন—অন্ততঃ তিনি যে বিদ্যা-

জীবী, এ কথাটা পাঠক জানুক,এ অভিপ্রায় তাঁর ছিল। ভারতচন্দ্রের কালে কবিদের জীবনী লেখার চল হয় নি, সুতরাং নিজের বরণডালা নিজেকেই তাঁকে সাজাতে হয়েছিল, অন্য জনকয়েক মঙ্গলকবির মতো করে, কিন্তু ও-কাজটা করেছিলেন খুব সাবধানে, পাছে কেউ তাঁর বৈদগ্ধ্যে সন্দেহ করে বসে। কবিরূপে তিনি আত্মাভিমানী, কিন্তু কালচার্ড মানুষ-হিসাবে উক্ত অহং-এর উপরে মনোরম আবরণ টানতে জানেন। তপ্ত অহঙ্কারের উপরে শীতলপাটি বিছিয়ে তিনি হয়ত ভেবেছিলেন, আর যাই হোক, কৃত্তিবাসের মতো রূঢ় সত্যভাষী হতে পারি না,[৩]

৩। পুরনো বাংলাসাহিত্যে কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র, এই তিনজনের আত্মপরিচয় বিখ্যাত। এঁদের মধ্যে মুকুন্দরাম সত্যই নিজেকে অপসৃত করতে পারতেন—তাঁর আত্মশাসন অপূর্ব। সেকথা বলা চলে না বাংলার 'আদিকবি' কৃত্তিবাস সম্বন্ধে। কৃত্তিবাস, কবির মহার্ঘ্য অহঙ্কারে অলঙ্কৃত করেছেন তাঁর আত্ম-পরিচয়ের [illegible]গুলিকে। বলেছেন, যেখানে-সেখানে নয়, তাঁর জন্ম 'গ্রামরত্ন ফুলিয়ায়', যার 'দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা-তরঙ্গিণী', যার কথা 'জগতে বাখানি।' আমরা জেনেছি, কৃত্তিবাসের চৌদ্দপুরুষ লেখাপড়া করেছেন। তিনি অতি 'শুভ-ক্ষণে'ই 'গর্ভ হইতে ভূতলে' পড়েছিলেন। লেখাপড়ার জন্য তিনি দূর গ্রামান্তরে যান, সেখানে এমন এক গুরুলাভ করেন যিনি ব্যাস বশিষ্ঠ বাল্মীকি চ্যবনের অবতারবিশেষ। এহেন গুরুর কাছে এমন শিখলেন যে, কৃত্তিবাস না বলে পারেন নি—'করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।' উক্ত উদ্ধারকৃত বিদ্যাঅস্ত্র যেখানেই ঘুরিয়ে-ছেন, সেখানেই জয়ী, হবেনই, 'সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে, নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হইতে স্ফুরে।' এক্ষেত্রে রাজপণ্ডিত হবার আশা করা এমন বড় আশা কি? উক্ত আশাহেতু তিনি গৌড়েশ্বরের প্রাসাদদ্বারে হাজির হয়ে অগ্রিম পাঁচ শ্লোক পাঠিয়ে দিলেন দ্বারীর হাত দিয়ে। রাজা তখন পাত্র-মিত্রসহ উঠোনে মাদুর পেতে বসে মাঘ মাসের রোদ পোহাচ্ছিলেন (পিঠে খাচ্ছিলেন না)—পূর্বের পঞ্চশ্লোকে তিনি উত্তপ্ত হয়েছেন, এখন কৃত্তিবাস তাঁর মাত্র চারহাত দূরে দাঁড়িয়ে আরও সাত শ্লোক শুনিয়ে দিলেন। কে শোনালেন? নাতি-বিনয়ে কৃত্তিবাস বলেছেন, 'পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে, সরস্বতী-প্রসাদে শ্লোক মুখ হইতে স্ফুরে।' শ্লোকাহত রাজা স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন—তাতে আরও উৎসাহিত কবি নানামতে নানা 'রসাল শ্লোক' বর্ষণ করে যেতে লাগলেন। তার-পর কী হল? রবীন্দ্রনাথ সেকথা লিখেছেন তার পুরস্কার কবিতায়। কৃত্তিবাসের

বিজয় গুপ্তের মতো ভাল্গার হওয়াও সম্ভব নয়,[৪] বা মুকুন্দরামের মতো 'সবার পিছে, সবার নীচে' হয়ে লুটিয়েও পড়তে পারব না।' ভারতচন্দ্র জানতেন, তাঁর হল শালীনতায় সংবৃত অহঙ্কৃত ভাষণ।

আত্মবিবরণী পাঠ করার আগেই তিনি তা লিখেছেন, কারণ রবীন্দ্রনাথের উক্ত কবিতা লেখার কয়েক বৎসর পরে তবে দীনেশচন্দ্র সেন ১৮৯৬ খ্রীঃ কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী প্রথম প্রকাশ করেন। অথচ রবীন্দ্রনাথের 'কবি' এবং কৃত্তিবাসের 'আমি' কি গভীরভাবে এক! আত্মবোধে তাঁরা এক। তফাত—কৃত্তিবাসের প্রখর আত্মসচেতনতা, আর রবীন্দ্রনাথের বিহ্বল আত্মবিস্মৃতি। পুরস্কার কবিতার রাজা ও কবি-সংবাদ সম্বন্ধে পাঠক অবহিত—এখানে কৃত্তিবাসের বিবরণীটি শোনা যাক, পাঠক মিলিয়ে নেবেন।

কৃত্তিবাসের শ্লোকপাঠ শেষ হলে 'খুশি হইয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমাল'; 'দিল পাটের পাছড়া।' কেদার খাঁ নামক রাজপার্ষদ কবিশিরে 'চন্দনের ছড়া'ও দিয়েছিলেন। রাজাকে খুশি দেখে তাঁর পাত্র-মিত্র সবাই কবিকে বললেন: হে দ্বিজরাজ, তোমার যা ইচ্ছা তাই মহারাজের কাছ থেকে চেয়ে নাও। এতক্ষণ কবি ছিলেন প্রার্থী, কিন্তু যে-মুহূর্তে বুঝলেন, তিনি স্বীকৃত, তিনি কবি—সে মুহূর্তে তাঁর ভূমিকা বদলে গেল—তিনি এখন দাতা—সেই বস্তু দেবেন, পৃথিবীর সমস্ত ধনরত্ন দিয়েও যাকে কেনা যায় না। মহৎ অহঙ্কারে কবি বললেন, 'কারো কিছু নাই লই, করি পরিহার; যথা যাই তথায় গৌরবমাত্র সার।' আরও বললেন, 'যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে, আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে।' সন্তুষ্ট রাজা কবিকে রামায়ণ রচনা করতে অনুরোধ করলেন। ভাষায় রামায়ণ রচনা!—অন্য গ্রন্থ নয়, যে রামায়ণ 'দেবের সৃজিত!' রাজা স্বীকার করেছেন, যে, রামায়ণকে 'লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত।' কৃত্তিবাস উক্ত স্বীকৃতির আনন্দকে পাবার আনন্দে রাজার কাছে বস্তুগত কিছু প্রার্থনা না করে বেরিয়ে পড়লেন, পথ হাঁটলেন, না, পথে ভাসতে-ভাসতে চললেন। নিজেই বলেছেন—'অপূর্ব জ্ঞানে লোক ধায় আমা দেখিবারে।' আহ্লাদিত অবিনয়ের সঙ্গে পুনশ্চ রিপোর্ট করেছেন: 'সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত।' 'মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি, পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী।'

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী আমাদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়—কবিরা কেন লক্ষ্মীছাড়া।

৪। বিজয় গুপ্ত তাঁর পূর্ববর্তী কবি কানা হরিদত্ত সম্বন্ধে কিছু মধুবাক্য শুনিয়ে-

নিজের বিদ্যা সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র কী বলেছেন, একটু সন্ধান করা যাক। মানসিংহের মধ্যে কবি স্বয়ং অন্নদাকে দিয়ে নিজের জীবনী বলিয়ে নিয়েছেন। বাড়তি কিছু প্রতিশ্রুতি আদায়ও করেছিলেন। দেবী বললেন :

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক ॥
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারসী।
দয়া করি দিব দিব্যজ্ঞানের আরশী ॥
জ্ঞানবান হবে সেই আমার কৃপায়।
এই গীত রচিবারে স্বপ্ন কব তায় ॥
কৃষ্ণচন্দ্র আমার আজ্ঞার অনুসারে।
রায়গুণাকর নাম দিবেক তাহারে ॥[৫]

ছেন : 'মূর্খে রচিল গীত, না জানে মাহাত্ম্য ; প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।' হরিদত্ত প্রমুখের আরও সমালোচনা করেছেন : 'কথার সঙ্গতি নাই, নাহিক সুস্বর, এক গাইতে আর গায়, নাহি মিত্রাক্ষর।' এমন চড়া কথা বলার পরে, বিজয়গুপ্ত বুঝেছিলেন, তাঁর নিজের কাব্য 'বেতাল' হলেই মাথায় চাঁটি পড়বে। অথচ হায়, বিজয় গুপ্তের কাব্যে তাল-বেতাল যমজ ভাই। তা জেনে তিনি কিছু বিনয় প্রকাশ করলেন, 'গীতের যতেক দোষ ক্ষমিবা আমার' ; সেইসঙ্গে বাংলা কাব্য-ছন্দকে গাল দিতেও ছাড়লেন না—'স্বভাবে পাঁচালী গীত নানা দোষময়।' এবং তারপর পণ্ডিতদের পিঠ চাপড়ে কাজ গুছোতে চাইলেন—'না লয় গীতের দোষ পণ্ডিত যেবা হয়।' কিন্তু এমন পিঠ চুলকানিতেও যদি কোনো পণ্ডিত যথেষ্ট আরাম না পান, তাঁদের জন্য বিজয় গুপ্ত প্রথমতঃ শুনিয়ে দিলেন তাঁর প্রতি মনসার সমর্থনের কথা—[মনসা বললেন]—'মনে কিছু না ভাবিও মুই দিলাম বর, না বুঝিয়া বল যদি হবে মিত্রাক্ষর।' তারপর শোনালেন মনসার শাসানি—'অহঙ্কারে মোর গীত করে উপহাস, মোর কোপে হবে তার সবংশে বিনাশ।' বিজয় গুপ্ত জানতেন—শেষোক্ত দাওয়াইয়ে সব রোগ ঠাণ্ডা—পণ্ডিতদেরও ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করতে হয়।

৫। চতুর কবির হাতে পড়ে কৃষ্ণচন্দ্রের উপভোগ্য অবস্থা। ভারতচন্দ্রকে তিনি রায়গুণাকর উপাধি দিতে এখন বাধ্য, না দিলে তাঁর দেবীদর্শন মিথ্যা হয়ে যায় !! দেবীভক্ত কৃষ্ণচন্দ্র পাবলিকের কাছে সে ঝুঁকি নিতে পারেন না।

কবির দীর্ঘ জ্ঞানসাধনার কথা অনেকবার বলেছি। উপরে কথিত বহুমুখ পাণ্ডিত্য যে তাঁতে অসম্ভব নয়, কাব্যমধ্যেও তার ভূরি-ভূরি প্রমাণ রয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন পর্যন্ত ভারতচন্দ্রকে পাণ্ডিত্যের শিরোপা না দিয়ে পারেন নি।[৬] সুতরাং ভারতচন্দ্রের চণ্ডী নাটকে সূত্রধারমুখে কথিত এই প্রগাঢ় কবিপরিচয় কে অস্বীকার করবে?—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো নৃপঃ ভূপস্তাস্য সভাসদো বিমলধীঃ শ্রীভারতো ব্রাহ্মণঃ, ভূরিশ্রেষ্ঠপুরে পুরন্দরসমো যত্তাত আসীন্নৃপঃ। রাজ্যোদ্‌ভ্রষ্ট ইহাগতস্য নৃপতেঃ পার্শ্বে বভূবাশ্রিতঃ, মূলাযোড়পুরং দদৌ য নৃপতির্বাসায় গঙ্গা-

---

৬। দীনেশচন্দ্র লিখেছেন : "সংস্কৃত কাব্য ও দর্শন যিনি ভালরূপ না পড়িয়াছেন, তিনি ভারতচন্দ্রের কাব্য আলোচনাকালে দিগ্‌দর্শনীহারা হইয়া কোন্ কবির নিকট ভারতচন্দ্রের কতটা ঋণ, তাহা বুঝিতে পারিবেন না। ভারতচন্দ্রের সময় পণ্ডিতগণ ন্যায়-দর্শনের বঙ্গানুবাদ করিয়া রাজসভায় যশ অর্জন করিতেন, বিদ্যা ও সুন্দরের তর্কে সেই সময়ে অধীত গ্রন্থগুলির প্রতি নির্দেশ রহিয়াছে। 'আত্ম-তত্ত্বে পূর্বপক্ষ সুন্দর করিল' পদের 'আত্মতত্ত্ব'…শব্দটির আড়ালে 'আত্মতত্ত্ববিবেক' নামক বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থের প্রতি নির্দেশ আছে। [সুন্দর ও বিদ্যার তর্কের আরও খানিক অংশ উদ্ধৃত করার পরে—] এই সকল অংশে কবি অতি অল্প কথায় বেদান্তের মত, ন্যায়শাস্ত্র, মীমাংসা, বৈশেষিক দর্শন এবং পাতঞ্জলের মত সম্বন্ধে দুই-একটি কথায় যে-ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা ষড়দর্শনের মর্মজ্ঞ ভিন্ন অপর কেহ সম্যক উপভোগ করিতে পারিবেন না। শেষের দুইটি ছত্র ('অন্য শাস্ত্র যে-সব, সেসব কাঁটাবন, তত্ত্বস্তু বাদরায়ণে প্রমাণ লিখন') উদয়নাচার্যের 'ইদন্তু কণ্টকা-বরণং তত্ত্বন্তু বাদরায়ণাৎ' শ্লোকটির অনুবাদ মাত্র। সুন্দর ধৃত হইলে রাজসভায় তাঁহার পরিচয়প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত দুইটি চরণ দৃষ্ট হয়—'এইরূপে পরিচয় যে কেহ জিজ্ঞাসে, বাকছলে সুন্দর উড়ায় উপহাসে।' এই কবিতায় ন্যায়দর্শনের 'বাকচ্ছল, সামান্যচ্ছল ও উপচারচ্ছল, এই ত্রিবিধ ছলের একটির প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।"

অসিতকুমার ভারতচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের তারিফ করে লিখেছেন : "ইচ্ছা করিলে তিনি একজন ভট্টাচার্য হইয়া টোল খুলিয়া বসিতে পারিতেন, অথবা মুর্শিদাবাদে নবাবসরকারের গিয়া কানে কলম গুঁজিয়া হিসাবনিকাশ লইয়া ব্যস্ত হইতেও পারিতেন। কিন্তু বাংলাসাহিত্যের সৌভাগ্য যে, তিনি সরস্বতীর সাধনার পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন।"

তটে। তস্মৈ ভারতচন্দ্ররায়কবয়ে কাব্যাম্বুরাশীন্দবে, ভাষাশ্লোককবিত্ব-গীতমিলিতং যত্নেন সদ্‌বর্ণিতম্‌।

বিপুল পাণ্ডিত্যসহায়ে ভারতচন্দ্র কিন্তু পণ্ডিত হতে চান নি—কবি হতে চেয়েছিলেন। কাব্যে সেইটুকু মাত্র পাণ্ডিত্যের সজ্জা তিনি দিয়েছেন, যেটুকু 'দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত'-প্রিয়দের মুখ বন্ধ করার প্রয়োজনে লাগে। আসলে তিনি 'ভাষাশ্লোককবিত্বগীত' মিলিত করার কবিসাধক।

কবি তাঁর কাব্যমধ্যে বারবার অন্নপূর্ণার স্বপ্নাদেশের কথা বলেছেন। মঙ্গলকবিদের প্রায় সকলেরই স্বপ্নদর্শন করা অভ্যাস ছিল, তা নিয়ে সঙ্গত কৌতুকবোধ করেছেন পরবর্তীকালে অনেকেই[৭], এবং একথা

৭। মঙ্গলকবিদের স্বপ্নদোষের চিকিৎসা যাঁরা করতে চেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দীনেশচন্দ্রের লেখাই সবচেয়ে উপভোগ্য। সাহিত্যের ঐতিহাসিক হয়েও দীনেশচন্দ্র যে, সাহিত্যিক ছিলেন, তা বারবার দেখা গেছে তাঁর ইতিহাস-গ্রন্থের পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায়। সেজন্য তাঁর লেখা উদ্ধৃত না করে উপায় নেই। তা আবার করা যাক:

"প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত লেখক না হইলে কেহ শুধু প্রতিভা, কি মনস্বিতার বলে দাঁড়াইতে পারিতেন না। এইজন্য প্রাচীন বঙ্গীয় লেখকগণের অনেককেই প্রত্যাদেশের ভান করিয়া কাব্য লিখিতে হইত। দেবাদেশে কাব্যরচনায় হাত দিয়াছেন, একথা ঘোষণা করা সাহিত্যের ব্যবসাদারী ছিল।…কৃত্তিবাস লিখিয়াছিলেন—'কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে';—তাঁহার সঙ্গে দল বাঁধিয়া বহুসংখ্যক লেখক 'স্বপ্ন', কি 'বরে'র দোহাই দিয়া কাব্যের মুণ্ডপাত আরম্ভ করিয়াছেন। [মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত, সঞ্জয়, মুকুন্দরামের স্বপ্নদর্শনকথা উদ্ধৃত। তারপর—] কবি কৃষ্ণরাম স্বপ্নে ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণের রায়ের মারফৎ যে আদেশ পাইয়াছিলেন… [তাহা] শুনিলে পাঠকের সর্বাঙ্গ শিহরিত, ও বাধ্য হইয়া কাব্যখানিকে ভাল বলিতে হয়। স্বপ্নে কবির নিকট আদেশ এই—'তোমার কবিতা যার মনে নাহি লাগে, সবংশে তাহারে তবে সংহারিবে বাঘে।' কিন্তু এই স্বপ্নময় কবিতাকাননে ভারতচন্দ্রের স্থান সকলের উপরে। [মজুমদারের নিকট দেবীর ভবিষ্যৎবাণী উদ্ধৃত।] দেবীর অপার লীলাগুণে কাব্যের উৎপত্তি, বিকাশ ও গায়েন কর্তৃক কীর্তন—সমস্তই স্বপ্ননিয়ন্ত্রিত।

ঠিক, বিনামূল্যের স্বপ্নাদ্য মাদুলি ধারণ করতে চেয়েছেন অনেক মন্দ-স্বাস্থ্য কবি ; কিন্তু এও দেখা যাবে, বড় কবিরাও ও-বস্তু লাভ করে ফেলেন, তবে মাঝে-মাঝে দেবীর নাম বদলে করে দেন—কল্পনাদেবী, কিংবা জীবনদেবতা।

ভারতচন্দ্র তাঁর স্বপ্নাদেশের কথা অনেকবারই বলেছেন :

স্বপনে রজনী-শেষে বসিয়া শিয়রদেশে
কহিলা মঙ্গল রচিবারে।

পুনশ্চ : [কৃষ্ণচন্দ্রকে দেবী বললেন—]

সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়॥
তুমি তারে রায়গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও॥
আমি তারে স্বপ্ন কব তার মাতৃবেশে।

পুনশ্চ : অন্নপূর্ণা ভারতেরে রজনীর শেষে।
স্বপনে কহিলা মাতা তার মাতৃবেশে॥

"পূর্বোক্ত কবিগণের মধ্যে হয়ত কেহ প্রকৃতই স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু তস্করের দলে পড়িয়া সত্যভাষী সারসপক্ষীটিকেও যেহেতু কুসঙ্গহেতু শাস্তি পাইতে হইয়াছিল, ইহাদের মধ্যে সত্যবাদী কবির উপরও সেরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে।"

ছুয়ো মঙ্গলকবিদের উপরে গঞ্জনার ঝুড়ি উপুড় করে দেবার পরে দীনেশচন্দ্র সুয়ো বৈষ্ণবকবিদের জন্য প্রশংসার বাজনা বাজিয়েছেন, যেহেতু বৈষ্ণবকবিরা চৈতন্য নিত্যানন্দের কিংবা নিজ-নিজ গুরুর দোর ধরেছিলেন।—"বৈষ্ণবগণ প্রাচীন সংস্কারগুলি দলন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিভা সত্যের সরল পথ আবিষ্কার করিয়া স্বাধীনতার মুক্তরাজ্যে বিহার করিয়াছিল।…প্রত্যাদেশে ; গিল্‌টি তাঁহারা দেখান নাই।…[তাঁহাদের] সরল ও বিনয়নম্র কথাগুলি পুষ্পমালার ন্যায় আপনিই সুরভিময়।"

বৈষ্ণবগণ সর্বত্র এমন বিনয়সুরভি ছড়িয়েছেন কিনা সে বিষয়ে দীনেশচন্দ্রেরই সন্দেহ আছে। কেন না, তিনি দেখেছেন, বৃন্দাবনদাসের পদাবলী অবৈষ্ণবদের মাথার মৃদঙ্গে 'তেরে কেটে তাক্' করতে চাইত, এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্ট অনুসন্ধিৎসা কেবলই দেখত—অরসজ্ঞ জ্ঞানী-কাকেরা জ্ঞান-নিম্বফল চুষেই চলেছে।

আরে বাছা ভারত শুনহ মোর বাণী।
তোমার জননী আমি অন্নদা ভবানী॥
কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমারে।
মোর ইচ্ছা গীতে তুমি তোষহ আমারে॥
ভারত কহিলা আমি নাহি জানি গীত।
কেমনে রচিব গীত একি বিপরীত॥
অন্নদা কহিল বাছা না করিহ ভয়।
আমার কৃপায় বলে বোবা কথা কয়॥
গ্রন্থ আরম্ভিয়া মোর কৃপা সাক্ষী পাবে।
যে কবে সে হবে গীত আনন্দে শিখাবে॥
এত বলি অমৃতান্ন মুখে তুলি দিলা।
সেই বলে এই গীত ভারত রচিলা॥

ভারতচন্দ্র নিজ কাব্যের শ্রেষ্ঠ আলোচনা নিজেই করে গেছেন অতি স্নিগ্ধ সঙ্গীতময় ভাষায়—শেষ তিন ছত্রে তার নিদর্শন আছে—বিশেষতঃ ঐ লাইনটি—'যে কবে সে হবে গীত আনন্দে শিখাবে।'

যে-দেবী ভারতের মুখে 'অমৃতান্ন' তুলে দিয়েছিলেন, তিনি কি কেবল অন্নদা, ভিন্ন নামে সরস্বতী নন—অভেদবাদী ভারতচন্দ্রের কাছে? ভারতচন্দ্রের সরস্বতীবন্দনা বিশেষভাবে কেউ লক্ষ্য করেন নি, সেটাই আশ্চর্য। এই দেবী 'বাগীশ্বরী বাক্যবিনোদিনী,' ইনি 'নৃত্যগীত-বাদ্যের ঈশ্বরী'—এঁকে ব্যাস-বাল্মীকি-আদি কবিরা অবিরত সেবা করেন, কবির কাছে ইনি মহামায়া, কেননা ইনি-ভিন্ন কবি তাঁর সৃষ্টি-কার্যে সমর্থ নন, ইনিই—এই ভারতীই—ভারতের ভরসা।—

ছত্রিশ রাগিণী মেলে ছয় রাগ সদা খেলে
অনুরাগ সে সব রাগিণী।
সপ্ত-স্বর তিন গ্রাম মূর্চ্ছনা একুশ নাম
শ্রুতিকলা সতত সঙ্গিনী॥
তান মান বাদ্য তাল নৃত্য-গীত ক্রিয়া কাল
তোমা হইতে সকল নির্ণয়।

যে আছে ভুবন তিনে তোমার করুণা বিনে
কাহার শকতি কথা কয় ॥
তুমি নাহি চাহ যারে সবে মূঢ় বলে তারে
ধিক্ ধিক্ তাহার জীবন।
তোমার করুণা যারে সবে ধন্য বলে তারে
গুণিগণে তাহার গণন ॥

এই দেবীকে হৃদয়ে ধরে কবি যে-গান রচনা করতে চেয়েছেন (সমালোচকেরা কবির মৌলিকতার অভাব সম্বন্ধে যাই বলুন) তা হল —'নূতন মঙ্গল গান।' 'নূতন মঙ্গল' কথাটা কবি কয়েকবারই বলেছেন।[৮] কবি কেন ঐ কথাটা বলেছেন—আত্মতোষণে? কিংবা মঙ্গল-কাব্য-জগতে এই হল প্রথম অন্নদামঙ্গল—এই জন্য? ক্ষুদ্র আকারে ঐ দুটি কারণই সত্য কিন্তু বৃহৎভাবে সত্য আর একটি কথা—ভারতচন্দ্র জানতেন, তিনি সত্যই নূতন লিখছেন—বিষয়ে নয়, চরিত্রে। তাঁর কাব্যের সুর তাঁর নিজের। এইখানেই তিনি একা, একান্ত, নির্জনে স্বসঙ্গ। তিনি জানতেন—হাসি জীবনের একটা গভীর জিনিস; তাই তাঁর সরস ভাষ উচ্ছলিত প্রাণরসেরই সুখসঙ্গীত—ঐ সঙ্গীতের দেবতা ও দেবীর জন্য তাঁর আরতি-কাব্য এই :

জয় জয় রাধা শ্যাম নিত্য নব রসধাম
নিরুপম নায়িকা নায়ক।
সর্ব সুলক্ষণধারী সর্বরস বশকারী
সর্বপ্রতি প্রণয়কারক ॥

৮। যথা—'ভারত ও-পদ আশে নূতন মঙ্গল ভাষে।' 'দয়া কর মহামায়া, দেহ মোরে পদচ্ছায়া, পূর্ণ কর নূতন মঙ্গল।' 'নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে।' 'সেই আজ্ঞা শিরে বহি নূতন মঙ্গল কহি।'

এই নূতন মঙ্গলের রূপ সম্বন্ধে কবি বলেছেন : 'অন্নদামঙ্গল কহে নবরসতর।' 'সরস ভাষ' বলতে কবি কেবল রসপূর্ণ ভাষাই বোঝেন নি, হাস্যরসপূর্ণ ভাষাও বুঝেছিলেন : 'রাধাকৃষ্ণের রাস হাস্যপরিহাস, ভারত উল্লাস অন্তরে'; 'ভারত-ভাষায় সকলে হাসায়।' কবি একাধিকবার বলেছেন—'ভারত সরস ভণে।'

বীণাবেণু যন্ত্রগানে রাগরাগিণীর তানে
বৃন্দাবনে নাটিকা নাটক।
গোপ গোপীগণ সঙ্গে সদা রাস রসরঙ্গে
ভারতের ভক্তিপ্রদায়ক ॥

ভারতচন্দ্র সুর ধরে নিলেন। বাংলায় 'মধুর কোমল কান্ত' কাব্যের এই রচয়িতা বললেন :

ভারতের রচিতের অমৃতের সার।
ভাষাগীত সুললিত অতুলিত সার ॥

পুনশ্চ বললেন :

ললিত সুচ্ছন্দে পরম আনন্দে
রায়গুণাকর গায়।

রসমঞ্জরীর রসকে 'ভাষায় বশ' করতে যিনি পারেন, তিনি গাইতে থাকেন 'ভারতমানস, মানসসরস, রাসবিনোদ-বিনোদিনী'দের গান— 'মাজিয়া বীণার তার, মিশাইয়া তান।' মুগ্ধ হয়ে দেখেন তাঁর রসের দেবতার নানা রূপ, নানা রঙ্গ :

কখন নাটক, কখন চেটক,
কখন ঘটক, কখন পাঠক,
কখন গায়ক, কখন গণক,
ভারতের মনোহর রে ॥

অমন দেবতার সামনে কখনো পাণ্ডিত্যের অভিমান রাখা যায়? সুতরাং কবি ফুলের কবিতা লিখেই চলেন (সেজন্য মত্তহস্তীদের চরণ-তলে বিমর্দিতও হন) :

ভারত রচিল ফুল-কবিতা,
কবিতারসের শালিকা।

ব্রাহ্মণ-কবি তিনি, তবু নাচতে থাকেন সকলের সঙ্গে রসের মহা-প্রসাদ মুখে নিয়ে, সাহিত্যের জয়জগন্নাথ-ক্ষেত্রে :

ভাঁড় কলাবত নাচত গায়ত
ভারত অভিমত গীত সুধারা।

এবং এসে দাঁড়ান সেইখানে যেখানে—

হোলীয়ং সমুপাগতা গতবতী ক্রীড়াকথা মাদৃশাং
দূরে ভূপতিরুন্মনাঃ পুরজনো দুর্গায়না গায়নাঃ।
বেশ্যা বাদ্যকরা মুখার্পিতকরা নিষ্ফল্ গুরাঃ ফাল্গুনো
নো জানে ভবিতা কিমত্র নগরে ভণ্ডোঽপি ভণ্ডায়তে ॥

মধুকর মধুপানে কান্তাসহ নানা গানে
নারীগণ পথপানে দেখিতেছে নয়নে ॥
আইল হোলির কাল ভগবতী কথাজাল
পুরজন আহ্লাদেতে গাইতেছে গান হে।
বেশ্যা বাদ্যকর যত ফল্গুতে ফাল্গুনে রত
ভাঁড়ামি করিতেছে ভাঁড় ছাড়িতেছে তান হে ॥

[অনুবাদ, বসুমতী সংস্করণের]

ভারতচন্দ্রের বিষয়ে শেষপর্যন্ত দুটি কথাই সত্য—তিনি পণ্ডিত এবং তিনি কবি। এখানে প্রশ্ন—পাণ্ডিত্য তাঁর কাব্যের সহায়ক না ক্ষতিকারক ? এবং প্রশ্ন—তিনি কোন জাতীয় কবি—বুদ্ধিমার্গীয় না ভাবমার্গীয় ?

ভারতচন্দ্রের পাণ্ডিত্য কাব্যকে সাধারণভাবে ভারগ্রস্ত করে নি, যেহেতু তিনি প্রথমাবধি কাব্যের প্রসাদগুণ ও রসালতা রক্ষা করার প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। মঙ্গলকাব্যের দায় বয়েও তিনি কাব্যকে সামাজিক সংবাদেব গুদোমঘর করে তোলেন নি। কিংবা ঠিকভাবে বলতে গেলে, উক্ত গোলদারি ভূমিকা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন. যদিও সম্পূর্ণ সকল হন নি মানসিংহে, যেখানে তাঁর চিত্তস্ফূর্তি বহুলাংশে স্তিমিত, এবং তাঁর ক্লান্তির সুযোগে কতকগুলি ধর্মীয় ভূগোলকথা (মানে তীর্থবন্দনাদি) সাহিত্যের শ্রেণীতে ঢুকে পড়বার চেষ্টা কবেছে। অন্নদামঙ্গলে ও-জিনিস ঘটতে পারে নি। সেখানে কবি কিভাবে পুরাণের মধ্যে নিত্যরস আবিষ্কার করেছেন, এমনকি নবপুরাণসৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়েছেন, তা আগে দেখিয়েছি।

পাণ্ডিত্য অপরপক্ষে ভারতচন্দ্রকে একটি মহৎ গুণ অর্জনে সাহায্য করেছিল—বহুপঠনে তিনি বিদগ্ধ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। বিদ্যা

মানেই বৈদগ্ধ্য নয়, কিন্তু বিদ্যা বাদ দিয়েও বৈদগ্ধ্য নয়। ভারতচন্দ্রের বৈদগ্ধ্যের মূলে তাঁর বিপুল বিদ্যা নিঃসন্দেহে। সংস্কৃত কাব্যের (ফার্সী-কাব্যেরও) বিস্তারিত ভূমিতে তিনি বিচরণ করেছিলেন, তার ফলে নিজ সাহিত্যে ছন্দ, অলঙ্কার, বাগ্‌রীতির অসাধারণ ঐশ্বর্য আনতে পেরেছিলেন, যার বিষয়ে অল্পাধিক উল্লেখ পরে করব। ভারতচন্দ্রের সুন্দর যে, ভারতচন্দ্রের বিদ্যার জন্মজন্মান্তরের স্বামী—এ কথা কতবার বলতে হবে?

এখানে কবি-হিসাবে ভারতচন্দ্রের কতকগুলি মানসিক দ্বিধার কথা আমরা যেন অনুভব করি। কিছু দ্বিধার কথা আগেই বলেছি—তিনি মঙ্গলকাব্যের কবি, কিন্তু কোন্ মঙ্গলকাব্য—ধর্মমঙ্গল? কামমঙ্গল? কাঞ্চনমঙ্গল? তিনি কি বিশ্বাসের কবি হবেন, না অবিশ্বাসের? তথ্য-নিষ্ঠ কাব্য লিখবেন, না রোমান্টিক কাব্য? এসব প্রসঙ্গ অনেক করেছি। কাব্যচরিত্রগত আর একটি দ্বিধার উল্লেখ করতে পারি, যে-বিষয়টি ভারতচন্দ্রের আলোচনায় বিশেষ ওঠে নি। তিনি অবশ্যই কবি, কিন্তু কোন্ শ্রেণীর—দীপ্তবুদ্ধি মাণিক্য আকীর্ণ রম্যকবি, নাকি স্বপ্নময় আনন্দ-বাউল রসকবি? তাঁর কাব্যে দুয়েরই প্রকাশ আছে। প্রথমের অধিক প্রকাশ, দ্বিতীয়ের অপেক্ষাকৃত অল্প। সেজন্য কবিকে দীপ্র, রম্য বলে সবাই মেনে নিয়েছেন—কিন্তু তাঁর বিহ্বল রূপটিকে মানতে এগিয়ে আসেন নি। আমরা দ্বিতীয় কবিকে কিন্তু বিশেষভাবে দেখতে ও দেখাতে চেয়েছি—রোমান্টিক কবিরূপে যেখানে তাঁকে দেখিয়েছি। তাঁর রহস্যরসাচ্ছন্ন গানগুলিতে দ্বিতীয় পরিচয় বেশি দেখা গেছে, কাব্যে কিন্তু ইতস্ততঃ, যথোচিত পরিমাণে নয়।

কেন নয়? কৃষ্ণনগরের রাজসভা তার রসকুটিলতার মধ্যে ঐ স্বপ্ন-সুরে নিমজ্জিত হতে অরাজি ছিল বলে? তার মনস্তুষ্টি কবিকে করতে হয়েছিল বলে?

একথা কিছুটা সত্য, সবটা নয়। দ্বিধা ছিল কবির স্বভাবে বা প্রতিভায়। বুদ্ধিপ্রতিভায় তিনি অজেয়, ভাষায় তাঁর অসাধারণ দখল, মানব-অভিজ্ঞতার বিপুল ভাণ্ডার আয়ত্তে—এতখানি শক্তিকে ব্যবহার করবেন

না?—যেখানে বাংলাসাহিত্য তখন মঙ্গলকাব্যিক গরুর গাড়িতে চড়ে অনন্তযাত্রায় চলেছে, কিংবা বৈষ্ণবকাব্যিক দাঁড়ে বসে তোতাগান গাইছে?

বুদ্ধিতে বিদ্যায় বৈদগ্ধ্যে জয়ী হতে চাইলেন তিনি, হলেনও। বাংলা-সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবিকে পেলাম। কিন্তু একটা অশান্ত অতৃপ্তির শ্বাস কবির বুক কাঁপিয়ে দিতে লাগল। কী হবে এই আয়োজনে, এই আলোকোৎসবে, এই বাদ্যরবে— যদি-না এর অন্তরের গানকে বীণার তারে তুলে নিতে পারি? ভারতচন্দ্র সেই চিরপলাতক বালক-টির সন্ধানে রইলেন, আর তারই জন্য গান গাইতে লাগলেন।—

নাচিয়া গাহিয়া বাঁশি বাজাইয়া
ভারত করিল ভোর॥

॥ ৩ ॥

শব্দসিদ্ধ কবি

'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা' ভারতচন্দ্রে শেষপর্যন্ত কোন্ আকারে দেখা গিয়েছিল, তার কথা সবশেষে বলব, তার আগে তাঁর কাব্য যে-সব উপাদানের দ্বারা গঠিত তাদের বিষয় কিছু বলে নেওয়া উচিত। প্রথমে শব্দ-উপাদান, কারণ সাহিত্য শব্দশরীর।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে শব্দের বহুবিচিত্র প্রদর্শনী—প্রধানতঃ তৎসম, তারপর দেশী, তারপর 'যাবনী।' যাবনীর মধ্যে কাজের সুবিধার জন্য আরবী-ফারসীর সঙ্গে হিন্দীকেও যোগ করে দিচ্ছি, যে-দুষ্কার্যের জন্য সাত্ত্বিক হিন্দীবাদীদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ভারতচন্দ্রের বাংলাকাব্যে আরবী-ফারসী-হিন্দী শব্দের প্রচুর ব্যবহারের একাধিক কারণ আছে। এক, তাঁর বাল্যের ফারসী শিক্ষা; দুই, তাঁর ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা; তিন, রাজসভার কবি হওয়া—ফারসী তখন দরবারী ভাষা।

যাবনী ভাষায় নিজ দক্ষতার কথা কবি মৃদু আত্মশ্লাঘার সঙ্গে

বলেছেন, যখন তিনি মানসিংহের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের কথাবার্তার বিবরণ দিচ্ছিলেন।

মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী।
উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী॥
পড়িয়াছি, সেই মতো বর্ণিবারে পারি।

তারপর কবি বললেন, ও-সকল ভাষা জানা থাকলেও পুরো সংলাপ তাতে তিনি লিখছেন না। লিখলে লোকে ভারি তো বুঝবে। ('কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারী!')। দুর্বোধ্যতার বাধা আছে, তদুপরি প্রসাদগুণের অভাব ঘটবে, এবং সরসতা আসবে না। সুতরাং যাবনী-মিশাল ভাষাই শ্রেয়:

না রবে প্রসাদগুণ, না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥

কবি তাঁর অবলম্বিত নীতির পক্ষে প্রাচীন পণ্ডিতদের সমর্থনবাক্য উদ্ধৃত করলেন:

প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হোক সে হোক ভাষা কাব্যরস লয়ে॥

কাব্যে শব্দব্যবহারের রীতি-নীতি সম্বন্ধে স্পষ্ট সচেতনতা বোধ হয় এই প্রথম বাংলাকাব্যে লিখিত আকারে পেলাম, যদিচ তা বহুপূর্ব থেকেই অল্পাধিক বর্তমান ছিল, বিশেষতঃ বৈষ্ণবকবিদের মধ্যে। জয়দেবীয় 'মধুর কোমল-কান্ত-পদাবলী'র ধ্বনিতরঙ্গ যিনি ব্রজবুলি-পদাবলীতে আনতে পেরেছিলেন সেই গোবিন্দদাস নিজ বাণী সম্বন্ধে বলেছেন 'শ্রবণরোচন ভাষ।' কাব্যদেহ সম্বন্ধে এই ধরনের বিক্ষিপ্ত বিশেষণ-প্রয়োগ আমরা পাব, বিজয়গুপ্তের ক্ষুদ্রপ্রাণ দম্ভের চেহারাও দেখে এসেছি, কিন্তু ভারতচন্দ্রের কথায় অনেক বেশি বস্তু আছে। তিনি ব্যক্তিভেদে ভাষাভেদের কথা বলেছেন, ব্যক্তি যখন বাংলাভাষী নন, তখন তাঁর মুখে পুরো বাংলা বসানোর ঔচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন।

আমরা প্রতিপ্রশ্ন করতে পারি, বাস্তবতারক্ষার জন্য যদি ভিন্নভাষী মানুষদের মুখে তাদের মাতৃভাষা বসাতে হয়, তাহলে কাব্য কি বহু-

ভাষার অভিধান-বিশেষ হয়ে দাঁড়াবে না ? আর স্বয়ং ভারতচন্দ্রও কি এই নিয়ম সম্পূর্ণ বজায় রাখতে ইচ্ছুক ? কাঞ্চীর সুন্দরকে দিয়ে তিনি তামিল ভাষায় কথা না বলিয়ে পরিষ্কার বাংলাতেই কথা বলিয়েছেন, এমন-কি সংস্কৃতও বলান নি। এখানে নিশ্চয় তিনি 'প্রেমিকের পক্ষে সবই সম্ভবপর'—এই অলৌকিক সত্যের উপরই নির্ভর করেন নি—তিনি কাব্যের ঊর্ধ্বতর নিয়মকেই মেনেছিলেন। তিনি জানতেন, ভাষাগত বাস্তবতা রাখতে গেলে প্রেম ছুটে যাবে, আর তাহলে থাকবে কি! বলাবাহুল্য সুন্দরকে এতদূর ছুটিয়ে এনে ও-বস্তুকে ছুটতে দিতে পারেন না। গান্ধর্ব বিয়ের ছেলে কোলে করে বাইরে এসে, শ্বশুরবাড়ি যাবার পথে পা বাড়িয়ে তবে বিদ্যার পক্ষে সকৌতুক আনন্দে সুন্দরকে বলা সম্ভব হয়েছিল, 'শুনিয়াছি সে দেশের কাই-মাই কথা।'

সুতরাং মূল চরিত্রের ক্ষেত্রে কবি ঝুঁকি নেবেন না; রসোদ্‌বোধনের কোনো প্রতিবন্ধক তিনি রাখতে পারেন না। তিনি জানেন, ভাষা-সংস্কার মানুষের মনে কত দৃঢ়মূল। তাহলে ভবানন্দ-পাতশাহের কথা-বার্তার বেলায় ভিন্ননীতি কেন ? কারণ—ওঁরা সমগ্র কাব্যের হিসাবে অপ্রধান চরিত্র, এবং পরিবেশগত 'বিচিত্র' বাস্তবতা দেখাতে হলে অপ্রধান চরিত্রকে অবলম্বন করেই তা দেখাতে হবে। বর্তমান ক্ষেত্রটি প্রেমরসসিঞ্চিত হৃদয়ক্ষেত্র নয়, বুদ্ধি ও চিন্তার রণস্থল; এখানে ভিন্ন সংস্কার ও ভিন্নধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন দুজন মানুষের চরিত্র ফোটাতে হলে তাদের নিজস্ব ভাষাভঙ্গি দেখানো দরকার।

এইখানে পরিমাণবুদ্ধির কথা এসে যায়। ভিন্ন ভাষা কতখানি মিশাল দেবেন ? এর নিয়ামক কবির সঙ্গতিবোধ। তাঁকে দেখতে হবে, মূল কাব্যভাষার চরিত্র যেন ক্ষুণ্ণ না হয়, বোধগম্যতা যেন বজায় থাকে, আবার যে-ভিন্নভাষী মানুষটি কথা বলছেন, তাঁর বাগ্‌ভঙ্গি থেকে যেন তাঁর চরিত্র চিত্রাকারে ফুটে ওঠে। সন্দেহ নেই, এই পরিমাণবোধ ভারতচন্দ্র দেখিয়েছিলেন, যদিও শেষপর্যন্ত কালের হাতে তিনি মার খেয়েছেন, কারণ তাঁর জীবনকালের পরে এদেশে রাজাবদল হয়ে যাও-য়ায় যে-বিবেচনায় তিনি যাবনীমিশাল ভাষা নির্মাণ করতে সচেষ্ট হয়ে-

হয়েছিলেন, তার প্রয়োজন হ্রাস পায়। বাংলাভাষায় সংস্কৃত শব্দ-ব্যবহার (ইংরেজি শব্দও) বৃদ্ধি পায়, যেজন্য ১৮৫০ সালে ওয়েঙ্গার ভারতচন্দ্রের কাব্যের দুর্বোধ্য হিন্দী শব্দের কথা তুলেছেন।[৯]

বাংলাভাষায় যাবনীশব্দ মিশাল দেওয়ার কাজেই ভারতচন্দ্র কিন্তু থেমে থাকেন নি—তিনি একেবারে মিশ্র ভাষার কথা ভেবেছিলেন—সেখানে কিন্তু তাঁর মধ্যে চিন্তাভ্রান্তি দেখা গেছে। এর মূলে হয়ত ছিল কবির সমন্বয়ী মনোভাব বা সর্বভারতীয় প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদ!! তিনি বোধহয় এদেশীয় ভাষাভেদের অসুবিধার দিকটি বুঝেছিলেন, সেই কারণে সংস্কৃত ও প্রাদেশিক কিছু ভাষা মিশিয়ে মিশ্র ভাষাকাব্য সৃষ্টি করতে উৎসাহী হয়েছিলেন। এর পিছনে কবির কাব্যচালাকি ছিল, এমন মনে করতে চাই না। তাঁর খণ্ড কবিতাগুলিতে মিশ্র ভাষার চেহারা দেখে অবশ্য মনে হতে পারে, কৌতুক ও কৌতূহলই ছিল কবির লক্ষ্য, কিন্তু আরও বিস্তারিত দেখলে সে ধারণা বদলাতে হবে।

বাংলাকাব্যে পুরো যাবনী ভাষার ব্যবহার ভারতচন্দ্র প্রায় প্রথমাবধি করেছেন। তিনি যখন সদ্যোজাত কবি, তখন সত্যপীরের দ্বিতীয় পাঁচালীতে ফকিরের মুখে যাবনী ভাষা বসিয়েছিলেন। 'হাওয়া' কবিতার দ্বিতীয়াংশ অমিশ্র যাবনী। পরিষ্কার হিন্দী কবিতা তাঁর আছে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে 'ভাটের প্রতি রাজার উক্তি' এবং 'ভাটের উত্তর' অধ্যায় দুটির ভাষা খাঁটি যাবনী।

অমিশ্র যাবনী ভাষা সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ নেই। বিদ্যাসুন্দরে

৯। যাবনী-মিশাল ভাষা ব্যবহারের সময়ে ভারতচন্দ্র কিন্তু সস্তা বাস্তবতা দেখান নি। বর্তমানে অনেক লেখক উগ্র বাস্তবতাবোধে প্রত্যেক চরিত্রের মুখে তাদের খাঁটি ভাষা বসিয়ে দিচ্ছেন। তার ফলে তাঁদের রচনা ভাষাসাহিত্যে উপভাষা-প্রদর্শনী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নানা ভাষা প্রদর্শনীও। অনেকে কলকাতার মেসে বসে নানা জেলার ডায়ালগ্ তৈরী করে ফেলছেন স্বচ্ছন্দে। এই জাতীয় লেখার সঙ্গে যদি কেউ পরশুরামের গণ্ডেরীরাম বাট্‌পারিয়া বা মুসলমান সহিসের কথার তুলনা করেন, তাহলেই বুঝবেন, সস্তার বাস্তবতার সঙ্গে সাহিত্যিক বাস্তবতার তফাত কতখানি।

ভাটের সঙ্গে রাজার কথাবার্তায় পুরো যাবনী ভাষার ব্যবহারকে আমরা কাব্যবিচারে অনুচিত মনে করি—আমাদের লক্ষ্য কবির ব্যবহৃত মিশ্র ভাষা, যা পাওয়া গেছে তাঁর কিছু খণ্ড কবিতার মধ্যে, মানসিংহ কাব্যে এবং অসম্পূর্ণ চণ্ডী নাটকে। তাঁর সর্বশেষ রচনা চণ্ডী নাটকে মূল ভাষা হিসাবে মিশ্র ভাষার ব্যবহার পরিষ্কার দেখিয়ে দেয়, কবি বিশেষ ক্ষেত্রে অন্ততঃ কাব্যভাষায় মিশ্রভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনকে অনুভব করেছিলেন—সেটা তাঁর বৈচিত্র্যস্পৃহামাত্র ছিল না। এবং এখানে আমাদের বলতেই হবে—কবির মনোভাব অকাব্যিক। কোনো মিশ্রভাষায় কবির মূল সত্তা আত্মপ্রকাশ করতে পারে না, এবং তা না করলে তাঁর হাতে মহৎ কাব্য রচিতও হতে পারে না।

পাঠকদের সঙ্গে কবির মিশ্রভাষার পরিচয় করানোর প্রয়োজন আছে। 'সংস্কৃত, বাংলা, পারস্য এবং হিন্দী, এই কয়েক ভাষা মিশ্রিত কবিতা' এইপ্রকার :

শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর বায়দকে গোয়দ্ রুবর
কাতর দেখে আদর কর কাছে মর রো রোয়্ কে।
বক্ত্রং বেদং চন্দ্রমা ছুঁ লালা চে রেমা
ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা মেট্টিমে কাহে শোয়্ কে ॥
যদি কিঞ্চিৎ ত্বং বদসি দর্ জানে মন্ আযৎ খোসি
আমার হৃদয়ে বসি প্রেম কর খোস্ হোয়্ কে।
ভূয়ো ভূয়ো রোরুদসি ইয়াদৎ নমুদা যাঁ কোসি
আজ্ঞা কর মিলে বসি ভারত ফকিরি খোয়কে ॥

খুব মজা লাগে কবিতাটি পড়তে। কবি যদি মজাকেই ফলশ্রুতি ধরেন, তাঁর প্রাপ্য তিনি পেয়ে গেছেন। কিন্তু সর্বত্র মজা তাঁর লক্ষ্য ছিল এমন মনে করি না, অন্ততঃ চণ্ডী নাটকের অসম্পূর্ণ অংশ পড়বার পরে, যাতে দেখি, তিনি সমগ্র নাটকটির ভাষা হিসাবে সংস্কৃত বাংলা ও হিন্দীকে মিশ্র অথবা অমিশ্ররূপে ব্যবহার করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কবির এই সিদ্ধান্ত কাব্যসৃষ্টির অনুকূল হয়নি, আমরা আগেই বলেছি, এবং সর্বভারতীয় ভাষাপার্থক্য দূরীকরণের কোনো মহৎ অভিপ্রায়

কবির থাকতে পারে, এমন অনুমান করার চেষ্টা বা দুশ্চেষ্টাও করেছি! নাটকে কয়েক রকম ভাষার ব্যবহার এদেশে অবশ্য নতুন নয়; কালিদাসের নাটকে পাত্র-পাত্রী-ভেদে সংস্কৃত ও নানারকম প্রাকৃতের ব্যবহার আছে, কিন্তু সেই পুরাতন সংস্কৃত-রীতিকে বহুদিন পরে আমদানী করা নূতন কাজ বইকি, এবং সংস্কৃতে যা ছিলনা তাকেও আনা—মিশ্র ভাষার ব্যবহার। ভারতচন্দ্র বোধহয় সচেতন ছিলেন, বাঙালি লেখকদের মধ্যে তিনিই প্রথম পুরো সংস্কৃত ভাষায় রচিত নয়, এমন নাটক লিখছেন, সংস্কৃত নাটকের গঠনভঙ্গি বজায় রেখে। পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, চণ্ডীনাটক নাটগীতি নয়—পুরো চেহারার নাটক।

এই নাটকে সূত্রধার সম্পূর্ণ সংস্কৃতে কথা বলেছে, সুতরাং উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন আছে মহিষাসুরের হিন্দী-বাংলা-মেশানো জোরালো কথাগুলি উপস্থিত করা, যা কিন্তু আগে উদ্ধৃত করেছি ('নব মূল্যায়নের প্রসঙ্গসন্ধান' অধ্যায়ে), পাঠক অবশ্যই দেখে নেবেন; নিচে তুলছি প্রথমে নটীর মিশ্রভাষার উক্তি :

শুন শুন ঠাকুর নিত্য বিশারদ চতুর সভাসদ সারি।
নূতন নাটক নূতন কবিকৃত হাঁম্ তোঁহি নূতন নারী॥
ক্যায় সে বাতায়ব ভাব ভবানীকো ভীতি ভৈঁ মুঝে ভারি।
দানব দলনে ধরণীমণ্ডলে তারিণী লে অবতারী॥
গুরু সম ধীর বীর সম শুনহ মম সগুণ মুরারি।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপ রাজশিরোমণি ভারতচন্দ্র বিচারি॥

এবার মিশ্রভাষায় (ব্রজবুলি পর্যন্ত আছে) দেবীর ক্রোধের বর্ণনা :

কমঠ করটট ফণিফণা ফলটট দিগ্‌গজ উলটট
ঝটটট ভ্যায়্ রে।
বসুমতী কম্পত গিরিগণ নম্রত জলনিধি ঝম্পত
বাড়বময় রে॥
ত্রিভুবন ঘুঁটত রবিরথ টুটত ঘনঘন ছুটত
যেঁও পরলয় রে।
বিজলী চট চট ঘর ঘর ঘট ঘট অট্ট অট অট
আ ক্যায়া হায় রে॥

কবির 'কাল্পনিক' উদ্দেশ্য যত বৃহৎই হোক এখানে কাব্যপরীক্ষার বেশি কিছু পাই না। বেশি কিছু সত্যই পাই, মানসিংহে। তবে ও-ক্ষেত্রে মিশ্রভাষা কথাটি ব্যবহার করা যাবে কি না সন্দেহ। ভাষা বাংলাই, কেবল যাবনী শব্দের অধিক ব্যবহার, নাটকীয় বাস্তবতারক্ষার প্রয়োজনে। জাহাঙ্গীরকে সম্বোধন করে মানসিংহের উক্তি এখানে নমুনা হিসাবে তোলা যাক :

মানসিংহ জোড় হাতে অঞ্জলি বাঁধিয়া মাথে
কহে জাঁহাপনা সেলামত।
রামজীর কুদরেতে মহিম হইল ফতে
কেবল তোমারই কেরামত॥
হুকুম শাহনশাহী আর কিছু নাহি চাহি
জের হইল নিমক হারাম।
গোলাম গোলামী কৈল গালিম কয়েদ হইল
বাহাদুরী সাহেবের নাম॥

মানসিংহের সেলামসুদ্ধ বাচনভঙ্গি উপরের অংশে পেয়েছি, নিচে দিল্লীতে অন্নদার ভৌতিক অত্যাচারের সকৌতুক চিত্ররসময় বর্ণনা :

এইরূপে দিল্লীতে পড়িল মহামার।
যবনের হাহাকার, ভূতের হুঙ্কার॥...
বিবিরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল।
পেশবাজ ইরাজ ধমকে ছিঁড়ি দিল॥
চিতপাত হয়ে বিবি হাত-পা আছাড়ে।
কত দোয়া দবা দিনু তবু নাহি ছাড়ে॥...
ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত।
বিবি লয়ে ভূতের আনন্দ বাড়ে তত॥

রোমান্টিক পরিবেশ রচনার কাজেও কবি এই যাবনীমিশাল ভাষাকে লাগিয়েছেন। বিদ্যাসুন্দর আলোচনাকালে তার নমুনা দিয়েছি, এখানে আর একটু :

সম্মুখে দেখেন চক চাঁদনী সুন্দর।
নৌবত বাজিছে বালাখানার উপর॥

চকের মাঝারে কোতোয়ালী চবুতরা।
ফাটকে আটক যত বাজে দায় ধরা॥

সৈন্যদল ও যুদ্ধবর্ণনায় এইপ্রকার ভাষাভঙ্গির সাফল্য যথেষ্ট। সৈন্যদলের বর্ণনার কিছু অংশ :

ঘোড়া উট হাতী পিঠে নাগরা নিশান।
গাড়িতে কামান চলে বাণ চন্দ্রবাণ॥
হাতীর অম্বিরী ঘরে বসিয়া আমীর।
আপন লস্কর লয়ে হইল বাহির॥
আগে চলে লালপোষ খাসবরদার।
সিপাই সকল চলে কাতার কাতার॥
তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেশে মাল।
দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল॥
আগে পাশে হাজারীর হাজারী হাজার।
নচ নটী হরকরা উরদুবাজার॥

যাবনী-মিশাল ভাষা নিয়ে ভারতচন্দ্র যে-ধরনের পরীক্ষাকাজ চালিয়েছিলেন, তা কোন্ ঐতিহাসিক কারণে সম্পূর্ণ সার্থকতালাভ করেনি, তা বলেছি। আর একদিকে কিন্তু তাঁর প্রয়াসের দারুণ সাফল্য ঘটেছে—খাঁটি দেশজ শব্দ ব্যবহারে। কী প্রচণ্ড প্রাণশক্তি না তিনি ঐসব শব্দগুলির মধ্যে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন! এত সতেজ সচল চঞ্চল পটু প্রখর শব্দপ্রয়োগ, যা তিনি করেছেন, কদাচিৎ দেখা যায়। আমি যথেচ্ছ কিছু নমুনা তুলছি :

খালাস করিয়া। খেদাইয়া দিল। লুঠি নিল। বিস্তর লস্কর। কারিল কাঙাল। নৌকার জাঙাল। ঝিউড়ি বহুড়ি। ফাঁপর হইলা। লড়ে দাঁত। ডেকরা বামুন। বড় কুন্দলিয়া। চল মোর বাপ। কবে যাবা। দেহ খেদাইয়া। হুলাহুলি দিয়া। জামাই লেংটা। বুড়া আঁটকুড়া। চক্ষু খেয়ে। গলে মেকামেকি। দাড়ি লড়ে। মাথা কোঁড়ে। ঝুঁটি বান্ধি। ঘুরুলে বাতাস। ঝাট এসো চলে। বড় ঠেঁটা। আই মাগো। বৈল কেটা। আঁখি ঠারে। সতীপনা। ঝুটাঝুটি। মাথা কুটাকুটি। আঁত ওঠে গন্ধে। ফোঁস করে। লয়ে তৈল কুড়। ঝুঁটি বান্ধি। মুখে ওঠে ফেঁকো। ভেকাচাকা। হৈহু ভেকো। কোন্দল বাজে। বুড়া গরু পুঁজি। কেবল আচাভুয়া। না ঘুচিল খাই-খাই। হাবাতে। খুদ কুঁড়া। ভাঙ্গী ধুতুরায় ভোল। বুড়াটির ঠাট। হেদে দেখ লো।

বিটলা বামুন। বাপে দিল তাড়া। বড়ই ছাবাল। ভাঙা লড়ি। ঝাঁকড় মাকড়। আঁদি-সাদি। করে কিলিকিলি। কোটরে নয়ন। মিটি-মিটি। কুঁজ ভার। শত গাঁটি ছেঁড়া টেনা। ভূমে ঠেকে থুতি হাঁটু। কুঁজ-ভরে পিঠ-ভাঁড়া। মরণটাকিলি। চুল শণ-নুড়ি। চলি গুড়ি-গুড়ি। বাতে কুঁজে বেঁকে-বেঁকে। কড়ে রাঁড়ি। বিস্তর ঠাট। গুঁড়া আছে। চেঙড়া ভুলায়ে। কত আছে ঠুলি। দেয় খোঁটা। কৈতে না জুয়ায়। ভুয়া দেয়। গছায়। বুক বাড়িয়াছে। বঁধুর ধূম। করিস হেলা। ধিঙ্গি এক-জন। জুজু হাপা বিছা। জানিলাম দড়। কথার কোলানী। দ্বারে কুঁজি দিয়া। বাজারে বেসাতি। তুই তো মাশাস। কাতি দিব গলে। চুনকালি দিলি গালে। এড়াইয়া ঝিঃ বিয়া দায়। নিমকহারাম বেটা। এক খাদে গাড়িব হারামজাদে। লাগে হুক আঁতে। কুটনী গন্তানী। বড় যে মস্তানী। চক্ষু পাকল।

অজস্র আটপৌরে শব্দের মাত্র কয়েকটি উপরে তুলেছি, এবং পরি-বেশ বিচ্ছিন্ন করে। ওর দ্বারা বোঝানো সম্ভব নয় ওদের যথাপ্রয়োগে কবি কিরকম কার্যসিদ্ধি করেছিলেন। আর নিশ্চয় ওগুলিকে শেকড়-সুদ্ধ হাজির করাও যায় না। চলিত ভাষা কেমন জীবন্ত বা জান্তব হয়ে উঠতে পারে তার পরিচয় পেতে হলে নারীগণের পতিনিন্দা অবশ্যপাঠ্য, যার কিছু নমুনা অন্য প্রসঙ্গে আগে দিয়েছি।

এইসব সাটামাটা দৈনন্দিনের ব্যবহার্য শব্দের উল্টোদিকে আছে সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দরাজি, ধ্বনিময় বাণীচ্ছন্দে যেগুলি গাঁথা। সংস্কৃত স্তোত্র রচনায় কবি পরম পারদর্শী।[১০] সুতরাং প্রায়-সংস্কৃত বাংলা দেবস্তোত্রে কবি কখনো ধ্রুপদের গম্ভীর মৌল তান তুলতে পেরেছেন,

---

১০। যথা: প্রসীদ মাতরন্নদে ধরাপ্রদে ধনপ্রদে।
পিনাকিপদ্মপাণিপদ্মযোনিসদ্মসম্মদে॥
করস্থরত্নদর্বিকাসুপানপাত্রশর্মদে।
পুরস্থভুক্তভক্তশম্ভুনর্তনে কটাক্ষদে॥
সুধান্বিতপ্রভাতভানুভানুদন্তকচ্ছদে।
স্মিতপ্রকাশিতক্ষণপ্রভাংশুমুক্তিকারদে॥
বিলোললোচনাঞ্চলেন শান্তরক্তপারদে।
প্রসীদ ভারতস্য কৃষ্ণচন্দ্রভক্তিসম্পদে।

[মজুমদারের অন্নদাস্তব]

কখনো দরবারী খেয়ালে মেতে উঠে ছড়িয়ে পড়েছেন।[১১] তবু বিস্ময়ের কথা, এই ধরনের শব্দগ্রন্থনে তাঁর উৎসাহ মাত্রাতিরিক্ত নয়। স্তোত্রাত্মক সঙ্গীতে, বা পৌরাণিক পরিবেশসৃষ্টিতে ঐ ধরনের শব্দসমবায় তিনি করেছেন, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, জয়দেবের অনুসরণে অখণ্ড শব্দতরঙ্গ তুলতে বা স্বাদু মন্দমন্থরতা আনতে তাঁর আগ্রহ যতখানি, ততোধিক উৎসাহ নাগরিক বা ইতর শব্দের প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে। কবি শব্দে শব্দ জুড়ে সঘন বিলম্বিত ধ্বনি-প্রবাহ সৃষ্টি করার চেয়ে শব্দগুলিকে পৃথক রেখে তাদের নিজস্ব ধ্বনিগুণ আবিষ্কারে বেশি সচেষ্ট ছিলেন। এই কারণেই তাঁর রচনায় হলন্ত শব্দের এত প্রয়োগ। বাঙালির বাচনভঙ্গিকে তিনি যথাযথ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, কাব্যচ্ছন্দের দাবির কাছে স্বাভাবিক উচ্চারণপদ্ধতিকে বলি দিতে চান নি।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে অনুকারবাচী বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্যও চোখে পড়ে। এর জন্য কবি প্রশংসা পেয়েছেন, নিন্দাও। এখানে তিনি সশব্দ কবি। রমেশ দত্ত যে, ধিক্কারের সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন,

---

১১। যথা : জয় জগদীশ জয় জগদম্বে।
ভব ভবরাণী ভব অবলম্বে॥
শিব শিবকায়া হর হরজায়া।
পরিহর মায়া অব অবিলম্বে।

যথা : জয় জয় হর রঙ্গিয়া।
করবিলসিত নিশিত পরশু অভয় বর কুরঙ্গিয়া॥
লক্ লক্ ফণী জটা-বিরাজ, তক্ তক্ তক্ রজনীরাজ।
ধক্ ধক্ ধক্ দহন সাজ, বিমল চপল গঙ্গিয়া॥
ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল
হুলু হুলু হুলু যোগিনীবোল,
কুলু কুলু কুলু ডাকিনীরোল, প্রমদ প্রমথ সঙ্গিয়া।
ভবম্ ভবম্ ভবম্ ভাল ঘন বাজে শিঙা ডমরু গাল
রুদ্রতালে-তাল দেই বেতাল, ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গভঙ্গিয়া॥
সুরগণ কহে জয় মহেশ, পুলকে পুরল সকল দেশ।
ভারত যাচত ভকতিলেশ, সরস অবশ অঙ্গিয়া॥

'কেবল শব্দ! শব্দ! শব্দ!'—সে নিশ্চয় এই ধরনের শব্দপ্রলোভন লক্ষ্য করেই। এক্ষেত্রে কবি অবশ্যই 'ভাষাচতুর', অসিতকুমার যা বলেছেন, যাঁর 'শব্দের নেশা···অনেক সময় নিছক শব্দের মাতলামিতে পর্যবসিত হইয়াছে।' তবু এ ধরনের অতিরেক তাঁর কাব্যে অল্পক্ষেত্রেই, অধিকাংশস্থানেই তিনি অত্যন্ত হিসেবী, এবং তাঁর সেই মেদবর্জিত শব্দস্বাস্থ্য সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। রাজনারায়ণ বসু বলেন, সে ভাষা 'চাঁচাছোলা মাজাঘষা', অক্ষয় সরকার গালাগালির ফাঁকে-ফাঁকে কিংবা তারই সূত্রে বলে ফেলেন, সে ভাষা 'পরিষ্কৃত', তাতে 'হীরার ধার', 'শব্দসমুদ্রের মন্থনদণ্ড' নিজের হাতে কবি নিয়েছেন, তিনি 'বাগ্‌বিশারদ', 'বাক্যরসরাজ।' নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে শাব্দিক কবি বললেও স্বীকার করেছেন, তিনি 'কথার তাজমহল' তৈরী করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন আরও অগ্রসর হয়েছেন; ভারতচন্দ্রের ভাষার, বিশেষতঃ তাঁর ধ্বন্যাত্মক শব্দব্যবহারের নমুনা তুলে আলোচনা করেছেন, কেবল কতকগুলি বিশেষণ ব্যবহার করে দায় সারেন নি।—"ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এত আদরণীয় হইল কেন? তাহার কারণ ভারতচন্দ্রের অপূর্ব শব্দমন্ত্র। বাংলা পৃথিবীর কোমলতম ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু এই কোমলতার কিরূপ আকর্ষণীশক্তি আছে, তাহা বিদ্যাসুন্দর না পড়িলে সম্যক উপলব্ধি হইবে না।" "ভাবযুগ-গতে সাহিত্যে শব্দযুগ প্রবর্তিত হওয়া স্বাভাবিক। ভারতচন্দ্রের ভাব বিচার না করিয়া ভাষা বিচার করিলে তাঁহাকে প্রাচীনকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিতে হইবে।···তিনি উৎকৃষ্ট শব্দকবি।···'ম'-কার, 'ল-কার' প্রভৃতি কোমল অক্ষর দ্বারা যে-যাদু প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা শ্রুতির অমৃত, তাহা পক্ষীর কাকলীর ন্যায় স্থানবিশেষে অর্থশূন্য হইয়াও চিত্তবিনোদনে সমর্থ।"

দীনেশচন্দ্র আরও অগ্রসর। উক্ত অর্থশূন্য শব্দরাজি কেবল ধ্বনি-গুণেই যে, রূপমূর্তি, এমনকি ভাবমূর্তিও নির্মাণ করতে সমর্থ, তা তিনি স্বীকার করেছেন, এবং তার দ্বারা ভারতচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভা বরমাল্য পেয়েছে। শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা-অংশ উদ্ধৃত করে তিনি বলে-

ছেন : "[এখানে] মহাদেবের যে ভৈরবসুন্দর চিত্রখানি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা কাব্যসাহিত্যে শীর্ষদেশে স্থান পাইবার যোগ্য।" "ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিতে যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। 'ছলচ্ছল, টলট্টল, কলকল, তরঙ্গা'—এই ছত্রটিতে তরঙ্গের তিনটি গুণ নির্দিষ্ট হইয়াছে : ছলচ্ছল—জলের প্রবাহব্যঞ্জক; টলট্টল—জলের নির্মলতাব্যঞ্জক; কলকল—জলের নিক্বণব্যঞ্জক। গঙ্গাতরঙ্গের এমন সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর বর্ণনা বোধহয় আর কোনো কবি দিতে পারেন নাই।"

ধ্বন্যাত্মক শব্দ-কাব্যের কিছু উদাহরণ পরপর উদ্ধৃত করে দেব। পাঠক লক্ষ্য করবেন—ব্যর্থতা অপেক্ষা সার্থকতাই অধিক। দেখবেন—বাণীপ্রতিমার পূজারাত্রে শব্দের আতসবাজিতে ফিনিক্ দিয়ে ফুটছে অজস্র আলোকচূর্ণ।—

হরিষে অবশ অলস অঙ্গে।
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ-তরঙ্গে ॥
লটপট জটা লপটে গায়।
ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায় ॥
গর গর গর গরজে ফণী।
দপ দপ দপ দীপয়ে মণি ॥
ধক্ ধক্ ধক্ ভালে অনল।
তর তর তর চাঁদ মণ্ডল ॥...
তাধিয়া তাধিয়া বাজায়ে তাল।
তাতা থেই থেই বলে বেতাল ॥

উর্ধ্বে ছুটে জটা ঘনঘটা জরজর।
উছলিয়া গঙ্গাজল ঝরে ঝরঝর ॥
গরগর গর্জে ফণী জিহি লক্‌লক্।
অর্ধ শশী কোটি সূর্য অগ্নি ধক্‌ধক্ ॥
হল হল জলিছে গলায় হলাহল।
অট্ট অট্ট হাসে মুণ্ডমালা দলমল ॥

কুহু কুহু কুহু কুহু কোকিল হুঙ্কারে।
গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ ভ্রমর ঝঙ্কারে ॥

সুশোভিত তরুলতা নবদলপাতে।
তরতর থরথর ঝরঝর বাতে ॥

গলে দোলে ধুক্‌ধুকি করে ধক্‌ধক্‌।
মণিময় আভরণ করে চকমক ॥

নূপুর রণরণ কিঙ্কিণী কণকণ
রঞ্জন ঝনঝন কঙ্কণিয়া।
লপট লটপট ঝপট ঝটপট
রচিত কচজট কমনিয়া ॥

ধিধি ধিকট ধিকট ধিধিকট ধেই ধেই।
ঝিঝি তক্‌ ঝিম তক্‌ ঝিম ঝমক ঝমক ঝেই ॥

ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুৎ চকমকী।
হুড়মড়ি মেঘের ভেকের মকমকী ॥
ঝড়ঝড়ী ঝড়ের জলের ঝরঝরী।
চারিদিকে তরঙ্গ জলের তরতরী ॥

পয়দল কলকল ভূতল টলমল
সাজিল দলবল অটল সোয়ারা।
দামিনী তকতক ধানকী ধকধক
ঝকমক চকমক খর তরবারা ॥

ধৃধৃ ধৃধৃধৃ নৌবত বাজে।
ঘন ভোরঙ্গ ভম্‌ ভম্‌ দামামা দম্‌ দম্‌
ঝনর ঝম্‌ ঝম্‌ ঝাঝে ॥[১২]

১২। কবি সংস্কৃত ভাষাকেও অব্যাহতি দেন নি। চণ্ডী ও মহিষাসুরের আগমন বর্ণনা এই প্রকার :

খট্‌মট্‌ খট্‌মট্‌ খুরোত্থধ্বনিকৃতজগতীকর্ণপূরাবরোধঃ
ফোঁ ফোঁ ফোঁ ফোঁৎি নাসানিলচলদচলাত্যন্তবিভ্রান্তলোকঃ।
সপ্‌ সপ্‌ সপ্‌ পুচ্ছঘাতোচ্ছলদুদধিজলপ্লাবিতস্বর্গমর্ত্ত্যো
ঘর্‌ ঘর্‌ ঘর্‌ ঘোরনাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ ॥

সুতরাং ভারতচন্দ্র শব্দসাধনায় সিদ্ধকবি ; কিন্তু—শব্দাবতার কবি নন। শেষেরটি একটি মহাশব্দ—একমাত্র মহাকবিরাই তাতে অধিকারী। লৌকিকে অলৌকিকে অবতারের স্বচ্ছন্দ যাতায়াত—ভারতচন্দ্র তাতে সমর্থ ছিলেন না। বাংলাসাহিত্যে সে কবি একমাত্র রবীন্দ্রনাথ। সিদ্ধসাধকের সঙ্গে অবতারের যে পার্থক্য, ভারতচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই পার্থক্য।

শব্দের ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের শক্তিসীমার কথা এখানে বলে নিতে হবে। ভারতচন্দ্রের শব্দ যতখানি উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ, ততখানি রসার্দ্র নয়। যাকে বলা হয় 'রহস্যঘরের চাবিকাটির মত শব্দ'—সে শব্দ তিনি নির্মাণ করতে পারেন নি। তাঁর শব্দে আলো ছিল, আচ্ছন্নতা ছিল না ; গতি ছিল, ছিল না রসাবেশ; তাতে মুক্ত চোখের সন্ধানী দৃষ্টি কিন্তু অন্তর্লীন মগ্নতা নয় ; সেখানে যে-কোমলতা, তা নয় কুহককোমলতা। ভারতচন্দ্রের ভাষা সম্বন্ধে বলতে পারব না—এ হল সেই ভাষা যাতে রয়েছে উষার আকাশ, সন্ধ্যার নিঃশ্বাস, রাত্রির নৈঃশব্দ্য এবং সুবিশাল ধ্যান কিংবা একটি শিশিরবিন্দুর অনন্য জীবনের আশ্চর্য ইতিহাস।

শব্দ নিয়ে ভারতচন্দ্রের নানাপ্রকার পরীক্ষার কথা মনে রেখেও আমরা বলব, এ-ব্যাপারে পুরাতন বাংলাসাহিত্যে তিনিই একক মানুষ নন। ষোড়শ শতকে মঙ্গলকাব্যে শব্দচর্চা অবশ্য বেশি হয় নি। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের কয়েকজন আখ্যানকাব্যের কবি সে কাজে লেগেছিলেন —আলাওল, রামেশ্বর ও ঘনরাম। এইসব কবি ভাষার রূপচর্চার চেষ্টা করেছেন, যেমন পূর্ববর্তী মুকুন্দরামে দেশীয়, সংস্কৃত এবং আরবী-ফারসীর মিশ্রণচেষ্টা দেখা গিয়েছিল। সপ্তদশে রামকৃষ্ণের শিবায়নে সংস্কৃতঘেঁষা ভাষার শিষ্ট শুচিতা যথেষ্ট। এঁরা আশ্চর্য সাফল্য অর্জন না করলেও এঁদের উদ্যোগের কথা মনে রাখতে হবে। সাফল্য

ধো ধো ধো ধো নাগারা গড়গড়্ গড়গড়্ চৌঘড়ী ঘোরঘর্ষৈঃ
ভোঁ ভোঁ ভোরঙ্গশব্দৈর্ঘন ঘন বাজেচ মন্দীরনাদৈঃ
ভেরী তুরী দামামা দগড় দড়মসা শব্দনিস্তব্ধদেবৈঃ
দৈত্যোঽহসৌ ঘোরদৈত্যৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ সার্বভৌমো বভূব॥

কিন্তু অদ্ভুত এসেছিল বৈষ্ণবসাহিত্যে। বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন কাব্যে (যা ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে কৃষ্ণ-কুকীর্তন কাব্য) ভাষাব্যবহারে যে-সচেতনতা ও নৈপুণ্য দেখা গেছে, তা বিস্ময়কর। লঘু তীক্ষ্ণ গ্রাম্য শব্দ কিংবা গুরুগরীয়ান্ তৎসম শব্দযোজনায় এই কবির সাফল্য দেখে স্বীকার করতে হয়, দীর্ঘকাব্যের ক্ষেত্রে বাংলাসাহিত্যে ভারতচন্দ্রের পূর্বসূরী হবার যোগ্য কবি একমাত্র ইনিই। বৈষ্ণব পদসাহিত্যে পদাবলীর চণ্ডীদাস আমাদের শব্দমৃত্তিকা দিয়ে যে-প্রতিমা নির্মাণ করেছিলেন, তার জন্যে অন্যত্র তাঁকে 'বাংলা কবিভাষার জনক' বলে চিহ্নিত করেছি।[১৩] আমাদের কোমল করুণ অভিমানী আতুর মনটিকে চণ্ডীদাস শব্দে-শব্দে ধরে দিয়েছেন—তাঁকে অনুসরণ করেছেন নরহরি, বংশীবদন, বলরাম। তেমনি আমাদের রহস্যরসপূর্ণ, মায়ামেদুর, যৌবন-অরণ্যে পথহারা স্বপ্নবিহ্বল মনকে শব্দে ধরেছেন রামানন্দ বসু, পুনশ্চ বলরাম, এবং সর্বাধিক জ্ঞানদাস। এখানেই শেষ নয়। জ্ঞানদাস যেমন শব্দ-রসে রোমান্টিক, গোবিন্দদাস তেমনি শব্দ-রূপে রোমান্টিক। 'পাখির নীড়ের মতো চোখ-তুলে-চাওয়া' রোমান্টিকতা জ্ঞানদাসে, আর 'শ্রাবস্তীর কারুকার্যে'র রোমান্টিকতা গোবিন্দদাসে। সজ্ঞান ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে বৈষ্ণবকবিরা কতখানি এগিয়েছিলেন তার প্রমাণ—তাঁরা তাঁদের সৃষ্টির এক বড় অংশকে পরিবেশন করেছিলেন একটি কৃত্রিম মিশ্র ভাষার আধারে। ব্রজবুলি কোনো মৌখিক ভাষা নয়, এর কোনো স্বীকৃত ব্যাকরণ নেই, কিছু ভাঙা মৈথিল শব্দ বাংলা শব্দের সঙ্গে মিশিয়ে, বাংলা বাগ্‌রীতির ছাঁচে ঢালাই করে, এই ভাষা তৈরী হয়েছে; এর জন্ম হয়ত চৈতন্যদেবের আগে, কিন্তু সাহিত্যে ব্যাপক ব্যবহার চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবকবিদের হাতেই। নূতন আন্দোলনের নূতন কবিভাষারূপে ব্রজবুলিকে গ্রহণ করে এবং তার সাহায্যে ছন্দ-অলঙ্কারের ঐশ্বর্যময় অভিনব রূপলোক নির্মাণ করে, বৈষ্ণবকবিরা ভাষামার্গে যে-সাহসিক পরীক্ষাকার্য করে গেছেন, ভারতচন্দ্র তাকে অতিক্রম

১৩। লেখককৃত 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ছেন, একথা বলতে পারি না। গোবিন্দদাসীয় ছন্দ-সঙ্গীতের অভ্রান্ত নৈপুণ্যকেও ভারতচন্দ্র পেরোতে পারেন নি। বিদ্যাসুন্দরে শব্দের কারু-কার্যের দ্বারা তিনি যে রোমান্টিক রূপজগৎ তৈরী করতে চেয়েছেন, তাও কারুশিল্পের দিক দিয়ে গোবিন্দদাসের সৃষ্টিকে হতমান করতে সমর্থ নয়।

ভারতচন্দ্র বৈষ্ণবকবিদের অতিক্রম করেছেন অন্যত্র—পরীক্ষাকাজে নয়—সিদ্ধান্তে। গোবিন্দদাসাদির প্রেমের জগৎ প্রায়শঃ জীবনবিচ্ছিন্ন, 'শ্রবণরোচন' শব্দগুলি বেছে সংগ্রহ করেছিলেন তাঁরা, সেই শব্দ-গুলিকেই মাত্র নিয়েছিলেন যাদের গায়ে চারপাশের জগতের কর্ম-ঘর্মের ছোঁয়া লেগে নেই, পার্থিবকে অপার্থিব করে তোলার দুষ্কর সাধনায় ব্রতী তাঁরা—সেখানে ভারতচন্দ্র স্থির করেছিলেন, জীবনকে স্বীকার করে নেব শব্দের ক্ষেত্রে—সে শব্দে ক্ষুধা থাকবে; কামক্ষুধার মতোই অন্নক্ষুধা; রতিরণের মতোই অস্ত্ররণ; থাকবে ইতরতা, চতু-রতা—মধুরতার সঙ্গে; গাম্ভীর্য আমন্ত্রিত হয়েও প্রত্যাখ্যাত হবে উপেক্ষার ফুৎকারে; প্রণামের নতমূর্তিকে আড়াল করবে জিজ্ঞাসার বক্রদেহ; বিশ্বাসের স্থির মুখের পাশে দেখা যাবে অশ্রদ্ধার মুখভঙ্গি। ভারতচন্দ্রের শব্দ বিচিত্রকে, বিপরীতকে ফোটাবার বিপর্যয় কাণ্ডে খুশি। সুন্দর সন্ধানের মতোই বিকট উদ্ভটের সন্ধান করেছে তা। শিবের নাচের চেয়ে শিবের ভূতের নাচের প্রতি তাঁর শব্দের ভালবাসা কম নয়।

এখানে কিন্তু স্বীকার করতে হবে, বচনীয়কে বাচ্যে ধ'রেই ভারত-চন্দ্র ক্ষান্ত হন নি—অনির্বচনীয়ের প্রতিও এই উজ্জ্বলদৃষ্টি কবির আকর্ষণ ছিল—তাঁর খোলা চোখের উপরে আঁখিপল্লবের ছায়া নেমেছে কখনো-কখনো—কবি যখন গান ধরেছেন। তখন ভাবাতুর, রসাতুর, রহস্যাতুর শব্দগুলি কবিচেতনার আলোছায়াপথে আনাগোনা করেছে, সুরের রেণুমাখা পাখা মেলে তারা উড়ে গেছে অপর ফুলের গর্ভে সৃষ্টি-সম্ভাবনা সঞ্চার করতে।—

'এ কি মায়া, এ কি মায়া!' 'এবার পাথারে ফেলিয়া আমারে, দোষ বারে বারে লয়ো না।' 'কে তোমা চিনিতে পারে মাগো।' 'যদি না তারিবে, যদি

না চাহিবে, ভারত চাহিবে কারে।' 'ভবসিন্ধু বিন্দু জানি, পার হৈনু হেন মানি, সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে।' 'ভাল মালা গাঁথে ভাল মালিয়া রে, বনমালী মেঘ-মালী কালিয়া রে!' 'চুপে চুপে এসো যেয়ো, আর দিকে নাহি ধেয়ো, সদা এক-ভাবে চেয়ো এই রাধিকায়।' 'আপন মণিময় বেচিনু তোমায়।' 'হাসি হাসি উত-রোল, আধ আধ আধ বোল।' 'প্রাণ কেমন রে করে, না দেখে তাহারে ; যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে!' 'মৃদু মৃদু হাসি বাজাইছে বাঁশি, কোকিল বিকল তায়।' 'অধরে মধুর হাসি, বাঁশিটি বাজাও হে।' 'ওহে বিনোদ রায়, ধীরে যাও হে!' 'একি অপরূপ তরুতলে, হেন মনে সাধ করে তুলে পরি গলি।' 'পসারী গোপের নারী বসিয়াছে সারি সারি, রসের পসরা গীত নাটে।' 'কি বলিলি মালিনী, ফিরে ফিরে বল, রসে তনু ডগমগ মন টলটল।' 'কোন্ পথ দিয়া কেমন করিয়া।' 'জানো কত খেলা-দেলা।' 'আলো, আমার প্রাণ কেমন লো করে, আকুল পরাণ মোর অকূল পাথারে।' 'সে দেখে সবারে, কে দেখে তাহারে!' 'সে কেমনে রবে ঘরে, ঘরে এত জ্বালা যার।' 'লোকে মোরে বলে মিছা চোর।' 'আলাপে মাতিল মন মাতালে নাচায়ো না।' 'কি দেখিনু অপরূপ রূপের বাহার!' 'সে মোর নাগর চিকন কালা, তারে সাজে ভাল বকুলমালা, আমি রয়ে লব পুরিয়া থালা।' 'চলো চলো রে ভাই, চলো চলো।'

আরও কত আছে। বিশেষতঃ বিদ্যাসুন্দরের তিনটি গানে, যা এখানে তুলি নি, আগে উদ্ধৃত হয়েছে বলে ('চলো সবে চোর ধরি গিয়া', 'আজি ধরা গেল চোর চূড়ামণি', 'ওহে পরাণবঁধু, যাই গীত গেয়ো না')— সেই অপূর্ব রসময় রচনাগুলি ভারতচন্দ্রের শব্দব্যঞ্জনাসৃষ্টির সন্দেহাতীত প্রমাণ।

কিন্তু ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যমধ্যে ঐ অপরূপতার নয়, দৃশ্যরূপেরই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। শব্দব্যবহারে অর্থদ্যোতকতাই (অর্থাতীত হওয়া নয়) তাঁর মূল লক্ষ্য, এবং সেজন্য প্রশংসাও পেয়েছেন। হেম-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মেঘনাদবধের সমালোচনা করতে গিয়ে এই শব্দের প্রয়োগসার্থকতার দিক দিয়ে ভারতচন্দ্র ও মধুসূদনের তুলনা করে-ছিলেন। তাঁর মত ছিল, ভারতচন্দ্র অনুষঙ্গ-সহিত শব্দপ্রয়োগ করে-ছেন, মধুসূদন তা করতে পারেন নি, এবং ভারতচন্দ্রের মতো মধুসূদনের শব্দ রসালও নয়। সমালোচনার এই অংশ হেমচন্দ্র পরে প্রত্যাহার

করে বলেন, না, মধুসূদনের শব্দবিন্যাস বিষয়ানুগ হয়েছে, বিদ্যাসুন্দরের শব্দাবলীতে মেঘনাদবধ রচিত হলে জঘন্য হত। হেমচন্দ্র মধুসূদনের শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর আপত্তি তুলে নিয়ে ঠিক কাজ করেছিলেন কিনা বিতর্কের বিষয়; রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় মধুসূদনের শব্দকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সশব্দের বেশি ভাবতে রাজি ছিলেন না—কিন্তু হেমচন্দ্র ভারতচন্দ্রের শব্দবিষয়ে যা বলেছেন তার মূল্য সবিশেষ। মুখের বুলিকে সাহিত্যে তুলে নিয়ে ভারতচন্দ্র বাংলাসাহিত্যে প্রাণের সাড়া এনেছিলেন—এই কথাটা দুঃখের বিষয় অনেকে বোঝেন নি—তাঁরা মাত্র কবির কারিকুরিই দেখেছেন।

॥ ৪ ॥

শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার

প্রয়োগেই শক্তির প্রমাণ। ভারতচন্দ্রের কাব্যে শব্দের প্রয়োগ-সাফল্যের অজস্র দৃষ্টান্ত ইতিমধ্যে দিয়েছি। আরও কিছু দেব। কবি জীবনধর্মী কতকগুলি মানুষকে তাঁর কাব্যে এনেছিলেন—তাদের মুখের শব্দগুলিকে দেখতে চাই। অন্নপূর্ণামঙ্গল আখ্যানকাব্য বলে তার মধ্যে নাটকীয়তার অবসর আছে, ভারতচন্দ্র তার সুযোগ যথেষ্ট নিয়েছেন। স্বচ্ছন্দে তাঁকে পুরনো বাংলাসাহিত্যের সেরা চিত্রনাট্য-কারের সম্মান দিতে পারি।

'চিত্রনাট্যকার' কথাটির দ্বারা ভারতচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার সীমা-বদ্ধতার দিকটিও দেখিয়ে দিতে চাই। সুগভীর নাট্যরস তাঁর মধ্যে নেই, কারণ গভীর জীবনদ্বন্দ্ব প্রকাশের চেষ্টা তিনি করেন নি, সে বস্তুর কিছু আভাস কেবল আছে ব্যাস-কাহিনীতে; ব্যাসের অন্তিম প্রস্থা-নের বর্ণনায় সহসা কোন্ ঘনবর্ণ অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল তা আগে দেখিয়েছি। সাধারণ বাঙালির জীবননাট্যের অতি সহজ অথচ ঘনীভূত ক্ষণটিকেও কবি অন্নদা-পাটনী-সংবাদে কিভাবে ফুটিয়েছেন, তার বর্ণনা দিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ জায়গায় ভারতচন্দ্রের নাটকীয়তা কোনো বিশেষ পরিস্থিতির রঙ্গভঙ্গকেই আশ্রয় করেছে, যার জন্য গতিশীল

নাটক অপেক্ষা নাট্যচিত্রই আমরা বেশি পাই। এই নাট্যচিত্র গার্হস্থ্য-জীবনের আনন্দবেদনার সঙ্গে জড়িত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে বালিকা উমা ও নারদের কথাবার্তায়, শিবসংসারের কলহবিবাদে; কামমধুর রোমান্সে লিপ্ত হয়ে রূপ ধরেছে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীতে। সেসব দেখে এসেছি। এই বিদ্যাসুন্দরেই নাট্যচিত্রের সেরা নমুনা আছে সুন্দর-মালিনী-সংবাদে। তার পরিচয়ও পাঠক পেয়েছেন। ঐ কাব্যে বিদ্যা ও রাণী-সংবাদ, রাণী ও রাজা-সংবাদ, রাজা ও কোটাল-সংবাদ, একই প্রকার তীক্ষ্ণ সাফল্যের নিদর্শন। এখানে আমি আরও কিছু দৃষ্টান্ত যোগ করতে চাই, যার একটির বিষয়বস্তু পুরাতন কিন্তু ভারতচন্দ্রের প্রতিভায় স্থায়ী দীপ্তিতে উজ্জ্বল। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে ভবানন্দের সঙ্গে তাঁর দুই রাণীর পুনর্মিলনের কথাই বলছি।

ভারতচন্দ্র প্রথমেই কিছু অকরুণ (নাকি সকরুণ!) রসিকতা করেছেন—'দুই নারী বিনা নাই পতির আদর।' দুই নারীর প্রতিযোগিতাপূর্ণ সমাদর প্রায়ই প্রাণান্তকর হয়, এক্ষেত্রে হতে পারত—যদি না ভবানন্দ যথেষ্ট চতুর হতেন। রাজনীতি ও কামনীতি—উভয় নীতিতে চাণক্য-নৈপুণ্য দেখিয়ে ভবানন্দ কিভাবে উভয়েরই সারাস্বাদ (ও সুরাস্বাদ) করেছেন, কবি তার লোভজনক বিবরণ দিয়েছেন। আমরা কিছু নমুনা দিচ্ছি, পাঠক তার মধ্যে ঘরোয়া শব্দের ব্যবহারে কবির সাফল্য দেখে নেবেন, নাটকীয়তাসৃষ্টিতে সাফল্য দেখার সঙ্গে-সঙ্গে।

ভবানন্দ ঘরে ফিরছেন—চাকর বাসু অগ্রিম সংবাদ দিল বড়রাণীর দাসী সাধী ও ছোটরাণীর দাসী মাধীকে—'দুই ঠাকুরাণীকে সংবাদ দেহ গিয়া, রাজা হয়ে ঠাকুর আইলা ডঙ্কা দিয়া।' শোনামাত্র তারা পড়ি-মরি করে ছুটল। এধারে ভবানন্দ বাড়ি পৌঁছে গৃহদেবতা গোবিন্দকে রীতিমাফিক প্রণামাদি করলেন, তারপরে জনক-জননীর পাদবন্দনা ইত্যাদি। এরপরে ভবানন্দের অন্তর্জগতের সমস্যা—আমার তো দুটি আছে—কি করি—'দুই নারী দুই ঘরে, কোথা যাব আগে?'

উপায়—কালহরণ, মাতৃমন্দিরে। মায়ের কাছে খাওয়া-দাওয়া সেরে, পান চিবুতে-চিবুতে ভবানন্দ সাত-পাঁচ কথা ভাবতে থাকেন।

এত ভাবি জননীর নিকটে বসিলা।
বিদেশের দুঃখ কত কহিতে লাগিলা॥
দেখা হেতু বন্ধুবর্গ এসেছিল যারা।
ক্রমে ক্রমে সকলে বিদায় হইল তারা॥
দরবেরে কাপড় ছাড়িল মজুন্দার।
দাস্ জোগাইল ধুতি-জোড় পরিবার।
সায়ংসন্ধ্যা সমাপিয়া বসি পান খান—

ঠিক তখনি ছুটে গেল বড়রাণীর কাছে তার খাস দাসী সাধী—গা তোলো, গা তোলো রাণী! এখন যদি ঠাকুরকে আদায় করে নিতে না পারো, তাহলে ছোটরাণী হাতিয়ে নেবে। সুর টেনে-টেনে সাধী বলতে লাগল—

বড় ঠাকুরাণী গো।
ঠাকুর হইলা রাজা, তুমি রাণী গো॥—

'ওগো মা, তোমারই তো অধিকার। কিন্তু যে অবস্থা দেখছি, তাতে মনে হয় বুঝি—'ছোটর ঘরেতে হবে রাজধানী গো!' দেখে এলাম—ছোট-রাণীর সঙ্গে মাধী কানাকানি করছে। সেই তাহলে টেনে নিয়ে যাবে, এখন তারই তো দিন, তার কাঁচা বয়স, প্রভুও যুবজানি হতে উৎসুক—

যুবা সুয়া, বুড়া দুয়া, সবে জানি গো।…
ছোটরে বলিবে লোকে মহারাণী গো।
তোমারে বলিবে বুড়া ঠাকুরাণী গো॥…
পুত্রবতী গুণবতী বট জানি গো।
যৌবন সে পতি-মন লবে টানি গো॥

সুতরাং যৌবন দিয়েই কার্যোদ্ধার করতে হবে। সাধীর উপদেশে বড়রাণী তার স্খলিত যৌবনকে মেরামত করতে উদ্যোগী হল। খোঁপা বাঁধল টান করে, সজোরে টিপে চোখে কাজল দিল ('পীড়িয়া কাজল চোখে দিলা'—'পীড়িয়া' কথাটির অপূর্ব ব্যবহার), তেল দিয়ে মুখ মাজল, মাথায় দিল ফুল, নানা মন্ত্র-সঙ্গে সিঁদুর পরল, গায়ে গন্ধ ঢালল—কিন্তু হায়, দেহের যে-দুটি অস্ত্রে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ, তারা বয়োগুণে ঔদ্ধত্য হারিয়ে নতশির, তাদের মুখ তুলে দাঁড় করাবে কি করে?

বড়রাণী এই চিন্তায় যখন বিপন্ন বিষণ্ণ, ঠিক সেই সময়ে উৎপাত—কোলের ছেলে ককিয়ে কেঁদে উঠল :

ছেলে কেন্দে ওঠে কোলে, তোষেন মধুর বোলে,
কান্দ না রে, ঐ তোর বাপা !
তোর বাপে আনি গিয়া, থাকো বাছা চুপ দিয়া,
অই ডাকে—কানকাটা হাপা !

চুপ চুপ চুপ, বাছা চুপ কর্, কানকাটা হাপা ডাকছে, এক্ষুনি ধরে নিয়ে যাবে।—ছেলেকে চাপড়ে, ভয় দেখিয়ে একটু ঠাণ্ডা করে, দাসীর কোলে তুলে দিয়ে, যতটুকু সংগ্রহ সম্ভব তাই শরীরে জুটিয়ে, বড়রাণী দেউড়ির কাছে প্রহরীর মতো পাহারায় রইল।

উল্টোপক্ষেও প্রস্তুতি যথোপযুক্ত। ছোটরাণীর দাসী মাধীর কথায় কম মুন্সীয়ানা ছিল না। বুঝিয়ে বলল— তোমার সর্বস্ব যায়। তোমার সতীনের কোলে তিন বেটা ; শ্বশুর-শাশুড়ীকে সে হাত করে রেখেছে, ঘরদ্বার সকলই তার, তোমার নিজের বলতে কেবল আমিই আছি—'এই মাধী কেবল তোমার।' মনে রেখো, প্রভু রাজা হয়ে ফিরেছেন, তিনি যদি আগে বড়র ঘরে যান, সেই হয়ে যাবে মহারাণী, আর 'তুমি হবে দাসীর সমান।' সুতরাং উঠে পড়ো, 'দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাকো, আঁখি ঠার দিয়া ডাকো।' আমি ঠাকুরকে খবর দিই। যদি একবার তাঁকে ঘরে এনে ফেলতে পারি, তাহলে তুমি নির্ঘাত রাণী। বেশী বলার দরকার ছিল না—যৌবনবতী ছোটরাণী তৎপর হয়ে উপদেশমতো কাজ করল। তখন মাধী প্রভুপত্নীর দিকে তাকিয়ে, সেই পদ্মমুখী-শরীরের বিজয়-পতাকার আন্দোলনে আশ্বস্ত হয়ে, চলল প্রভুর কাছে—তার সেই আশ্বস্ত গমনকে কবি ফুটিয়েছেন অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক নৈপুণ্যে, যখন বলেছেন, প্রভুপত্নীর যৌবনগরিমা দাসীর অঙ্গ বেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে :

এত বলি তাড়াতাড়ি চলিল বাহির বাড়ি
মাধী যেন মাতাল মহিষী।
চূড়া-ছাঁদে বাঁধা চুল তাহাতে চাঁপার ফুল
আঁচল লুটায় মাটি মিশি ॥

মাধী-মুখে স্ত্রীর পত্র পেয়ে ভবানন্দ মাতোয়ারা। এতক্ষণ মায়ের সঙ্গে ইতস্ততঃ কথাবার্তা চলছিল, এবার মাতৃসঙ্গে অরুচির লক্ষণ। মাও বুঝলেন। মা হয়ে ছেলেকে চিনবেন না?

রাখিতে কে পারে আর মাধী দিল টান।
ঘাড় ফিরে আড়ে-আড়ে মার দিকে চান॥
মায়ের পোয়ের ভাব রহে নাকি ছাপা।
সীতা কন ঘরে গিয়া পান খাও বাপা॥

হাসি-হাসি আগে যাচ্ছে মাধী-দাসী, পিছনে থরোথরো মজুন্দার, এমন সময়ে—সর্বনাশ! সামনে বড়রাণী চন্দ্রমুখী পথ আটকে! অনুনয় করে সে বলল, আমার ঘরে চলো, সেখানে পান-জল খাবে। কাতর হয়ে বলল, ছেলেদের জন্য অন্ততঃ চলো। 'দেখিবারে ছেলেপিলে হয়েছে বিকল।' ফলে মজুন্দারের 'বড় উন্মাদ' অবস্থা। কি করি! 'কার ঘরে আগে যাব?' ছোটর ঘরে যেতে মনোরথ, কিন্তু 'বড় কৈলা বাদহাটা আগুলিয়া পথ।'—

এক চক্ষু কাতরায়ে ছোটঘরে যায়।
আর চক্ষু রাঙা হয়ে বড়জনে চায়॥

পরিস্থিতি সংকটজনক। দুই দাসী-দূতীতে এবার বেধে গেল 'কথার হুটাহুটি।' একজন বলল, 'তুই ঘরমজানো কৈকেয়ীর কুঁজি', অন্যজন উত্তর দিল, 'আমি জানি অমন বিস্তর এঁড়ে ডাক!' মাধী ছুটে গেল ছোটরাণীর কাছে। 'সাধী হারামজাদী' তোমার কাছ থেকে ঠাকুরকে সরিয়ে নিতে চায়, আমাকে কথা শোনাচ্ছিল, তেড়ে শুনিয়ে দিয়েছি ('দিয়াছি খুব ঝাড়াঝাড়ি')—এখন চলো তুমি—।

'মাধীর বচনে পদ্মমুখী ত্বরান্বিতা' হয়ে চলে এল। ভবানন্দর কাছে গিয়ে 'গলায় আঁচল দিয়া কৈল নমস্কার।' নয়নে নয়নে দুজনের কথা হয়ে গেল। 'পদ্মমুখী তুষ্ট হৈলা ইশারা পাইয়া।' এবার তার উদারতার বান ডাকল। বিনয়ে গলে গিয়ে বলল, আহা, 'বড়দিদি দাঁড়াইয়া কেন দুঃখ পান, উচিত যে উহারি মন্দিরে আগে যান।' ভবানন্দ বাঁচলেন। আশ্বস্ত প্রৌঢ় রসিক মিষ্টান্নভোজনের আগে একটু তিক্তরস আস্বাদ

করতে চাইলেন। 'দু সতীনে কোন্দল নহিলে রস নহে।' দাসীদের সরিয়ে দিতে বললেন, তোরা নিজেদের ঘরে যা। দরকার হয় আমি 'কামের করাতে ভাগ করি কলেবরে, সমভাগে রব গিয়া দুজনার ঘরে।' না হয়, যে ধরে নিয়ে যেতে পারবে, তার ঘরে আগে যাব। দাসী দুজন সরে গেল—দুই সতীন মুখোমুখি দাঁড়াল কলহ করতে।

না, ঠিক কলহ নয়—রাণীরা দাসী নয়—তারা কথার, হাসির ছুরি-খেলায় নামল। ছোটরাণী বেশি বলল না, কেবল ছুরির ফলাটুকু বড়র বুকের ঠিক মাঝখানটিতে বিঁধিয়ে দিয়ে হাসতে লাগল :

পদ্মমুখী বলে ভাল আজ্ঞা দিলা স্বামী।
ধরি লইতে তোমারে তো না-পারিব আমি।
বড়দিদি বড় সুয়া, সব কাজে বড়।
ধরি লইতে উনি বিনা কেবা হবে দড় ॥

উত্তরে বড়রাণী অনেক কথা বলল। বলতে লাগল আর বুঝতে লাগল—শেষ জিৎ ছোটরই। স্বামী-শিকারের অব্যর্থ শর তার নবীন দেহেই আছে, কেননা ভবানন্দ রসিক রাজসিক পুরুষ। বড়রাণী খুবই জানে। তাই সে ছোটর দিকে ফিরে বলল, বোন, বড় ব্যঙ্গ করলে। একদিন আমি দড় ছিলুম বটে, কিন্তু তিন ছেলে কোলে নিয়ে এখন আর কত দড় হব বলো ? সেদিনের কথা আর এদিনের কথা !—

দড়বেলা ফিরিয়াছি কত ঠাট করি।
ধরিতে না হইত, প্রভু আনিতেন ধরি ॥
এখন ধরিতে চাহি ধরা দিলে পারি।
ধরাধরি যার সঙ্গে ধরাধরি তারি ॥

কলহের কটু কথা ছাপিয়ে বিগতযৌবনা নারীর খেদোক্তি মর্মান্তিক যন্ত্রণায় ছটফট করেছে :

তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সুয়া।
হারায়ে যৌবন আমি হইয়াছি দুয়া ॥
সুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেন, নিম হন তিনি ॥

ক্ষোভে রোষে অনেক বেশি বলে, মুখের ঝগড়ায় অবশ্যই বড়রাণী

জিতেছিল। এই জয়ের চেয়ে পরাজয় আর কি হতে পারে! ছোটরাণী অল্প বলে, বড়কে ছিটেয় জ্বালিয়ে, স্বামীর ইঙ্গিতে তুষ্ট হয়ে, গরবিনীর মতো যখন প্রস্থান করেছিল, তখন, তারি মধ্যে, ভারতচন্দ্রের প্রতিভায় সংসারজীবনের একটি শিল্পসফল একাঙ্কিকা আমরা পেয়ে গেছি।

অন্তঃপুরের নাটকের পরে বারবাড়ির নাটক দেখা যাক। কুটনী ও কোটালকে মুখোমুখি দেখব। এদের একজন সমাজঘরে সিঁদ কাটবার সুযোগ করে দেয়, অন্যজন ও-কাজ ধরবার জন্য মাইনে খায়। স্বভাবতঃই প্রথমের হাত দ্বিতীয়ের টুঁটিতে। বিচিত্র এই, প্রায়ই দেখা যায়, টুঁটির কঠিন হাত শিথিল হয়ে আদরে গলা জড়িয়েছে—গলাগলি চলেছে কুটনী ও কোটালে—দুজনেই চোরের পয়সায় সুখে পানভোজন করছে।

লোকে বলে—আধুনিক লোকেরা ধিক্কার দিয়ে বলেন—ধর্মব্যাপারটা একেবারে অনড়, ধার্মিকেরা ধারাবাহী, আয়োজনে আয়তনে সর্বদাই অচল। হয়ত। কিন্তু সাহিত্য পাঠ করলে দেখা যাবে—অধার্মিকেরা কম ধারাবাহী নয়। তাদের চেয়ে ঐতিহ্যবাদী কম দেখা যায়। একথায় যদি কারো সন্দেহ হয়, তাহলে কালিদাস, শূদ্রকের চোর বা পুলিশের চেহারার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের পুলিশের চেহারা মিলিয়ে নেবেন।

ভারতচন্দ্রের কোটালের নামটি তাৎপর্যপূর্ণ—ধর্মকেতু! পুলিশের কর্তা হিসাবে তার মধ্যে রয়েছে নিরেট বিরাট বর্বরতা। অপরদিকে কুটনী-মালিনীর মধ্যে সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও চতুর কুশলতা। পূর্ব অধ্যায়ে কোটাল কিভাবে চোর-সুন্দরকে ধরেছিল বলেছি। ঐ সময়ে কোটালের হাতে মালিনী-নিগ্রহের উল্লেখও করেছি। এবার তার পুরো চেহারাটা দেখা যাক।

কোটাল খাঁটি বঙ্গবীর। নারীর উপরে যত বীরত্ব। দৈহিক নিগ্রহও বাদ যায় না। অপরপক্ষে শরীরের শক্তিতে হারলে কি হয়, হীরা (বঙ্গনারীর মতোই?) কণ্ঠে অপরাজেয়। আজ কিন্তু হীরার হার। সুড়ঙ্গের মতো বাস্তব তথ্যটাকে তো ওড়ানো যায় না! সেই প্রত্যক্ষ

প্রমাণের সামনে দাঁড়িয়ে, গোড়ায় কুঁকড়ে গিয়েও পরে তার আত্ম-রক্ষার চেষ্টা, বন্দী সুন্দরকে দেখে, ও তার মুখে অসহ্য মাসী-ডাক শুনে পাড়া মাথায় করার ভঙ্গি—নাট্যচিত্র হিসাবে অতুলনীয়।

গোড়া থেকে আরম্ভ করা যাক। সুড়ঙ্গপথ দিয়ে বিদ্যার ঘর থেকে মালিনীর ঘরে গেল কোটাল সদলবলে। তারপর মালিনীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল:

কোতোয়াল শুনি ভাল খাঁড়া ঢাল ধরে।
ছুটে বীর যেন তীর মালিনীর ঘরে ॥
আগু সরে চুলে ধ'রে দর্প করে কয়।
কথা জোর বল চোর কেবা তোর হয় ॥
দেই গালি বল শালী কোথা পালি চোরে।
কেটা সেটা কার বেটা বল সেটা মোরে ॥

মার খেয়ে প্রথমে হীরা চমকে গিয়েছিল, তারপর ফুঁসে উঠল। তাছাড়া সে সত্যই বিদ্যার ঐদরিক গোলযোগের কথা জানত না। চড়ে বলল: আরে কোটালিয়া, আমাকে মেরে খুন করে ফেললি? কি দোষ দেখলি যে, এমন কাজ করতে সাহস করলি? এর ফল পাবি। তিন প্রহর রাত ধরে তুই ডেকে ডাকাতি করে বেড়াস, রাজার দোহাই দিয়ে বাড়ি লুঠ করিস, ধরে লোকের জাত খাস—তোর এতবড় সাহস?

অন্য সময় হলে রাজার বাড়ির মালিনীর গায়ে হাত তুলতে কোটা-লের সাহস হত না, বিশেষতঃ মালিনীর মুখের খ্যাতি যখন সর্ববিদিত। আজ কিন্তু কোটালের হাসার পালা।—হেদে বুড়ি শালী, এসব কথা বলতে তোর লজ্জা হচ্ছে না? ভয়-ডর বুঝি নেই? শুনে হীরাও উত্তর দিল: ওরে বেটা, 'তোরে ভয় করে কেটা? তোর গুণপনা জানে সর্ব-জনা'—সেকথা বুঝি ভুলে মেরে দিয়েছিস!

বারবার চরিত্তির ধরে টান দিতে সেটা কোটালের মোটা চাম-ড়াতেও বাজল। রেগে গেল খুব।—কি বলিলি বুড়ি মাগী? কুটিনী তুই, ঘরে চোর পুষিস, আবার গলার জোর দেখাচ্ছিস?

এবার হীরা ক্ষেপে গেল। এত বড় কথা? যতবড় মুখ নয় ততবড়

কথা! আমি হলুম রাজার মালিনী, আমাকে কুটিনী বললি? দাঁড়া, কাল তোকে শেখাব কোন্ কথার কি মানে? আঁ্যা—আমি কুটিনী? বল্ না, কার যুবতী বেটি বহুড়ী কাকে ভেট দিয়েছি আমি? আর তুই —নচ্ছার—

লোকের ঝি-বউ লয়ে সদা থাকো মত্ত হয়ে
তোর ঘরে যত সকলি অসত
আমি দিতে পারি কয়ে ॥

কোটালের আর সহ্য হল না। রাগে ফুলে উঠে, মালিনীর চুল ধরে মাটিতে পেড়ে ফেলল, সগর্জনে বলল, কুটিনী গস্তানী, তুই মস্তানী করছিস! এখনি তোকে শূলে চড়াবো। তোর এতবড় আস্পর্ধা যে, আমাকে কথা শোনাচ্ছিস! জানিস—'রাজার নন্দিনী হয়েছে গর্ভিণী, তুই দিলি চোরা-বর?'

মুহূর্তে পটবদল। কী সর্বনাশ! সত্যি? হীরার মনে বিদ্যুৎ ঝলসালো—নিশ্চয় সত্য। তাহলে উপায়? হীরার পরিবর্তিত চেহারার অনবদ্য ছবি :

হীরার হইল ভয় কানে হাত দিয়া কয়
আমি জানি নাই জানেন গোঁসাই
যতো ধর্মস্ততো জয় ॥

হায়, আজ ধর্ম করমর্দন করছে ধর্মকেতু কোটালের সঙ্গে! কোটালের ধর্মহাত মালিনীকে টেনে নিয়ে গিয়ে সুন্দরের ঘরের মধ্য সুড়ঙ্গদর্শন করিয়ে দিল। মালিনী বুঝল, কিভাবে কাজটি সমাধা হয়েছে। এড়াবার উপায় নেই—'হাতে-নাতে ধরিয়াছে।' কাকে কি বলব? 'যার ঘরে সিঁদ সেকি যায় নিদ?' নির্বাক হীরাকে এবার কোটাল হিঁচড়ে নিয়ে চলল সুড়ঙ্গ দিয়ে চোরের কাছে। সুন্দর ও হীরা মুখোমুখি। সুন্দরের নাগরিকতা অনবদ্য, ঔজ্জ্বল্যে হীরাকেও ম্লান করে দিল। উভয়ের সংলাপ :

সুন্দর কহেন হাসি এস গো মাসী হিতাশী।
মলিনী রুষিয়া বলে গালি দিয়া
কে তুই কে তোর মাসী ॥

কি ছার কপাল মোর　　আমি মাসী হব তোর
মাসী মাসী কয়ে　　ছিলি খাসা লয়ে
কে জানে সিঁধেল চোর ॥
যজ্ঞকুণ্ড ছল পাতি　　সিঁধ কাট সারা রাতি
আই মা কি লাজ　　করিলি যে কাজ
ভাগ্যে বাঁচে মোর জাতি ॥

হীরা রাগে, সুন্দর হাসে। তারপর সুন্দর কথা বলে, হীরা আরও অস্থির হয়। বিশেষতঃ অসহ্য ঐ মাসী-ডাক। সুন্দরের প্রতি বিদ্বেষ শেষ পর্দায় চড়িয়ে কোটালের করুণা চায় সে :

আরে বাছা ধূমকেতু　　মা বাপের পুণ্যহেতু।
কেটে ফেল চোরে　　ছাড়ি দেহ মোরে
ধর্মের বাঁধহ সেতু ॥
সুন্দর হাসি আকুল,　　মাসী সকলের মূল।
বিদ্যার মাশাশ　　মোর আইশাশ
পাড়ি দিয়াছিল ফুল।
কৌতুক না বুঝে হীরা　　পুনঃ পুনঃ করে কিরা।
কি বলে ডেকরা　　বড় যে চেগরা
ঐ কথা ফিরা ফিরা ॥

॥ ৫ ॥

প্রবচনেন লভ্য

নাটকে চাই ঠিক শব্দটি। এই শব্দটিকে 'দর্শন' করতে হয়। তারপর প্রকাশ করতে হয়। প্রকাশ করার সময়ে মাজতে হয়, কিন্তু দেখতে হয় যে, জীবনবর্ণ না হারিয়ে ফেলে। সে জীবন কেবল বিদগ্ধের নয়, অবিদগ্ধেরও। প্রবাদকার ভারতচন্দ্রকে এইখানে পাচ্ছি, যিনি নাগরিকতার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন ইতর জীবনের চাঞ্চল্য, তারপর জিনিসটিকে বেঁধে দিয়েছিলেন কয়েকটি শব্দে।

ভারতচন্দ্র বাংলাসাহিত্যের সেরা প্রবাদকার। এ গৌরব অল্প নয়। প্রবাদ মুখে-মুখে ফেরে। সুতরাং প্রতিদিনের জীবনে প্রবাদকার বর্তমান

থাকেন। কেবল উচ্চবর্গ নন, নিম্নবর্গও প্রবাদ ব্যবহার করেন। সেজন্য রাজার সভাকবি হয়েও ভারতচন্দ্র আংশিক গণকবি।

ভারতচন্দ্রের এ কোন্ শক্তি, যা তাঁকে তাবৎ বাঙালি-কবির মধ্যে প্রবাদস্রষ্টা হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব দিল? একটি উত্তর—তাঁর মানবিকতা।

কোন্ অর্থে মানবিকতা বলছি? সাধারণভাবে ভারতচন্দ্র মুকুন্দ-রামীয় সহজ সহানুভূতির মানবিকতায় পূর্ণ ছিলেন না। তাহলে?

প্রবাদের মৌল উপাদান সামাজিক অভিজ্ঞতা। ঐ অভিজ্ঞতাকে স্বল্পাক্ষরে প্রকাশ করা হয় এবং ক্ষুরধাররূপে। সমাজের বাস্তব প্রয়োজনকে, সমস্যাকে, তার কার্যকর সমাধানকে সূত্রাকারে প্রকাশ করেই প্রবাদকার-কবি মানবিক।

ভারতচন্দ্র ছাড়াও অনেক বাঙালি-কবি উজ্জ্বল ভাবগর্ভ উক্তিতে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন (তাঁদের মধ্যে পূর্বকালে বড়ু চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব সর্বাধিক, যিনি একাধিক অর্থে ভারতচন্দ্রের পূর্বসূরী)—তাঁরা নন, ভারতচন্দ্রই প্রবাদ-প্রৌঢ়োক্তির ব্যাপারে অধিক গণস্বীকৃতি পেলেন কেন—তার উত্তর, ভারতচন্দ্রের বচনের শুধু মার্জন নয়, অমার্জনও বটে।

ভারতচন্দ্রের ভাষার নিকষিত দ্যুতির কথা জানি—এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তার ভাবের ইতরতার দিকে। ইতর অর্থে অশ্লীল কিছু নয়—ইতর অর্থে সাধারণ।

প্রবাদের গৌরব ভাবের সূক্ষ্মতায় নয়, তার উচ্চতায়ও নয়, নিত্য-সত্যের উদ্ঘাটনে নয়, প্রবাদকার ঋষি নন—তা রয়েছে সামাজিক অভি-জ্ঞতার নিশ্চিত, ভঙ্গিতে অভ্রান্ত, সতেজ ক্ষিপ্র ঘোষণাতে। চিরসত্যের সঙ্গে সাংসারিক অভিজ্ঞতার বিরোধ ঘটে বহুসময়, সুতরাং প্রবাদের সঙ্গেও। প্রবাদ প্রয়োজনের সত্যকেই আঁকড়ে ধরে, তারপর ছুটে চলে স্বার্থসাধনে। চতুর মনের ধনুতে শররূপী প্রবাদ কদাপি দ্বিধান্বিত-গতি নয়, যেহেতু ভেদ করাই তার লক্ষ্য।

ভারতচন্দ্র তা জানতেন। তিনি বহু স্থূল, স্বার্থসন্ধ, রূঢ় ও হিসাবী উক্তিতে ক্ষুরের ধার, হীরার পালিশ, শরের গতি এবং প্রয়োজনের তাগিদ যোগ করে দিয়েছেন। এইকালে তিনি চিন্তাপীড়াহীন, নাতি-

গভীর ও দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন—সামাজিকের মনে উত্তেজনাসৃষ্টি করতে ও তাকে উপভোগ করতে উৎসুক, উৎসাহী[১৪], সমাজঅভিজ্ঞতার চতুর-সূত্রকার।

প্রবাদ রচনা করা কঠিন, ব্যবহার করা সহজ। ব্যবহার করবার জন্য এমন-কি বেশি সন্ধানী হওয়ার প্রয়োজনও নেই—বহু প্রবাদ পূর্ব থেকেই জন্মে আছে। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য প্রবাদের রত্নাকর। ভারতচন্দ্র তাঁর প্রবাদ রচনাকালে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ঋণ নিয়েছেন; তাঁর কতকগুলি প্রবাদ সংস্কৃতের বাংলা ভাষান্তর (সাহিত্যপরিষদ সংস্করণের 'টিপ্পনী' অংশে অনেক মূল সংস্কৃত শ্লোক আছে)। যেখানে তিনি নতুন রচনা করেছেন, সেখানেও সংস্কৃত সাহিত্যের শিক্ষা তাঁর সহায়ক হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষায় গাঢ়বন্ধ বাক্‌সংহতির চরম নিদর্শন আছে। ভারতচন্দ্র তা বিশেষভাবে জানতেন।

প্রবাদ-উপাদান হাতে পেয়ে যথেচ্ছ ব্যবহার করলেই চলবে না—ঐ ব্যবহারের সাহিত্যমূল্য প্রমাণ করতে হবে লেখককে। যত্রতত্র প্রবাদ ব্যবহারের ইতর লোভের জন্য পুনশ্চ এই প্রবাদ রচিত হয়েছে—প্রবাদ সৃষ্টি করে বুদ্ধিমান, ব্যবহার করে নির্বোধ। পুরনো বাংলাসাহিত্যে এই

১৪। এ কথা মনে করার কারণ নেই, প্রবাদের ভাবগত ইতরতায় কৃষ্ণনগরের অভিজাত বিদগ্ধ রাজসভা একটুও অখুশি ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সাজানো সভায় বাণেশ্বরের সঙ্গে গোপাল ভাঁড়ের সহাবস্থান, তা দীনেশচন্দ্রের রচনা অনুযায়ী আগেই দেখিয়েছি। ভারতচন্দ্র ঐ দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে মিটি-মিটি হেসেছেন। ভারতচন্দ্রের একথা বুঝতে দেরী হয় নি, রাজসভা ও জনসভা—উভয়ের ভোগ্য-বস্তু একই, কেবল রাজসভার জন্য একটু পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার। রাজসভা জনসাধারণের চেয়ে কম গাঁজানো ঝাঁঝালো জিনিস চায় না—পাত্রটা ভাল হলেই চলে যায়। ভারতচন্দ্র তা বুঝে, অসাধারণ কৌশলে উভয়ের পাতে দেবার উপ-যোগী রসকরা তৈরী করেছিলেন। বিচিত্র ব্যাপার হল, নীতিবাতিকতা অভিজাত বা অনভিজাত—এই দুই স্থলে অনুপস্থিত, তা সরবে উপস্থিত মধ্যবর্তীদের মধ্যে, যারা হয় আদর্শে উত্তোলিত-বিবেক, নয় রুচিতে উন্নীত-নাসা। কিংবা তাদের অশ্লীল আঙুরফল টক !!

ধরনের নির্বুদ্ধিতার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ভারতচন্দ্রের সাহিত্য তেমন নির্বুদ্ধির অতিবুদ্ধির দড়ি ধরে ঝোলে নি। তাঁর সাহিত্যে এপিগ্রাম ছিল—এপিগ্রাম্যতা ছিল না।

প্রবাদ ব্যবহারের বিশিষ্ট সাহিত্যিক কারণ—প্রবাদের দ্বারা ভাষা ও ভঙ্গির ক্রীড়াশক্তি বাড়ানো যায়। পাঠক প্রবাদের ঘন-ঘন ব্যবহারে সমর্থনের মাথা নেড়ে মানসিকভাবে উত্তেজিত থেকেছে, যে উত্তেজনা কবির আকাঙ্ক্ষিত। অনেকগুলি প্রবাদ কবি ইচ্ছাকৃতভাবে অস্থানে প্রয়োগ করেছেন। পাঠক যখন কবির সঙ্গে গোপনগমনের গর্হিত সুখ বোধ করছে, তখন হঠাৎ কবি দুম্ করে প্রবাদী তত্ত্বকথা শুনিয়ে দিলেন, তার ফলে পাঠক প্রথমে চমকালো, তারপর হেসে ফেলল, আর তাতে কবির কার্যোদ্ধার হয়ে গেল—অত্যন্ত অশ্লীল বস্তুকে সহাস্য করে সহ-নীয় করে নিলেন, রঙ্গলীলাময় অশিষ্ট সাহিত্য জনগ্রাহ্য হয়ে উঠল।

এতক্ষণ 'প্রবাদ' শব্দটি ব্যবহার করেছি। ওর মধ্যে প্রবচন, প্রৌঢ়োক্তি, সূক্তি, সুভাষিত, বিশিষ্টার্থক বাক্য, বাগ্‌রীতি—ইত্যাদি সবই ঢুকে আছে। এবার কাজের সুবিধার জন্য 'প্রবচন' শব্দটিকে আলাদা করে নেব। প্রবাদ, ধরা যাক (পণ্ডিতেরা ধরবেন কিনা জানি না), গণস্বীকৃত অভিজ্ঞতার প্রজ্ঞাবচন, আর প্রবচন এক বিশিষ্ট ধরনের বাগ্‌বন্ধ, যা গণস্বীকৃতি পেতে পারে, নাও পারে, কিন্তু সাহিত্যের রসস্বীকৃতি পাবেই। প্রবাদ সকলের, প্রবচন সকলের বা সকলের নয়। প্রবাদে অনেক সময়ে স্থূলতা থাকে, প্রবচনে তা নেই। উজ্জ্বল বাক্যাংশ, যা কবি হয়ত নিজের মুখে বা তাঁর চরিত্রের মুখে বিশেষ পরিস্থিতিতে বসিয়েছেন, যাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ব্যবহার করা সম্ভব—তাকেই প্রবচন বলতে চাই। 'প্রবচন' শব্দের এই বিশেষ ব্যবহার অনেকে মানবেন না। তাঁদের জন্য সাহিত্যিক প্রবাদ বা কবিবচন কথাটা এগিয়ে দিচ্ছি। যেমন ধরা যাক, বঙ্কিমচন্দ্রের—'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?' 'ধীরে, রজনি, ধীরে!' সঞ্জীবচন্দ্রের, 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'; রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষ্যাপা খুঁজে ফিরে পরশপাথর'; বিবেকানন্দের 'যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়' ইত্যাদি।

শিক্ষা সংস্কৃতির বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে অনেক প্রবচন আবার জনসাধারণের মুখে ঘুরে-ঘুরে প্রবাদের আকার নিয়ে নেয়। যেমন বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা স্কুল-কলেজে সর্বাধিক পাঠ্য থাকার জন্য, এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত জনপ্রিয় হবার জন্য, ঐসকল কবিতা বা গানের অনেক অংশ মুখেমুখে ফেরে, যা হয়েছিল রামপ্রসাদের গানের ক্ষেত্রে, কিংবা পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের গদ্যের ক্ষেত্রে।

ভারতচন্দ্রে সুভাষিতের সীমাসংখ্যা নেই। ছত্রে-ছত্রে জ্বলে আছে তারা। এত বেশি প্রয়োগ তাদের যে, সন্দেহ হতে পারে, কবি কথার লোভে পড়েছিলেন। বিস্ময়কর এই, প্রয়োগ যেখানে অগণ্য, অপপ্রয়োগ সেখানে অঙ্গুলি-গণ্য। অপপ্রয়োগের একটি দৃষ্টান্ত—অন্নদা ব্যাসকে শেষ আঘাত করবার সময়ে বলেছেন—'খয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত?' কথাটা দেবীজনোচিত হয় নি—এতে নীচতার আভাস আছে। এমন আরও দু'একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—দু'একটিই, বেশি নয়।

সুভাষিতের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত দেব—ভারতচন্দ্র কোন্ ভাষায় ভঙ্গিতে মনোহরণ করেছিলেন তা বোঝা যাবে উদ্ধৃত অংশ থেকে! এদের কিছু কিছু আগেও প্রাসঙ্গিকভাবে উপস্থিত করেছি—এখানে তাই অল্পস্বল্প পুনরুদ্ধৃতি ঘটবে। এই সব প্রবাদ-প্রবচনের বড় অংশ একদিন মুখে-মুখে ফিরত, সেই চল আজ নেই। তার একটা কারণ যুগরুচি বদলেছে, অন্য কারণ, ভারতচন্দ্র আগে যেভাবে পাঠকমনে একাধিপত্য করেছিলেন, সেই নিঃসপত্ন অধিকার বজায় আর নেই, তিনি পূর্বের মতো পঠিত হন না।

প্রবাদ হিসেবে যারা স্বীকৃতি পেয়ে গেছে, সেগুলি :

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ॥ হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায় ॥ ঘরে অন্ন নাহি যার, মরণ মঙ্গল তার ॥ বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির ॥ মাতঙ্গ পড়িলে দরে পতঙ্গ প্রহার করে ॥ মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন ॥ দুর্দৈব যখন ধরে ভাল কর্ম মন্দ করে ॥ নিকটে পাইয়া নিধি চিনিতে নারিনু ॥ অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত, খয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত ॥ পেয়েছিনু মাণিক আঁচলে না বাঁধিনু, নিকটে পাইয়া নিধি হেলে হারাইনু ॥ লোহা যেন হেম হয়

পরশ-পরশে ॥ মাটিমুটা ধর যদি সোনামুটা হবে ॥ ভবিতব্যং ভবত্যেব খণ্ডিতে না পারে ॥ যদি কালী কূল দেন কূলে আগমন ॥ যতন নাহিলে কোথা মিলয়ে রতন ॥ নীচ যদি উচ্চ ভাবে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে ॥ আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে, এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে ॥ বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল ভিজায় ॥ কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে ॥ বন্ধু নাই কড়ি বই। কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে ॥ বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধরে দিতে পারি চাঁদ ॥ বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বোঝা ॥ যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে ॥ গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল ॥ বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ ॥ যাহার লাগিয়া চুরি করে গিয়া সেই জন বলে চোর ॥ বিধি নিধি নাহি দিলে আর কেবা দেই ॥ ভূমিতে চাঁদ উদয় ॥ উত্তম উত্তমে মিলে, অধমে অধম, কোথায় মিলন হয় অধমে উত্তম ॥ পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার ॥ ভবিষ্যতে ভাবি কেবা বর্তমানে মরে, প্রসবের ভয় তবু পতিসঙ্গ করে ॥ মৃগ হয়ে দিবে কি সিংহের ঘরে হানা ॥ সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর ॥ শিলা জলে ভাসি যায়, বানরে সঙ্গীত গায়, দেখি-লেও না হয় প্রত্যয় ॥ যার কর্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে ॥ অরণ্যে রোদন কিবা ফল ॥ গুণ হৈয়া দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায় ॥ ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন ॥ ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়, হায় বিধি পাকা আম দাঁড়-কাকে খায় ॥ ভেকে ভুলাইয়া ভৃঙ্গ পদ্মে মধু খায় ॥ মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ রয় ॥ সাপের মাথায় ভেকেরে নাচায় ॥ আমি মৈলে ফুরায় জঞ্জাল ॥ যার ঘরে সিঁদ সে কি যায় নিদ ॥ হাতে-নাতে ধরিয়াছে ॥ হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার ॥ সোনা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার ॥ নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ॥ অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে, পুষ্পসনে কীট যেন ওঠে সুরমাথে ॥ পরশ পরশে লোহা সোনা করিবারে ॥ সুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি, দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি ॥ বুঝ লোক যে জানো সন্ধান ॥ কার ঘাড়ে দুটো মাথা এ কর্ম করিবে ॥ চুনকালি দিলি গালে ॥ তরু যেন ফল ধরে সবার লাগিয়া ॥ ধুইলে না যাবে ধোয়া ॥ বালকের নাহি শুদ্ধি, বৃদ্ধ হলে হতবুদ্ধি ॥ বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডে ॥ বিনা মূলে কিনিলে আমারে ॥ মুখে এক মনে আর ॥ চোরের ধন বটেপাড়ে লয় ॥ যৌবনে সকল ধন্য ॥ রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন ॥ লাভ কে করিতে চায়, মূল রাখা হৈল দায় ॥ লোভেতে আইসে লোভ ॥ বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস ॥ ভিক্ষায় নৈব চ নৈব চ ॥ বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে ॥ জনক হৈতে স্নেহ জননীর বাড়া, মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া ॥ অন্নবিনা অন্নদার অস্থিচর্মসার ॥ চঞ্চলা, তোমার রূপা চঞ্চলা সমান ॥ আমার

সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে ॥ রূপে গুণে লক্ষ্মী সরস্বতী ॥ লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়, পশুপক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায় ; দেব উপদেব পড়ে তন্ত্র-মন্ত্র ফাঁদে, নিরাকার ব্রহ্ম দেহফাঁদে পড়ি কাঁদে ॥ ইতো গুতো ভ্রষ্ট নষ্ট ন পূর্ব ন পর ॥ রাহুগ্রস্ত হন চন্দ্র লোকে পুণ্য দিতে ॥ এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার ॥ অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর, ক্ষীরোদে থাকিলা হরি, হিমালয়ে হর ॥ অন্তরে না সহে ব্যাজ, বাহিরে বাড়ায় লাজ ॥ অমৃতে উঠিল হলাহল ॥ অশ্বত্থামা বাক্যে যেন হত্যা দ্রোণাচার্য ॥ আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে করে খুন ॥ আদর কাজের বেলা, তারপর অবহেলা ॥ উপায়ের সীমা নাই ময়ূর উড়ায় ॥ করিয়া সুখের নিধি পুরুষে করিল বিধি ॥ দৈব রুষ্ট যার, বুদ্ধি নাশে তার ॥ পুরুষের আট-গুণ মেয়ে ॥ বাথানিয়া গাই-মতো ফেরে অঙ্গভঙ্গে ॥ বাসনা করয়ে মন পাই কুবেরের ধন ॥ যত কৈনু সাধ সব হৈল বাদ ॥

প্রবাদ কোন্‌গুলি হয়েছে, মানে কোন্‌গুলি গণস্বীকৃতি পেয়েছে, এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করতে গণভোট নিতে হবে। তা যখন বর্তমানে সম্ভব নয়, তখন নিম্নে আরও কিছু উজ্জ্বল বাক্যাংশ তুলছি, যার স্বীকৃতির পরিমাণ পাঠক ঠিক করবেন, যাঁরা বাংলাদেশের নানাস্থানের অধিবাসী হিসাবে স্থানীয় স্বীকৃতির বিষয়ে অধিক জানেন। তবে নিম্নে উদ্ধৃত অংশগুলি ভারতচন্দ্রের কাব্য পড়া থাকলে বেশি উপভোগ্য হবে, সন্দেহ নেই।—

যে কবে সে হবে গীত আনন্দে শিখাবে ॥ একে তো নারদ আরো বিষ্ণুর আদেশ ॥ বর দেখি হিমালয় হৈল হতবুদ্ধি ॥ কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে, নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে ॥ হরগুণ বরগুণ হৈল এক ঠাঁই ॥ তব মায়া-ফান্দে বিশ্ব পড়ি কান্দে ॥ সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের, আর সবে মিছে ফের ॥ ধর্মে জানি সুখ হয়, তবু মনে নাহি লয় ॥ রসকথা কহিতে বিরস হয়ে যায় ॥ ভারতে বিদিত ভাল দুঃখের কোন্দল ॥ শাঁখা শাড়ি সিন্দুর চন্দন পান গুয়া, নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া ॥ বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে ॥ নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা ॥ যত আনি তত খাই, না ঘুচিল খাই-খাই ॥ চেতনা যার চিত্তে সেই চিদানন্দ ॥ গলে সাপ বান্ধি চাই, তবু অন্ন নাহি পাই ॥ গলে বিষ সেও নাহি বধে ॥ যার নারী সুতাসুত সদা অন্নকষ্টযুত, সর্বদা তাহার অবসাদ ॥ অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কাঁদে অন্নের তরে, এ বড় মায়ার পরমাদ ॥ বিশ্বনাথ বিনা কারে লাগে বিশ্ব-ভার ॥ তোমার সামগ্রী দিয়া পূজিব তোমারে, লাভ হৈতে বর পাব, তরিব

সংসারে ॥ ভবানী ভবের সার ॥ চিরজীবী নরাকার লীলা ॥ ভবঘোর পারাবার, হরিনাম তরী তার ॥ অভেদ হইল ভেদ এ বড় বিরোধ ॥ অভেদ যে-জন ভজে সেই ভক্তবীর ॥ সাপে বাঘে যদি খায় মরণ নাহিক তায়, চিরজীবী করিল গোঁসাই ॥ তেজোবধ হয় যার, প্রাণবধ হয় তার ॥ ব্যাসের তপের গাছ অন্নদার লয়ে পাছ ফলিবেক বিষবৃক্ষ হয়ে ॥ মরণ টাকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া ॥ বিধি বিষ্ণু শিব আদি তোমার মায়ায়, মৃণালের তন্তুমধ্যে সদা আসে যায় ॥ বাক্যাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব ॥ শক্তিযোগে শিবসংজ্ঞা, শক্তিলোপে শব ॥ অলঙ্ঘ্য দেবীর বাক্য অন্যথা না হয় ॥ এক পাপে দুঃখ পেয়ে আর কৈলা পাপ ॥ কর্মভূমি ভূমণ্ডল ত্রিভুবন সার ॥ ধনমত্ত যেই সেকি সেবা দেই ॥ ভূমে কলি বড় বলবান, নাহি রাখে ধর্মের বিধান ॥ বিধি চক্ষু দিল যারে, সে যদি না দেখে তারে, তাহার লোচনে কিবা ফল ॥ খুলিল মনের দ্বার, না লাগে কপাট ॥ আকাশবাণীতে হাতে পাইল আকাশ ॥ তীর তারা উল্কা বায়ু শীঘ্রগামী যেবা, বেগ শিখিবারে বেগে সঙ্গে যাবে কেবা ॥ চাকুরির মুখে ছাই, ছাড়িতে না পারি ভাই, বিষকৃমি সম হয়ে আছি ॥ নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য নহে ভাল তাহা ॥ কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম ॥ তুমি মোর বাপ বাছা, বাপের ঠাকুর ॥ বাসার সুসারে হবে আশার সুসার ॥ বুনিপোর উপযুক্ত মাসী ॥ এ টাকা উচিত দেয়া কেবল জুয়ায় ॥ আট পণে আধ-সের কিনিয়াছি চিনি, অন্যলোকে ভুয়া দেয়, ভাগ্যে আমি চিনি ॥ খুন হয়েছিনু বাছা চুন চেয়ে চেয়ে। পরিচয় দেহ আগে কে বট আপনি ॥ কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা, পদনখে পড়ে তার আগে কতগুলা ॥ কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরু-চূড়া ধরে ॥ কে বলে অনঙ্গ-অঙ্গ দেখা নাহি যায় ॥ গাঁথিনু বড়িশে মাছ, আর কোথা যায় ॥ বুড়া হলি তবু গেল না ঠাট ॥ রাঁড় হয়ে যেন ষাঁড়ের নাট ॥ মণি ধরে যেন ফণী ॥ পূজা না হৈতে মাগে আগে ভাগে বর ॥ আঁখি পালটিয়া ঘরে যাওয়া হৈল কাল ॥ পাখি এড়াইতে নারে, মানুষে কি পারে ॥ হায় বিদ্যা, কোথা বিদ্যা, কবে বিদ্যা পাব ॥ স্থলে জলে মণি জ্বলে, হরে অন্ধকার ॥ চাঁদের মণ্ডল বরিষে গরল, চন্দন আগুনকণা ॥ একি লো একি লো, একি কি দেখি লো ॥ আসিয়াছি আশ্বাসে, বিশ্বাস হইলে বসি ॥ তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে ॥ বিচার হইবে কি প্রথমে অবিচার ॥ মন চুরি কৈল চোর সিঁদ দিয়া ঘরে ॥ চোর-সহ বিচার কি করে সাধুজন ॥ কন্যাকর্তা হৈল কন্যা, বরকর্তা বর, পুরোহিত ভট্টাচার্য হৈল পঞ্চশর ॥ লাজে পলাইল লাজ, ভয়ে ভাঙে ভয় ॥ রসলাভ হবে রহিয়া ফুটিলে ॥ পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান ॥ রায় বলে আমি দেহ তুমি যে জীবন, বিচ্ছেদ তখনি হবে যখন মরণ ॥ বুঝহ চতুর সব একি চতুরালি, কুটিনীরে ফাঁকি দিয়া করে

নাগরালি ॥ সাধু লোক চোর হয় চুরি শুনি তোর ॥ বড় রসিয়া নাগর হে ॥ জানিয়া আনিয়া মণি টানিয়া ফেলিলে ॥ পুরাতন ফেলাইয়া নূতনেতে মন, পুরুষ যেমন পারে নারী কি তেমন ॥ আধবুড়া হৈলে তবু ঠাট ঘুচে নাই, পেয়েছ অভাবে ভাল নাতিনী-জামাই ॥ আমি হৈনু বাসী ফুল, ফুরাইল মধু, কেবল কথায় কি রাখা যায় বঁধু ॥ লোকে বলে পাপকাজ কদিন লুকায় ॥ না মিলিল দড়ি না মিলিল কড়ি কলসী কিনিতে তোরে ॥ না ধরিলে রাজা ধরে, ধরিলে ভুজঙ্গ, সীতার হরণে যেন মারীচ-কুরঙ্গ ॥ আজি গেল ধরা চোর-চূড়ামণি, মোরা জেগে আছি সকল রমণী ॥ করিলাম বদকাম বদনাম শেষে ॥ আগে দিয়া মনোদুখ, মধ্যে দিন-কত সুখ, শেষে দুঃখ বাড়ালি দ্বিগুণ ॥ যুবতী জনম কালামুখ, পরের অধীন সুখ দুখ ॥ কেহ বলে এ চোর কেমন, এখনি করিলে চুরি মন ॥ বিদ্যারে করিয়া চুরি এ হৈল চোরা, ইহারে যদ্যপি পাই চুরি করি মোরা ॥ সাধ করে শিখিলাম কাব্যরসকত, কালার কপালে পড়ে সব হৈল হত ॥ আলোকে কিঞ্চিৎ ভাল, প্রমাদ আঁধারে ॥ ঝাঁপনি কাঁপনি সার কেবল উৎপাত ॥ বদনে রদন লড়ে ওদনে বঞ্চিত ॥ আমি কাঁদি কামজ্বরে, সে বলে উল্বণ ॥ কেবল আমার গুণে পুত্রমুখ দেখে ॥ রাত্রি দিন আটপর ঘড়ি পিটে মরে, তার ঘড়ি কে পিটায় তল্লাস না করে ॥ শাঁখা সোনা রাঙা শাড়ি না পরিনু কভু, কেবল বাক্যের গুণে বিবাহের প্রভু ॥ কাটিতে উচিত কিন্তু কেমনে কাটিব, কলঙ্ক করিতে দূর কলঙ্ক করিব ॥ নষ্ট নই, নষ্ট-সঙ্গে হয়েছে মিলন, রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন ॥ শুন শ্বশুর-ঠাকুর শুন শ্বশুর-ঠাকুর, আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর ॥ হায় বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যথা ॥ সে দেশের সুধাসম এ দেশের নীর ॥ সোনা অঙ্গে ছাই মাখে-হাসিয়া হাসিয়া ॥ বিনা ভয়ে প্রীতি নাই, জয়া বলে বটে ॥ খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছিব হাত, নাচিব গাহিব কুতূহলে ॥ যে হোক সে হোক ভাষা কাব্যরস লয়ে ॥ যে হোক সে হোক তথা যাওন নিশ্চয় ॥ দুই নারী বিনা নাই পতির আদর ॥ তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সুয়া, হারায়ে যৌবন আমি হইয়াছি দুয়া ॥ মা বিনা বালকে অন্ন কে দেয় ডাকিয়া ॥ অপরাধ করিয়াছি, হুজুরে হাজির আছি ॥ যে কর্ম করিবে তায় অপ্রদীপ করিবে প্রদীপ ॥ আমি জানি বিস্তর অমন এঁড়ে ডাক ॥ উচ্চ জাতি হৈলে বুঝি উচ্চ শালে দিবে ॥ এতদিনে শিব বুঝি হৈল অনুকূল, ফুটাইল ভগবতী বিবাহের ফুল ॥ করুণাসাগর বিনা কেবা কৃপা করে ॥ কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ কোলে করে ॥ কেবা দুটো মাথা ধরে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে ॥ খোয়াব তনুর তরী প্রবাসসাগরে ॥ গুণেতে না দেখি সীমা, রূপ ততোধিক, বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক ॥ ঠেকিবে যখনি সুখ জানিবে তখনি ॥ তিনকাল গিয়া মোর এক কাল আছে ॥ তোমার কৃপায় ভক্ত

না করি তোমায় ॥ ত্রিভুবনে তুমি ভাল, আর সব কাল গো ॥ দিনে হয় রাস ॥ ধর্ম জানে আমি নাই এসব কথায় ॥ ধ্যানে রব যেন বক ॥ নাই ঘরে, সদা খাই খাই ॥ নারীর যৌবন বড় দুরন্ত, শরীরের মাঝে পোষে বসন্ত ॥ পরের কলমে সদা দোয়াতি জোগায় ॥ প্রমদা বন্ধন সংসারেরি ॥ ফল হেতু ফুল তার মাসে মাসে ফুটে ॥ বাপ ঘরে কন্যা যাবে নিমন্ত্রণ কিবা ॥ বিধি কৈল নারী, লাজ দিল ভারী ॥ বুড়া বয়সের ধর্ম অল্পে হয় রোষ ॥ বৃক্ষমূলে হানি শিরে ঢাল পানি ॥ বৃষ্টিছলে মেঘ কাঁদে ॥ বোলে চালে গেল দিবা, বিভাবরী ঘুমে ॥ ভয় না টুটিবে ভয় না তুড়িলে ॥ ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে ॥ মঙ্গল কলসে হায় চরণে ঠেলিলে ॥ মা বাপের পুণ্য-হেতু ধর্মের বাঁধহ সেতু ॥ মাটি খেয়ে বিদেশে আইনু ॥ মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই ॥ মেঘ করে যেমন সকলে জলদান ॥ যত আনি তত খাই, না ঘুচিল খাই খাই ॥ যদি দেখে আঁটি-আঁটি, কাঁদিয়া ভিজায় মাটি ॥ যারে কালে ধরে সেই নিন্দে হরে ॥ যুবতীর মন শফরী-জীবন ॥ যে বিধি চাঁদেরে কৈল রাহুর আহার ॥ যে মার খেয়েছি আমি চোরের অধিক ॥ যৌবন কমলাঙ্কুর, লোভে না করিহ চুর ॥ যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে ॥ রসিকের স্থানে হয় রসের বিস্তার ॥ পাত্র মিত্র গোবর গণেশ ॥ রূপের নাগর গুণের সাগর ॥ লাজের মাথায় হানিয়া বাজ ॥ সরম ভরম গেল উদরের লেগে ॥ হাত ছোট আম বড়, এ বড় প্রমাদ ॥ হারাই বা হারি, হইল দুই ভার ॥

॥ ৬ ॥

ছন্দ ও অলঙ্কারের লীলালোক

[ক]

ছন্দ-অলঙ্কারের বিষয়ে আলোচনার গোড়ায় এইটুকু বলা প্রয়োজন, বাণীনির্মাণে অমন সহায়ক সেবক বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে অল্পই মিলবে। ভারতচন্দ্রের কাব্যের রূপপ্রতিমা সালঙ্কারা গরবিনী কন্যার মতো গতিছন্দে ঢেউ তুলে, পাঠকের 'বাহা! বাহা!' হর্ষধ্বনির মধ্যে এগিয়ে এসেছে কাব্যসভাতলে। তাকে দেখে স্বতঃই বলতে ইচ্ছা হয়, 'রূপযৌবন উপঢৌকন দেবেন কন্যা তাহারে (আহা রে! কাহারে?), তাই পরেছেন চীনাংশুকের পট্টবসন বাহারে।'

ভারতচন্দ্র বহুপ্রকার ছন্দের ব্যবহার করেছেন নিখুঁতভাবে—এর

জন্য তিনি বাংলার অন্যতম সেরা ছন্দ-স্রষ্টা কবি, পুরনো কালে এক-নম্বর, এবং একাল সেকাল ধরলেও দু'নম্বর (?), রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর স্থান। একথা আমার নয়, ক্লাসিকে মগ্ন বিদগ্ধ প্রমথ চৌধুরীর, কবিসমালোচক মোহিতলালের, ছন্দাচার্য শ্রীপ্রবোধ সেনের।

'বাংলা কবিতার ছন্দ' গ্রন্থে মোহিতলাল বাংলাছন্দের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত আলোচনার ভিতরে বলেছেন, ভারতচন্দ্রের আগে পয়ার-ছন্দের মধ্যে, 'ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির সঙ্গে ছন্দের পূর্ণ সাযুজ্য ঘটে নাই।' অর্থাৎ 'কাব্যচ্ছন্দের সঙ্গে উচ্চারণপদ্ধতির সম্পর্ক' বিশেষ ছিল না। ছন্দ যে একটা বাহির হইতে গড়া যন্ত্রবিশেষ নয়—যাহার ছাঁচে বাক্যকে ফেলিয়া একটা বাজনা বাজাইলেই হইল—আমরা এখন যেমন বুঝি (ছন্দশাস্ত্রীরা এখনও বুঝেন না)—পূর্বে, কাব্যে সেই অলঙ্কারপ্রিয়তার যুগে, কেহ তেমন বুঝিত না।' বুঝেছিলেন ভারতচন্দ্র—বুঝেছিলেন যে, ছন্দকে 'ভাষার রস···রক্ষা করিতেই হইবে।' তার ফল: 'ভারত-চন্দ্রের পয়ারকে—কেবল বাংলাবুলির প্রাধান্য নয়, কথ্যভাষার বাচন-ভঙ্গিও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে; প্রত্যেক বাক্যে, ভাব ও অর্থের অন্বয়-রীতিকে আশ্রয় করিয়া শব্দগুলি স্ব স্ব মর্যাদালাভ করিয়াছে—ছন্দের মধ্যে স্বাভাবিক স্বরভঙ্গিও ফুটিয়া উঠিয়াছে।'

কাব্যের প্রয়োজনে ভারতচন্দ্র পয়ার ও ছড়ার ছন্দকে বক্তব্যের অনুগত করে কিভাবে প্রয়োগ করেছেন, তার দৃষ্টান্ত দেবার বিশেষ প্রয়োজন নেই। কাহিনীধারা, বিশেষতঃ নাটকীয়তার রূপ উপস্থিত করার সময়ে আগে যেসব বাক্যাংশ তুলেছি, তার মধ্যে দেখাবার চেষ্টা করেছি, কবি কিভাবে ঠিক শব্দটি ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছেন; এবং যেহেতু ও-জিনিস গদ্যে নয়, পদ্যে হয়েছে, তাই কবি তা করতেই পারতেন না, যদি-না ছন্দকে স্বাভাবিক জীবনছন্দ করে তুলতে পারতেন।

কিন্তু একথাও সত্য, কবি তাঁর উপভোক্তা অভিজাত রসিকদের জন্য নানারকম ছন্দের নমুনা তাঁর কাব্যে দিয়েছেন। নিশ্চয় সংস্কৃত-পণ্ডিতদের চমকে দেবার ইচ্ছে তাঁর হয়েছিল—বাংলায় সংস্কৃতছন্দের প্রয়োগসাফল্য দেখিয়ে। কিন্তু ছন্দোবিৎ-দের কাছে 'বাহবা, চমৎকার'

শোনার পরে কাব্যরসিকেরা এগিয়ে এসে বলতে পারেন—'সো হোয়াট ?' হ্যাঁ, ছন্দ উত্তম—কিন্তু তাতে কাব্যের কী—যদি-না ছন্দ কাব্যপ্রকাশক হয় ? ভারতচন্দ্র নানা সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহার করে একটি ছন্দের কাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু সেগুলি কাব্যের ছন্দ হয় নি—এমন সন্দেহ কারো কারো মনে উঠেছে।[১৫]

১৫। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এমনকি মনে করেছেন, সংস্কৃত ছন্দ-ব্যবহারে ভারতচন্দ্রে ছন্দপতন দোষ আছে।—

"ভারতের পদ্য-পংক্তি পাঠকালীন বোধ হয়, যেন মধুকরনিকরের ঝঙ্কার হইতেছে। রায়গুণাকর বাঙ্গালা ছন্দে সন্তুষ্ট না হইয়া স্থানে স্থানে ভুজঙ্গপ্রয়াত, তূণক, তোটক প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দ ঋণ করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু অপার্যমানে স্থানে স্থানে ছন্দপতন দোষ হইয়াছে। সংস্কৃত ছন্দাবলীর যতি অর্থাৎ বর্ণের লঘুত্ব গুরুত্ব রাখিয়া অন্যভাষায় কবিতা রচনা করা অতীব কঠিন কর্ম।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ' গ্রন্থে সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের ছন্দপতনের কথা বলেন নি কিন্তু ব্যাপারটা যে বাংলা দাঁড়ায় নি, তা না-বলে পারেন নি :

"আমাদের সাধুছন্দে বর্ণগুলির মধ্যে যে, সাম্য ও সৌভ্রাত্র দেখা যায়, তাহা গানের সুরে সাঁচ্চা হইতে পারে, কিন্তু আবৃত্তি করিয়া পড়িবার প্রয়োজনে তাহা ঝুটা। এই কথাটা অনেকদিন আমার মনে বাজিয়াছে। কোনো কোনো কবি ছন্দের এই দীনতা দূর করিবার জন্য বিশেষজোর দিবার বেলায় বাংলা শব্দগুলিকে সংস্কৃতের রীতি অনুযায়ী স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ রাখিয়া ছন্দে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রে তাহার দুই-একটা নমুনা আছে। যথা—

'মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।'

বৈষ্ণব কবিদের রচনায় এরূপ অনেক দেখা যায়। যেমন—

'সুন্দরি রাধে, আওয়ে বনি
ব্রজ রমণীগণ-মুকুটমণি !'

কিন্তু এগুলি বাংলা নয় বলিলেই হয়। ভারতচন্দ্র যেখানে সংস্কৃত ছন্দে লিখিয়াছেন, সেখানে তিনি বাংলা শব্দ যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করিয়াছেন [সম্পূর্ণ সত্য নয়], এবং বৈষ্ণব কবিয়া যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা মৈথিলী ভাষার বিকার।"

বহুদিন আগে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিধিধার্থ সংগ্রহে (অগ্রহায়ণ, ১৭৮১ শক)

স্বীকার করি, সন্দেহের সঙ্গত কারণ আছে। সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহার করার সময়ে কবিকে বাংলা উচ্চারণপদ্ধতির বিপর্যয় ঘটিতে হ্রস্ব-দীর্ঘ মাত্রাভেদ আনতে হয়েছিল অনেক সময়ে। তার ফলে ঐসব ছন্দের ক্ষেত্রে অন্ততঃ মোহিতলালের পূর্বোক্ত প্রশংসা সরিয়ে রাখতে হয়। নিশ্চয় ওখানে 'ভাষার রস' ফোটে নি, কারণ কথ্যভঙ্গিকে বজায় রাখা সম্ভব হয় নি। সুতরাং ওখানে তিনি জীবনবিচ্ছিন্ন।

কথাগুলি মোটামুটি স্বীকার করেও স্মরণ করিয়ে দেব—সাহিত্য কখনো সম্পূর্ণতঃ জীবনের অসংস্কৃত বাস্তবতাকে গ্রহণ করে না; এবং কিছু কৃত্রিমতার সাহায্যে অভিনব রূপের-রসের জগৎ-নির্মাণও কবির কাম্য হতে পারে, তার সাহিত্যমূল্যও আছে (যদি না থাকে, তাহলে

মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রসঙ্গে ছন্দ সম্বন্ধে দীর্ঘ মূল্যবান আলোচনা করেছিলেন। তার মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাসের প্রতি বাঙালির আসক্তি সত্ত্বেও তিনি বলেন 'সংস্কৃত, ইংরাজি, লাটিন ও গ্রীক মহাকবিদিগের অনুকরণে অনুপ্রাসের ত্যাগ শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে।' এই সূত্রে স্বতঃই ভারতচন্দ্রের কথা এসেছিল। "ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, বাঙালি কবির মধ্যে ভারতচন্দ্র যেমন কবিতার লালিত্য অনুভব করিতে পারিতেন, এমন আর কোনো কবি পারেন নাই। তিনি শব্দের গৌরব ও অর্থের গৌরব অতি চমৎকৃতরূপে সমাহিত করিয়া রাগদ্বেষাদি-প্রকাশ-করণ-সময়ে তদপযুক্ত গম্ভীর কর্কশ ভয়ানক শব্দ, ও কোমল মৃদু শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।" কেবল শব্দপ্রয়োগে নয়, ঐ সকল শব্দবহনের উপযোগী ছন্দও যে ভারতচন্দ্র সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, এবং ছন্দের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, সে বিষয়ে রাজেন্দ্রলাল লিখেছেন : "শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা-সময়ে বিবরণ মধ্যে শব্দার্থের সমন্বয়-বিষয়ক একটি অপরূপ উদাহরণ আছে।...সতীর দেহত্যাগ-সংবাদে মহাদেব ভয়ঙ্কর কোপে ভূত-প্রেত-পরিচারক সমভিব্যাহারে দক্ষালয়ে গমন করিয়া কি কহিতেছেন তদ্বিষয়ে লিখিত আছে—'অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে, অরেরে অরে দক্ষ দেরে সতীরে।' এই ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে ভয়ানক কোপ-জ্ঞাপক অর্থের সহিত শব্দের সাম্যত্ব সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু পয়ার কি অন্য বাঙালি-ছন্দে তাহার সমাধা হয় না। ভারত-সদৃশ কবিও তাহার চেষ্টা করিয়া পরাস্ত হইয়াছেন।"

সংস্কৃত ছন্দের প্রতি প্রীতিতে রাজেন্দ্রলাল এর পরে কিছু বিচার বিভ্রাট করে-

ব্রজবুলিতে লেখা গোটা বৈষ্ণব পদসাহিত্যকে বাতিল করে দিতে হয়) দ্বিতীয়তঃ, এই তথাকথিত উচ্চারণ-বিপর্যয় কবির উদ্দিষ্ট ভাবপ্রকাশের সহায়কও হতে পারে। ব্যবহৃত সংস্কৃত ছন্দ থেকে কিছু নমুনা নিয়ে ব্যাপারটা দেখানো যাক।

সতীর দেহত্যাগের পরে শিব দক্ষালয়ে চলেছেন : 'ধক্-ধ্বক্ ধক্-ধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।' উন্মত্ত শিব—তাঁর হৃৎপিণ্ডকে কে যেন উপড়ে নিয়েছে—তাঁর ভিতর থেকে সেই গভীর আর্তনাদ উঠছে, যা বিশ্বগর্ভের আলোড়িত অন্ধযন্ত্রণার হাহাস্বর। ভারতচন্দ্রের ভুজঙ্গপ্রয়াত দীর্ণ দীর্ঘ ঝঞ্ঝাক্রন্দনকে সত্যই আনতে পেরেছে :

অদূরে—মহারুদ্র—ডা-কে—গভীরে—
অরে রে—অরে দক্ষ ! দে-রে—সতীরে—।...
সতী দে—সতী দে—সতী দে—সতী দে—॥

শিবের শূন্যযন্ত্রণা প্রলয়ের নাশচ্ছন্দে পরিবর্তিত হয়; ধ্বংসের উল্লাসে মাতেন পাগল, তূণক ছন্দে :

ভূতনাথ ভূতসাথ
দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ
অট্ট অট্ট হাসিছে॥

ছেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, রাগের ভাষা এবং ছন্দ সর্বদা এক রকম? হয় সুতরাং সতীহারা উন্মত্ত শিব, এবং ঘন্টাকয়েক না খেয়ে বসে থাকার জন্য চটিতং বিদ্যা একই ছন্দে রাগ প্রকাশ করবে। বিদ্যা সে ছন্দ নেয়নি, 'শুনলো মালিনী সই. কি তোর রীতি', ইত্যাদি বলে বাংলা ছন্দে রাগ দেখিয়েছিল—সেটা রাজেন্দ্রলালের পছন্দ নয়। তিনি উক্ত অংশ খানিক উদ্ধৃত করার পরে বলেছেন : '...ইত্যাদি বাক্যে কি প্রকার শব্দে ও ভাবে বিরোধ করিয়াছেন।...তিরস্কারের নিমিত্ত ইহা [অর্থাৎ এই ছন্দ] নিতান্ত অপ্রযোগ্য—মধুরভাষিণী কামিনীর উক্তি বলিলেও ইহার দোষ খণ্ডিত হয় না। পরন্তু ইহা যে কেবল ছন্দ অনুপ্রাসের অনুরোধে ঘটিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্র যদ্যপিও অন্ত্যানুপ্রাস ত্যাগ করিয়া এই কবিতা লিখিতেন, তাহা হইলে এই দোষ কদাপি হইত না।"

[সাহিত্যসাধক চরিতমালা, তৃতীয় খণ্ড : রাজেন্দ্রলাল মিত্র]

ধ্বংসে উল্লাস শিবের যত, ততোধিক তাঁর প্রেত-অনুচরগণের:

যজ্ঞ গৃহ ভাঙি কেহ
হব্য-কব্য খাইছে।
উর্দ্ধহাত বিশ্বনাথ
নাম-গীত গাহিছে॥

মার মার ঘোর ঘোর
হান হান ডাকিছে।...
উর্দ্ধবাহু যেন রাহু
চন্দ্র-সূর্য পাড়িছে।...
মৌন তুণ্ড হেঁট মুণ্ড
দক্ষ মৃত্যু জানিছে।
কেহ ধায় মুষ্টি ঘায়
মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে॥

উপরের সংস্কৃত ছন্দ-দুটির প্রয়োগের উদ্দেশ্য ছিল উন্মোচন ; কবি আর একটি ছন্দ এনেছেন যার উদ্দেশ্য আবরণ। তিনি বিদ্যাসুন্দরের বিহার বর্ণনা করেছেন, বস্তুতে কোনো আড়াল রাখছেন না, কিন্তু জান্তব ব্যাপারটিকে ছন্দে দুলিয়ে যতখানি কাব্যিক করা সম্ভব, তা করতে সচেষ্ট তিনি—অর্থাৎ কবি সংস্কৃত ছন্দে ঢেকে ক্লাসিক্যাল কেলেঙ্কারী এনেছেন।—

রতিরঙ্গ-রণে মাতিল দুজনে।
দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে॥

যে-তিনটি সংস্কৃত ছন্দের কথা বললাম, সেগুলি যদি কাব্যে সার্থক হয়ে না থাকে, তাহলে 'সার্থক' কাকে বলে আমরা নিশ্চয় জানি না।

বাংলা ছন্দের অজস্র বৈচিত্র্য আছে ভারতচন্দ্রের কাব্যে, এবং সেগুলি কদাপি যাদুঘরের নানা কক্ষের মৃত প্রদর্শনী নয়, চিড়িয়াখানায় বেড়া-বাঁধা বন্যতাও নয়, সহজ স্বাভাবিক জীবনের বহুমুখিতার অভিব্যক্তি। কিছু দৃষ্টান্ত চয়ন করি।

রতি কাঁদছে টেনে টেনে :

অরে নিদারুণ প্রাণ কোন্ পথে পতি যান
আগে যা রে পথ দেখাইয়া।
চরণ-রাজীব রাজে মনঃশিলা পাছে বাজে
হৃদে ধরি লহ রে বহিয়া॥

মাতোয়ারা ভক্তি চঞ্চল ছন্দে, কিন্তু মহিমার সুর অব্যাহত:

'জয় জয় হর রঙ্গিয়া....' [পূর্বে উদ্ধৃত]

তৃপ্তির ভোজনছন্দ—দুপাশে হেলে-দুলে :

'অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন'···[পূর্বে উদ্ধৃত]

মর্যাদামন্ত্রিত বন্দনাছন্দ—একেবারে নিখুঁত—যে-কোনো সংস্কৃত বন্দনার সমতুল :

জয় জগদীশ্বরী জয় জগদম্বে।
ভব ভবরাণী ভব অবলম্বে॥
শিব শিবকায়া হর হরজায়া।
পরিহর মায়া অব অবিলম্বে॥

এবং : তুমি ব্রহ্ম তুমি ব্রহ্মা তুমি হরিহর।
তুমি জল তুমি বায়ু তুমি চরাচর॥
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মধ্য হও।
পঞ্চভূতময় পঞ্চভূতময় নও॥

প্রচলিত ত্রিপদীতে থর-থর গতি :

উরু গুরু গুরু
হিয়া দুরু দুরু
কাঁপয়ে আবেশরসে।
ক্ষণে আগে যায়
ক্ষণে পাছে চায়
অবশ অঙ্গ আলসে॥

রবীন্দ্রনাথের 'দে দোল্ দোল্···বধূরে আমার পেয়েছি আবার ভরেছে কোল'—এই ঝুলনের পূর্বছন্দে দোলায়িত রতিরঙ্গ :

খেলে রে সুন্দরী রঙ্গে।
বিষম কুসুমশর থর শর জরজর
তর তর থর থর অঙ্গে ॥
রতিম-সাগর নাগরী নাগর
সুন্দর সুন্দরী কোলে।…

স্ফূর্তির রায়বেশী নাচ :

জয় কালী ভাল ভালি যত ঢালী গাজে।
দেই লম্ফ ভূমিকম্প জগঝম্প বাজে ॥
ডাকে ঠাঠ কাট কাট মালসাট মারে।
কম্পমান বর্ধমান বলবান ভারে ॥

শব্দের মহাযজ্ঞ (কাব্যের পক্ষে মরণ-যজ্ঞ) ছন্দের পৌরোহিত্যে :

কালি কালি কালিকে।
চণ্ডমুণ্ডমুণ্ডখণ্ডি খণ্ড-মুণ্ডমালিকে ॥
লট্ট পট্ট দীর্ঘ জট্ট মুক্তকেশজালিকে ॥
ধক্ক ধক্ক তক্ক তক্ক অগ্নিচন্দ্রভালিকে ॥
লীহ লীহ লোহজীহ লক্ক লক্ক সাজিকে।
স্তক্ক ঢক্ক ভক্ক তক্ক রক্তরাজিরাজিকে ॥

বিপরীত দৃষ্টান্ত, ত্রিপদীর অপূর্ব কাব্যিক ব্যবহার, তালে-তালে সঞ্চরমান সর্বনাশের পদক্ষেপ ফোটাতে :

নরশিরোমালা সমর বিশালা
শোণিত-তটিনী-তীরে।
রণজয় তালি ঘন দিয়া কালী
শৃগালী বেষ্টিত ফিরে ॥

ছন্দ সম্বন্ধে শেষ কথা : ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ও দেশি নানা ছন্দের প্রয়োগ যে করেছেন, তার পিছনে কাব্যবৈচিত্র্যসাধন ছাড়া অন্যতর গূঢ়তর এক উৎকণ্ঠাও ছিল। পুরাতন ধারার কবি তিনি—কিন্তু নূতন মানুষ। দূর বন্যার জলকল্লোল তাঁর চেতনায় এসে গেছে, কিন্তু বাঁধ-ভাঙার আঘাত এখনো এসে আছড়ায় নি। ভারতচন্দ্র তাঁর সেই দূরাগত, অস্পষ্ট কিন্তু অনস্বীকার্য চেতনাকে প্রকাশ করতে অস্থির হয়ে-

ছেন। বিষয় বা বক্তব্যে সেই অস্থিরতার চেহারা আগে আমরা যথেষ্ট দেখেছি, শব্দের ক্ষেত্রেও, এখানে অধিকন্তু স্মরণ করিয়ে দেব—একই চাঞ্চল্য ছিল ছন্দেও। তিনি প্রকাশিত হতে চাইছেন, কিন্তু প্রকাশের নূতন ভাষা নেই, নূতন ছন্দ নেই। পুরাতন বাংলা ছন্দকেই তাই যত-ভাবে সম্ভব ব্যবহার করলেন, তাতে নূতন জীবনীশক্তি দিলেন, এবং অবলম্বন করলেন সংস্কৃত ছন্দকে। এ কাজ আত্মবিস্তারের অন্তর্নিহিত তাড়নাতেই। মধুসূদন ইংরেজি অমিত্রাক্ষর ছন্দকে নিয়েছিলেন সচেতনভাবে—কোন্ প্রেরণায় তা আমরা জানি। ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ছন্দ নিয়েছিলেন কোন্ প্রেরণায়—তা অনুমান করবার চেষ্টা অন্ততঃ করতে পারি। আমাদের বক্তব্য, (কতখানি গ্রাহ্য হবে জানি না)—উভয়-ক্ষেত্রে ভিতরের তাগিদ একই ধরনের ছিল। তবে মধুসূদন যেহেতু আত্মস্পর্ধী বিদেশীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির দ্বারা উন্মথিত ছিলেন, তাই ছন্দ-অবলম্বনের ক্ষেত্রে প্রখর সচেতনতা দেখিয়েছেন, পুরাতন সভ্যতার কোলে লালিত ভারতচন্দ্র তা দেখাতে পারেন নি।

[খ]

অলঙ্কার সম্বন্ধে বক্তব্য দীর্ঘ করার দরকার নেই। অলঙ্কার, সাহিত্যের কী—সে বিষয়ে সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা যেসব কথা বলে গেছেন, তার বেশি কথা বলা কঠিন, কারণ যাঁরা বলেছেন তাঁরা যে আলঙ্কারিক! মোটমাট এটুকু আমরা জেনেছি, ভারতবর্ষে অন্ততঃ কোনো আইনেই অলঙ্কারের দোকান বন্ধ করা চলবে না, যে-ভারতবর্ষের বৈরাগ্য অপর-পক্ষে দিগম্বরকে আদর্শ করেছে! এই কারণে অনুচিত অলঙ্কার সম্বন্ধে এদেশীয় সার্থক অলঙ্কার—যেন যতিদেহে অলঙ্কার!

সংক্ষেপে এই সিদ্ধান্ত করা যাক: এক, অলঙ্কার কাব্যদেহে আরোপিত বস্তু কিন্তু তার রূপসৌন্দর্যের কারণ; দুই, অলঙ্কার জন্মসূত্রে প্রাপ্ত এবং মৃত্যুমূল্যেই মাত্র ছেদ্য, যথা কর্ণের কবচকুণ্ডল; তিন, অলঙ্কার দেহগতই, স্বাস্থ্যরূপে তা সৌন্দর্য্যের কারণ। ভারতচন্দ্রের অলঙ্কার প্রধানতঃ প্রথম দুই শ্রেণীর।

ভারতচন্দ্রের অলঙ্কারের অনৌচিত্যও আছে। তবে তা মৃতদেহে বা যতিদেহে অলঙ্কার পরানোর অনৌচিত্য নয়, হঠাৎ-নবাবির উগ্র আতিশয্য নয়, অবিদগ্ধের অস্থানে আরোপের হাস্যকর ব্যাপারও নয়—তার অনৌচিত্য অতিরিক্ততার, যেমন সচেতন বিলাসিনীর বর্ণবাহুল্য, যা ভুলিয়ে কাছে টানতে চায়।

অলঙ্কারশিল্পী হতে ভারতচন্দ্রের অসুবিধা ছিল না। অনেকগুলি ভাণ্ডার হাতের কাছেই ছিল—মুঠি ডুবিয়ে তুলে নেওয়ার অপেক্ষা। যথা, পৃথিবীর অতিপ্রাচীন এক ধনভাণ্ডার, সংস্কৃতের রত্নগৃহ, যার মধ্যে স্বচ্ছন্দ প্রবেশাধিকার কবির ছিল ; এবং দেশীয় বাগ্‌বৈভব, প্রাণের সবুজ রঙ-ধরা, যাদের পালিশ করে তিনি নীলা করে দিয়েছেন ; এবং নিজ অভিজ্ঞতা নামক অফুরন্ত উৎসগুহা, যার ভিতর থেকে যথেচ্ছ বস্তু চয়ন করতে তিনি সমর্থ।

সংস্কৃত অলঙ্কারের প্রয়োগসিদ্ধি ভারতচন্দ্রে এমনই যে, যে-কোনো বাংলা অলঙ্কারগ্রন্থের পৃষ্ঠা ওলটালে ভারতচন্দ্র থেকে আহৃত দৃষ্টান্ত ভূরি-ভূরি চোখে পড়বে। বাংলা অলঙ্কারগ্রন্থের লেখকেরা নানাবিধ সংস্কৃত অলঙ্কারের নামোল্লেখ করে, ভারতচন্দ্রের রচনায় ঐ সকল অলঙ্কারের নমুনা দেখিয়ে, আবেগে মরি-মরি করেছেন এবং অপর অলঙ্কার-পণ্ডিতের সঙ্গে মারামারি করেছেন অলঙ্কারনির্ণয় ঠিকভাবে করা হয়েছে কিনা, তা নিয়ে। অনেক সংস্কৃত অলঙ্কারের ডিজাইন আপাততঃ এমনই একপ্রকার যে, পাকা জহুরী ছাড়া তাদের আলাদা করতে পারবে না, আমি তা নই, সুতরাং ভারতচন্দ্রের অলঙ্কারগুলির গায়ে সংস্কৃত অলঙ্কারের নাম-ছাপ লাগাবার কঠিন চেষ্টা থেকে দূরে থাকব। কেবল ভারতচন্দ্র অলঙ্কারকে কাব্যভাষারূপে কিভাবে ব্যবহার করেছেন, সে বিষয়ে দু'একটি কথা শেষে বলে নিতে চাই, যার অনেকটা আবার আগেই বলে ফেলেছি। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের আলোচনাকালে নানাভাবে দেখিয়েছি, সংস্কৃত অলঙ্কারের ইচ্ছাকৃত আতিশয্যকে কোন্ কাব্যিক প্রয়োজনে সহাস্যে কবি ব্যবহার করেছিলেন। বিদ্যার রূপবর্ণনার প্রসঙ্গে যা বলেছি, পাঠকদের তা স্মরণ

করতে বলি।[১৬]এখানে সেইসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের গায়ে ধরানো সুবিখ্যাত গহনাগুলির কথা মনে পড়ে—কী অপূর্ব কৈতববচন, স্মিত কৌতুক-রসে মিশিয়ে! কাব্যের এ অংশ পড়লে বুঝতে পারি—একই কাব্যাংশ কিভাবে বহুজনের প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে পারে। ঐ আলঙ্কারিক বচনের দ্বারা প্রথমতঃ কৃষ্ণচন্দ্র প্রশস্তিলাভ করলেন, খুশি হলেন, আবার মনে-মনে জানলেন—এটা কাব্যই, চতুরতম কাব্য। তারপর, রসিক পাঠকেরা জানলেন, অলঙ্কারের এমন প্রদর্শনী অল্পই পাওয়া যায়; সংস্কৃত-কবিরা এ ধরনের কাজ দেখিয়েছেন ঠিক কিন্তু এতখানি সজীবতা সেখানে নেই। শেষতঃ, কবি জানলেন, এ অংশ লেখার পরে আমার মান ও মাহিনা নিরঙ্কুশ হয়ে গেল; প্রশস্তিকাব্যের চূড়ান্ত নমুনা কাব্যসরস্বতীর চরণতলে রেখে দিলাম; এবং আমার এ কাব্য নিশ্চয় সবাই অবিশ্বাসের স্বেচ্ছানিরোধের সঙ্গে উপভোগ করবে।

সেই আলঙ্কারিক কাব্যের অংশ :

প্রতাপতপনে কীর্তিপদ্ম বিকাশিয়া।
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া॥…

১৬। ভারতচন্দ্রের আলঙ্কারিক আতিশয্যকে অনেকে পছন্দ করেন নি। দীনেশচন্দ্র বলেছেন : 'বিদ্যার রূপবর্ণনায় কবির প্রাণান্ত চেষ্টাজালে খাঁটি মূর্তি ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।…ভারতচন্দ্র প্রকৃত কবির প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অলঙ্কারশাস্ত্র তাঁহার মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছিল।" র.· গ দত্ত বলেছেন, বেশি রঙ চড়িয়ে কবি বিদ্যার ছবিটি নষ্ট করে ফেলেছেন। রাশিকৃত উদ্ভট বিকট অলঙ্কার তার হাত মুখ চোখ কানের বর্ণনায় লাগানো হয়েছে, কিন্তু বোঝা যায়নি তার মুখের ঠিক আদলটি কী ছিল! তা কি সুকোমল স্মিতহাস্যময়? তা কি উজ্জ্বল আয়ত কৃশ? তা কি দীপ্ত আঁখি সমন্বিত? সে কি ক্ষীণমধ্যা, কিংবা পুষ্টদেহী? কৈলাস বসু বিদ্যার রূপবর্ণনার আলঙ্কারিকতা নিয়ে কৌতুক করেছিলেন, রঙ্গলালের বিবরণে তা এইরূপ : "বসু-বাবু বিদ্যার রূপবর্ণনের কিয়দংশ পাঠ ও তদনুবাদ করিয়া গত সভায় অতীব রসোদ্দীপন করিয়াছিলেন।…বীরসিংহবালা বিদ্যাবিনোদিনীর রূপবর্ণনা পাঠ করিয়া তাঁহাকে ভয়ঙ্করী নিশাচরী ভাবিয়া থর থর কম্পিতকলেবর হইয়াছিলেন।"

চন্দ্র সবে ষোলকলা হ্রাসবৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মিলে॥
চন্দ্রের হৃদয়ে কালি কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্রহৃদে কালী সর্বদা উজ্জ্বল॥
দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়॥

ভারতচন্দ্রের অলঙ্কারের আলোচনায় দৃষ্টান্ত দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে হবে, কারণ কাব্যের ভাষাই আলঙ্কারিক। অথচ ঐ সকল অলঙ্কারকে তিনি এমন প্রাণালোকপূর্ণ করেছেন যে, গোটা ব্যাপারটি স্বভাবোক্তি হয়ে উঠেছে। তাঁর কাব্যালঙ্কারের আলোচনার সময়ে সাধারণতঃ যেসব অলঙ্কারে পুরনো রীতি বজায় আছে, সেগুলিকেই হাজির করা হয়। কিন্তু আমরা দেখি, তাঁর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারগুলি রয়েছে নতুন বাগ্‌-রীতির মধ্যে, দেশীয় ভাব ও ভাষার ঢঙ মেনে যাদের রচনা করেছেন, এবং যাদের অজস্র নমুনা আমরা 'প্রবচনেন লভ্য' অংশে উপস্থিত করেছি। ঐসব অংশেই কবির শক্তির প্রমাণ জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে, ঐসব অংশেই আমরা জীবনরসিক মানুষটিকে দেখি যিনি চারদিকের জীবন-রঙ্গ থেকে রসবস্তু আহরণ করেছেন।

অলঙ্কারের আলোচনায় কবির একটি বিশেষ প্রবণতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিরোধমূলক অলঙ্কারের প্রতি তাঁর খুবই আসক্তি ছিল। কারণ, অনুমান করি, কবি জীবনের বিরোধী সত্যসমূহের আভাস ফোটাতে চেয়েছেন—যে-বিষয়ে কবির সচেতনতার কথা আমরা বহুভাবে বলে এসেছি। কবির ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় আমরা বলেছি, তিনি ধর্মসংঘাতকে চান নি—সমন্বয়কে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমন্বয় মানে কি—কোনো একটা খোঁয়াড়ে সকলকে ঘাড় ধরে ঢুকিয়ে দিয়ে একই ঘাস খেতে বাধ্য করা? কদাপি নয়। সমন্বয় মানে—সমস্ত আপাত-বিরোধী সত্যের একটি অখণ্ড বিলয়ভূমি আবিষ্কার করা, যেখানে সব

প্রতিমাই (চরণযুক্ত নিরাকারসুদ্ধ) তাঁদের সকল অলঙ্কারসজ্জা নিয়ে, শেষ মশালের আলোকে ঝলমল করে উঠে, শেষ প্রণাম গ্রহণ করে, বিসর্জনের বিদায় নেবেন। সমন্বয় কোনো স্পষ্ট দার্শনিক সিদ্ধান্ত নয়— অনির্বচনীয় উপলব্ধিতে অপরোক্ষ-প্রস্থান। ভারতবর্ষে শিব এইজন্য সমন্বয়ের দেবতা, যাঁর মধ্যে সকল বিচিত্র বিপরীত মিলিত হয়েছে এক অপরূপ শ্মশানের গৃহাঙ্গনে। কবি ভারতচন্দ্রও এই শিবে-সম্মিলিত বিরোধী সত্যসমূহের রহস্যগভীর রূপকে বারে-বারে অলঙ্কারে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। শক্তি সম্বন্ধেও সে জাতীয় অলঙ্কার আছে, কিন্তু শিব-কেন্দ্রিক অলঙ্কারগুলির ভাবগভীরতা সর্বাধিক। এগুলি কখনো ব্যাজ-স্তুতি, কখনো শ্লেষ, কখনো অসঙ্গতি, কখনো বিরোধ বা বিরোধাভাস।—

সভাজন শুন, জামাতার গুণ, বয়সে বাপের বড়।
কোনো গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
মান অপমান, সুস্থান কুস্থান, অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি জানে ধর্ম, নাহি মানে কর্ম, চন্দনে ভস্মজ্ঞেয়ান॥
যবনে ব্রাহ্মণে কুকুরে আপনে শ্মশানে স্বরগে সম।
গরল খাইল তবু না মরিল, ভাঙড়ের নাহি যম॥

[দক্ষের শিবনিন্দা : 'শিবনিন্দায় দেবীর দেহত্যাগ]

শিব শিব শিবনাম সবে বলে শিবধাম
বাম দেব আমার কপালে।
যার দৃষ্টে মৃত্যু হরে তার দৃষ্টে প্রভু মরে
এমন না দেখি কোনো কালে॥
শিবের কপালে রয়ে প্রভুরে আহুতি লয়ে
না জানি বাড়িল কিবা গুণ॥
একের কপালে রহে আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন॥

[রতিবিলাপ]

কিসে অনুগ্রহ তাঁর নিগ্রহ বা কিসে।
বুঝিতে কে পারে যাঁর তুল্য সুধা বিষে॥

ভালে যাঁর সুধাকর গলায় গরল।
কপালে অনল যাঁর শিরে গঙ্গাজল ॥
সম যাঁর সুধা বিষে হুতাশন জল।
অন্যের যে অমঙ্গল তাঁরে সে মঙ্গল ॥

[শিব সম্বন্ধে ব্রহ্মা : 'ব্যাস ও ব্রহ্মার কথোপকথন']

পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম ॥
অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোনো গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন ॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে ॥

[অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা]

ভারতচন্দ্রের কাব্যে মিস্টিসিজম্ বা অধ্যাত্মরহস্য যদি কেউ পেতে চান, উপরের অংশে তার কিছু আস্বাদ পাবেন।

তবু, ভারতচন্দ্রের অলঙ্কারের সীমাবদ্ধতাও স্বীকার করতে হবে। তাঁর অলঙ্কারে, বিদ্যা, বৈদগ্ধ্য, এবং প্রয়োগনৈপুণ্য যতখানি, ততখানি কিন্তু কল্পনার অবকাশ নেই। সাধারণতঃ কল্পজগতের সৌন্দর্যে তিনি অলঙ্কার ভরিয়ে তুলতে পারতেন না ; অর্থাতিরিক্ত ব্যঞ্জনালাবণ্য নেই তাদের মধ্যে ; আলোক যতখানি আচ্ছন্নতা নেই তেমন ; বুদ্ধিকে তৃপ্ত করে যে পরিমাণে, বোধকে স্পর্শ করে না সেই মাপে।

তবু আছে—আছে গানে। অনেক উদ্ধৃত করেছি আগে, এখানে কেবল একটি :

অপরূপ মেঘ তুমি দেখি আলো হয় ভূমি
না দেখিলে অন্ধকার—আন্ধার দেখায়ো না।

॥ ৭ ॥

নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা

শব্দ ছন্দ অলঙ্কার, অভিজ্ঞতা প্রজ্ঞা ও প্রতিভা নিয়ে ভারতচন্দ্র কোন্ অপূর্ব বস্তু নির্মাণ করেছিলেন, তার তর্কাতীত উত্তর—ভাষা। সেই ভাষার চরিত্র কী?

ভারতচন্দ্রের কাব্যের নাটকীয়তার আলোচনায় বলেছি—নাটকের জন্য চাই, ঠিক শব্দটি আর রোমান্টিক কাব্যের জন্য—অপূর্ব শব্দটি। ঠিক শব্দটি প্রয়োজন-পূরণের সার্থকতার আনন্দ আমাদের দেয়, আর অপূর্ব শব্দটি আমাদের বাড়িয়ে ছড়িয়ে দেয়।

ভারতচন্দ্র তাঁর রোমান্টিক গানগুলিতে অপূর্ব শব্দ ও অপূর্ব কাব্য-ছত্র আমাদের দিয়েছেন, আর কাব্যের আখ্যানঅংশে ঠিক শব্দ স্থাপন করেছেন। শব্দব্যবহারে এই দুই জাতীয় প্রয়াসের জন্য তাঁর সাহিত্য-রীতির বিষয়ে মতপার্থক্য ঘটেছে। প্রমথ চৌধুরী তাঁকে ফরাসি-জাতীয় ধরেছেন, আর প্রমথনাথ বিশী মনে করতে চেয়েছেন বাঙালি-রোমান্টিক।

ভাবধর্মে ভারতচন্দ্র কতখানি রোমান্টিক, তার বিস্তারিত আলোচনা করেছি; ভাষামার্গে তাঁর রোমান্টিক মেজাজের চরিত্রনির্ণয়ও করতে চেয়েছি। কাব্যের ক্ষেত্রে কবির অধিক রোমান্টিক প্রবণতার কথা স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যের ভাষাচরিত্র বিশ্লেষণ করলে শেষ পর্যন্ত প্রমথ চৌধুরীর কথাই সমর্থন করতে হয়।

রোমান্টিক কাব্যরূপে অন্নপূর্ণামঙ্গলের বিচার যে· ধ্যায়ে করেছি সেখানে দেখেছি, প্রমথ চৌধুরী পুরনো বাংলাসাহিত্যে সাবজেকটিভ ও অবজেকটিভ দুই ধারার অস্তিত্ব লক্ষ্য ক'রে ভারতচন্দ্রের কাব্যকে অবজেকটিভ ধারার মধ্যে ফেলেছেন। তাঁর মতে, সংস্কৃত-সাহিত্য মূলে অবজেকটিভ, ফরাসি-সাহিত্যও তাই। কিন্তু ইংরেজি-সাহিত্য আবার মূলে সাবজেকটিভ :

নরম মাটির বাংলাদেশে রোমান্টিক মেজাজ স্বতঃসিদ্ধ, ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে তা বর্ধমান। সাহি·্যর ভারসাম্যের জন্য প্রয়োজন অবজেকটিভ ধারার পুষ্টি, সেটা এদেশে অভিনব কিছু হবে না, কারণ

মঙ্গলকাব্যের বস্তু-ঐতিহ্য রয়েছে— আর ঐ বস্তুসাহিত্যকে মঙ্গলকাব্যের মতো আর্টহীন করবার প্রয়োজনও নেই, যেহেতু সংস্কৃতসাহিত্য অগ্রে বর্তমান।[১৭]

এইসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী চান, ফরাসি-সাহিত্যের চর্চা হোক দেশে, যার দ্বারা তীক্ষ্ণ ক্ষিপ্র সাহিত্য বাংলায় রচিত হতে পারবে।[১৮]

প্রমথ চৌধুরী স্পষ্টভাবে বলেন নি, কিন্তু আমরা যোগ করে দিতে পারি, ভারতচন্দ্র নিজ সাহিত্যে সংস্কৃত ও ফরাসি উভয় সাহিত্যের লক্ষণ মেলাতে পেরেছিলেন। আর্টচর্চার দিক দিয়ে সংস্কৃত ও ফরাসি সাহিত্যের ঐক্য আছে কিন্তু সংস্কৃতে ঐ শিল্পচর্চা ভাষার বর্ণাঢ্য ঐশ্বর্যকে বাদ

১৭। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন : "সঙ্গীতের মতো সাহিত্যও যে একটা আর্ট, এবং যত্ন ও অভ্যাস ব্যতীত এ আর্ট যে আয়ত্ত করা যায় না, এ সত্য আমরা উপেক্ষা করতে শিখেছি। ইংরেজি গদ্যের কুদৃষ্টান্তই এর একমাত্র কারণ। কেননা যে জাতির ক্লাসিকস্ হচ্ছে সংস্কৃত, সে জাতির পক্ষে রচনার আর্ট সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া স্বাভাবিক নয়।"

১৮। ফরাসি-সাহিত্যের রূপলক্ষণ সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী অনেক কথা বলেছেন, আমি সেই অংশটুকু চয়ন করছি, যা ভারতচন্দ্রের সাহিত্য সম্বন্ধেও সত্য :

"মানবচরিত্রের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপরেই ফরাসি-মনোভাব গঠিত।·· হেনরি জেমস বলেছেন, ফরাসি-মনের চোখ চিরদিনই আলোর দিকে চেয়ে রয়েছে। দিনের আলোয় যা দেখা যায় না, ফরাসি-মন স্বভাবতঃই তা দেখতে চায় না; এর ফলে যে মনোভাব অস্পষ্ট ও অস্ফুট, যে সত্য ধরা দেয় না, শুধু আভাসে-ইঙ্গিতে আত্মপরিচয় দেয়, সে মনোভাবের, সে সত্যের সাক্ষাৎ ফরাসি-সাহিত্যে বড় একটা পাওয়া যায় না। সরস্বতী-দর্শনের কাল, ফরাসিকবিদের মতে গোধূলি লগ্ন নয়। যা কেবলমাত্র কল্পনার ধন, সে ধনে ফরাসি-সাহিত্য অনেক পরিমাণে বঞ্চিত। অপরপক্ষে এই আলোকপ্রিয়তার ফলে সে সাহিত্য অপূর্ব স্বচ্ছতা, অপূর্ব উজ্জ্বলতা লাভ করেছে। এর তুল্য স্পষ্টভাষী সাহিত্য ইউরোপে আর দ্বিতীয় নেই।···ফরাসি-সাহিত্য এই অর্থে স্পষ্টভাষী যে, সে সাহিত্যের ভাষায় জড়তা কিংবা অস্পষ্টতার লেশমাত্রও নেই। যে-বিষয়ে লেখকের পরিষ্কার ধারণা আছে, সেই কথা অতি পরিষ্কার করে বলাই হচ্ছে ফরাসি-সাহিত্যের ধর্ম।···ফরাসি-সাহিত্যের ভিতর সায়েন্স ও আর্ট দুইই আছে।" [ফরাসি সাহিত্যের বর্ণপরিচয়]

দিয়ে নয়, ফলে সে ঐশ্বর্য অনেক সময়ে বাহুল্যে পৌঁছেছে। আর ফরাসির চেষ্টাচর্চা বাহুল্যবিনাশে। ভারতচন্দ্র দুই রীতিকেই নিয়েছেন। সেজন্য কোনো একটি সাহিত্যরীতির প্রতি আনুগত্যের গুণদোষ তাঁর উপরে আরোপ করা চলে না। আলঙ্কারিক কবিরূপে যখন তাঁকে দেখতে চাইব, তখন বিশেষভাবে সংস্কৃতরীতির কথা মনে পড়বে। আর যখন তিনি ছুরির ফলার মতো ভাষায় লিখছেন, তখন ফরাসি-রীতির অনুরূপতার কথা মনে আসবে।

ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের দৃষ্টান্তই দেখিয়ে দেয়, বাংলায় পুরো ফরাসি-রীতির প্রবর্তন সম্ভব নয়। ইংরেজির মতোই বাংলাও বর্ণসংকর ভাষা। প্রমথ চৌধুরী বলেন, ইংরেজিতে যেহেতু অ্যাংলো-স্যাক্সন ও নর্মান-ফ্রেঞ্চ, এই দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষার মিশ্রণ হয়েছে, তাই তা বর্ণসংকর ভাষা, কিন্তু বাংলা তা নয়, যেহেতু তাতে বিদেশী শব্দ বেশি নেই। বাংলার ক্ষেত্রে তাঁর কথা আমরা ঠিক বলে মানতে পারি না। ভারত-চন্দ্রের যুগে অন্ততঃ বাংলায় সংস্কৃত, দেশী, এবং আরবী-ফারসী, এই তিন ভিন্নজাতীয় ভাষা-শব্দের যথেষ্ট মিশ্রণ ছিল। তাই এ ভাষাও বর্ণ-সংকর। বর্ণসংকর ভাষায় নানাজাতীয় সাহিত্যরীতি গড়ে ওঠে, লেখকের প্রতিভা অনুযায়ী বিভিন্ন রীতি স্বীকৃতি পায়।[১৯] তাহলে শব্দবিয়োগের দ্বারা ফরাসি সাহিত্য যে-ধরনের একহারা লক্‌লকে ধারালো চেহারা পেয়েছে (প্রমথ চৌধুরী যা বলেন), বাংলাসাহিত্য সে চেহারা পেতে পাবে কি করে? এমন-কি ভারতচন্দ্রও সে চেহারা দিতে পেরেছেন কি

১৯। স্বয়ং প্রমথ চৌধুরীই কি পুরনো বাংলাসাহিত্যে সাবজেকটিভ অবজেক-টিভ দুই ধারার কথা বলেন নি? সাবজেকটিভ বৈষ্ণবকবিতার মধ্যে কি খাঁটি বাংলা এবং মিশ্র ভাষার ব্রজবুলি, উভয় রীতি গড়ে ওঠে নি? ভারতচন্দ্রে দুই রীতির অস্তিত্বের কথা তো বললাম। পরবর্তীকালে বাংলাকাব্যে কি মধুসূদন ও রবীন্দ্র-নাথ দুই পৃথক রীতিকে বলবৎ করেন নি? বাংলা গদ্যের পাঁচ প্রধান স্টাইলিস্ট —বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ এবং প্রমথ চৌধুরী কি নিজস্ব চরম রীতির চেহারা দেখান নি—এবং সেই রীতিগুলি শব্দে ও ভঙ্গিতে কি যথেষ্ট পৃথক নয়? বাংলা বর্ণসংকর ভাষা বলেই এ জিনিস হতে পেরেছে।

করে—তাঁর সাহিত্যে যখন নানা ভাষার শব্দমিশ্রণ আমরা দেখি ? প্রমথ চৌধুরী এ প্রশ্ন উত্থাপন করেন নি, সুতরাং উত্তরও দেন নি। আমরা ধরে নিতে পারি, জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, একথা ঠিক ভারতচন্দ্রে নানা ভাষার শব্দ আছে, কিন্তু তাদের সুনির্বাচিত সাবধান ব্যবহার কবি করেছেন, শব্দনির্বাচনের সময়ে শব্দবর্জন যথেষ্ট করেছেন। তার থেকেও বড় কথা, কবি তাঁর ভাষায় এমন বাহুল্যবর্জিত তীক্ষ্ণতা এনেছেন, যা ফরাসি সাহিত্যের কথা স্মরণ করায়। ভাষাক্ষেত্রে গদাকে তিনি চাবুক করেছেন, গদাই লস্করকে করেছেন তীর-তারা-উল্কা-বায়ুর মতো বেগশীল। এ জিনিস ভারতচন্দ্রের দ্বারা করা সম্ভব হয়েছে বলে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, 'আমাদের ভাষার অন্তরেও ফরাসি ভাষার গতি ও স্ফূর্তি নিহিত আছে। বিদ্যাসুন্দরের মতো কাব্যগ্রন্থ জর্মানের ন্যায় স্থূলকায় গুরুভার শ্লীপদ ও গজেন্দ্রগামী ভাষায় রচিত হওয়া অসম্ভব।' এবং তাঁর দুঃখ, 'আমরা যে-ভাষায় এখন সাহিত্যরচনা করি, সে ভারতচন্দ্রের ভাষা নয় ; ইতিমধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের অনুকরণে আমরা সে ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেছি, অর্থাৎ তার গায়ে একরাশ মুখস্থ-করা শব্দ চাপিয়ে দিয়ে তার ভার বৃদ্ধি করেছি, তার গতি মন্দ করেছি।'

যে-বিশেষ গুণের জন্য প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রের ভাষার ঐ উচ্চ প্রশংসা করলেন, সেই গুণ বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত অনিচ্ছুকভাবেও লক্ষ্য করেছিলেন ; না হলে তিনি কখনই বলতেন না, ভারতচন্দ্র আধুনিক বাংলাভাষার জন্মদাতা। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে ঠিক কোন্ অর্থে *Father of Modern Bengali* কথাগুলি বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তা ব্যাখ্যা করেন নি। ধরে নিতে পারি, তিনি বলতে চেয়েছিলেন, আধুনিক সাহিত্যের ভাষা জীবনের সর্বাঙ্গীণ পরিচয়কে বহন করবার শক্তি ধরবে, কেবল পরিচিত কিছু মনোভাব বা চেনা হৃদয়ভাবকে পুরনো পদ্ধতিতে প্রকাশ করেই তৃপ্ত থাকবে না।[২০] ভারতচন্দ্রের ভাষাকে

২০। বঙ্কিমচন্দ্র ধরা পড়ে গিয়েছেন। সর্বাঙ্গীণভাবে বলতে গেলে, তিনিই বাংলা সাহিত্যিক গদ্যভাষার জন্মদাতা। স্বতঃই তিনি অশ্লীল ভারতচন্দ্রের কাছে

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, একদিকে তিনি জ্ঞানবস্তু প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে সজীব জীবনের চঞ্চলতাকে ধরেছেন। সাধারণের মুখের কথাকে সাহিত্যকর্মে লাগিয়ে ভাষার দেহরক্তে স্বাস্থ্যের উন্মাদনা এনে দিয়েছিলেন, আবার তার উপরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন অলঙ্কারদ্যুতি। তার ফলে মণিকক্ষের ধাতব আলোক এবং হাট-মাঠের রৌদ্রকিরণ, দুইই তাঁর ভাষায় মেলে। অসাধারণ ক্ষমতায় তিনি ভাষারাজ্যে প্রাসাদ ও প্রান্তরের ব্যবধান কমিয়ে দিয়েছিলেন।[২১]

শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল কী? ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সমালোচক চৌধুরী মহাশয়কেই অবলম্বন করা যাক। ইংরেজি প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, 'শিল্পকর্ম-হিসাবে ভারতচন্দ্রের রচনার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, পুরনো বাংলাসাহিত্যের গোটা আয়তনের মধ্যে তেমন কোনো কিছুর দেখা মিলবে না' (এমন লেখার সময়ে তিনি গোবিন্দদাসের কথা ভুলে গিয়েছিলেন)—'এক কথায় তার নাম সাহিত্যের ভাস্কর্য।' 'ভারতচন্দ্রের ভাষা সম্বন্ধে বলতে পারি, সমস্ত বাংলাসাহিত্যের মধ্যে এর

ঋণস্বীকারে অনিচ্ছুক (যেমন পরবর্তীকালে অশ্লীল হুতোমের কাছে), কিন্তু ঐ একটি বাক্যে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। বঙ্কিমের বাংলার পিছনে কে ছিলেন—বিদ্যাসাগর? হাঁ, ছন্দে। প্যারীচাঁদ—চলিত ভাষায়? না। ভারতচন্দ্রই তাঁর চেতনায়, চাঞ্চল্যে, ভেদশক্তিতে, সংক্ষিপ্তিতে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে, কামবশ্যতায় বঙ্কিমকে প্রভাবিত করেছেন। 'কামবশ্যতা' কথাটি যদি বিস্ময়কর মনে হয়, তাহলে মোহিতলাল যে বদলী শব্দটি প্রয়োগ করেছেন, তাকেই পাঠক গ্রহণ করুন—'রূপমোহ।' সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র—বঙ্কিম বলেছেন। হায়, সুন্দর শব্দটির সঙ্গে ভারতচন্দ্র চিরকালের জন্য একটি বিশেষ মুখের ছবি সেঁটে দিয়েছেন!

২১। প্রমথ চৌধুরী যে বলেছেন, আমরা ভাষামার্গে ভারতচন্দ্রের অনুসরণ করতে পারি নি, সে-কথা ঠিক। রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে বাংলাসাহিত্যে ভাষা-শুচিতার প্রতি পক্ষপাত খুব বেড়ে গিয়েছিল। ভিক্টোরীয় নীতিবাদের দ্বারা লালিত ব্রাহ্ম নীতিবাদ এর জন্য দায়ী, এ কথা অন্ততঃ ডঃ সুশীলকুমার দে মনে করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক প্রতিভা এক আশ্চর্য সৌন্দর্যের জগৎ নির্মাণ

চেয়ে বেশি স্বচ্ছ, বেশি উজ্জ্বল, বেশি লাবণ্যময়, বেশি মার্জিত কিছু নেই। আমাদের ভাষাদেহে সৃষ্টির নমনীয় সম্ভাবনা কতখানি আছে, তা এদেশের মানুষ জানতই না, যতদিন-না ভারতচন্দ্র তার দ্বারা নিখুঁত সৌন্দর্যের বাক্‌প্রতিমা নির্মাণ করেছিলেন, রেখাবিন্যাসে যা অভ্রান্ত দৃঢ়, অবয়বসংস্থানে অপূর্ব ছন্দোময়।' (অনূদিত)। বলাবাহুল্য প্রমথ চৌধুরীর কাছে এহেন ভারতচন্দ্র 'সাহিত্যের চরম কারুশিল্পী হিসাবে গুরুস্থানীয়।' হবেনই, যেহেতু তিনি স্বীকারই করতে রাজি নন, 'যে-কবিতায় দেহের সৌন্দর্য নেই, তার আত্মার সৌন্দর্য আছে।'

রূপময় কাব্যের প্রতি এই রূপরসিক সমালোচকের সমাদরবাক্য :

"ভারতচন্দ্রের হাতে বঙ্গসরস্বতী একেবারে 'তন্বীশ্যামা শিখরদশনা' রূপ ধারণ করেছেন। যাঁর অন্তরে বঙ্গভাষা এই প্রাণবন্ত সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ লাভ করেছে, তাঁর যে কবিপ্রতিভা ছিল, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। বাংলাভাষাকে শাপমুক্ত করা যদি তাঁর একমাত্র কীর্তি হত, তাহলেও আমরা বাঙালি লেখকেরা তাঁকে আমাদের গুরু বলে স্বীকার করতে তিলমাত্র দ্বিধা করতুম না। অমন সরল ও তরল ভাষা তাঁর পূর্বে আর কেউ লিখেছেন বলে আমি জানি নে।"

করেছিল; সেই রোমান্টিক স্বপ্নলোকের কুহককোমল ভাষা তাঁরই ভাষা, অনমুকরণীয়, কিন্তু বহুভাবে অনুকৃত হয়ে বাংলা গদ্যসাহিত্যে এক অস্বাস্থ্যকর বাষ্পচ্ছায়া সৃষ্টি করেছিল। তার থেকে মুক্তিলাভের প্রয়োজন সাহিত্যিকেরা বোধ করেছিলেন। সৌন্দর্যের কারাগারও কারাগার। উক্ত কারাগারে স্বেচ্ছাবন্দী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা গদ্যের খাতবদল' প্রবন্ধে বলতে চেয়েছিলেন, অতিরিক্ত সংস্কৃতানুসরণ বাংলাভাষার পেশলতা হরণ করে নিয়েছে। গদ্যে পেশীশক্তি আনতে দেশী শব্দশক্তির ব্যবহার প্রয়োজন।

সংস্কৃতের মহাপণ্ডিত ভারতচন্দ্রের ভাষা এক্ষেত্রে আদর্শ। তৎসম শব্দের সঙ্গে প্রচুর তদ্ভব ও দেশজ শব্দ মেলাতে তিনি দ্বিধা করেন নি, টেনে এনেছিলেন হিন্দী ও আরবী-ফারসী শব্দকে, তারপর সব কিছু গলিয়ে নিয়েছিলেন তপ্ত জীবনপাত্রে। সংস্কৃতের মার্জনায় ভাষাকে কি পরিমাণে অর্থবহ করা যায়, আবার তাকে গ্রাম্য শব্দের সঙ্গে জুড়ে দংশনক্ষম সর্পপটুত্ব দেওয়া যায়—তার আদর্শ দৃষ্টান্ত আছে তাঁর ভাষায়।

প্রমথ চৌধুরী আরও বলেছেন। কবিতায় ভারতচন্দ্রের কাব্যের বাসনারূপের বন্দনা করেছেন। (বিস্ময়ের কথা, হরচন্দ্র দত্ত ভারতচন্দ্রের কাব্যে বাসনা বা প্যাশনের সন্ধান পান নি!)—

জলন্ত অঙ্গার চোর! তোর প্রতি শ্লোক,
দেহ আর মন যাতে একত্র গলিয়া
হয়েছে পুষ্পিত, রূপে মর্ত্য উজলিয়া—
কামনার অগ্নিবর্ণ রক্তাক্ত অশোক!

প্রমথ চৌধুরীকে একেবারেই পছন্দ করতেন না বাংলাসাহিত্যের বিখ্যাত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যাঙ্গনে ফুল্ল হৃদয়ে দুজনেই উপস্থিত :

"ভারতচন্দ্র বাংলাভাষার প্রথম সাহিত্যশিল্পী এবং বৃটিশপূর্ব যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্যকার। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর সহিত তুলনা করিয়া অনেকে তাঁহার কবিশক্তির ন্যূনতা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র যে বাংলাভাষার কে, এবং তাঁহার ভাষা যে কাব্যের পক্ষে কী, এই জ্ঞান যাঁহাদের নাই, তাঁহারাই প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে ভারতচন্দ্রের স্থান কোথায় তাহা বুঝিতে ভুল করেন। ভারতচন্দ্রের কবিতায় প্রধান রস তাহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, এবং তাহাও বাংলাভাষারই। তিনি বাংলাভাষাতরুর শুধুই ফুল নয়—পাতাগুলি পর্যন্ত লইয়া, সেই তরুরই আশ্রিত গুলঞ্চ-লতার ডোর দিয়া, সাহিত্যের যে-রূপকর্ম করিয়াছেন, সেকালে বাঙালির পক্ষে তাহা এক অভাবনীয় বস্তু। ভারতচন্দ্র ভাষাকে যেন একখানি শান্তিপুরী শাড়িমাত্র পরাইয়া, পায়ের মল কয়গাছির মাপ ঠিক করিয়া এবং মাথার চুল একটু ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিয়া—তাহাব শ্রী যেরূপ বাড়াইয়াছেন, এবং কেবল তাহারই কারণে সেই সুচতুরা স্বল্পভাষিণী যুবতীর চোখে যে কটাক্ষ, এবং অধরে যে হাসির ভঙ্গিমা ফুটিয়াছে—সে যে কত বড় প্রতিভার কাজ, তাহাতে কি কোনো সন্দেহ আছে।...ভারতচন্দ্রের পূর্বে বাংলায় গান ছিল, গানের উপযুক্ত ভাষাও ছিল ; কিন্তু এমন কাব্যও ছিল না, কাব্যের উপযুক্ত ভাষাও ছিল না।" ['বাংলা কবিতার ছন্দ']

ভারতচন্দ্রের কাব্যের রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে সমালোচকেরা আলঙ্কারিক হয়ে পড়েন ভাবাবেগে। সে এমন রূপ যে, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সকৌতুকে বলেছিলেন, নিরাকারবাদী ব্রাহ্মরাও বোধহয় কালে ঐ সুন্দরের মূর্তি গড়িয়ে পূজা করবেন।[২২] হরচন্দ্র দত্ত ভারতচন্দ্রের কাব্যের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টে দেখেছিলেন, 'প্রত্যেক নূতন পৃষ্ঠায় নূতনতর সঙ্গীত, সুন্দরতর অলঙ্কার। পাঠকেরা যেন কোনো এক রস-জটিল মধুবনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলে।' হীরেন্দ্র দত্ত-কথিত এই 'অশ্লীলতার চারুশিল্প'[২৩] সম্বন্ধে বলতে গিয়ে গঙ্গাচরণ সরকার বিশেষ লীলায়িত হয়েছেন: 'ভারতচন্দ্র এই ভাষাকে কখন নাচাইয়াছেন, কখন দোলাইয়াছেন, অতি যত্নের সহিত তাহার অঙ্গরাগ করিয়াছেন, এবং নানা অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়াছেন; ইনি যেন বঙ্গভাষাকে বড় মানুষের মেয়ে করিয়া তুলিয়াছেন, এবং ইহাকে যেন যৌবনের প্রথম সীমায় লইয়া গিয়াছেন।' কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ভারতপ্রসঙ্গে আলঙ্কারিকদের মধ্যে একেবারে রসবাদী। তিনি খোলাখুলি বলেছেন, রস না খেলে ভাষায় ও-রস আনা সম্ভব নয়: 'আমরা এই সময়ের দুই এক-জন কবিকেও সুরাপান করিতে দর্শন করি।...এই কালের ভাষা সুরা-পায়ী ব্যক্তির উদার মুক্তকণ্ঠের ন্যায় সরল ও সুমধুর; ইহাতে কোনো-রূপ আবর্জনা নাই—সর্বত্রই সুপরিষ্কৃত ও মসৃণ।'

কৈলাস ঘোষের মতো উদারচরিত নন নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি কতভাবে ভারতচন্দ্রকে মারতে চেয়েছেন, আগে দেখেছি। এখন দেখা যাক, ভাষা-প্রসঙ্গে তিনি কেমন মরি মরি করেছেন।—

২২। একেশ্বরবাদ যে শেষে পৌত্তলিকতায় পরিণত হয়, তা বোঝাতে গিয়ে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, "ব্রাহ্মরা বলিতেছেন, 'নিরাকারে ঈশ্বর পরম সুন্দর।' কালে বোধহয় ভারতচন্দ্রের সুন্দরের মূর্তি নির্মিত হইয়া ঈশ্বর বলিয়া আরাধিত হইবে।" [সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৭ম; 'চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়']

২৩। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা' (সাহিত্য বৈশাখ, ১৯১২) প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

"তবে কি ভারতচন্দ্র কবি নন ? কবি নন, একথা কে বলিবে ?··· ভাষা এত সুন্দর কাহার ? মর্মরপাষাণের উপব উজ্জ্বলপ্রভ মণি-মাণিক্যের মতো এক-একটি কথা যেন ঘষিয়া মাজিয়া খুদিয়া গলাইয়া বসানো হইয়াছে।···ভারতের কাব্য কথার তাজমহল। এত সাংসারিক জ্ঞান এত সামান্য কথায় কোন্ কবির প্রতি চরণে প্রতিভাত ? কাহার কথা বাঙালির এত গৃহের কথা হইয়াছে ? ভারতচন্দ্র বাংলা পদ্যের যে গঠন গড়িয়াছেন, সে বিশ্বকর্মার কারিগরিতে কে না চমৎকৃত !—রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মধুর গঠনে আজও তাঁহার প্রসাদভোগী।···আমরা জানি না, কোনো বাঙালি কবির গান সময়েব অস্থিমজ্জার ভিতর এত অন্তঃপ্রবিষ্ট কি না! কম সৌভাগ্যেব কথা নহে—অনেক সময়ে দেশে ভারত-শব্দে তাঁহাকেই বুঝায়।"

দেশপ্রেমিক ও সিভিলিয়ান রমেশ দত্ত ভারতচন্দ্রকে সমাজবিরোধী আসামীরূপেই দেখেছিলেন; তিনিও 'ছন্দ-তরঙ্গ প্রবাহিত করাব ব্যাপারে কবির বিরল ক্ষমতা'র কথা না বলে পারেন নি। 'পৃষ্ঠাব পর পৃষ্ঠা উল্টে যাওয়া যায় একই সুখানন্দে।' 'কলানৈপুণ্যে ও রচনা-লাবণ্যে মুকুন্দরামের চেয়ে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ' এই কবি 'ভাষার অঙ্গ-মার্জনা যেভাবে কবেছেন, তার বিষয়ে কোনো উক্তিই অত্যুক্তি নয়।' 'ভারতচন্দ্রের স্টাইল সর্বদাই বৈভবময়, লাবণ্যময়, প্রবহমাণ।' 'বাংলা-ভাষা কোমল, বাংলাকাব্য সঙ্গীতময়, কিন্তু ভাবতচন্দ্র দেখিয়েছেন. ছন্দ-সঙ্গীতের সৌষম্যকে কোন্ চরমসীমায় নিয়ে যাওয়া যায়।'

দীনেশচন্দ্র সেন সিভিলিয়ান নন কিন্তু শিক্ষক, সুতরাং বিদ্যামন্দিরের শাসনকর্তা। দুষ্ট লেখকটিকে কিভাবে তিনি শায়েস্তা করেছেন, তা যথেষ্ট দেখেছি। হায়, তিনিও ভারতচন্দ্রের কাব্যহারটির রচনা-নৈপুণ্যে মোহিত, যদিও হার যেখানে দোলে, সেখানে দৃষ্টি দেবার দুর্নীতি তাঁর ছিল না:

"জয়দেব দেবভাষাকে যে ললিতকলায় শোভিত করিয়াছেন, ভারত-চন্দ্রের বাংলায় সেই কোমলতার শ্রী আরও অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে। বঙ্গভারতীর কণ্ঠে তিনি যে, সাতনরী হার দোলাইয়া দিয়া-ছেন, তাহার প্রত্যেকটিতে দামী পাথর ও মণিমাণিক্যের প্রভা স্পষ্ট।"

কণ্ঠহারের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের কাব্যের তুলনার ক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্র অবশ্য মৌলিক নন। রবীন্দ্রনাথ অল্প আগে সে উপমা প্রয়োগ করে ফেলেছেন। ভারতচন্দ্রের সযত্ন রচনার পিছনে কোন্ পরিবেশগত কারণ ছিল, তা রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন :

"পূর্বকালের গানগুলি হয় দেবতার সম্মুখে নয় রাজার সম্মুখে গীত হইত—সুতরাং স্বতঃই কবির আদর্শ অত্যন্ত দুরূহ ছিল। সেইজন্য রচনার কোনো অংশেই অবহেলার লক্ষণ ছিল না, ভাব ভাষা ছন্দ রাগিণী সকলেরই মধ্যে সৌন্দর্য এবং নৈপুণ্য ছিল। তখন কবির রচনা করিবার এবং শ্রোতৃগণের শ্রবণ করিবার অব্যাহত অবসর ছিল ; তখন গুণিসভায় গুণাকর-কবির গুণপনাপ্রকাশ সার্থক হইত।"

গুণাকর-কবির গুণপনার রূপ রবীন্দ্রনাথ এইভাবে দেখেছেন :

"রাজসভাকবি রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গলগান রাজকণ্ঠের মণি-মালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।"

ভারতচন্দ্রের অনেক দোষ। তাঁর কাব্যের চরিত্র ভাল নয়। তা দেশের অনেক ক্ষতি করেছে। সমালোচকেরা এসব কথা বলেছেন। পারলে তাঁরা কবির চিতাভস্ম যোগাড় করে ফাঁসি দিতেন। কিন্তু দিতে পারেন নি—ঐ একটি কারণে—রূপের ছলনা। মাদক মোহন রূপের কুহক। সর্বশেষ অধ্যায়ে সমালোচকগণের সেই রূপানুরাগের বিবরণই দিলাম—মরণ জেনেও কিভাবে তাঁরা উক্ত বিষকন্যাকে আলিঙ্গন করেছেন, তারই ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথও দেখলেন মণিমালা। বললেন, সে মালা রাজকণ্ঠের। সত্যই ? এখন রাজতন্ত্র নেই। তাই বলে কি সে মালা ধুলোয় লুটোচ্ছে ? নহে। রাজা প্রজা সকলেরই জীবনসত্য মর্মান্তিকভাবে কবি প্রকাশ করছিলেন :

'পরিণাম, হরিনাম আর কামপাশ।'

নির্ঘণ্ট

[এই নির্ঘণ্টে সকল নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। ভারতচন্দ্রের ত্রয়ী কাব্য এবং তার অন্তর্গত অধ্যায়গুলির নামও দেওয়া হয় নি। তাঁর অন্য রচনার নামোল্লেখ অবশ্য করা হয়েছে। বৈষ্ণবকাব্য, মঙ্গলকাব্য, স্থান-নাম ইত্যাদি মোটামুটি বাদ দেওয়া হয়েছে। উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে যেসব নাম আছে সেগুলি রচনার বা গ্রন্থের নাম।]

কয়েকটি ভুল সংশোধন করে নিতে অনুরোধ করি : ১৭ পৃ. পা-টী-তে ৩ লাইনে 'কৃষ্ণচন্দ্রের'-এর বদলে 'কৃষ্ণনগরের'; ১০৫ পৃ ১৩ লাইনে 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব'-এর বদলে 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি' ; ১১৭ পৃ. পা-টী-তে 'রঙ্গিনী পরী'-এর বদলে 'রঙ্গময় পরী-ছোকরা' ; ২৪০ পৃ. ২৫ লাইনে 'সভ্যতাকে'-এর বদলে 'সত্যতাকে' ; ৩০৪ পৃ ২০ লাইনে 'অবিকৃত'-এর বদলে 'কবিকৃত' হবে।



ভারতচন্দ্র কে? কী?

সাহিত্যের দুরন্ত প্রতিভা এই কবির সম্বন্ধে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। রামমোহন : কবিতা লেখার ইচ্ছা ছিল আমার, কিন্তু ভারতচন্দ্রের পরে ও কাজ করা আর সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগর : সংস্কৃতে যেমন কালিদাস, বাংলায় তেমনি ভারতচন্দ্র। রমেশ দত্ত : কবির শক্তি আছে ঠিকই, তবে শয়তানের শক্তি। বঙ্কিমচন্দ্র : আধুনিক বাংলা ভাষার জন্মদাতা —নোংরা অনুগামীদেরও জন্মদাতা। মধুসূদন : আমাদের পোপ, কিন্তু জঘন্য ধাবার প্রবর্তক। পাদ্রির ওয়েজার : ইতালীয় গীতিনাট্যের তুল্য এঁর কাব্য। রেভারেন্ড লঙ : বাংলার হোরেস; বাংলার বার্নস। রবীন্দ্রনাথ : রাজকণ্ঠের মণিমালা রচনা করেছেন, আবার সমাজের তলায় সুড়ঙ্গ কেটেছেন। প্রমথ চৌধুরী : যেন ফরাসী মাস্টারপিস—বাংলা সাহিত্যে কামনায় অগ্নিবর্ণ রক্তাক্ত অশোক।—

শঙ্করীপ্রসাদ বসু, অধ্যাপক, গবেষক, লেখক—বহু দুষ্প্রাপ্য লেখা উদ্ধার করে ভারতচন্দ্র-সমালোচনার দীর্ঘ ইতিহাস লিখেছেন। সেই সঙ্গে নিজের বক্তব্য বলেছেন। পুরনো সাহিত্যের নবমূল্যায়নে এই অগ্রণী লেখক, যাঁর বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনাকে অতুলনীয় মনে করেছেন ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—বহুনিন্দিত ভারতচন্দ্রের মধ্যে ইনি আবিষ্কার করেছেন একজন চিরকালের মানুষকে, আদর্শে উদ্বুদ্ধ, দ্বন্দ্বে আলোড়িত, যিনি আত্মখণ্ডনের রক্তে রাঙিয়েছেন নিজের সাহিত্যকে—